বাংলাদেশের রাজবংশী : সমাজ ও সংস্কৃতি

অশোক বিশ্বাস

সাহিত্যলোক
৩২/৭ বিডন স্ট্রীট। কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯৭

প্রকাশক · নেপালচন্দ্র ঘোষ
সাহিত্যলোক। ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট। কলিকাতা - ৭০০০০৬

প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী

মুদ্রাকর নেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স। ৫৭/এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। কলিকাতা - ৭০০০০৬

কম্পিউটার টাইপসেটিং মা দুর্গা লেজার
৩৭ জি. সি. ঘোষ রোড। কলিকাতা - ৭০০০৪৮

উৎসর্গ

এসো আলোকে ববণে মধুবও পবনে কাঞ্চন চরণে
মম হৃদি মাঝে আলোকে .

স্বজাতিগোষ্ঠীব উন্নয়নে নিবেদিত বাজবংশীদেব উদ্দেশে —

প্রাক্‌কথন

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্ত যেসব নৃতাত্ত্বিক গবেষক, ঔপনিবেশিক আমলের ইংরেজ সিভিলিয়ান, চিকিৎসক, ঐতিহাসিক ও নৃবিজ্ঞানী রাজবংশীদের উপর গবেষণা ও মন্তব্য করেছেন তাঁদের সবাই ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, কোচ ও পলিয়া জাতিগোষ্ঠীর রক্তমিশ্রণজাত সম্প্রদায়ই হচ্ছে রাজবংশী, যারা নিজেরা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত ক্ষত্রিয়ত্বের দাবিতে অন্দোলন করেছিল বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। এই রাজবংশীরাই পরবর্তীকালে নিজেদের ক্ষত্রিয় রাজবংশী হিসাবে পরিচয় দিয়ে থাকে। গবেষকদের গবেষণা মন্তব্য থেকে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে কীভাবে, কোন সময়কালে এবং কোন প্রেক্ষাপটে কোচ, পলিয়ারা রাজবংশী নামে নূতন জাতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে? *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, বৃহদ্ধর্মপুরাণ,* পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত দেবীবর মিশ্রের *খেলবিধি,* ধ্রুবানন্দ মিশ্রের *কুলকারিকা* প্রভৃতি গ্রন্থে কোচ জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। *যোগিণীতন্ত্র* ও *পদ্মপুরাণে,* সপ্তদশ শতাব্দীর *তারিখ-এ-আসাম, আলমগীরনামা,* অষ্টাদশ শতাব্দীর *রিয়াজস্ সালাতিন,* উনিশ শতকের *মোর্সেদ জাঁহানামা* প্রভৃতি মুসলমান ঐতিহাসিকদের গ্রন্থে কোচ ও মেচ জাতির কথা উল্লেখ আছে। মধ্যযুগের বাংলা *মঙ্গলকাব্যগুলোতেও* প্রাচীনকাল থেকে কোচ রমনীর প্রতি শিবের আসক্তি ও প্রেমের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। বর্তমানেও উত্তরবঙ্গের কোথাও কোথাও কোচ-রাজবংশী, ও কোচ-পলিয়া ও পলিয়া-রাজবংশী কথাগুলো শোনা যায়। বেদ, পুরাণ, মনুসংহিতা ও উপরিউক্ত গ্রন্থগুলোতে কোথাও জাতি হিসাবে 'রাজবংশী'দের উল্লেখ পাওয়া যায় না। সর্বপ্রথম ডাঃ বুখানন হ্যামিল্টন (১৮০৭-১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে) কোচদের সাথে একত্রিত করে 'রাজবংশী'দের উল্লেখ করেছেন। সুতরাং সঙ্গত কারণে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ঐসব শাস্ত্রগ্রন্থগুলো রচনাকালে 'রাজবংশী' নামে কোনো জাতি আত্মপ্রকাশ করে নি। ভারতবর্ষে কোচ জাতির প্রথম বসতি এলাকা আসাম ও কুচবিহার। এব্যাপারে আসাম সম্পর্কিত ই.এ. গেইট এর আদমশুমারি প্রতিবেদন, আর, এইচ. এস হাচিনসন এর *ইসটার্ন বেঙ্গল এণ্ড আসাম ডিস্ট্রিক গেজেটিয়ার* ও ই. টি ডাল্টনের *জাতিতাত্ত্বিক গ্রন্থে* সমর্থন পাওয়া যায় যে, ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কোচ জাতির রাজা হাজোর বংশধরেরা রাজার বংশধর হিসাবে কোচ নাম ত্যাগ করে 'রাজবংশী' নাম গ্রহণ করেছে। এই কোচ ও পলিয়া জাতিগোষ্ঠী পরবর্তীকালে রাজংশোদ্ভূত 'রাজবংশী' নাম গ্রহণ করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে। কোচ জাতির যেসব লোক আর্থিকভাবে সচ্ছল ছিল, তারা রাজার অনুগামী ছিল ও সাহচর্য লাভ করেছিল এবং 'রাজবংশী' নাম গ্রহণ করে কোচদের থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল। ফলে বর্তমান সমাজ ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে কোচদের সাথে কিছু ব্যাপারে মিল পাওয়া গেলেও অমিল পাওয়া যায় অনেক ব্যাপারে।

রাজবংশীদের উৎপত্তি বিষয়ে নৃতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক ও ইংরেজ সিভিলিয়ান পণ্ডিতগণেব মতামত থেকে জানা যায় যে, রাজবংশীরা দৈহিক গঠনগত দিক দিয়ে আদি মঙ্গোলয়েড (proto-Mongoloid) শ্রেণীভুক্ত, তবে তাদের মঙ্গোলয়েড রক্তের সাথে বেশ কিছুটা প্রটো-অস্ট্রালয়েড রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে বলেও মতামত পাওয়া যায়। আর ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণের মতামত থেকে জানা যায় যে, তারা বৃহত্তর বোড়ো (Bodo) ভাষাগোষ্ঠীর একটি সম্প্রদায়। বর্তমান রাজবংশীরা বোড়ো ভাষা হারিয়ে বাংলা ভাষায় কথা বললেও তাদের ভাষাকে পণ্ডিতগণ কামরূপী ভাষা বা রাজবংশী ভাষা বলে উল্লেখ করেছেন। বর্তমান রাজবংশী ভাষাতে এখনো বোড়ো ভাষার সংমিশ্রণ, বোড়ো ভাষার উৎসজাত শব্দাবলী ও বোড়ো ভাষার অপভ্রাংশ শব্দ পরিলক্ষিত হয়। এখনো তাদের ভাষায় বাংলা ক্রিয়াপদে ও বিশেষ্য পদের শেষে ও মাঝে 'ঙ' 'ং' এবং 'ম' এর উচ্চারণ ও ব্যবহার প্রচুর পরিমাণে লক্ষ করা যায়। এইসব শব্দ রাজবংশীদের কথ্যভাষায় বহুল প্রচলন রয়েছে বলে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাদের আদি ভাষাকে বোড়ো ভাষা বলে চিহ্নিত করেছেন। ভাষাতাত্ত্বিক J.D. Anderson-এর সাথে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একমত পোষণ করে বাংলা ভাষা নির্মাণে বোড়ো ভাষার শক্তিশালী প্রভাবের কথা স্বীকার করেছেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর *The Origin and Development of the Bengali Language* গ্রন্থে লিখেছেন, "J. D. Anderson saw a strong 'Bodo' influence in the growth of Bengali language. He postulated that Bengali syntax and accentuation were influenced by Bodo language." পরবর্তীকালে Baden Powel, Clarence T. Maloney, ভাষাবিদ রফিকুল ইসলাম প্রমুখ বাংলা ভাষায় বোড়ো ভাষার প্রভাবের কথা স্বীকার করেছেন। বাংলা ভাষার আদি-নিদর্শন *চর্যাপদ* ও *মঙ্গলকাব্যগুলোর* ভাষা ও সংস্কৃতি বিশ্লেষণ করলে বৃহত্তর উত্তরবঙ্গের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাব প্রমাণিত হয়, যার সংস্কৃতি রাজবংশীরা আজও লালন করে।

বর্তমানে রাজবংশীরা বৃহত্তর রংপুর, দিনাজপুর, পাবনা, যশোর, ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, বগুড়া জেলাতে বসবাস করছে। ১৮৭২ সালের আদশুমারির রিপোর্ট অনুযায়ী বর্তমান বাংলাদেশ সীমানা এলাকায় এদের বসবাস ছিল ৫,১৫,৩১৪ জন। ১৯২১ ও ১৯৩১ সালে বাংলা অঞ্চলে এদের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৭,২৭,১১১ এবং ১৮,০৬,৩৯০। ১৯৫১ ও ১৯৬১ সালে রাজবংশীদের আদমশুমারি প্রতিবেদনে হিন্দু হিসাবে গণনা করায় প্রকৃত সংখ্যা পাওয়া যায় নি। ১৯৯১ সালের আদমশুমারিতে রাজবংশীদের আলাদাভাবে গণনা করা হলেও অল্পশিক্ষিত, অসচেতন গণনাকারীদের গণনা ও রাজবংশীরা হিন্দু ধর্মাবলম্বী হওয়ায় আলাদাভাবে শুধুমাত্র যশোর, টাঙ্গাইল, জয়পুরহাটে সর্বমোট ৭,৫৫৬ জনকে রাজবংশী হিসাবে গণনা করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ সংখ্যা অনেক অনেক বেশি হবে। রাজবংশীরা বর্তমানে নিজেদের ক্ষত্রিয় হিসাবে পরিচয় দেয়। তবে পাশাপাশি জাতিগোষ্ঠী হিসাবে তারা যে রাজবংশী এটাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বীকার করে নেয়। গবেষকদের প্রচুর গবেষণা থেকে জানা যায় যে, বৈদিক আমলের বর্ণভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণ ছিল। সেখানে কোনো বহু জাতিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা ছিল না। পরবর্তীকালে এই তিন বর্ণের সেবাদাস হিসাবে বহুজাতিভিত্তিক ও পেশাভিত্তিক কয়েকটি জাতিগোষ্ঠীকে (যারা তৎকালীন ভারতবর্ষে আর্যদের তৈরিকৃত বর্ণভিত্তিক সমাজব্যবস্থার

বাইরে ছিল) শূদ্র বর্ণে উন্নীত করে চতুর্বর্ণভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা চালু করেন। এই চতুর্বর্ণের বাইরে আরো অনেকগুলো কৌম সমাজ থেকে যায়, যাদের বেদ, উপনিষদ ও মনুসংহিতায় ম্লেচ্ছ, অনাস, শবর, পুলিন্দ, কিরাত, নিষাদ জাতি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ভারতবর্ষে আর্যকর্তৃক বর্ণভিত্তিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হলেও অনেকগুলো পেশাভিত্তিক জাতিগোষ্ঠী বর্ণব্যবস্থার বাইরে থেকে যাওয়ার ফলে বর্ণভিত্তিক সমাজব্যবস্থা কখনো প্রতিষ্ঠিত হয় নি, বরং বহুজাতিগোষ্ঠীভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। বৈদিক আমলের বর্ণভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় ক্ষত্রিয়দের দৈহিক গঠন, পেশা হিসাবে যুদ্ধ, অমাত্যবর্গের ও রাজন্যবর্গের কাজ ছিল, যা ক্ষত্রিয় রাজবংশীদের সাথে সম্পূর্ণ পার্থক্যপূর্ণ। আর্য ক্ষত্রিয়দের দৈহিক গঠন ব্রাহ্মণদের অনুরূপ, কিন্তু রাজবংশী ক্ষত্রিয়দের দৈহিক গঠন মঙ্গোলীয়। তবে রাজবংশীদের রক্তে বেশ কিছুটা প্রটো-অস্ট্রালয়েড জাতির রক্ত সংমিশ্রণ ঘটেছে। উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে এটা কম হয়েছে, কিন্তু বৃহত্তর যশোর, পাবনা, ঢাকার রাজবংশীদের মধ্যে প্রটো-অস্ট্রালয়েড রক্তই সবচেয়ে বেশি। এটি কেন ঘটেছে-সেটি অনুসন্ধান সাপেক্ষ। এসব এলাকায় রাজবংশীদের অধিকাংশের চেহারার বৈশিষ্ট্য অবিকৃত নেই। পেশা হিসাবে রাজবংশী ক্ষত্রিয়দের রয়েছে কৃষিকাজ ও মৎস্যভিত্তিক জীবিকা। তা ছাড়াও নীহাররঞ্জন রায়, ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার ও ড. অতুল সুর প্রমুখ ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিকগণের বিশ্লেষণ থেকে জানা যায় যে, বাংলা অঞ্চলে কখনো ক্ষত্রিয়দের আগমন ঘটে নি। রাজবংশীদের ক্ষত্রিয়ত্ব দাবির আন্দোলন ও ব্রাহ্মণ্য ব্যবস্থায় পুরোহিত দ্বারা মন্ত্রপাঠের মাধ্যমে বিয়ের ক্ষেত্রে একটি ব্যাপারে আপত্তি ওঠে যে, ক্ষত্রিয় বিয়ের ক্ষেত্রে একই গোত্রে কখনো বিয়ে হয় না। কিন্তু রাজবংশীদের সমাজ ব্যবস্থায় কোনো গোত্র প্রথা ছিল না, ছিল গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা, যা এখনো বর্তমান। ক্ষত্রিয়ত্ব দাবির আন্দোলনের ফলে তারা কলকাতা হাইকোর্টের শরণাপন্ন হলে হাইকোর্ট এক রুলনিশি জারির মাধ্যমে তাদের কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য, পরাশর, ভরদ্বাজ প্রভৃতি বারোটি গোত্রের নাম প্রদান করেন। কিন্তু বাস্তবে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় তারা সকলেই কাশ্যপ গোত্র দাবি করেন। এছাড়াও মৃত আত্মার সদ্‌গতির জন্যে শ্রাদ্ধের ব্যাপারে ক্ষত্রিয়রা বারো দিনে শ্রাদ্ধ করে থাকে। ক্ষত্রিয়ত্ব আন্দোলনের ফলে বর্তমান রাজবংশীরা বারো দিন পর শ্রাদ্ধ করলেও অর্ধশতাব্দী আগ পর্যন্তও তাদের সমাজে ত্রিশ দিনে মৃত আত্মার শ্রাদ্ধ করা হতো, যে-ব্যবস্থাটি আজো মানিকগঞ্জের দৌলতপুরের রাজবংশীদের মধ্যে বহাল পাওয়া যায়। রাজবংশীদের সমাজ ও সংস্কৃতি বিশ্লেষণ করলে আর্যক্ষত্রিয় হিন্দুদের সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, ভিন্নধর্মী অথচ উজ্জ্বল ও চমকপ্রদ সংস্কৃতির সন্ধান পাওয়া যায়। রাজবংশীদের পরিচয়ের ক্ষেত্রে এ-ধরনের সংকট পরিলক্ষিত হয়। তারা নিজেদের রাজবংশী হিসাবে জানলেও অপরের সামনে সে-পরিচয় গর্ব সহকারে তুলে ধরে না। বাঙালিরা রাজবংশীদের আদিবাসী হিন্দু বা উপজাতীয় হিন্দু হিসাবে কিছুটা না বুঝেই তাচ্ছিল্য করে থাকেন, হয়তো সে জন্যেই। নিজের সঠিক পরিচয় অপরের সামনে তুলে ধরা ও ধরতে পারাটাই গর্বের, গৌরবের। নিজের পরিচয় জেনে বা না জেনে লুকানোর মধ্যে কোনো গৌরবের বা অহংকারের কিছু নেই। রাজবংশীদের যে গৌরবের ইতিহাস রয়েছে, স্বকীয় সত্তা রয়েছে, রয়েছে অম্লান ও হাজার বছরের পুরানো স্বীয় সংস্কৃতি, তার পরিচয় জানা ও আত্মপ্রকাশ করার মধ্যেই প্রকৃত তৃপ্তি নিহিত রয়েছে। রাজবংশীদের ধর্মীয় বিশ্বাসেও স্বকীয় সত্তা এখনো বহাল রয়েছে।

প্রত্যেকের সংস্কৃতি নিজের কাছে গর্বের। কোনো সংস্কৃতিকে খাটো করে দেখবার কোনো কারণ নেই। লেভি স্ট্রস (Levi Straus) বলেছেন, "কোনো সংস্কৃতি ভাল, আর কোনো সংস্কৃতি খারাপ এরকম ভাবা অবান্তর।"

বাংলাদেশে সরকারিভাবে স্বীকৃত উপজাতীয় জনগোষ্ঠীগুলো অন্যান্য বাঙালিদের মতোই হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছে, ও পালন করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা (উপজাতীয়) নামধাম, আচার–রীতি, ভাষা, তাদের আদি ধর্মীয় বিশ্বাস–সংস্কার ত্যাগ করে নি। তার কারণ হলো জাতিসত্তার সাথে প্রাতিষ্ঠানিক বা শাস্ত্রীয় ধর্মের সম্পর্ক ক্ষীণ, কিন্তু সংস্কৃতির সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সংস্কৃতির শোণিতধারা জাতিসত্ত্বার সূক্ষ্মতর তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে প্রবাহিত, কিন্তু ধর্মীয় চেতনা বহিরঙ্গে প্রোথিত। সেকারণে ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক জাতিসত্তার ভীত ধর্মভিত্তিক জাতিসত্তার চেয়ে অধিকতর সুদৃঢ়। সংস্কৃতিভিত্তিক জাতিসত্তার ভীত অধিকতর দৃঢ় বলেই প্রাচীনকাল থেকে রাজবংশীরা একটু একটু করে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করলেও তাদের নিজস্ব সমাজ সংস্কৃতির আচার–সংস্কার, পূজা–পার্বণ, ধর্মীয় বিশ্বাস ত্যাগ করে নি।

বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ সমাজ–সংস্কৃতির বহু উপাদান, সংস্কৃতির বিভিন্ন আচার–সংস্কার, ভাষা, ধর্ম প্রভৃতি নিরীক্ষণ করে আবিষ্কার করেছেন যে, মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস, মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা, বিবিধ ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ার মন্ত্রাদি, প্রকৃতির সৃজন শক্তিকে মাতৃরূপে পূজা, শিব ও লিঙ্গপূজা, অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষের পূজা, টোটেমের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা, দেবদেবীর বাহনের কল্পনা, জীবজন্তু পূজা. গ্রাম–নদী–বৃক্ষ–অরণ্য–পর্বত প্রভৃতির মধ্যে নিহিত শক্তির পূজা, মানুষের রোগব্যাধি ও দুর্ঘটনাসমূহ দুষ্টশক্তি বা ভূত–প্রেত দ্বারা সংঘটিত হয় বলে বিশ্বাস, বিবিধ নিষেধাজ্ঞাজ্ঞাপক অনুশাসন, জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, শ্রাদ্ধের লোকাচার, নবান্ন, পৌষপার্বণ, হোলি, চড়কপূজা, গাজন, মনসা, শীতলা, কালী প্রভৃতির পূজা অনার্য অর্ধহিন্দু–আদিবাসী ও আদিবাসী–উপজাতি (semi-Hinduized aboriginals and aboriginal tribes)-দের। আনুষ্ঠানিক কর্মে চাউল, কলা, কলাগাছ, নারিকেল, পান–সুপারি, আল্পনা প্রভৃতির ব্যবহার, লিঙ্গপূজায় ঘটের ব্যবহার, গ্রহ পশমণের জন্য তাবিজ–কবজের ব্যবহার অনার্য আদিবাসী–উপজাতিদের সংস্কৃতি বলে চিহ্নিত হয়েছে। বিয়ের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া যেমন–গায়ে হলুদ, পানখিলি, দধিমঙ্গল, স্ত্রী–আচার প্রভৃতি অনার্যদের। বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণের দ্বারা নির্ণীত উপর্যুক্ত বিষয়াবলির প্রায় সমস্ত আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বিশ্বাস ও দেব–দেবী রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

রাজবংশীরা হাজার হাজার বছর নানাবিধ চড়াই–উৎরাই পেরিয়ে আজকের সমাজ ব্যবস্থায় পদার্পণ করলেও তাদের পেশা, সামাজিক কাঠামো, আচার–সংস্কার, ধর্মীয় বিশ্বাস, ভাষার স্বতন্ত্র স্টাইল, সংস্কৃতির বিভিন্ন প্রপঞ্চ শত শত বছর পূর্বের পুরানো জীবন–প্রণালীর সঙ্গে মিল পাওয়া যায়. শত শত বছর ধরে রাজবংশীরা আর্য–অনার্য বিভিন্ন জাতির সাথে পাশাপাশি বসবাস, মেলামেশা, আদান–প্রদান সত্ত্বেও তাদের স্বীয় ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার–সংস্কার, সমাজ–সংস্কৃতি ও জীবন–রীতিতে শ্রদ্ধাশীল ও নিষ্ঠাবান। তাদের নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী জীবিকা কৃষিকাজ ও মৎস্যচাষ করে এখনো তারা পূর্বপুরুষের অবদান, বিশ্বাস–

সংস্কারকে শ্রদ্ধার সাথে সংরক্ষণ করেন। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে রাজবংশীদের সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কিছুটা গ্রহণ বর্জন লক্ষ্য করা গেছে। তাদের সংস্কৃতি অনেকক্ষেত্রে বাঙালির সংস্কৃতির সাথে সাংস্কৃতিক সংশ্লেষণ (cultural assimilation) ঘটেছে। মেলামেশা, শিক্ষাদীক্ষা, আদান-প্রদান, একই ভাষায় কথা বলার ফলে চিন্তা-বিবেক-মনন সংস্কৃতির আদান-প্রদান অহরহ ঘটেছে। ফলে স্বাভাবিকভাবে সাধারণ মানুষের কাছে গভীরভাবে সমাজ ও সংস্কৃতি নিরীক্ষণ না করলে বাঙালি ও অন্যান্যের সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে রাজবংশীদের সমাজ ও সংস্কৃতির কতখানি পার্থক্য রয়েছে তা স্পষ্ট বোঝা যায় না।

রাজবংশীরা সমাজে-জীবনে-মননে যে ভিন্ন সংস্কৃতির ধারা ও ঐতিহ্য লালন করে আসছে তা এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। সুদীর্ঘকাল ধরে বর্ণহিন্দুদের পাশাপাশি অবস্থান, সংস্পর্শ, সংশ্লেষণ প্রভৃতি কারণে তারা এখন হিন্দু ধর্মাবলম্বী হয়ে পড়েছে। তারা সামাজিক ক্রিয়াকলাপ যেমন—বিয়ে, জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি উপলক্ষে আচার-অনুষ্ঠানে বর্ণ হিন্দুদের অনুসরণ করে ও পাশাপাশি নিজস্ব আদি ঐতিহ্যবাহী আচার, মেয়েলী সংস্কার স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালন করে। বিয়ের ক্ষেত্রে বর-কনে গোপনে বিয়ে করলে কিংবা সমাজ ডেকে সকলের অনুমতি না-নিয়ে বিয়ে করলে এখনো সমাজপতিরা নব-দম্পতি ও তাদের পরিবারকে *'একঘরে'* করে রাখে। সমাজে এখনো প্রতীকী হিসাবে কন্যাপণ প্রথা চালু আছে। এখনো *ঘরে ঢোকা বিয়ে, ঘর জিয়া বিয়ে, পানি ছিটা বিয়ে, উঠানি বিয়ে, ধরা বিয়ে* তাদের সমাজের নিজস্ব সংস্কৃতির ঔজ্জ্বল্য প্রমাণ করে। ঋতুমতি হওয়ার পূর্বে কন্যার বিয়ে হলে ঋতুমতি হওয়ার পর পুনরায় বর-কনের দ্বিতীয়বার বিয়ে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করাতে হয়। এ রীতি এখনো বিরল হলেও সমাজে বহাল রয়েছে।

ধর্মপালনের ক্ষেত্রে বর্ণহিন্দুদের প্রায় সকল দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে তারা পূজা-পার্বণ ও ভক্তি শ্রদ্ধা করেন, এবং এসবের পাশাপাশি সারাবছর ধরে নিজস্ব দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা, আচার-সংস্কাররের মাধ্যমে নিজের ও পরিবারের মঙ্গল কামনা করে। তারা পারিবারিক ও মঙ্গল কামনায় গ্রাম মাঙ্গলিক থানে মা-কালীর উদ্দেশ্যে পশুবলী, বুক চিরে রক্ত দান, মস্তকমুণ্ডন করে চুলদান করে। কঠিন পীড়ায় কেউ আক্রান্ত হলে বা কোনো মারাত্মক বিপদে পতিত হলে গঙ্গাদেবীর উদ্দেশে মানত করা হয়, ও মুক্তি পেলে নদনদীতে মানতের টাকা-পয়সা ও অন্যান্য জিনিসপত্র নিক্ষেপ করা হয়। তারা গ্রামের মধ্যে কিংবা পাশে অবস্থিত কোনো বড় বৃক্ষের গোড়ায় মা-কালীর থান অধিষ্ঠিত মনে করে সেখানে পূজা করেন। শিব, মনসা, তিস্তা বুড়ি, মা-লক্ষী, বুড়াবুড়ি প্রভৃতির পূজা জাঁকজমক সহকারে তারা পালন করে। তাছাড়াও নানা ধরনের পূজা ও ধর্মীয় সংস্কারের মধ্যে *আমাতি বা অম্বুবাচি* পালন, সেবা, ধানের ফুল আনা, যাত্রাপূজা, শিয়ালপূজা, ব্যাঙ বিয়া ও হুঁদুম দ্যেও পূজা, নানান রকমের কালীপূজা, সত্য নারায়ণপূজা, মনসার ভাসান, কার্তিক (কাতি) পূজা, চড়ক পূজা, শিবলিঙ্গপূজা, হ্যাঁচড়া পূজা, গ্রাম মাঙ্গলিক থানে গাইটে পূজা, ত্রিনাথ পূজা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

সামাজিক উৎসবের মধ্যে রয়েছে জমিতে বীজ বপনের উদ্দেশ্যে গোচরপণা ও শিবের মুঠ (উঠোনের মাঝখানে বীজবপন) স্থাপন। নতুন ধান উঠলে চলে ঘরে ঘরে নবান্ন খাওয়া উৎসব। নতুন ধান উঠলে মাঠের তেমাথায় শিয়াল ঠাকুরের উদ্দেশ্যে খাবার পরিবেশন ধর্মীয়

সংস্কার হিসাবে বর্তমান। এখনো ধানের সাধ খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে শিশু-কিশোর ছেলে-মেয়েরা কুলা বাজাতে বাজাতে আশ্বিন মাস শেষে ভোরে মাঠে ধানের জমিতে যায়।

রোগ বালাই দূর করতে এখনো তাদের সমাজে সমস্ত মাঘ মাস জুড়ে সন্ধ্যায় ও ভোরে হ্যঁাচড়া পূজা করা ও গান গাওয়া, অনাবৃষ্টি দেখা দিলে রাজবংশী সমাজের মহিলারা রাত্রিবেলায় হুঁদুম দ্যেও এর পূজা করেন ও বৃষ্টি আবাহনী গান গেয়ে থাকেন, নৃত্য করেন। বনজঙ্গলের পশু-পাখির ভয়, ও তাদের হাত থেকে রক্ষার জন্য এখনো সোনারায়ের গান, বনবিবির গান ও তাদের উদ্দেশ্যে মানতের প্রচলন আছে। নতুন গৃহে প্রবেশের সময় বাস্তুপূজার গান হয়, ও বাস্তুদেবতার উদ্দেশ্যে গৃহের মেঝেতে চুলা তৈরি করে আতপ চালে দুধ উথলানো হয়। এতে গৃহস্থের কল্যাণ নিহিত। ষষ্ঠী পূজার গান, সত্য নারায়ণের পাঁচালী গান, জাগগান, মনসার ভাসান উপলক্ষে গান, চৈত পূজা বা চড়কপূজা উপলক্ষে গান, ত্রিনাথের গান, কাতিপূজার গান, রজঃসংক্রান্তি উপলক্ষে গান, বিয়ের গান, সাধভক্ষণের গান, অন্নপ্রাশন বা মুখেভাত অনুষ্ঠানের গান তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির, যা আজও স্বমহিমায় উজ্জ্বল। তাদের সমাজ-জীবনে তন্ত্র-মন্ত্র, প্রবাদপ্রবচন, ব্রতকথা, ধাঁধাঁ, পুরাকাহিনী, লোকনাট্য, ছড়া প্রভৃতি ভিন্ন ধারার সাক্ষ্য বহন করে।

সামগ্রিক বিচারে বলা যায় যে, তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে নিজস্ব আচার-সংস্কার-বিশ্বাসের পাশাপাশি প্রাচীন বৌদ্ধ প্রভাব, শৈব প্রভাব, শাক্ত প্রভাব, যেমন —মনসা, চণ্ডী, শীতলা, ষষ্ঠী প্রভৃতির প্রভাব পড়েছে। তাছাড়া পরবর্তীকালে বর্ণহিন্দু ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার ফলে পৌরাণিক প্রভাব, বৈষ্ণব প্রভাব, গৌরাঙ্গ প্রভাবের সন্ধান পাওয়া যায়।

সূচিপত্র

অধ্যায় ১

পটভূমি

এক

বেদ, পুরাণ, উপনিষদ, মনুসংহিতা, মুসলিম আমলের বিভিন্ন প্রামাণ্য গ্রন্থাবলি যেমন-*আইন-ই-আকবরী, তবকাত-ই-নাসিরী, মিনহাজ-ই-সিরাজ* প্রভৃতি, এবং বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থে ভারতবর্ষে প্রাচীন কাল থেকে যেসব জনগোষ্ঠী বসবাস করে আসছে বলে উল্লেখ রয়েছে তারা হলো— কোল, ভীল, নিষাদ, কিরাত, শবর, পুলিন্দ প্রভৃতি। কোল, ভীল, নিষাদ, কিরাত, শবর, পুলিন্দ প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর উত্তরপুরুষ রক্তসম্পর্কীয় সূত্রের বংশধরেরা যারা আজও তাদের অতীত ঐতিহ্য, পেশা, জ্ঞাতিভিত্তিক সামাজিক প্রথা, নিয়মকানুন, ভাষা-ধর্ম-সংস্কৃতি আঁকড়ে ধরে আছে, সর্বোপরি যারা তাদের পূর্ব-পুরুষের জাতিসত্তা হারিয়ে ফেলে নি তারা বর্তমান রাষ্ট্রে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমল থেকে উপজাতি হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকে। বৈদিক যুগে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর লোকজন অর্থাৎ আর্যদের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিনটি বর্ণে বিভক্ত করা হয়েছিল, আর পরবর্তীকালে আর্যদের সেবাদাস হিসাবে এদেশীয় অনার্যদের মধ্যে থেকে নির্দিষ্ট পেশাভিত্তিক কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীকে একত্রিত করে শূদ্র বর্ণে উন্নীত বা চিহ্নিত করেন। এই চতুর্বর্ণের বাইরে যেসব জনগোষ্ঠী ছিল তাদের আর্যরা অসুর, অনাস, ম্লেচ্ছ, অস্পৃশ্য ইত্যাদি অভিধায় চিহ্নিত করেছিল। বর্ণপ্রথায় নিম্নবর্ণ শূদ্র ও চতুর্বর্ণের বাইরের জনগোষ্ঠীর লোকজনকে গুপ্তযুগে বা পাল আমলে পেশাভিত্তিক ভিন্ন ভিন্ন জাতি হিসাবে উল্লেখ পাওয়া যায়। এই জাতি-বর্ণ (Caste) প্রথার তাত্ত্বিক গবেষক Celestine Bougle[১] বলেছেন, ভারতবর্ষে চতুর্বর্ণ প্রথা কখনো আদর্শ হয়ে ওঠে নি ; তাঁর মতে জাতিভিত্তিক সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল তিনটি মৌলিক নীতির ভিত্তিতে। সেগুলো হলো : উত্তরাধিকার নির্দিষ্টকরণ (hereditary specialisation), সমাজে মর্যাদার ভিত্তিতে ক্রমোচ্চস্তর (hierarchy) ও জাতিতে-জাতিতে পারস্পরিক অপছন্দের মনোভাব ও পারস্পরিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা (repulsion or isolation of one group from another)। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলের একজন ইংরেজ সরকারি কর্মকর্তা হাটন (Hutton) জাতিভিত্তিক সম্প্রদায়ের উত্থান ও উন্নয়নের ভিত্তি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মোটামুটিভাবে পনেরটির বেশি নীতির (factors) কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হলো : জনপদের বিচ্ছিন্নতা, স্ব স্ব পেশা সম্পর্কিত যাদুবিশ্বাস (magical beliefs), খাদ্যের শক্তিগুণ সম্পর্কিত আদিম ধারণা, উপজাতীয় বিধি নিষেধের ধারণা, মানা (mana), আত্মায় বিশ্বাস (soul-stuff), টোটেমবাদ, অস্পৃশ্যতা, পবিত্রতার ধারণা, জাতিভিত্তিক সুনির্দিষ্ট কর্মে বিশ্বাস, দেহবর্ণের ভিত্তিতে সংঘর্ষ, ক্রমোচ্চস্তরের প্রথায় ইচ্ছাকৃতভাবে শোষণ (deliberate exploitation by a hierarchy)[২]। অবশ্য হাটনের এই মত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সামাজিক নৃবিজ্ঞানীরা প্রচণ্ড সমালোচনা করেছেন।[৩] হাটনের মতের মধ্যে যেসব উপাদানের

উল্লেখ রয়েছে, ভারতবর্ষের উপজাতি সমাজে সেগুলোর অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল, এবং ক্ষয়িষ্ণু হলেও বর্তমানেও সেগুলোর অস্তিত্ব রয়েছে। ডি.ডি. কোসাম্বির একটি মন্তব্যে অনুরূপ সমর্থন পাওয়া যায় ; তিনি বলেছেন, —জাতি বর্ণ (caste) প্রথার ভিত্তিমূলে সমাজের মধ্যে অনেক উপজাতীয় উপাদানের সংমিশ্রণ নিহিত রয়েছে।[৪] ভারতের প্রাচীন ইতিহাস গবেষক Suvira Jaiswal এর বক্তব্যেও উপর্যুক্ত পণ্ডিতগণের মতের সমর্থন মেলে। তিনি বলেছেন, "*Jatis* emerged within the varna system through fragmentation as well as the incorporation of tribal communities within a structure which regulated hierarchy through marriage rules and endogamy, and privileged heredity or birth in a particular lineage, leading to the use of the term *'Jati'* for indicating membership in a particular community.[৫] ভারতবর্ষের জাতিভিত্তিক সমাজের উৎপত্তি বিষয়ক ইউরোপীয় নৃতাত্ত্বিক গবেষক ও ইংরেজ সরকারি কর্মকর্তাদের মন্তব্যের উপর সমালোচনা করে যাঁরা প্রামাণ্য আলোচনা করেছেন, তাঁরা হলেন লুই ডুমোঁ (Louis Dumont),[৬] কেতকার (Ketkar),[৭] ইবিতসন (Ibbetson),[৮] জি, এস, ঘুরি (G.S.Ghurye)[৯] নির্মল কুমার বসু[১০] প্রমুখ।

বাংলায় জাতি শব্দের পরিভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হয় 'caste' শব্দটি। এটি পর্তুগীজ শব্দ *casta* থেকে উৎপত্তি হয়েছে। *casta* শব্দের অর্থ হলো একই রক্তসম্পর্কীয় সূত্রের বা বংশের জনগোষ্ঠী। হার্বার্ট রিজলীর মতে, ভারতীয় জাতি (caste) হলো অনেক পরিবার নিয়ে গঠিত অনেক দলের সমষ্টি, যার একটি নাম এবং সদস্যদের একটি নির্দিষ্ট পেশা থাকে, ও তারা এক কাল্পনিক পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত বলে মনে করে।[১১] অধ্যাপক লীচ ও ডুমোঁ ভারতীয় সমাজে জাতি-ব্যবস্থা নিরীক্ষণ করে বলেছেন যে, জাতি হলো ভারতীয় সভ্যতার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গবিন্যাস। জাতিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার উপর গবেষণা করে তাই বৃটিশ সমাজবিজ্ঞানী এডমণ্ড লিচ (Edmand Leech) ভারতীয় জাতি ব্যবস্থার পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, এগুলো হলো—ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ, বংশ পরম্পরায় কৌলিক পেশা অবলম্বন, সমকূলে বিবাহ, ভোজন সংক্রান্ত বিধিনিষেধ অনুসরণ এবং অস্পৃশ্যতা।[১২] অবশ্য পরিবর্তনশীল সমাজ ব্যবস্থার পশ্চিমী ভাবধারার অনুকরণ, নানান ধরণের সাংস্কৃতিক অনুকরণ ও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মব্যবস্থা জাতির এই বৈশিষ্ট্যগুলোকে পূর্বের মতো অটুট রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে।

J.V. Stalin তাঁর *Marxism and the National and Colonial Question* গ্রন্থে জাতির সংজ্ঞা দিয়েছেন, "জাতি হলো ইতিহাসের বিভিন্ন যুগের মধ্য দিয়ে ক্রমবিকাশপ্রাপ্ত একভাষী নির্দিষ্ট স্থানে বসবাসকারী, একই আর্থনৈতিক জীবনসম্পন্ন ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত একই মানসিক গঠনযুক্ত স্থায়ী জনসমাজ[১৩]। অর্থাৎ জাতি একটি স্থায়ী জনসমাজ। পৃথিবীতে এমন কোনো জাতি নাই যা একটিমাত্র বংশজাত গোষ্ঠী (clan), বা এক বংশজাত উপজাতি (tribe), অথবা একটিমাত্র মূল মানবশাখাজাত গোষ্ঠী (ethnic group) নিয়ে গঠিত। যে সংজ্ঞাটি উল্লেখ করা হয়েছে সেটি নেশন-এর বৈশিষ্ট্য বহন করে। ভারতীয় জাতি (caste) সিস্টেমের বৈশিষ্ট্যের সাথে এর পার্থক্য আছে। আবার 'জাতি', 'উপজাতি' শব্দদ্বয় বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হওয়ার সময় ও অর্ন্তনিহিত অর্থ

ব্যাখ্যা করার সময় দেখা যায় যে, শব্দ দুটির মধ্যে একটি আন্তঃযোগাযোগ আছে। অর্থাৎ অর্থটা এমন দাঁড়ায় যে, উপজাতি শব্দের অর্থ উপ-জাতি, পুরোপুরি জাতি নয়। কিন্তু কয়েকটি উপজাতি নিয়ে একটি জাতি গঠিত হয়— প্রকৃত অর্থে এরকম ব্যাখ্যা কোনোভাবেই সঠিক নয়। প্রশান্ত ত্রিপুরার ভাষায় "বাংলায় tribe অর্থে উপজাতি কথাটি চালু থাকলেও, উপজাতি আর 'জাতি'র মধ্যে একটি ব্যুৎপত্তিগত যোগাযোগ আছে, যেটি ইংরেজি tribe আর nation এর মধ্যে নেই। tribe আর nation প্রত্যয়গুলো দুটি ভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক সংগঠনকে নির্দেশ করে, যার ফলে আমরা বলতে পারি না যে, এটি বিভিন্ন tribe এ বিভক্ত।[১৪] কিন্তু বাংলায় উপজাতি শব্দের 'উপ' এই ইঙ্গিত করে যে, উপজাতি হলো একটি জাতির উপশাখা।

উনবিংশ শতাব্দীর শুরুর আগে ভারতবর্ষে যখন নৃতাত্ত্বিক গবেষণা শুরু হয় নি অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এদেশীয় 'উপজাতি' অভিধা চিহ্নিত মানুষজনকে বিভিন্ন জাতি (caste) হিসাবে চিহ্নিত করা হতো। সেই ধারাবাহিকতা আজও সাধারণ জনগণ ও ঐ অভিধাচিহ্নিত মানুষজনের মধ্যে দেখা যায়। তারা নিজেদের চাকমা জাতি, তঞ্চঙ্গ্যা জাতি, হাজং জাতি বা মণিপুরী জাতি ইত্যাদি হিসাবে পরিচয় দেয়। উনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে যখন এদেশের মানুষের উপর পশ্চিমী ভাবধারা পুষ্ট গবেষকদের দ্বারা নৃতাত্ত্বিক গবেষণা শুরু হয়, তখন এদেশীয় কিছু জাতিকে যারা সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক দিক দিয়ে অনগ্রসর (backward) ছিল তাদের 'ট্রাইব' হিসাবে আখ্যায়িত করেন। পরবর্তীকালে এদেশীয় অনগ্রসর জাতিগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করতে বহু শব্দের অবতারণা করা হয়, যেমন-সংখ্যালঘু সম্প্রদায় (ethnic minorities), ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, নরগোষ্ঠী, নৃতাত্ত্বিক জাতিসত্তা, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, পাহাড়ি, জুম্মা, নিম্নবর্গ, নিম্নকোটি শ্রেণী, ভূমিজ, এ্যাবোরিজন প্রভৃতি। এতসব নামে এদের চিহ্নিত করা হলেও বিশেষজ্ঞ, গবেষক ও উক্ত অভিধা চিহ্নিত জনগণের নিকট এসব শব্দ ঠাঁই পায় নি, বরং পরিতক্ত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর নব্বই দশকের শুরু থেকে এসব মানুষ নিজেদের জন্য 'আদিবাসী' শব্দটি বেশি যুক্তিযুক্ত মনে করছে, এবং সেকারণেই বর্তমানে শব্দটি ক্রম সম্প্রসারিত হচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশ রাষ্ট্র ঔপনিবেশিক আমল থেকে অদ্যাবধি এই অনগ্রসর জাতিগোষ্ঠীগুলোকে চিহ্নিত করতে সরকারি বিভিন্ন দলিল-দস্তাবেজ ও নথিপত্রে 'tribe' বা 'উপজাতি' শব্দটি ব্যবহার করে আসছে।

'ট্রাইব' শব্দটি Latin শব্দ 'tribus' থেকে এসেছে, যার অর্থ হলো পৈত্রিকভাবে প্রাপ্ত একই শারীরিক ও মানসিক গুণাবলিবিশিষ্ট একটি জাতিতাত্ত্বিক সম্প্রদায় (ethnic communities).[১৫]

> *Standard Dictionary*-তে ট্রাইবের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, A division or group of people varying ethnologically according to their circumstances, from which their separation or distinction would be supposed to originate. An aggregation of persons usually consanguineous and endogamous characterized under one chief by its culture, having a name, a dialet, a government, and usually a territory of its own.[১৬]

Charles Winick এর *Dictionary of Anthropolgy* তে ট্রাইবের সংজ্ঞায় উল্লেখ করেছেন, A social group with definite area, dialect, cultural homogeneity and uniform social organization. It may include several subgroups such as sides or villages. A tribe ordinaily has a leader and may have a common ancestor as well as patron deity. The families of small communities making up the tribe are linked through economic, social, religious family or blood ties.[১৭]

Oxford Advanced Learner's Dictionary তে tribe এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, A group of people of the same race and sharing the same language, religion, customs etc. often led by a chief.[১৮]

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলো থেকে দেখা যায় যে, ট্রাইব হলো একই রক্তসম্পর্কীয় ও বর্ণগোষ্ঠীর লোক, যাদের নিজস্ব ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি থাকে এবং একজন শাসক ও একটি নির্দিষ্ট বসবাসের এলাকা থাকে। সংজ্ঞাগুলো ব্যাখ্যা করে বলা যায় যে, কোনো ট্রাইব রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার আওতাভুক্ত নয়, কিংবা রাষ্ট্রীয় সীমানাভুক্ত নয়।[১৯] বাংলাদেশসহ পৃথিবীর কোনো দেশেই এখন এরকম অবস্থা পাওয়া যাবে না। কারণ সকল মানুষই আধুনিক রাষ্ট্রীয় সীমানায় ও শাসনাধীনে বসবাস করছে। তাছাড়া কারো কারো ভাষা হারিয়ে গেছে, কারো ধর্ম হারিয়েছে, নতুন নতুন প্রভাবশালী ভাষা ও ধর্ম গ্রহণ করেছে, আবার কেউ কেউ বৈশ্বিক গ্রামের (global village) বিভিন্ন এলাকায় শিক্ষা, কর্ম-অন্বেষণে, কিংবা অর্থের জন্য বসতিস্থাপন করেছে। সুতরাং সংজ্ঞায় উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের সবগুলো এখন অধিকাংশ উপজাতি (tribe) চিহ্নিত সমাজে অটুট নেই।

তাছাড়া ফ্রিড ও অন্যান্য কয়েকজন নৃতাত্ত্বিকের সমর্থনে একথা প্রমাণিত হয়েছে, পৃথিবীতে কোনো জাতি বা উপজাতির মধ্যে অবিমিশ্র রক্তধারা নেই।[২০] বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন সমাজের মধ্যে বিভিন্ন জাতি-উপজাতির রক্তমিশ্রণ ঘটেছে। আর অর্থনৈতিক সম্পর্ক তাদের গোষ্ঠীসীমানাকে ভেঙ্গে ফেলেছে। সত্যিকার অর্থে, আরো বলা যায়, পৃথিবীতে উপজাতি অভিধা চিহ্নিত সমাজগুলোতে কতিপয় বিষয়ে সাধারণ মিল থাকলেও অনেক বিষয়ে অমিল পাওয়া যায়। সুতরাং একটা সংজ্ঞার ফ্রেমে সকল সমাজকে আবদ্ধ করা সত্যিই দুঃসাধ্য।

'আদিবাসী' (indigenous peoples) শব্দটি বর্তমানে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে ঐসব শ্রেণীচিহ্নিত লোকজন ও বিশেষজ্ঞ গবেষকগণ ব্যবহার করছেন। শব্দটির অর্থ ঔপনিবেশিক আমলে ব্যবহৃত aboriginal ও aboriginal tribes এর কাছাকাছি। ব্রিটিশরা এসব শব্দ ব্যবহার করেছে অর্থনৈতিক ও শিক্ষা-দীক্ষায় কম অগ্রসর (backward) মানুষজন থেকে মূল স্রোতধারার মানুষজনকে পৃথক করার জন্য। এগুলোর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ছিল aborigines রা উন্নয়নের সঙ্গে তেমনটা যুক্ত হতে পারে নি, তারা স্বপ্লোন্নত— এরকম।

আদিবাসী শব্দটিরও শব্দগত অর্থে উপজাতির মতো আলাদা ব্যঞ্জনা আছে। 'আদিতে বসবাস ছিল' এই অর্থেই আদিবাসী কথাটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু শব্দটিতে আদি অর্থে কোন সময়কালকে ধরা হবে, অথবা আদি মানে এইসব মানুষজনের বসতি এলাকাতেই তারা

জন্মগ্রহণ করে প্রথম বসতি স্থাপন করেছিল কি–না এই নিয়ে মতভেদ দেখা যায়। শেষোক্ত বক্তব্যের নিরিখে ভারতবর্ষে আদিবাসী কারা বা ভারতে আদৌ ঐ অর্থে ভূমিজ সন্তান আছে, না–কি সবাই পৃথিবীর অন্য কোনো–না–কোনো অঞ্চল থেকে এসে বসতি স্থাপন করেছিল— এ প্রশ্নের উত্তরে ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিকদের মতামতে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ভারতবর্ষে ও বাংলা অঞ্চলে যাদের আদিবাসী বলা হয় তাদের ক্ষেত্রে কোনো কোনো পণ্ডিত এরকম মতামত ব্যক্ত করে থাকেন যে, আর্যদের আগমণের পূর্ব থেকেই যেসব জাতির পূর্ব পুরুষগণ ভারতীয় উপমহাদেশে বসবাস করে আসছেন তারাই আদিবাসী।[২১] প্রখ্যাত ভারতীয় ভাষাবিদ ড. অনিমেষ কুমার পাল আদিবাসীদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "যে–সমস্ত সম্প্রদায় আদিকাল থেকে পাক–ভারত উপমহাদেশে বসবাস করিয়া আসিতেছে, এবং যাহাদের জীবনধারা এই বিংশ শতাব্দীর চরম শিখরেও আদিম পদ্ধতিতে পরিচালিত হইতেছে তাহারাই আদিবাসী নামে পরিচিত।"[২২]

১৯৮৩ সালে জাতিসংঘের working group on indigenous population-এ আদিবাসীদের সম্পর্কে একটি সংজ্ঞা গৃহীত হয়। সেটি হলো : indigenous communities, peoples and nations are those, which having a historical continuity with pre-invasion and pre-colonial societies that developed on their territories, consider themselves distinct from other sectors of the societies now prevailing in those territories, or parts of them. They from at present non-dominant sectors of society and are determined to preserve, develop and transmit to future generations their ancestral territories and their ethnic identity, as the basis of their continued existence as peoples, in accordance with their own cultural patterns, social institutions and legal systems.[২৩]

১৯৮৯ সালে গৃহীত আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) –র ১৬৯ নং কনভেশনের ১ নং আর্টিকেলে উপজাতির ও আদিবাসীর নিম্নরূপ সংজ্ঞা[২৪] প্রদান করা হয়েছে।

a) tribal peoples in independent countries (are those) whose social, cultural and economic conditions distinguish them from other sections or the national community and whose status is regulated wholly or partially by their own customs or traditions or by special laws or regulations.

b) Peoples in independent countries who are regarded as indigenous on account of their descent from the populations which inhabitated the country, or a geographical region to which the country belongs, at the time of conquest or colonisation or the establishment of present state boundaries and who, irrespective of their legal status, retain some or all of their own social, economic, cultural and political institutons.

সুতরাং নৃতাত্ত্বিক অভিধান প্রণীত সংজ্ঞা ও আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত সংজ্ঞাগুলোর বৈশিষ্ট্য এদেশীয় উক্ত অভিধা চিহ্নিত মনুষ্য সমাজে অটুট না থাকলেও অধিকাংশ বৈশিষ্ট্য অটুট রয়েছে, কিছু কিছু ক্ষয়িষ্ণু হলেও বর্তমানেও বহাল রয়েছে বলে তারা নিজেদের আদিবাসী হিসাবে দাবি করে থাকেন।

সংস্কৃতি একটি সামগ্রিক জীবনব্যবস্থা। একটি জাতির সংস্কৃতিই সেই জাতির বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে। ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলোর স্ব-স্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যেসব বৈশিষ্ট্য দেখেই তাদের আলাদা আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায়। একটি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীকে জাতি হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া কিংবা 'উপজাতি' হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া, কিংবা বহাল রাখা নিয়ন্ত্রণ করে রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের ভূমিকা এ বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় দলিলপত্র ও নথিপত্রে এদের 'উপজাতি' হিসাবে আখ্যায়িত করে (পরিশিষ্ট ১ দেখুন) সেজন্য রাষ্ট্রীয় নীতিমালার আলোকে এই বইয়ে এদের চিহ্নিত করার জন্য উপজাতি শব্দটি ব্যবহৃত হবে। পৃথিবীর সমস্ত দেশেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলোকে tribe & indigenous peoples নামে চিহ্নিত করে.উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য রাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, এবং তাদের উন্নয়নের মূলস্রোতে আলাদা ও বিশেষ সুযোগ সুবিধা প্রদান করে। সেজন্য আলাদাভাবে চিহ্নিত করার জন্য সে-দেশের জাতীয় সংবিধানে আদিবাসী, উপজাতি ইত্যাদি শব্দ সংজ্ঞায়িত করে সুনির্দিষ্টভাবে উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করার কথা উল্লিখিত থাকে। তাছাড়া সাংবিধানিক ব্যাখ্যায় ও দেশের অন্যান্য আইনে এসম্পর্কে সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকে।

উনবিংশ শতকের ইংরেজ নৃবিজ্ঞানীরা বিশ্বের অনুন্নত ও জ্ঞাতিসম্পর্কের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জনগোষ্ঠীর উপর নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষা চালানোর সময় অনুন্নত ও জ্ঞাতিসম্পর্কীয় জনগোষ্ঠী চিহ্নিত করতে রোমান শব্দ "ট্রাইবুয়া'[২৫] (ট্রাইবুয়া>ট্রাইবাস্>ট্রাইব) থেকে ট্রাইব শব্দটির ব্যবহার শুরু করেন। ভারতবর্ষে ইংরেজ নৃবিজ্ঞানী ও সরকারি সেন্সাস কমিশনারগণ অনুন্নত জাতিগোষ্ঠীর উপর গবেষণা করে, এবং সরকারি নথিপত্রে এইসব জনগোষ্ঠীদের ট্রাইব, সেমিহিন্দুইজড এ্যাবোরিজিন (tribe and semi-Hinduized aboriginge) হিসাবে চিহ্নিত করেন। পরবর্তীকালে ট্রাইবের পরিভাষা উপজাতি ও সেমিহিন্দুইজড এ্যাবেরোজিন-এর পরিভাষা অর্ধ-হিন্দু আদিবাসী হিসাবে পরিচিতি পায়। সেই থেকে উপজাতি-আদিবাসী শব্দগুলো বিভিন্ন সময়ে পরস্পর সমার্থক শব্দ হিসাবে অনেক পণ্ডিত ব্যবহার শুরু করেন, এবং বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিশেষ করে নব্বই-এর দশকে শব্দ দুটি নিয়ে বিতর্কের সূচনা হয়। যাহোক, লুইস হেনরি মর্গান, *ম্যাকমিলান ডিকশনারী অব এ্যানথ্রোপলজি'র* প্রণেতা শার্লট সিমোর-স্মিথ[২৬] ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ডিকশনারীতে উপজাতির সংজ্ঞা ও আন্তর্জাতিক সংস্থা (ILO) কর্তৃক স্বীকৃত 'আদিবাসী'র সংজ্ঞার দৃষ্টিকোণ থেকে উনবিংশ শতাব্দীতে রাজবংশীদের উপজাতি বা উপজাতীয় আদিবাসী হিসাবে চিহ্নিতকরণ সংজ্ঞাসিদ্ধ ও যথার্থ ছিল। কারণ উনবিংশ শতাব্দীতে রাজবংশী সম্প্রদায় 'প্রাক-রাজনৈতিক' কিংবা 'প্রাক-চুক্তিভিত্তিক সমাজ' হিসাবে তৎকালীন নৃতাত্ত্বিক গবেষকগণের নিকট যেমন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তেমনি ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিকগণকর্তৃক রাজবংশী জনগোষ্ঠী তাদের বসতি এলাকায় প্রাক-আর্য যুগ থেকে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী হিসাবে প্রমাণিত হয়েছিল।

ব্রিটিশ শাসনামলে এদেশে যখন 'ট্রাইব' বা 'উপজাতি' শব্দটির ব্যবহার শুরু হয় তখন থেকেই রাজবংশীরা রাষ্ট্রীয়ভাবে উপজাতি হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আসছে। গারো ও রাজবংশীরা আসামের আদি অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও তাদের উপজাতি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। তাদের উপজাতি হিসাবে চিহ্নিত করার পিছনে যেসব কারণ দাঁড় করানো যায়, সেগুলো হলো— ১) নিঃসন্দেহে তাদের উৎস উপজাতীয় ছিল, ২) তাদের বসতি এলাকা ছিল

সুগম্যতাবর্জিত। ব্রিটিশ শাসনের আগ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার আওতাভুক্ত সুযোগ-সুবিধাগুলো ঐসব বসতি এলাকায় পৌঁছে নি, ৩) সর্বক্ষেত্রে তারা পশ্চাৎপদ ছিল, ৪) তাদের ভাষা ও ধর্মীয় সংস্কৃতি এদেশের বৃহত্তর জনসমাজের থেকে বেশ স্বতন্ত্র ছিল, আর ৫) দৈহিক গঠনে তারা ছিল মঙ্গোলীয় বৈশিষ্ট্যযুক্ত, এটি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এদেশে সকল মঙ্গোলীয় বৈশিষ্ট্যযুক্ত জাতিগুলোকে উপজাতি বলা হয়ে থাকে। তাছাড়া এদেশে বসবাসরত সকল মঙ্গোলীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জাতিগোষ্ঠীগুলোর মতো রাজবংশীরা নিজেদের ক্ষয়িত্র বলে দাবি করেন। এদেশে মঙ্গোলীয় জাতিগোষ্ঠীর লোকেরা সবাই একই সময়ে আসে নি, এসেছে দলে দলে বিভিন্ন সময়ে। গুপ্তযুগে কোনো আগন্তুক গোষ্ঠী বিজয়ী হলে সমাজে ক্ষত্রিয় পবিচয় পেত।[৩০] এটা ঠিক যে, ক্ষত্রিয়রা বিভিন্ন বসতি এলাকা দখল করেছিল, এবং বিভিন্ন আক্রমণ প্রতিহত কবে টিকে ছিল। এই হিসাবে তাদের ক্ষত্রিয় দাবি যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু বৈদিক গ্রন্থগুলোতে ক্ষত্রিয়দের যে দৈহিক বৈশিষ্ট্য ও পেশা হিসাবে যুদ্ধ ও রাজন্যবর্গের কাজ উল্লেখ আছে, তার সাথে মঙ্গোলীয়দের কোনো মিল পাওয়া যায় না। তাছাড়া দৈহিক গঠন, সংস্কৃতি ও ধর্মের দিক দিয়েও বৈদিক ক্ষত্রিয় ও মঙ্গোলীয় ক্ষত্রিয়'র রয়েছে আমূল পার্থক্য। নৃতাত্ত্বিক ও সরকারি সেন্সাস কমিশনারগণ রাজবংশীদের নৃতাত্ত্বিকভাবে আর্যক্ষত্রিযদের সাথে তাদের কোনো মিল পান নি বলেই হয়ত ক্ষত্রিয় হিসাবে উল্লেখ কবেন নি। সেজন্য সবকারিভাবে ১৯১১ সালের আগপর্যন্ত রাজবংশীদেব ক্ষত্রিয় হিসাবে গণনা করা হয় নি।

দুই

প্রতিটি গবেষণাকর্ম একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়, এবং সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তার ক্ষেত্র-পরিধি নির্ণিত হয়। তাছাড়া উক্ত গবেষণা কর্মটিতে সমাজ ও সংস্কৃতি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা উল্লেখ করা প্রয়োজন।

সমাজ বলতে এমন এক জনসমষ্টিকে বুঝায় যারা একটি সাধারণ ঐতিহ্য, প্রথা, জীবন-প্রণালী বা একটি সাধারণ সংস্কৃতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে একই সাথে বসবাস করে, এবং সেই গোষ্ঠী-সদস্য একত্রে পাশাপাশি সুদীর্ঘকাল বসবাসের ফলে পরস্পরের প্রতি সচেতনতা ও ইতিবাচক মনোবৃত্তি প্রকাশ পায়। অর্থাৎ সমাজ বলতে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত এমন একদল জনসমষ্টিকে বুঝায় যারা একই সংস্কৃতির ধারক-বাহক। মূলত সমাজ ও সংস্কৃতি প্রত্যয় দুটি পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটি ছাড়া আরেকটির অস্তিত্ব কল্পনাতীত।

বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে সংস্কৃতির সংজ্ঞা দিয়েছেন। হার্বার্ট স্পেনসার, ল্যামব্রেথট, রবার্ট, র‍্যালফ লিনটন্, ম্যালিনওস্কি, ওয়েলসে, ই.বি টাইলার, সামনার, র‍্যাডক্লিক ব্রাউন প্রমুখ পণ্ডিতগণ সংস্কৃতির নানাভাবে সংজ্ঞা দিয়েছেন। সেসব সংজ্ঞায় ধারণকৃত মৌলিক বিষয়াবলি এই গবেষণাকর্মে সংস্কৃতি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে ই.বি টাইলার বলেন, "Culture is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, customs, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society".

এই গ্রন্থে সংস্কৃতি বলতে সামগ্রিক জীবন–ব্যবস্থার রূপরেখাকে বুঝানো হয়েছে। সংস্কৃতি তো মানুষের উদ্দেশ্য সাধনের বস্তুগত ও অবস্তুগত উপায় বা কৌশল। মানুষ তার উদ্দেশ্য পূরণ বা অভাব মোচনের জন্য যা কিছু কলা–কৌশল উদ্ভাবন করেছেন বা যেসব কাজকর্ম সম্পাদান করছেন তাই তার সংস্কৃতি। ঘর–বাড়ি, তৈজসপত্র, আসবাবপত্র, উৎপাদন কৌশল ইত্যাদি মানুষের বস্তুগত সংস্কৃতি ; আর দক্ষতা, জ্ঞান–বিদ্যাবুদ্ধি, আচার–সংস্কাব–বিশ্বাস, ধ্যান–ধারণা, মূল্যবোধ, মনোবৃত্তি, সঙ্গীত, নৃত্য, সাহিত্য ইত্যাদি হলো অবস্তুগত সংস্কৃতি। মূলত উভয় সংস্কৃতিকেই এই গ্রন্থে স্থান দেওয়া হয়েছে।

মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতি গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্য সংগ্রহের মৌলিক কৌশলসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো পর্যবেক্ষণ ও অংশগ্রহণমূলক (observation and participatory observation) পর্যবেক্ষণ। সাধারণভাবে, কোনো সমাজ ও সংস্কৃতির নানান প্রপঞ্চ (phenomenon), যেমন–সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস (social stratification), জাতি–পরিচয় নির্মাণ, ভাষা, সামাজ ও সংস্কৃতির নানা বস্তুগত ও অবস্তুগত বিষয়াবলির তথ্য সংগ্রহের জন্য পর্যবেক্ষণ ও অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখে। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রানুসন্ধানের মাধ্যমে তাদের জীবন–ধারণ পদ্ধতি, সামাজিক রীতি–নীতি, আচার–সংস্কার–বিশ্বাস, মূল্যবোধ, সামাজিক, সংস্কৃতিক ও ধর্মীয় উৎসবাদি সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার বা আলাপ–আলোচনার ভিত্তিতে প্রকৃত তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাতকার গ্রহণের ক্ষেত্রে গ্রন্থকার একটা চেকলিস্ট অনুসরণ করেছেন। গ্রন্থটির তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য গ্রন্থকার রাজবংশী জাতিগোষ্ঠীর বর্তমান বসতি এলাকা, যেমন–যশোর, ঝিনাইদহ, নড়াইল, মাগুরা, ঠাকুরগাঁ, নীলফামারী, রংপুর, দিনাজপুর, জয়পুরহাট, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, নওগাঁ প্রভৃতি জেলায় সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ, অংশগ্রহণ ও আলোকচিত্র সংগ্রহ করেছেন। আলোকচিত্রে তাদের সমাজের বাস্তব পরিবেশ, সামাজিক পর্বানুষ্ঠান যেমন—বিয়ে ও বিয়ের আচার, ধর্মীয় বিগ্রহ, ধর্মীয় পূজার্চনার স্থান, মানুষজন, কাজকর্ম, ঘরবাড়ির ধরন ইত্যাদি বিষয় স্থান পেয়েছে। তাছাড়া যারা বিভিন্ন তথ্যাদি, গান, ছড়া, প্রথা, আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া–কর্মাদির বর্ণনা দিয়েছেন তাদের নাম, ধাম, বয়স, পেশা, শিক্ষাগত যোগ্যতার তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

অধ্যায় ২

রাজবংশী জাতিগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

উনবিংশ শতাব্দীর পুরোটা সময় জুড়ে ভারতবর্ষে নৃতাত্ত্বিক গবেষণার ব্যাপকতা শুরু হয়েছিল। এই শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্ত যেসব নৃবিজ্ঞানী, গবেষক, সরকারি সেন্সাস কমিশনার, চিকিৎসক ও জাতিবিজ্ঞানী রাজবংশীদের উপর গবেষণা ও মন্তব্য করেছেন, তাদের সবাই ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, কোচ ও পলিয়া জাতির রক্তমিশ্রণজাত সম্প্রদায়-ই হচ্ছে রাজবংশী। কিন্তু কোচ, পলিয়াদের রক্ত মিশ্রণজাত সম্প্রদায় হলেও বর্তমান সমাজ, সংস্কৃতি, ভাষা, ধর্মের দিক থেকে রাজবংশীরা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। তাই বর্তমানে স্বতন্ত্র সমাজ ব্যবস্থা ও সংস্কৃতি বিশিষ্ট রাজবংশীদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক চালচিত্রসহ সাহিত্য-শিল্প-সাংস্কৃতিক সত্তা সঠিকভাবে উদ্ধারের নিরিখে তাদের বসতি এলাকার ভূ-প্রকৃতি (Physical feature), পরিবেশ (Ecology), জাতিতত্ত্ব (Ethnology), সমাজতত্ত্ব (Sociology) ও ভাষাতত্ত্বকে (Linguistics) প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

নামকরণের উৎপত্তি অনুসন্ধান

প্রাচীন *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ*, পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত দেবীবর মিশ্রের *'খেলবিধি'*, ধ্রুবানন্দ মিশ্রের *কুলকারিকা* প্রভৃতি গ্রন্থে কোচ জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে কম্বোজ শব্দ থেকে কোচ শব্দ আগত হয়েছে। *যোগিণীতন্ত্র* ও *পদ্মপুরাণে* কোচদের 'কুবাচ' ও 'কুবাচক' বলা হয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দীর *তারিখ-এ-আসাম* ও *আলমগীরনামা*, অষ্টাদশ শতাব্দীর *রিয়াজস্ সালাতিন*, উনিশ শতকের *মোর্সেদ জাঁহানামা* প্রভৃতি মুসলমান ঐতিহাসিকদের গ্রন্থেও কোচ ও মেচ-জাতির উল্লেখ আছে। বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলোতেও প্রাচীনকাল থেকেই কোচ রমণীর প্রতি শিবের আসক্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। বর্তমানে আসামে কোথাও কোথাও কোচ-রাভা, উত্তরবঙ্গের কোথাও কোথাও কোচ-রাজবংশী ও কোচ-পলিয়া কথাগুলো উল্লেখ পাওয়া যায়।[১] সেন্সাস কমিশনারগণ ১৮৭২ সালের আদমশুমারি প্রতিবেদন ও পরবর্তীকালের আদমশুমারি প্রতিবেদনগুলোতে কোচ-রাজবংশীদের একই রক্তজাত বলে বর্ণনা করেছেন।[২] দিনাজপুরে প্রাপ্ত কম্বোজ রাজবংশের রাজা গৌড় কর্তৃক ৮৮০ শক (৯৭৬ খ্রি.)-এ স্থাপিত বানগড় শিলালিপিতে কোচ জাতির উল্লেখ রয়েছে। ড. অজয় চক্রবর্তী তাঁর *Literature in the Kamta-Koch Rajdarbar* গ্রন্থে লিখেছেন, "Sir R. P. Chanda suggested, Kamboja of the inscription can only mean the koch people of the period"[৩]। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পৌরাণিক

আমল এমনকি হাজার বছরোর্ধ কালের শিলালিপিতে ও পৌরাণিক গ্রন্থাবলিতে 'রাজবংশী' নামে জাতির উল্লেখ পাওয়া যায় না। সর্বপ্রথম ডা: বুখানন হ্যামিল্টন (১৮০৭-১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে) কোচদের সাথে একত্রিত করে 'রাজবংশী'দের উল্লেখ করেছেন। তার আগে কোনো গ্রন্থে রাজবংশী নামের উল্লেখ নেই।

ডা: বুখানন হ্যামিলটন[৪] (Dr. Buchanan Hamilton), স্যার হার্বার্ট রিজলী[৫] (Sir Herbert Risley), বি.এইচ. হাজসন[৬] (B.H. Hudgson), কর্ণেল ই.টি ডাল্টন[৭] (Colonel E.T. Dalton), ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার[৮] (W.W. Hunter) প্রমুখ চিকিৎসক ও নৃতাত্ত্বিকগণ বলেছেন যে, নৃতত্ত্বের বিচারে কোচ, পলিয়া, রাজবংশী মূলত একই উপজাতীয় গোষ্ঠীর মানুষ। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই একটি প্রশ্ন আসে, কোচ ও পলিয়া জাতিগোষ্ঠীর লোকজন কখন, কীভাবে, কোন প্রেক্ষাপটে সম্প্রদায় হিসাবে 'রাজবংশী' নাম গ্রহণ করেছেন? *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে* অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্য জাতি হিসাবে 'কোচ'দের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু *বেদ, পুরাণ* ও *স্মৃতিশাস্ত্র*-গুলোর কোথাও জাতি হিসাবে 'রাজবংশী'দের উল্লেখ পাওয়া যায় না। সুতরাং সঙ্গত কারণেই আমরা সিদ্ধান্তে উপনিত হতে পারি যে, ঐসব শাস্ত্রগ্রন্থ রচনাকালে রাজবংশী নামে কোনো জাতি আত্মপ্রকাশ করে নি। ভারতবর্ষে কোচ জাতির প্রথম বসতি এলাকা আসাম ও কুচবিহার। এব্যাপারে আসাম সম্পর্কিত ই.এ. গেইট[৯] (E.A. Gait) এর আদমশুমারি প্রতিবেদন, আর, এইচ, এস হাচিনসন[১০] (R.H.S. Hutchinson) এর *'ইস্টার্ণ বেঙ্গল এণ্ড আসাম ডিস্ট্রিক গেজেটিয়ার* ও ই.টি. ডাল্টনের[১১] জাতিতাত্ত্বিক গ্রন্থে সমর্থন পাওয়া যায় যে, ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কোচ জাতির রাজা হাজোর বংশধরেরা রাজার বংশধর হিসাবে কোচ নাম ত্যাগ করে 'রাজবংশী' নাম গ্রহণ করেছে। অবশ্য এস.ডি.ও. হেমন্তকুমার বর্মা তাঁর *কুচবিহারের ইতিহাস* গ্রন্থে কম্বোজ রাজবংশ থেকে রাজবংশী নামের উদ্ভব[১২] হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। *মনুসংহিতায়* পৌণ্ড্রক, ওড্র, দ্রাবিড়, কম্বোজ ও শক জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং ধরে নেওয়া যায় যে কম্বোজ রাজবংশ থেকে কোচ (কম্বোজ>কুবাচ>কোচ>) শব্দ এসেছে। আর কোচ জাতিই পরবর্তীকালে রাজবংশোদ্ভুত 'রাজবংশী' নাম গ্রহণ করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে। কোচ জাতির যেসব লোকজন আর্থিকভাবে সচ্ছল ছিলেন, তারা কোচ রাজার অনুগামী ছিলেন ও সাহচর্য লাভ করেছিলেন, এবং-রাজবংশী নাম নিয়ে আজ তারা আলাদা হয়ে পড়েছেন। আর যেসব লোকজন আর্থিকভাবে অসচ্ছল ও রাজার সংস্পর্শ থেকে অনেক দূরে ছিলেন, রাজার সাংস্কৃতিক কার্যাবলীর স্পর্শ যারা পান নি তারা আজও কোচ জাতি হিসাবে রয়ে গেছেন। এইসব কারণে কোচ ও রাজবংশীদের বিশ্বাস, সংস্কার, সংস্কৃতির সাথে অনেক ব্যাপারে মিল থাকলেও অমিলও অনেক ব্যাপারে পরিলক্ষিত হয়। চারশো-সাড়ে চারশো বছরের ইতিহাস পরিক্রমায় রাজবংশীরা আজ তাদের পূর্বপুরুষের পুরানো অতীত ইতিহাস জানে না। সেকারণে নিজেদের কোচ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে পরিচয় দিতে অস্বীকৃতি তো জানাই-ই বরং কোচদের কিছুটা তাচ্ছিল্যের চোখেও দেখেন।[১৩] ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারিতে রাজবংশীদের কোচ হিসাবে দেখানো হয়েছিল, এবং গণনা কর্তৃপক্ষ নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, রাজবংশীরা কোচদের সমতুল্য, সেজন্যে তাদের কোচ সম্প্রদায়ের সাথে একীভূত করে গণনা করা হবে।[১৪] এই সময়ে রাজবংশীদের মধ্যে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে, এবং তৎকালীন রংপুরের

জেলা প্রশাসক ফ্রান্সিস স্ক্রাইনের নিকট স্মারকলিপি পেশ করেন। স্মারকলিপিতে বলা হয় যে, আদমশুমারি প্রতিবেদনে রাজবংশীদের ক্ষত্রিয় হিসাবে ও কোচ জাতি থেকে আলাদাভাবে গণনা করা হোক।[১৫] কিন্তু ১৯০১ সালেও রাজবংশীদের কোচ হিসাবে গণনা করা হয়।

রাজবংশীদের উৎপত্তি সম্পর্কে নৃতাত্ত্বিক মন্তব্য

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক পণ্ডিত রাজবংশী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি সম্পর্কে নানান ধরনের মন্তব্য করেছেন। তাঁদের অধিকাংশের উৎপত্তি সংক্রান্ত মন্তব্য ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক গ্রন্থাবলিতে বর্ণিত বিষয়াবলির সাথে সাযুজ্যপূর্ণ। আর দু'একজন পণ্ডিত রাজবংশী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি সম্পর্কে ভিন্ন ধারার মন্তব্য করার ফলে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। অবশ্য এই দুএকজন পণ্ডিতের মন্তব্যগুলো ইতিহাস ও পুরাণে উল্লিখিত বিষয়াবলি সমর্থন করে না, এবং এসব বিরুদ্ধ মন্তব্যের পিছনে জোরালো কোনো ভিত্তি নেই। যাহোক, এ পর্যায়ে বিভিন্ন পণ্ডিতের উৎপত্তি সম্পর্কিত মন্তব্য সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার জন্য এখানে প্রণিধানযোগ্য। ডা: বুখানন হ্যামিলটন (১৮০৭–১৮০৯ খ্রি.) বলেছেন যে, "আমার কোনো সন্দেহ নেই যে কোচ জনগোষ্ঠীর সমস্ত লোকজনের উৎপত্তি হয়েছে একই উৎস থেকে, এবং অধিকাংশ রাজবংশী–ই কোচ জনগোষ্ঠীভুক্ত।"[১৬] ১৮৭২ সালে আদমশুমারি প্রতিবেদন সম্পাদনাকালে ঢাকা জেলার কোচ–রাজবংশীদের বসতিসম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে W.W. Hunter বলেন, "ছয়–সাত পুরুষ আগে কুচবিহার থেকে অভিবাসিত হয়ে রাজবংশী উপজাতি জনগোষ্ঠীর লোকজন ঢাকাতে বসতিস্থাপন করেছিলেন ; বর্তমানে তারা তাদের নিজস্ব আদিবাসভূমির স্মৃতি হারিয়েছেন, এবং আদিবাসভূমি কোথায় ছিল তারা তা জানেন না।...এইসব রাজবংশী জনগোষ্ঠীর লোকজন কোচ উপজাতি থেকে উত্থিত হলেও বর্তমানে কখনো কোচদের সাথে তাদের রক্তমিশ্রণ ঘটে না।" ১৮৮১ সালের আদমশুমারি প্রতিবেদন পর্যালোচনা করতে গিয়ে হান্টার বলেন যে, "আদমশুমারি প্রতিবেদনে অর্ধ–হিন্দু আদিবাসী হিসাবে উল্লিখিত কোচ, পলিয়া ও রাজবংশী জনগোষ্ঠীর লোকজন, যারা কুচবিহার রাজ্যে ও রাজ্যসংলগ্ন আদিবাসী, তারা মূলত একই বংশোদ্ভুত উপজাতি।"[১৮] ১৯০৫[১৯]ও ১৯০৬[২০] সালে সম্পাদিত ও প্রকাশিত *আসাম ডিস্ট্রিক গেজেটিয়ারে* কোচ বা রাজবংশীদের মঙ্গোলীয় মানবগোষ্ঠীর আদিবাসী–উপজাতি হিসাবে উল্লেখ দেখা যায়। জি.এ. গ্রীয়ার্সন (G.A. Grierson) তাঁর *Linguistic Survey of India*-তে উল্লেখ করেছেন যে, "যেসব কোচ বর্তমানে হিন্দু ধর্মাবলম্বী তারা প্রধানত রাজবংশী হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছেন।"[২১] নৃতত্ত্ববিদ হার্বার্ট রিজলী তাঁর *Tribes and Castes of Bengal* গ্রন্থে কোচ, পলিয়া ও রাজবংশীদের একই বংশোদ্ভুত জাতি হিসাবে বর্ণনা করেছেন।[২২] অবশ্য তিনি এদের দ্রাবিড় জাতি হিসাবে উল্লেখ করে তাদের সাথে মঙ্গোলীয় রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। তবে, রাজবংশীরা দ্রাবিড় ভাষাভাষী কি–না সে ব্যাপারে পরে আলোচনা করা হবে। ১৯৬১ সালের আদমশুমারি প্রতিবেদনের বর্ণনামূলক অংশে রংপুর[২৩] ও দিনাজপুর[২৪] এর কোচ, পলিয়া রাজবংশীদের একসাথে উল্লেখ করে মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠী হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। Beverly-র মতে কোচ, রাজবংশী এবং পলিয়া প্রায় সর্বাংশে একই উপজাতীয়ভুক্ত। ১৮৭২ সালে কুচবিহারের তদানীন্তন ডেপুটি কমিশনার Captain Lewin মন্তব্য করেন, ভূটান, ডুয়ার্সের অধিবাসী মেচ উপজাতির সঙ্গে দক্ষিণ ভারতীয় হিন্দুগণের পারস্পারিক বৈবাহিক সংমিশ্রণের ফলেই

রাজবংশী জাতির উদ্ভব হয়েছে।[২৫] অবশ্য দক্ষিণ ভারতীয় হিন্দুগণের সাথে রাজবংশীদের ব্যাপক বৈবাহিক সংমিশ্রণ ঘটেছিল কি–না তা গবেষণা ছাড়া সিদ্ধান্তে পৌছানো সঙ্গত নয়। ১৮৯১ সালের আদমশুমারি প্রতিবেদনে O' Donnel বলেছেন, রাজবংশী বা কোচদের মধ্যে মঙ্গোলীয় রক্তের প্রভাব বেশি।[২৬]

কুচবিহারের ইতিহাস প্রণেতা হরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী বলেছেন, "রাজবংশী কখনো দুটি উপজাতির সংমিশ্রণ নয়।"[২৭] অবশ্য এ ব্যাপারে তাঁর মন্তব্যে জোরালো কোনো যুক্তি পাওয়া যায় নি। এ ছাড়াও O'Malley'র একটি মন্তব্য এখানে প্রণিধানযোগ্য, সেটি হলো–"*কোচ, মেচ ও বোড়ো তিব্বত–বর্মী ভাষীরা একই উপজাতীয় উৎস থেকে এসেছেন।*"[২৮] তাঁর এ মন্তব্য থেকে কোচ–রাজবংশীদের সাথে মেচ ও বৃহত্তর বোড়ো ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর সাথে মিলের সন্ধান পাওয়া যায়। ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে O'Donnel তাঁর ভারতের আদমশুমারি বিবরণে বলেছেন, "রাজবংশীদের জাতিগত অবস্থা নির্ণয় করা যদিও বিতর্কমূলক তবুও বলা যায়, এরা পূর্ব গিরিপথগুলো দিয়ে মঙ্গোলীয় জাতির আগমন ধারার তৃতীয় শাখা হিসাবে উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করেন।[২৯] আর *তবকাত–ই–নাসিরীতে* কোচ–মেচ–থারু সম্প্রদায়গুলোকে মঙ্গোলীয় শাখার লোক বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।[৩০] Beverly'র মতে কোচ, রাজবংশী, পলিয়া এবং দেশী–এরা সকলেই দ্রাবিড় জাতি উদ্ভুত।[৩১] রাজবংশীদের ক্ষত্রিয় আন্দোলনের সময় O' Malley বলেছেন, "কোচ হতে রাজবংশী জাতি ভিন্ন–এ দাবি অসঙ্কোচে মঞ্জুর করা হলো। জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে যতই প্রশ্ন থাকুক আজ এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, রাজবংশী ও কোচ পৃথক জাতি।"[৩২]

ড. পীয়ের বেসাইনের (Dr. Pierre Bassignet) মতে, "তিব্বতীয় ও ভারতীয় সংমিশ্রণের ফলে রাজবংশীদের উদ্ভব। এদের কেউ কেউ কোচ উপজাতি ত্যাগ করে নাম বদল করে রাজবংশী হয়ে হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। এ ঘটনা ঘটে অহম'দের আসাম জয় ও কুচবিহারের কোচদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ার পর।"[৩৩] ই.টি ডাল্টন (E.T, Dalton) এর মতে, "এ ব্যাপারে সব বিশেষজ্ঞই একমত যে, মেচ ও কাচারি একই জাতির মানুষ অন্তত, তাদের উৎস এক।... সময়ের স্রোতে নানান পরিবর্তন ঘটেছে এদের। গোয়ালপাড়া জেলার মেচপাড়া অঞ্চলের নাম এদের নামানুসারে হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মেচপাড়ার সর্দার একজন মেচ। কিন্তু সে নিজেকে রাজবংশী হিসাবে পরিচয় দেন।"[৩৪] জে.এ. ভাসের (J.A. Vass) মতে, "রংপুরের রাজবংশী কোচ জাতি থেকে উদ্ভুত এবং মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তাদের মধ্যে দ্রাবিড়ীয় রক্তের সংমিশ্রণ রয়েছে, উত্তরাংশে তা সামান্য এবং পশ্চিমাংশে তা যথেষ্ট; আর্য রক্ত তাদের শিরায় প্রায় নেই বললেই চলে।"[৩৫] ই.এ গেইট (E.A. Gait) এর মতে "আসল কোচরা (যেমন আসামীয় কোচ) হলো মঙ্গোলীয় জাতি। রাজবংশীরা সম্পূর্ণ আলাদা জাতি। দ্রাবিড়দের সাথে এদের সংস্পর্শ রয়েছে। এদের প্রতিবেশী ছিল অসংখ্য হিন্দু। মানস নদীর পশ্চিম তীরের কোচরা হিন্দু ধর্ম অবলম্বন করার পর রাজবংশী নাম গ্রহণ করেন। মানস নদীর পূর্ব তীরে রাজবংশীদের বাস ছিল না, এবং সেই কারণে এখানকার রাজবংশীরা বিশুদ্ধ কোচ না–হয়ে তারা হয়েছে এক মিশ্র জাতি, যার মধ্যে মঙ্গোলীয় বৈশিষ্ট্য বেশি দেখা যায়।"[৩৬] ষোড়শ শতাব্দীর দিকে র‍্যালফ ফিচ, ব্রায়ান, হাজসন ও বুখানন প্রমুখ পরিব্রাজকগণ মনে করেছেন যে, কামরূপ বা কামতাপুরীর অধিবাসীরা

(বর্তমান কালের আসাম, কুচবিহার, রংপুর, দিনাজপুর এলাকা) মঙ্গোলীয় ছিলেন।"[৩৭]

উপরিউক্ত পণ্ডিতগণের মন্তব্য থেকে একটি বিতর্কের উদ্ভব হয়, সেটি হলো–রাজবংশীগণের দেহে মঙ্গোলীয় রক্ত প্রবাহিত হয়, এটি প্রায় সকলে সমর্থন করেছেন। কিন্তু মঙ্গোলীয় রক্তের সাথে দ্রাবিড়ীয় রক্ত মিশ্রণ ঘটেছিল, নাকি প্রটোঅস্ট্রালয়েডদের রক্তমিশ্রণ ঘটেছিল সে ব্যাপারে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। বর্তমান রাজবংশীগণের দৈহিক গঠন, গায়ের রঙ, নাক, চোখ, চোয়ালের গঠন ও দাড়ি–গোঁফ পর্যবেক্ষণ করে এটি নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তাদের মঙ্গোলীয় রক্তের সাথে অন্য জনজাতির রক্তমিশ্রণ ঘটেছিল। এ পর্যায়ে কোন জনজাতির রক্তমিশ্রণ ঘটেছিল সেটি বিচার্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কোচ রাজবংশীরা ভাষাতাত্ত্বিকগণের ও ঐতিহাসিক–গণের মতানুযায়ী বোড়ো (Bodo) ভাষাগোষ্ঠীর একটি উপজাতি, এবং তাদের বসতি এলাকা বৃহত্তর উত্তরবঙ্গ, নেপাল ও ভূটানের কিছু এলাকায়। এখন স্মর্তব্য যে, উক্ত উত্তরবঙ্গ, নেপাল ও ভূটানের কিছু এলাকায় কোন কোন জনজাতির বসতি ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক শাস্ত্রগ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, সেটি। পৌরাণিক শাস্ত্র গ্রন্থাবলি, ইতিহাসবিদ, ঔপনিবেশিক আমলের ইংরেজ সরকারি কর্মকর্তাগণের মন্তব্য ও বিভিন্ন সময়ের পরিব্রাজকগণের ভ্রমণ বৃত্তান্তের মন্তব্য থেকে জানা যায় যে, এসব এলাকায় মূলত কোচ, গারো, রাভা, মেচ, ডিমাসা, ধীমল, ত্রিপুরা, কাচারি প্রভৃতি উপজাতির বসবাস ছিল, যারা বোড়ো ভাষাগাষ্ঠীভুক্ত মঙ্গোলীয় জনগাষ্ঠী। তাছাড়া টোটো, রাই, লিম্বু, লেপচা, সরকি, কামি প্রভৃতি উপজাতিদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় সঠিকভাবে জানা না গেলেও চেহারাবৈশিষ্ট্য থেকে এটা স্পষ্ট যে এরা দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীভুক্ত নয়। উত্তরবঙ্গেব সাঁওতাল, মুণ্ডা, কুকামার, মাহালী প্রভৃতি উপজাতীয় জনগোষ্ঠীগুলো প্রটোঅস্ট্রালয়েড। তাছাড়া উত্তরবঙ্গে বসবাসকারী দ্রাবিড় ভাষী দুটি উপজাতি ওরাওঁ ও পাহাড়ি, এরা ইংরেজ আমলে নীল চাষের সময় অভিবাসিত হয়েছিল। দ্রাবিড় ভাষী জনগোষ্ঠীর বসতিস্থান দক্ষিণ ভারতে। সেসব জনগোষ্ঠী হলো তামিল, তেলেগু, মালয়ালম প্রভৃতি। তামিল, মালয়ালম ও তেলেগু প্রভৃতি দ্রাবিড় পরিবারভুক্ত ভাষাগোষ্ঠীর সাথে ওরাওঁ ও পাহাড়িয়াদের দৈহিক গঠনগত ও ভাষাগত মিল পাওয়া যায়। রাজবংশীদের বর্তমান ভাষা বাংলা হলেও তাদের ভাষা বোড়ো ভাষাভুক্ত ছিল ভাষাতাত্ত্বিকগণ যেমন মতামত প্রকাশ করেছেন, তেমনি দৈহিক গঠন বৈশিষ্ট্যে মঙ্গোলীয় গঠন বৈশিষ্ট্যের সাথে অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী (Australian aborigine) কিংবা শ্রীলঙ্কার–ভেদ্দা জনগোষ্ঠীর মিল পাওয়া যায়, যারা প্রোট্রো–অস্ট্রালয়েড শ্রেণীভুক্ত। এছাড়াও রাজবংশীদের সংস্কৃতির সাথে উত্তরবঙ্গের মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর সংস্পর্শ লক্ষ করা যায়, কিন্তু দ্রাবিড় ভাষী জনগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে কোনো মিল পাওয়া যায় না। সুতরাং বলা যেতে পারে, রাজবংশীদের রক্তের সাথে দ্রাবিড় ভাষী জনগোষ্ঠীর রক্ত সংমিশ্রণ ঘটে নি। যেহেতু ঐতিহাসিক ও পৌরণিকভাবে স্বীকৃত যে, উত্তরবঙ্গে মঙ্গোলীয় ও প্রটোঅস্ট্রলয়েড জনগোষ্ঠী (সাঁওতাল, মুণ্ডা, মাহালী, কুকামার) ইত্যাদি প্রাচীনকাল থেকে পাশাপাশি বসবাস করে আসছে, সেহেতু রাজবংশীদের মঙ্গোলীয় রক্তের সাথে প্রটো–অস্ট্রালয়েড রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে, দ্রাবিড় রক্ত নয়–এই সিদ্ধান্তই সঙ্গত। তাছাড়া রাজবংশী সমাজের সবাই কাশ্যপ গোত্র বলে পরিচয় দিলেও গোত্র–টোটেম প্রথা কচ্ছপ তারা খায়। সুতরাং তারা পূর্বকালে গোত্র–টোটেম মানত না। বাংলাদেশের প্রায় সকল উপজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে গোত্র–টোটেম সংক্রান্ত বিশ্বাস চালু ছিল ও আছে। এই গোত্র–টোটেম বিশ্বাসের আধিক্য দ্রাবিড়দের মধ্যে সবচেয়ে বেশি।[৩৮] দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড়

জনগোষ্ঠীর মধ্যে গোত্র–টোটেম সংস্কার এখনো বিদ্যমান। সুতরাং রাজবংশীদের মধ্যে রক্ত সংমিশ্রণ ঘটেনি–এটাও তার একটা বড় প্রমাণ।

উৎপত্তি বিষয়ে ভাষাতাত্ত্বিক অনুসন্ধান

ভাষাভাত্বিক পণ্ডিতগণের মন্তব্য থেকে জানা যায় যে, কোচ–রাজবংশীরা বৃহত্তর বোড়ো (Bodo) ভাষাগোষ্ঠীর একটি সম্প্রদায়। কিন্তু বর্তমান রাজবংশীরা বাংলাভাষারই একটি উপভাষা[৩৯] বা রাজবংশী ভাষায় কথা বলেন। তাহলে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, রাজবংশীরা কবে থেকে বোড়ো ভাষা ত্যাগ করে রাজবংশী ভাষা বা বর্তমান ভাষায় কথা বলতে শুরু করেন কিংবা তারা আদৌ বোড়ো ভাষাভুক্ত ছিল কি না। এ প্রশ্নের সমাধান পেতে হলে দেখতে হবে যে, বর্তমান রাজবংশীদের ভাষায় বোড়ো ভাষার সংমিশ্রণ, বোড়ো ভাষার শব্দাবলি কিংবা বোড়ো ভাষার অপভ্রংশ শব্দ আছে কি–না এবং রাজবংশীদের মৌখিক ভাষা হিসাবে সেগুলো ব্যবহৃত হয় কি–না। ভাষা সমীক্ষকদের বিশ্লেষণ থেকে পাওয়া যায় যে, বোড়ো ভাষাভাষী লোকজনই উত্তর অঞ্চলকে 'হা–বাংলা' নামে পরিচিত করে তুলেছিলেন।[৪০] ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে, হা–বাংলা থেকেই বাংলা শব্দের উদ্ভব হয়েছে।[৪১] বোড়ো ভাষায় 'হা' শব্দের অর্থ জমি বা স্থান (যেমন–হাওড়, হাওলা প্রভৃতি) বুঝায়। 'বাং' শব্দের অর্থ প্রচুর এবং 'লা' শব্দের অর্থ হলো অধিকার করা। সামগ্রিকভাবে 'বাংলা' শব্দটির ইংরেজি অর্থ দাঁড়ায় "possess or occupy as much as you can as there is enough fertile land."। বোড়ো ভাষাভাষী এসব মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর জনগণ ছিলেন কৃষিজীবী এবং তাদের কৃষিকাজে ব্যবহৃত দ্রব্যাদির নাম বোড়ো ভাষা থেকে আগত বলে অনেকেই দাবি করেন।[৪২] যেমন–নাঙ্গল (লাঙ্গল), লাষ্ঠি (লাঠি), জুঙ্গল (জঙ্গল), যুসলী (যোয়ালী), মই প্রভৃতি শব্দ বোড়ো ভাষা থেকে আগত। Prof. M.R. Laharry তাঁর *Contribution of Bodo People to Aryan Culture* গ্রন্থে চাষবাস, কর্ষণ, বীজবপন, রোপন, ফসল সংক্রান্ত শব্দাবলীর অধিকাংশই বোড়ো ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের বলে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। নিম্নলিখিত আধুনিক নাম শব্দগুলোর[৪৩] ক্ষেত্রেও বোড়ো শব্দগুলো সংস্কৃতায়নের মাধ্যমে উদ্ভব হয়েছে বলে গ্রহণ করা হয়েছে :

বোড়ো শব্দ	**আধুনিক শব্দ**
খাম–রু–রু	কামরূপ
খা–মা–ফ্রিয়া	কামাখ্যা
উমালদই	উমানন্দ
ভুরলুং বুথুর	ব্রহ্মপুত্র
দই চং চং	ডিচং
দই ব্রু ব্রু	ডিব্রু
দই খ্রোং–খ্রোং	ডিখৌ
হা–গজৌ	হাজো

উত্তরবঙ্গের নদ–নদীগুলোর নামকরণের ক্ষেত্রেও বোড়ো ভাষার প্রভাব ভাষাতাত্ত্বিকগণ স্বীকার করেছেন। আসামের অনেকগুলো নদীর নামের আগে 'ডি' 'দি' শব্দ লক্ষ করা যায়। 'ডি' বা

'ডুই' শব্দটি কাচারি, মেচ ও বোড়ো ভাষায় জল বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। ডিহং, ডিবং, ডিসং ডিখু, ডিসোই, ডিজু ইত্যাদি নদীর পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের 'ডি' যোগে উৎপন্ন নদীর নাম ডিস্তাম>ডিস্তা>তিস্তা, ডিমা প্রভৃতি স্মর্তব্য। বৃহত্তর রংপুরের অসংখ্য স্থাননাম পর্যালোচনা করলে বোড়ো ভাষা তথা মঙ্গোলীয় প্রভাব লক্ষ করা যায়।[৪৪] উপর্যুক্ত বোড়ো ভাষার শব্দাবলী লক্ষ করলে অনেক শব্দের শেষে 'ং' 'ঙ' বিশিষ্ট শব্দ লক্ষ করা যায়। রাজবংশী সমাজের কথ্য ভাষায় যদি ঐ ধরনের উচ্চারণ (accent) বিশিষ্ট শব্দ খুঁজে বের করে বোড়ো ভাষার প্রভাবজাত শব্দ কি–না, কিংবা বোড়ো ভাষার শব্দ কি–না তা নিরীক্ষণ করলেও বিষয়টি সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌছানো সহজ হয়। এ পর্যায়ে বর্তমান গবেষক বেশ কিছু শব্দের শেষে 'ং' এবং 'ঙ' বিশিষ্ট শব্দ খুঁজে বের করে সিদ্ধান্তে পৌছাতে সচেষ্ট হয়েছেন। শব্দগুলো হলো : মুঁই (আমি) বাঙর, চড়াং (চড়াব), যাং (যাই), থুইচং (রাখা), চোঙা (চোঙ), চ্যাংরা–চ্যাংরী (উঠতি বয়সী যুবক–যুবতী), গাঙুর, বাঙ্গান, সুঁই, ডাং, শোনং, ধরং, বাইরাং (ধুক ধুক করা), পিন্দন (পরা), হইলং, ঘুল্টুং, কইচং, ধরং, পঙিখ, ছাড়িলং, কাঙেখ, দিলং (দিলাম), ঘুংরা (ঘুঙর), ফেলাওং (ফেলানো), মুঙি সামটাং, গেইছুং, নাইয়ং, গোঁসা, পঙ্থে, বান্দিচেন, হুঁদুম, হংকে, রান্ধং, কান্দং, ডাঙ্গেয়া ভাঙ্গিম ঠ্যাং, ঝাং ঝাং (উচ্চ কণ্ঠে ডাকাডাকি), নাং (উপপতি), করং, দেখং, ছ্যাং ছ্যাংগা, বান্দং, কাংখে, কান্দিম (কাঁদিব), আছং (আছি), ইত্যাদি। তাছাড়া বোড়ো শব্দ দি, দৈ, তি, থৈ, থি, থিয়া প্রভৃতির অর্থ হলো নদী বা জলধারা। এই শব্দগুলো থেকে দেখা যায় যে, এর অধিকাংশ শব্দই ক্রিয়াপদ। সাধারণত বাংলাক্রিয়া পদের শেষে, কখনো কখনো পদের মাঝখানে 'ঙ' বা 'ং' ব্যবহৃত হয়েছে। এই 'ং' এবং 'ঙ' এর উচ্চারণ (accent) বোড়ো ভাষায় প্রচুর লক্ষ করা যায়। আরেক ধরনের পদ রয়েছে এই শব্দগুলোর মধ্যে, সেগুলো হলো বিশেষ্যপদ, যা বোড়ো ভাষার শব্দভাণ্ডার থেকে আগত বলে মনে হয়। এইসব শব্দ রাজবংশীদের কথ্যভাষায় বহুল প্রচলন রয়েছে বলে এই শব্দগুলো তাদের আদি শব্দ হিসাবে ধরে নেওয়া যায়।

ভাষাতাত্ত্বিক J.D. Anderson–এর সাথে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একমত পোষণ করে বাংলা ভাষা নির্মাণে বোড়ো ভাষার শক্তিশালী প্রভাবের কথা স্বীকার করেছেন। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর *The Origin and Development of the Bengali Language* গ্রন্থে লিখেছেন, "J.D. Anderson saw a strong 'Bodo'Influence in the growth of Bengali Language. He postulated that Bengal syntax and accentuation were influenced by 'Bodo' language."[৪৫] বাংলাভাষায় বোড়ো প্রভাবের কথা পরবর্তীকালে ক্লারেন্স ম্যালোনি, পিটার ম্যাকনি, রফিকুল ইসলাম প্রমুখ স্বীকার করে নেন। বর্তমান আসাম (মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর আদি বাসস্থান) শব্দটিও কোনো কোনো পণ্ডিত বোড়ো ভাষার উৎসজাত বলে বিবেচনা করেছেন। বোড়ো ভাষায় 'হা–কোম' শব্দটির অর্থ 'নিম্ন বা সমতল ভূমি'। এই 'হা–কোম' শব্দ থেকেই আসাম শব্দের উৎপত্তি হয়েছে বলে কেউ কেউ মত দিয়েছেন। ব্যাডেন পাওয়েল বলেন, "The name Assam is most probably traceable to the (Bodo) Ha-com, the low or level country."[৪৬] Clarence T. Maloney তাঁর *Tribes of Bangladesh and Synthesis of Bengali Culture* প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, "ভাষাবিদ রফিকুল ইসলাম ও তার আগে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে, ময়মনসিংহ অঞ্চলের বাংলাভাষার কথ্যরূপ মূলত বোড়োভাষা গোষ্ঠীর

পরিবর্তিতরূপ বিশেষ করে গারো ও কাচারি উপভাষার। রংপুর অঞ্চলের বাংলা ভাষার কথ্যরূপেও বোড়ো ভাষাগোষ্ঠীর প্রভাব রয়েছে। বিশেষ করে ভারতের আসাম প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত উপজাতীয়দের ভাষার প্রভাব বাংলাদেশের রংপুর অঞ্চলের বাংলা কথ্যরূপে স্পষ্টই ধরা পড়ে।...কোচরা এককালে কুচবিহার অঞ্চলে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। তাদেরই বংশধর রাজবংশীরা এখনো বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমাংশে ছড়িয়ে আছে।... একটু গভীরভাবে লক্ষ করলে ধরা পড়ে যে, তাদের ব্যবহৃত কথ্যরূপ বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমাংশের কথ্যরূপের একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত যা আদর্শ বা স্টাণ্ডার্ড বাংলাভাষার সাথে যথেষ্ট পৃথক।" ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রাজবংশীদের মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর তিব্বত-ব্রহ্মদেশীয় ভাষা-শাখার লোক বলে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া আধুনিককালের গবেষক ড. গিরিজাশঙ্কর রায়ের উক্তি থেকেও পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর তিব্বতী-ব্রহ্মদেশীয় ভাষার সাথে পরবর্তীকালে অস্ট্রিক-দ্রাবিড় ভাষার সংমিশ্রণ ঘটেছে।[৪৭] ড. রায় বলেছেন, "আসাম, ব্রহ্মদেশ, ত্রিপুরা, নেপাল এবং হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত স্থানগুলোর লোকদের যে মঙ্গোলীয় নৃ-শাখার দৈহিক আকৃতির বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, তারই পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়কে বিচার করিলে এই মতের সমর্থন না করিয়া পারা যায় না। পরবর্তীকালে ইহাদের সহিত অস্ট্রিক-দ্রাবিড় ভাষী গোষ্ঠীর মিশ্রজাতি বাঙালিদের সহিত রক্ত সংমিশ্রণ ঘটিতে পারে। তাহার একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রমাণ রাজবংশীরা যে ভাষায় কথা বলিয়া থাকে, সেটি বাংলা ভাষারই একটি বিশিষ্ট উপভাষা।"[৪৮] ড. রায়ের মতটি সমর্থযোগ্য। অবশ্য এই মতটি সমর্থন করে নিলে এটি বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা থাকে, সেটি হলো— কোন সময়ে বোড়ো ভাষাগোষ্ঠীর কোচরাজবংশী জনগণ অস্ট্রিক দ্রাবিড় ভাষা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বর্তমানের বাংলার উপভাষা অর্থাৎ রাজবংশী ভাষা গ্রহণ করেছেন? ভাষাত্বিকদের গবেষণা থেকে জানা গেছে যে, এক শতাব্দীকালের মধ্যে কোনো জাতির ভাষা তার পার্শ্ববর্তী প্রভাবশালী ও বৃহত্তর জাতির ভাষার মধ্যে হারিয়ে ফেলতে পারে। সেক্ষেত্রে কিছু বিক্ষিপ্ত শব্দ ছাড়া সেই ভাষার ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যগুলো আর খুঁজে পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিকদের লিখিত ইতিহাস থেকে জানা যায়, ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কোচ রাজা বিশ্বসিংহের নেতৃত্বে কোচরাজবংশীগণ সম্পূর্ণভাবে তাদের পূর্বের ভাষা, ধর্ম ত্যাগ করে হিন্দু ধর্মগ্রহণ করেন. ও পুরোপুরিভাবে বর্ণ হিন্দুদের ভাষা ব্যবহার শুরু করেন। সুতরাং বোড়ো ভাষী মঙ্গোলীয় কোচ-রাজবংশীগণ ষোড়শ-শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যেই তাদের নিজস্ব ভাষা হারিয়ে ফেলে বাংলাভাষা গ্রহণ করে, এবং তারও অনেক আগে থেকেই অষ্ট্রিক-দ্রাবিড় ভাষী জাতির সাথে রক্তমিশ্রণ ঘটায়, যারা নিজেরাও ইন্দো-আর্য-অস্ট্রিক-দ্রাবিড় ভাষা প্রভাবিত ভাষা বাংলা গ্রহণ করেছিল। উত্তরবঙ্গের রাজবংশীগণ ব্যতীত বাংলাদেশের বৃহত্তর যশোর, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, ঢাকার রাজবংশীদের ভাষার ক্ষেত্রে স্ব স্ব এলাকার আঞ্চলিকতা পুরোমাত্রাই ঢুকে পড়েছে।

দৈহিক গঠন

দৈহিক গঠন বিষয়ক বিবরণের শুরুতে একটি বিষয় বলা প্রয়োজন যে, দৈহিক গঠনের ক্ষেত্রে পৃথিবীর কোনো জাতি-উপজাতিই অবিমিশ্র রক্তধারা বহন করে না। সে কারণে দৈহিক গঠনের ভিত্তিতে জাতিতাত্ত্বিক শ্রেণী বিভাজন নৃতত্ত্বে বর্তমানে অচল। কিন্তু নৃতত্ত্বের তাত্ত্বিক

গবেষণার শুরুতে মানুষের উৎপত্তি, বিকাশ ও তার দৈহিক গঠন প্রণালী অর্থাৎ মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রতঙ্গের আনুপাতিক পার্থক্য নির্ধারণ নৃ-বিষয়ে পরিমাপ বিদ্যার (Anthropometry) করা হয়েছিল। সেজন্যে এদের দৈহিক গঠন বিষয়ে কিঞ্চিত আলোকপাত করা হলো।

রাজবংশীদের দৈহিক গঠন বিষয়ে অনেক নৃতাত্ত্বিক একমত হয়েছেন যে, কোচ রাজবংশীরা মঙ্গোলীয়। তবে তাদের মঙ্গোলীয় বৈশিষ্ট্যের সাথে অন্যান্য কোন কোন জাতিসত্তার দৈহিক বৈশিষ্ট্য সংযুক্ত হয়েছে এ ব্যাপারে মতভেদ দেখা যায়। হার্বার্ট রিজলী, ই.এ. গেইট[৪৯] প্রমুখ নৃবিজ্ঞানীগণ বলেছেন, রাজবংশীদের মঙ্গোলীয় রক্তের সাথে দ্রাবিড় (Dravidian) ভাষাভাষী জাতির রক্ত সংমিশ্রণ ঘটেছে। কিন্তু ডক্টর অতুল সুর মঙ্গোলীয় বৈশিষ্ট্যের সাথে আদি অস্ট্রালয়েড (Proto-Australoid) জাতির রক্ত সংমিশ্রণ ঘটেছে বলে মনে করেন[৫০] প্রকৃতপক্ষে রাজবংশীদের রক্তের সাথে দ্রাবিড় ভাষাভাষী গোষ্ঠীর রক্তমিশ্রণ ঘটেনি। কারণ রাজবংশীরা প্রাচীন আমল থেকে আসাম, কুচবিহার, দিনাজপুর, রংপুর, জলপাইগুড়ি এলাকায় বসবাস করে আসছে। এসব এলাকাতে দ্রাবিড় ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী ওঁরাও ও পাহাড়িয়ারা ব্রিটিশ শাসনামলে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের দিকে অভিবাসিত হয়েছিল বলে ঐতিহাসিক প্রমাণ মেলে। তাছাড়া তামিল, মালয়ালম, তেলেগুরা দ্রাবিড় পরিবারভুক্ত। এদের বসতিস্থল দক্ষিণ ভারত। ওরাওঁ, পাহাড়িরা যখন এদেশে এসেছে তখন জাতিভেদপ্রথা সমাজে কঠোরতা লাভ করেছে এবং সামাজিক স্তরবিন্যাস (social stratification) সমাজে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং তখন দ্রাবিড় রক্তমিশ্রণ রাজবংশীদের সাথে ঘটেনি–এটি মোটামুটিভাবে নিশ্চিত। বৃহত্তর বোড়ো (Bodo) ভাষাভাষী গোষ্ঠীর সাথে তাদের রক্ত সংমিশ্রণ ঘটতে পারে। কারণ আসাম ও কুচবিহার এলাকায় এদের যেমন ছিল পাশাপাশি অবস্থান, তেমনি ছিল ভাষাগত মিল। আর রাজবংশী নাম গ্রহণ ও ক্ষত্রিয়ত্বের আন্দোলনে কিছু উপজাতীয় মানুষজন নিজেদের ক্ষত্রিয় ও রাজবংশোদ্ভুত পরিচয় দেওয়ার মানসে রাজবংশী হিসাবে পরিচয় দিয়েছে, করেছে সংস্কৃতি ও পদবী বদল। এই রক্ত সংমিশ্রণ দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, নদীয়া, যশোহর, ফরিদপুর, মানিকগঞ্জ, পাবনা এলাকায় ঘটেছে সবচেয়ে বেশি, আর রংপুর ও বগুড়া এলাকায় সবচেয়ে কম। সেজন্য রংপুর ও বগুড়া এলাকার রাজবংশীদের অনেকের মধ্যে এখনো মঙ্গোলীয় বৈশিষ্ট্য অনেকের মধ্যে সুস্পষ্ট আকারে পরিলক্ষিত হয়। রাজবংশীদের দৈহিক গঠনবৈশিষ্ট্য হলো—চ্যাপ্টা মুখমণ্ডল, প্রশস্ত নাক, উঁচু চোয়ালের হাড়, উঁচু গণ্ডাস্থি, চোখ কালো, চুল সোজা থেকে ঈষৎ ঢেউ খেলানো, দাঁড়ি গোঁফ কম, দেহবর্ণ পীত থেকে ঈষৎ কালোর দিকে ইত্যাদি।[৫১]

'অজয় রায় রাজবংশীদের দৈহিক গঠন বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, "রাজবংশী ক্ষত্রিয়রা গড়ে মধ্যম শিরস্ক হলেও দীর্ঘ শিরস্কতার ঝোঁক লক্ষণীয়, তারা দীর্ঘ সুন্দর নাসার অধিকারী, তবে সামান্য মঙ্গোলীয় উপাদানও হয়তো মিশ্রিত হয়েছে। কারণ চাপা নাসাসেতু উপস্থিত রয়েছে কিয়ৎ পরিমাণে।"[৫২] রাজবংশীদের দৈহিক গঠন বিষয়ের সূচকাঙ্ক তৈরির কাজটি হার্বার্ট রিজলী করেছিলেন। তিনি এক্ষেত্রে বঙ্গদেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে অবস্থিত রাজবংশীদর ১০০ জনের গড় শিরাঙ্ক ৭৫.২–৭৬.৬, গড় অ,ক, নাসাঙ্ক ১১০.৮ এবং গড় উচ্চতা ১৬০.৭ সেন্টিমিটার হিসাব করেছিলেন।[৫৩] রাজবংশীদের দৈহিক গঠন বিষয়ে ১৯৭২ সালে দিনাজপুর জেলা গেজেটিয়ারে লেখা হয়, "The typical Rajbansi has a

short broad figure, broad across the shoulder and across the claves of the legs. The nose is broad across the nostrils, the eyes are long and narrow and the cheek bones high. The general appearance shows unmistakable signs of Mongolian strians, the Kochs, the Rajbansis and the Paliyas have the same general appearance."[৫৪]

রাজবংশী সম্প্রদায়ে রক্ত সংমিশ্রণ

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, রাজবংশীরা ছিল বিরল পরিমাণে হলেও, বোড়ো উপজাতিদের সংমিশ্রণজাত। অন্যান্য বোড়ো ভাষী উপজাতিগুলো কোচ, মেচ, পলিয়া, গারো, রাভা, কাচারি, লালুঙ্গ, ডিমাসা, ত্রিপুরা, চুটিয়া, মোরা ও ধীমল। এসব উপজাতিগুলোর মধ্যে কোচ, মেচ, পলিয়া, রাভা ও কাচারিদের মধ্যে সম্পর্ক কম বা বিরল হলেও রক্তমিশ্রণের ঘটনার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথমেই কোচদের খাদ্য ও ধর্মীয় জীবন প্রণালীর দিকে লক্ষ করে বুখানন বলেছেন যে, "কোচরা খাদ্য হিসাবে শুয়োর, মোরগ ও যে-কোনো ধরনের পাখির মাংস গ্রহণ করত। ভাত পচিয়ে পরিশোধন না করেই এরা মদ্য প্রস্তুত করত। আর ধর্মীয় উপাস্য দেবতা ছিল সূর্য, চন্দ্র, নদী পর্বত, বন। যখন গোষ্ঠীর কোনো সদস্য দেবীর উদ্দেশ্যে বলিদান করবে বলে মনস্থির করত তখনি পুরোহিতের প্রয়োজন মনে করত। বুখানন লিখেছেন, যদিও এরা মূলত হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতিকে গ্রহণ করে নি, তথাপি বহু দেব-দেবীর নাম এরা জানত, এবং প্রয়োজন হিন্দু দেবদেবীর নামে মন্ত্র উচ্চারণ করত।"[৫৫] রাভারা খাদ্য ও মৃতের সৎকার বিষয়ে কোচদের প্রথাদি অনুসরণ করত। রাভাদের মধ্যেও বিধবা বিবাহ ছিল। তাছাড়া উপজাতির কোনো লোক রাভা কন্যাকে বিয়ে না করলেও রাজবংশী কন্যাকে বিয়ে করত।[৫৬] কাচারিদের খাদ্য ও অন্যান্য আচার-ব্যবহার আবার মেচরা অনুসরণ করত। এদের মধ্যে যারা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছিল তারা রাজবংশী বলে নিজেদের পরিচয় দিত। এদের কেউ কেউ হিন্দু আচার মেনে চলত, ও বাংলায় কথা বলত, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে উপজাতীয় প্রথা, জীবনধারা বর্জন করে নি।[৫৭] এভাবে যদিও বোড়ো ভাষাভাষী উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলো বিভিন্ন দলে বিভক্ত ছিল তথাপি এরা প্রায়শই আন্তঃবিবাহ করত। তাছাড়া আর্থিক জীবনে, সামাজিক সংগঠনে, উত্তরাধিকারী নির্বাচনের নিয়ম, ভাষায়, উৎসবে, ধর্মে এবং পৌরাণিক কাহিনী বিশ্বাসেও ছিল অনেকটাই সহধর্মী।[৫৮] এসব কারণেই রাজবংশীদের মধ্যে রক্ত সংমিশ্রণ ঘটেছে, ও সাংস্কৃতিক বিবর্তন ঘটেছে— ধারণা করাই যুক্তিসঙ্গত।

এদের মধ্যে বিভিন্ন জনজাতির রক্তমিশ্রণ ঘটেছে, তার প্রমাণ ডা: জেমস্ ওয়াইজ (James Wise M.D.) এর মন্তব্য থেকে পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, "পাহাড়ি গারোরা সমভূমিতে এসে হিন্দু মেয়েদের বিয়ে করছে—আর তা থেকে উদ্ভুত হয়েছে হাজং —এক বর্ণ শঙ্কর জাতি। গারোরা আবার দোইদের জ্ঞাতি, যাদের পুরোহিত ব্রাহ্মণ। এই ব্যাপারটি রাজবংশী, কোচ, মান্দাই ও সূর্যবংশীদের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়।"[৫৯] জেমস ওয়াইজ পূর্ববঙ্গের তিয়র, ময়মনসিংহের 'তিলক দাস' এবং গঙ্গা নিকটবর্তী অঞ্চলের 'সুরাজবংশী'দের রাজবংশী হিসাবে পরিচয় দেওয়ার কথা তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[৬০]

তথ্যসূত্র

১. বেণু দত্তরায়, *উত্তর বাংলার লোকসংগীত* (কলকাতা : সাহিত্য অকাদেমী, ২০০২), পৃ-১১
২. W.W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal, vol-x,* (London: Turbner and Co., 1876), pp.346-358.
৩. বেণু দত্তবায়, প্রাগুক্ত, পৃ-১১
৪. Dr. Buchanan Hamilton, *Account of the District or Zila of Rangpur,* India Office Libray, M.S.S.E.U.R.D.-74-75.

১৮০৭-১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে Francis Buchanan Hamilton জাতিতত্ত্ব বিচার বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, ". all the Koch are sprung from the same stock, and that most of the Rajbansis are Koch; but I am inclined to think that many of the former (Koch etc.) are of different tribes and having abandoned their impure practices, have been admitted to a communion."

৫. Herbert Risley, *Tribes and Castes of Bengal* (Calcutta : 1891) vol-II. p. 183.
৬. B.H. Hudgson, 'Essay on the Koch, Bodo, and Dhimal Tribes' in *Journal of the Asiatic Society of Bengal* (Calcutta : Asiatic Society, 1849), Part-II
৭. E.T. Dalton. *Descriptive Ethnology of Bengal* (Calcutta : 1872), pp. 88-90.
৮. W.W. Hunter, *Statistcal Account of Bengal, vol-x* (London: Trubner & Co, 1876) p. 3461. সুবোধ ঘোষ, *ভারতের আদিবাসী*

১৮৮১ সালের আদমশুমারি বিশ্লেষণ করে W.W. Hunter বলেছেন "The semi-Hinduized aborigins of the census report, who are considerably more numerous than the Hindus proper, mainly consist of the cognate tribes of Koch, Pali and Rajbansi... ..."

৯. E.A.Gait, *Census of India* (Assam vol.,1901)
১০. R.H.S. Hutchinson, *Eastern Bengal and Assam District Gazetteer* (Chittagong Hill Tracts), Allahbad, 1909.
১১. E.T. Dalton, *Descriptive Ethnology of Bengal,* op.cit.
১২. হেমন্ত কুমার বর্মা, *কোচবিহারের ইতিহাস,* উদ্ধৃত : *রংপুর জেলার ইতিহাস,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২-১০৬
১৩. আব্দুস সাত্তাব, *আরণ্য জনপদে*
১৪. সমর পাল, 'জেলার আদিবাসী : নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' *রংপুর জেলার ইতিহাস* (সম্পাদনা) জেলা প্রশাসন, রংপুর, ২০০; পৃ. ৮২-১০৬
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ ৮২-১০৬
১৬. Dr. F. Buchanam Hamilton, *Account of the District or Zila of Rangpur,* India Office Library, M.S.S.E.U.R.D. 74-75.

উদ্ধৃত সমর পাল, 'জেলার অধিবাসী : নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' রংপুর জেলা প্রশাসন (সম্পা.) *রংপুর জেলার ইতিহাস*

১৭. W.W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal,* Vol. v, (London : Trubner & Co., ১৮৭৭), পৃ. ৪২-৪৩, উক্ত বইয়ে বলা হয়েছে

'The Bansis or Rajbansis came originally from Kuch Behar six or seven generations ago, but can give no reason for their immigration. The Collector states that this tribe is evidently a hill people, but they have now lost all remembrance of their own country, and cannot even state where it was. The collector has been unable to find any district in considerable number. The Rajbanis keep themselves allof from the rest of the population, and never amalgamate with them,although admitted a caste of the general Hindu Community. They are permanent settlers, and follow the same occupations as the Koches, of which tribes, indeed, they are said to be an offshoot. The upper classes of aboriginal Koches, when they embrace Hinduism, become Rajbansis'.

১৮. উদ্ধৃত সমর পাল, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৯

The semi-Hinduized aborigines of the Census Report, who are considerably more numerous than the Hindus proper, mainly consist of cognate tribes of Koch, Pali and Rajbansi, whose home is in the adjoining state of Kuch Behar, and who are known to be still more largely represented in the general Muhammadan population. These three tribes number is collectively 4,32,498 among the Hindu population. The number of Muhammadan Koches is unasertainable.

১৯. B.C. Allen (ed.), *Assam District Gazetteers,* Vol.V (Calcutta: printed at the city press, 1905), pp. 95-96.

২০. B.C. Allen (ed), *Assam District Gazzeteers,* Vol. VII, 1906, pp. 93-94. উক্ত গেজেটিয়ারে বলা হয়েছে :

The Koches or Rajbansis were an aboriginal tribe, apparently of Mongolian origin, which at the beginning of the sixteenth century, rose to power under their great leader Viswa Singh. His son, Narnarayan, extended his conquests as far as Upper Assam Tippera. The Koch king had attained to a position of such power that the aboriginal people were anxious to be enrolled as members of this tribe. The result is that at the present day the name is no longer that of a tribe but a caste into which new converts to Hinduism are enrolled.

২১. G.A Grierson, *Linguistic Survey of India,* vol-v, part-l, p. 163

"...Those Koch, who are now Hindus, are principally known under the name of Rajbansis, but large number of them have become Mussalmans, so that of mere number of people of the Rajbansi tribe affords no idea of the number of people Koch extraction in the country."

২২ H.H. Risley, *Tribes and Castes of Bengal,* vol. II, & ফকরুজ্জামান চৌধুরী, '*পাকিস্তানের উপজাতি* (ঢাকা : পা.পা., ১৯৬৬), পৃ. ১৮

২৩. Population Census of Pakistan-1961, *District Census Report Rangpur 1961* (Karachi: Ministry of Home & Kashmir Affairs, Home Affairs Division), parts-1-V. pp. 1-17.
"Santhals, Koches, Rajbanshis and Hajongs constitute the tribal population of the district. They are usually grouped under the name of 'Aboriginal' but Rajbanshis have come a long way from what that name implies. They are noted for their simplicity and artlessness and honesty. Their dress, food and mode of life are quite different from of the rest of the population. They are generally of dark complexion and of medium stature with a bright black small eyes. Their women generally wear one piece of cloth which covers their body from the breast into the knee. The males wear 'lengti' (a narrow strip of cloth worn as a baby's diaper) while working in the field. They are very hard working people and men, women and children work energetically in the field".

২৪. Popuuation Census of Pakistan 1961. *District Census Reprot Dinajpur 1961* (Karachi: Home Affairs Division, Govt, of Pakistan), pp. 1-19.
"The Rajbanshis and the Paliyas who are the original inhabitants of this district are, no doubt, of Mongolion descent. They are a short stature, have small eyes, flat nose with protruded cheek bones, scanty beard and a dusty yellow complexions, the distinctive characteristics of the Mongolian race. For some research studies attempts have been made to class these people as Dravidians in common with the Koch, another Mongoloid tribe inhabiting the neighbouring district of Rangpur and Kuch Behar in India but their appears to be no justification for such assumption in the face of the strong evidence of their Mongolid physical features."

২৫. রণজিৎ দেব, 'উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজজীবন ও সংস্কৃতি', রতন বিশ্বাস (সম্পা.), *উত্তরবঙ্গের জাতি ও উপজাতি*

২৬. ঐ. পৃ. ৬৬

২৭. ঐ. পৃ. ৬৬

২৮. অশেষ কুমার দাস, 'মেচ জনজাতিদের কথা' বতন বিশ্বাস (সম্পা.), *উত্তরবঙ্গের জাতি ও উপজাতি*, ঐ, পৃ. ১৫৮

২৯. রণজিৎ দেব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

৩০. ঐ. পৃ. ৬৪

৩১. ঐ. পৃ. ৬৩

৩২ ঐ. পৃ. ৬৬

৩৩. Dr Pierre Bessaignet সম্পাদিত এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তানের ৫নং প্রকাশনার Social Research of East Pakistan গ্রন্থে প্রকাশিত সম্পাদক লিখিত প্রবন্ধ, পৃ. ১৫২

৩৪. Edward Tuite Dulton, *Descriptive Ethnology of Bengal,* 1872, p.88

৩৫. J.A. Vass, *Eastern Bengal and Assam District Gazzetteers,* Rangpur, p.155. উদ্ধৃতি পীয়ের বেসাইনের প্রবন্ধ থেকে

৩৬. E.A. Gait এর উদ্ধৃতিটি *পাকিস্তানের উপজাতি গ্রন্থ* থেকে, পৃ. ১৯

৩৭. ফকরুজ্জামান চৌধুরী, 'রাজবংশী', পাকিস্তান সরকার (সম্পা.) *পাকিস্তানের উপজাতি* (ঢাকা : পাকিস্তান পাবলিকেশনস, ১৯৬৬), ২য় সংস্করণ, পৃ. ১৯

৩৮. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলার লোক-সংস্কৃতি,* ২য় সংস্করণ

৩৯. মনিরুজ্জামান, *উপভাষা চর্চার ভূমিকা* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪), পৃ. ১৮৪-১৯২

৪০. বেণু দত্তরায় (সম্পা. এবং সংকলিত), *উত্তর বাংলার লোকসংগীত*

৪১. রেণু দত্তরায়, ঐ পৃ. ৯

৪২. ঐ, পৃ. ৯

৪৩. ঐ, পৃ.৯

৪৪. সমর পাল, 'জেলার অধিবাসী : নৃতাত্ত্বিক পরিচয়', জেলা প্রশাসন (সম্পা.), *রংপুর জেলার ইতিহাস*

৪৫. Dr Sunitikumar Chatterji, *The Origin and Developmet of the Bengali Language.* উদ্ধৃতি রেণু দত্তরায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

৪৬. Baden-Powell, *Indian Village Community,* p. 70 Quoted from বেণু দওরায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

৪৭. Sunitikumar Chatterji, *ODBL,* Op. cit. p. 69.

৪৮. ড. গিরিজাশঙ্কর রায়, *উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের দেবদেবী ও পূজা-পার্বণ,* পৃ ৭। উদ্ধৃত বেণু দত্তরায়, *প্রাগুক্ত, পৃ. ১০*

৪৯. E A. Gait, *Histry of Assam.* (Calcutta : 1906), p. 45.

৫০. ড. অতুল সুর, *ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়* ।

৫১. W.W. Hunter, *Statistical Account of Bengal,* vol-x. op cit., p.352.

৫২. অজয় রায়, *আদিবাঙালি : নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭), পৃ. ১০১

৫৩. H.H. Risley, *The People of India,* Apendix III, Calcutta, 1887.

৫৪. GOB, *Bangladesh District Gazetteers* : *Dinajpur* (Dhaka : Ministry of Establishment, 1972), p.51.

৫৫. বুখানন, *রংপুর বুক টু,* পৃ-১৩৩-১৩৪। *Statistical Account of Bengal,* Vol-x, op. cit., pp. 334-355, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৪-৩৫৫

৫৬. শিনকিচি তানিগুচি, প্রাগুক্ত, পৃ-১৬৪

৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫

৫৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫

৫৯. James Wise, *Races, Castes, and Trades :* Eastern Bengal ফওজুল করিম (অনূদিত), মুনতাসীর মামুন (সম্পা), *পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশা বিবরণ,* দ্বিতীয়ভাগ

৬০. ঐ, পৃ. ২৩

অধ্যায় ৩

বসতি এলাকা, জনসংখ্যা ও পরিবেশ

কোচ রাজবংশীদের প্রাচীন বসতি এলাকা ছিল তিব্বত ও ব্রহ্মদেশের পাহাড়ি ও মালভূমি এলাকায়। পরবর্তীকালে তিব্বত ব্রহ্মদেশীয় ভাষা-শাখার কোচ রাজবংশীগণ আসাম, ত্রিপুরা, নেপাল ও হিমালয়ের পাদদেশে বসতি স্থাপন শুরু করেন। ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দের আদমশুমারি বিবরণ প্রদানকালে O'Donnel বলেন, পূর্ব গিরিপথগুলো দিয়ে প্রবেশকারী মঙ্গোলীয়দের তৃতীয় শাখা হলো রাজবংশী।[১] অবশ্য ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন খ্রিস্টাব্দ গণনার শুরুর দিকে অর্থাৎ দুহাজার বছর আগে আসাম, পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে তিব্বত ব্রহ্মদেশীয় ভাষা শাখার বৃহৎ বোড়ো জাতির মেচ-কোচ-কাচারি প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলো বসতি স্থাপন করেন।[২] কোনো কোনো ঐতিহাসিক রাজবংশীদের উত্তরবঙ্গের আদিবাসী হিসাবে উল্লেখ করেছেন। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়ের *বাঙ্গালীর ইতিহাস* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, কোচ রাজবংশীদের বসতি স্থাপনের পরবর্তীকালে দ্রাবিড়-অষ্ট্রিক-মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর সাথে সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংঘাত ও সংমিশ্রন চলেছে। তিনি আরো বলেছেন যে, মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর সঙ্গে ভারতবর্ষের জনপ্রবাহে গভীরভাবে এর স্পর্শ কোথাও না লাগলেও আসাম, উত্তর হিমালয়শায়ী নেপাল, ভূটান এবং পূর্ব প্রান্তে ব্রহ্মদেশীয় প্রত্যন্ত জনপদ ও অরণ্যবাসীর লোকেদের মধ্যে লেগেছে। তাঁর নিজের ভাষায়, "কোচ, পলিয়া, রাজবংশী প্রভৃতি লোকদের ভিতর ইহার একটি ধারা প্রবাহ ধরা পড়িয়া গিয়াছে।... ব্রহ্মপুত্র উপত্যাকাধৃত ধারাটির একটি প্রবাহ ঐতিহাসিককালে বাংলাদেশে আসিয়া ঢুকিয়া পড়ে এবং রংপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি অঞ্চলে এইভাবেই খানিকটা মঙ্গোলীয় প্রভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।"[৩] সুতরাং খ্রিস্টপূর্ব সময়কালে যখন উত্তরবঙ্গ এলাকায় আর্যদের পদার্পণ ঘটে নি তখন থেকেই রাজবংশীগণ এসব এলাকায় বসতি স্থাপন করেছিলেন।

রাজবংশীদের বসতি এলাকা সম্পর্কে ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, "কুচবিহার জেলা সংলগ্ন দক্ষিণে অবস্থিত রংপুর জেলার যে রাজবংশী বা বাহে সম্প্রদায়ের লোক বাস করে, তাহারা...দক্ষিণ অঞ্চল হইতে গিয়া কালক্রমে উত্তরবঙ্গে নিজেদের বসতি স্থাপন করিয়াছে।"[৪] ডক্টর পীয়ের বেসাইনের মতে, "রাজবংশীরা তিব্বতের অধিবাসী এবং ভারতীয়দের সংমিশ্রণে এসে নতুন এক জাত হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে।"[৫] কুচবিহার ও আসামের বৃহত্তর বোড়ো (Bodo) ভাষাগোষ্ঠীর একটি মঙ্গোলীয় মানবগোষ্ঠী রাজবংশী। কোচরা কুচবিহার ও আসামে প্রাক-আর্য যুগ থেকে বসবাস করে আসছেন। বোড়ো ভাষাগোষ্ঠীর মঙ্গোলীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন অন্যান্য জনগোষ্ঠীগুলো হলো কোচ, মেচ, পলিয়া, গারো, রাভা, কাছারি, ত্রিপুরা প্রভৃতি। প্রতিটি জনগোষ্ঠীই চেহারায় মঙ্গোলীয় বৈশিষ্ট্যযুক্ত, এবং একই ভাষাগোষ্ঠীর লোক হওয়ায় বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ছিল। তাছাড়া বসতিস্থাপনের প্রাক্কালে জাতিভেদ প্রথা দৃঢ়তা লাভ করে নি। ফলে ঐসব

জাতির মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে কোনো অন্তরায় ছিল না বলে তাদের মধ্যে রক্ত সংমিশ্রণ ঘটেছে—এই সিদ্ধান্তে পৌছানো যুক্তিসঙ্গত। পরবর্তীকালে কালক্রমে রাজবংশীরা আসাম ও কুচবিহার থেকে বর্তমানের বৃহত্তর রংপুর, দিনাজপুর ও বগুড়া এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৭২ সালের আদমশুমারি প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, রাজবংশীরা উপর্যুক্ত এলাকা ছাড়াও মালদহ, দার্জিলিং, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, যশোর ও পাবনাতে ছড়িয়ে আছে। *বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার বৃহত্তর ময়মনসিংহ* থেকে জানা যায়, ময়মনসিংহ জেলার পশ্চিমাঞ্চলে বসবাসরত রাজবংশীরা ১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দে রংপুরে দুর্ভিক্ষের কারণে এখানে অভিবাসন ঘটায়।[৬] সমসাময়িক কালেই যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, নড়াইল, বৃহত্তর ঢাকার মানিকগঞ্জ, টাঙ্গাইল, গাজীপুর এবং পাবনা এলাকায় রাজবংশীরা বসতিস্থাপন করে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

চীনা পর্যটকদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত, তাম্রশাসন ও ঐতিহাসিক–পৌরাণিক গ্রন্থাবলি থেকে জানা যায় যে রাজবংশী অধ্যুষিত অঞ্চলটি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়েছে। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় *Kirata-Jana-Krti* গ্রন্থে[৭] রাজবংশী অধ্যুষিত অঞ্চলকে প্রথমে প্রাগ–জ্যোতিষপুর বলেছেন, তারপর লৌহিত্য, কামরূপ, কামতাপুর প্রভৃতি বলে উল্লেখ করেছেন। এই এলাকার বিস্তৃতি সম্পর্কে *কালিকাপুরাণ, যোগিণীতন্ত্রে* উল্লেখ করা হয়েছে, করতোয়া নদীর পূর্ব অংশ থেকে দিক্ষু পর্যন্ত এবং হিমালয় থেকে দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রের শাখা নদী লাক্ষার সঙ্গমস্থল পর্যন্ত আটশ' মাইল পর্যন্ত দীর্ঘ। কুচবিহারের তৎকালীন নৃপতি নরনারায়ণ তাঁর স্কেচ মানচিত্রে কামতাপুর রাজ্যের বিস্তৃতি দেখিয়েছেন মোরঙ্গ, বিহারের পূর্ণিয়া, মালদহ ব্যতীত সমগ্র উত্তরবঙ্গ, সমগ্র আসাম, ত্রিপুরা, মণিপুর, শ্রীহট্ট, নোয়াখালী প্রভৃতি স্থান। নরনারায়ণের সময়কালে কামতাপুর, কুচবিহার রাজ্যে রাজবংশীদের প্রাধান্য ছিল। তাই রাজবংশীদের সংস্কৃতির উৎপত্তির ব্যাপারে রংপুর, কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলাগুলোকেই ভাবতে হয়। পরবর্তীকালে রাজবংশীদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ধীরে ধীরে তারা পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তবে নেপালের ভদ্রপুর, মোরঙ জেলা, বাংলাদেশের বৃহত্তর রংপুর, দিনাজপুরে প্রচুর সংখ্যক রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করে। বিহারের পূর্ণিয়া জেলাতেও রাজবংশীদের স্থায়ীভাবে বসবাসের তথ্য পাওয়া যায়।[৮] ড. পীয়েরে বেসাইন তাঁর এক গবেষণায় উল্লেখ করেছিলেন যে, রাজবংশীরা পশ্চিমে রাজশাহী ও দিনাজপুর, উত্তরে দিনাজপুর ও রংপুর এবং পূর্বে রংপুর ও বগুড়া এলাকায় বসবাস করেন। তাছাড়া পার্শ্ববর্তী ভারতীয় এলাকা কুচবিহার, বিহার, মুর্শিদাবাদ, আসাম অঞ্চলে এই রাজবংশী উপজাতিদের বিপুল পরিমাণে দেখা যায়।[৯]

বর্তমান বসতিস্থান

বাংলাদেশে রাজবংশীরা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলাগুলোতে অধিক পরিমাণে বসবাস করেন। উত্তরবঙ্গের যে–সমস্ত জেলাতে রাজবংশীরা বসবাস করেন সে–জেলাগুলো হলো রংপুর, নীলফামারী, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁ, দিনাজপুর, জয়পুরহাট, পাবনা। এছাড়া দেশের অন্যান্য জেলাগুলোর মধ্যে ঢাকা, ময়মনসিংহ মানিকগঞ্জ, গাজীপুর, নড়াইল, ঝিনাইদহ, যশোর, মাগুরা, সাতক্ষীরা ও খুলনা। এছাড়াও বিক্ষিপ্তভাবে দেশের অন্যান্য জেলাতে কিছু রাজবংশী পরিবার বসবাস করে আসছে।

জনসংখ্যা পরিসংখ্যান

বাংলাদেশে রাজবংশী জাতিগোষ্ঠীর প্রকৃত জনসংখ্যা কত—তা নির্ণয় করা বেশ কঠিন। এ পর্যন্ত এমন কোনো বিশ্বাসযোগ্য উৎস পাওয়া যায় নি যা থেকে তাদের প্রকৃত জনসংখ্যার পরিমাণ জানা যায়। অবিভক্ত বাংলায় অর্থাৎ ১৯৪১ সাল পর্যন্ত রাজবংশীদের সংখ্যা তৎকালীন আদমশুমারি প্রতিবেদনগুলোতে পাওয়া গেলেও তৎপরবর্তী সময়কালে বিভিন্ন কারণে তাদের প্রকৃত জনসংখ্যার পরিমাণ আদমশুমারি প্রতিবেদনে দেওয়া হয় নি। তবে Peter McNee ১৯৮৪ সাল তাঁর *Crucial Issues in Bangladesh* গ্রন্থে বাংলাদেশের রাজবংশীদের একটি সংখ্যা নির্ণয়ের চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর মতে, বাংলাদেশে রাজবংশী জনসংখ্যা হলো ১০,৬১,০০০। এদের মধ্যে বৃহত্তর রংপুরে বাস করে অর্ধেক, বৃহত্তর দিনাজপুরে বাস করে ২,০০,০০০, এবং বৃহত্তর বগুড়া, পাবনা, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা ও ময়মনসিংহের প্রতিটি জেলায় বাস করে ২০,০০০–৩০,০০০ জনসংখ্যা। পরবর্তীকালে ১৯৯১ সালের আদমশুমারিতে রাজবংশীদের সংখ্যা নিম্নরূপ দেখানো হয় :

১৯৯১ সালের আদমশুমারি প্রতিবেদনে বাংলাদেশে বসবাসকারী রাজবংশী জনসংখ্যা

জেলার নাম	পরিবার	রাজবংশী জনসংখ্যা
টাঙ্গাইল	৪১৯	২,১১২
জয়পুরহাট	৬০৯	২,৯৭০
যশোর	৪৭৬	২,৪৭৪
মোট	১৫০৪	৭,৫৫৬

উৎস : আদমশুমারি প্রতিবেদন, ১৯৯১ জাতীয় সিরিজ (ঢাকা : বাংলাদেশ পরিসংখ্যার ব্যুরো, ১৯৯৪), পৃ. ১৯৪–১৯৮

১৯৯১ সালের আদমশুমারি প্রতিবেদনে রাজবংশীদের পৃথক দুটি জাতিগোষ্ঠী 'বংশী' ও 'রাজবংশী' হিসাবে উল্লেখ করা হলেও প্রকৃতপক্ষে 'বংশী' ও 'রাজবংশী' এক ও অভিন্ন জাতিসত্তা। গাজীপুর এলাকার বাঙালিরা রাজবংশীদের 'বংশী' জাতি হিসাবে সম্বোধনের ফলে 'বংশী' হিসেবে গণনা করা হয়েছে। ১৯৯১ সালের আদমশুমারি প্রতিবেদনে রাজবংশীদের প্রকৃত জনসংখ্যার চিত্র না-পাওয়ার কারণ হলো : ক) উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ জেলার বিভিন্ন এলাকায় রাজবংশীরা নিজেদের ক্ষত্রিয় হিন্দু বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন, আদিবাসী হিসেবে নয়। জাতিগোষ্ঠী হিসেবে তারা যে 'রাজবংশী' এ তথ্যটি তারা সচরাচর প্রকাশ করতে দ্বিধাগ্রস্থ হয়। তবে উত্তরবঙ্গ (ব্যতিক্রম নওগাঁর মহাদেবপুর থানা ও জয়পুরহাট) ছাড়া বাংলাদেশের প্রায় সবগুলো জেলার রাজবংশীরা নিজেদের রাজবংশী জাতিসত্তা হিসেবে পরিচয় দেয়, যদিও তাদের অনেকেই দ্বিধাগ্রস্থ যে তারা বর্ণহিন্দু না-কি বর্ণব্যবস্থার বাইরের জাতিগোষ্ঠী। খ) আদমশুমারি প্রতিবেদন প্রস্তুতকালে নিয়োজিত গণনাকারীগণ এ সম্পর্কে অনেকক্ষেত্রে সঠিক নির্দেশনা পায় নি, এবং তারা নিজেরাও সচেতন ছিল না।

বুখানন-হ্যামিলটন উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে (১৮০৭–১৮০৯) শুধু রংপুরেই কোচ ও রাজবংশীদের সংখ্যা উক্ত জেলার সমগ্র জনগণের ১৮% হিসাব করেছিলেন। হাজসন ১৮৪৭ সালে ইসলামধর্মে ধর্মান্তরিত রাজবংশী কোচসহ সর্বমোট বারো লক্ষ থেকে সাড়ে বারো লক্ষ

মনে করেছিলেন। ১৮৭২ সালের আদমশুমারি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, বাংলা, বিহার ও আসামের কোচ, পলিয়া, রাজবংশীদের সংখ্যা সর্বমোট পনের লক্ষেরও কিছু বেশি।[১০] তাদের মধ্যে ৪৯% রাজবংশী, ২৬% কোচ ও অবশিষ্ট ২৫% পলিয়া। ডব্লিউ. ডব্লিউ হান্টার অবশ্য বলেছেন যে, রাজবংশীদের মধ্যে পূর্ববঙ্গের কিছু নিম্নবর্গের মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ও রাজবংশী নাম ধারণ করেছেন। তিয়র তাদের অন্যতম।[১১] বর্তমান লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় তার প্রমাণও রয়েছে। তিয়ররা নিজেদের তিয়রী রাজবংশী বলে পরিচয় দেন।

১৮৭২ সালের আদমশুমারি প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে অর্জিত স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশ সীমানা এলাকায় রাজবংশীদের বসবাসের জেলা ও সংখ্যাভিত্তিক তালিকা প্রণয়ন করা হলো :

স্ট্যাটিস্টিক্যাল একাউন্ট অব বেঙ্গল

জেলা	জনসংখ্যা	ভল্যুম নং	পৃষ্ঠা	প্রকাশকাল
১. রংপুর	৩৯৯,৪০৭	ভল্যুম ৭	২১২	১৮৭৬
২. দিনাজপুর	৮৬,৩৫১	" ৭	৩৭৪	১৮৭৬
৩. পাবনা	২,৮৭৪	" ৯	২৮২	১৮৭৬
৪. যশোর	২,২৬৭	" ২	১৯৬	১৮৭৭
৫. ঢাকা	৪,৩৬৩	" ৫	৩৯	১৮৭৭
৬. ফরিদপুর	৩,৮৬২	" ৫	২৮৮	১৮৭৭
৭. ময়মনসিংহ	১৪,০০৭	" ৫	৩৯৯	১৮৭৭
৮. বগুড়া	২,১৫৩	" ৬	১৬৫	১৮৭৬
মোট	৫,১৫,৩১৪			

ভারতবর্ষে প্রথম আদমশুমারির আগেই দিনাজপুর, রংপুর ও বগুড়ায় রাজবংশীদের একটি অংশ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল।[১২] ১৯২১ সালের বাংলা, বিহার ও আসামের সর্বমোট রাজবংশীদের জনসংখ্যা ছিল ১৭,২৭,১১১ এবং ১৯৩১ সালের আদমশুমারি প্রতিবেদনে এদের সংখ্যা ১৮,০৬,৩৯০ জন পাওয়া যায়। ১৯৫১ ও ১৯৬১ সালের আদমশুমারিতে রাজবংশীদের হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত করে গণনা করা হয়েছে। কিন্তু ১৯৫১ ও ১৯৬১ সালেরই জেলাভিত্তিক আদমশুমারি প্রতিবেদনে রংপুর ও দিনাজপুরের জেলা পরিচিতির বর্ণনামূলক অংশে রাজবংশী, কোচ, পলিয়াদের উপজাতি (tribe) হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৩] ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত *New Age Encyclopaedia*-তে বাংলাদেশে কোচ-পলিয়া-রাজবংশীদের সংখ্যা প্রায় বারো লক্ষ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৪] স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে সরকারিভাবে রাজবংশীদের সঠিক তথ্য উপাত্ত পাওয়া যায় না। ১৯৯১ সালের আদমশুমারি প্রতিবেদনে শুধমাত্র টাঙ্গাইল, জয়পুরহাট ও যশোরে সর্বমোট ৭,৫৫৬ জন গণনা করে। কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশ সীমানাঞ্চলে রংপুর ও দিনাজপুরে রাজবংশীদের সংখ্যা সর্বাধিক হওয়া সত্ত্বেও রংপুর ও দিনাজপুরের রাজবংশীদের উপজাতি হিসাবে গণনা করা হয় নি। তাছাড়া ঢাকা, মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, নড়াইল, খুলনা ও কুষ্টিয়া জেলাতে

প্রায় ২০,০০০–৩০,০০০ জন[১৫] রাজবংশী বসবাস করে। তাদেরও ১৯৯১ সালের আদমশুমারি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় নি। এসব কারণে বর্তমানে কত সংখ্যক রাজবংশী বাংলাদেশে বসবাস করে তার সঠিক পরিসংখ্যান দেওয়া সম্ভব হলো না।

১৯৬১ সালের ভারতীয় আদমশুমারি অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে রাজবংশীদের সর্বমোট সংখ্যা পাওয়া যায় ১২, ০১, ৭২৬ জন।[১৬] বর্তমানে এই সংখ্যা নিঃসন্দেহে আরো বেশি হবে। নিম্নে ভারতীয় আদমশুমারি প্রতিবেদন ১৯৬১ অনুযায়ী উত্তরবঙ্গ ও অন্যান্য অঞ্চলে বসবাসকারী রাজবংশীদের[১৭] জনসংখ্যার একটি হিসাব ছকে দেওয়া হলো—

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী	উত্তরবঙ্গ ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চলের রাজবংশী
১. কুচবিহার–৪,১৮,৮৯৩	১. বর্ধমান–১১,১৯৭
২. জলপাইগুড়ি–৩,১৬,০২০	২. বীরভূম–৫,৫৭৫
৩. দার্জিলিং–৩১,৪৭২	৩. বাঁকুড়া–৩৯৮
৪. উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর ৯৩,৩৭১	৪ কলকাতা–২,৭১৯
৫. মালদহ–৩৮, ৪৪৩	৫. হাওড়া–৩৬,২৪৬
	৭. মেদিনীপুর–৬৪,৬১২
	৮. মুর্শিদাবাদ–২৯, ৭৪২
	৯. নদিয়া–১২,৭৩৯
	১০. চব্বিশ পরগণা–১,২০,১২৪
মোট সংখ্যা–৮,৯৮, ১৯৯ জন	মোট সংখ্যা–৩,০৩,৫২৭ জন

ভারতের সর্বমোট রাজবংশী জনসংখ্যা—১২,০১, ৭২৬ জন।

ভৌগোলিক পরিবেশ

সমতলবাসী, পর্বতবাসী, মরুবাসী বা মেরুবাসীর জীবনযাত্রা, ভাবনা-চিন্তা, সংস্কৃতি-সমাজব্যবস্থা এক রকম হয় না। ভিন্ন ভিন্ন ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এলাকার জনগণ প্রকৃতির কাছ থেকে ভিন্ন ভিন্ন উপাদান পায়। সুতরাং তাদের সংস্কৃতির জীবনাচরণ ভিন্ন ভিন্ন হওয়াটা স্বাভাবিক। যেমন–প্রকৃতির বিভিন্ন ধরনের বৈচিত্রকে স্বীকার করে, ভূ-প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে সমতলবাসী গরু-মহিষ, পর্বতবাসী ঘোড়া, মরুবাসী উট এবং মেরুবাসী কুকুরকে বশ মানিয়ে বাহনের কাজ করেছে; আবার হ্রদ, নদীবাসীর এগুলোর কোনোটাই কাজে লাগে না ; ভাসমান তরী, জলযান তাদের বাহন ও বাসস্থান। সুতরাং মানুষের চরিত্র, দেহগঠন ও সমাজ-সংস্কৃতি নির্মাণে প্রকৃতি ও পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের বহির্জীবন ও অন্তর্জীবন উভয়কেই ভৌগোলিক পরিবেশ প্রভাবিত করেছে। উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক পরিবেশ, ভূপ্রকৃতি ও জলবায়ু অনেকাংশে দক্ষিণবঙ্গ থেকে আলাদা। উত্তরবঙ্গ ঔপনিবেশিক শাসনামলেও অবহেলিত ছিল, যাতায়াত ব্যবস্থা সহজ ছিল না, বিভিন্ন এলাকা ছিল বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ, দুর্গম। শিক্ষিত লোকজন এসব এলাকাতে ছিল বিরল। শিক্ষাব্যবস্থা মোটেও সহজ ছিল না। এসব কারণে এই এলাকায় বসবাসকারী রাজবংশী সম্প্রদায় সেখানকার মাটি কামড়ে থাকার ফলে তারা সভ্য

জগৎ থেকে অনেক পিছিয়ে পড়েছে। আলাদা ভৌগোলিক ভূ-খণ্ডে সীমাবদ্ধ হওয়ার ফলে আচারে-ব্যবহারে, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের নানান আচার-সংস্কারে তা বেশ স্বাতন্ত্র্য। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে (colonial period) সমতলভূমির রাজবংশীরা কৃষিকাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। বাংলাদেশ অঞ্চলের বাইরে ভারতীয় ভূ-খণ্ডে অনেকেই শ্রমিক হিসাবে কর্মরত থেকেছেন। তাদের অর্থনৈতিক মুক্তি ঘটে নি আজও, দারিদ্রের দুষ্টচক্রে (vicious cycle of poverty) আজও বন্দী তাদের জীবন।

উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক পরিবেশে যেমন বৈচিত্র আছে, তেমনি আবহাওয়ার ক্ষেত্রেও স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান। এই এলাকার আবহাওয়া তুলনামূলকভাবে শীতকালে বেশি শীত এবং গ্রীষ্মকালে বেশি গরম অনুভূত হয়। অর্থাৎ আবহাওয়ার ক্ষেত্রে এই এলাকাটি বাংলাদেশের চরমভাবাপন্ন এলাকা। বর্ষাকালে বৃষ্টির পরিমাণ কম, কদাচিৎ বন্যা হয়। প্রায়ই খরা দেখা যায়, ফলে গাছ পালাও তুলনামূলকভাবে কম। উত্তরবঙ্গের প্রকৃতিতে বাংলাদেশের শ্যামলীমা ও স্নিগ্ধতার স্পর্শ বেশ কম; বড় নদী নেই, তবে কিছু ছোট নদী আছে। সেগুলো পাহাড়ি ঢলের সময় খরস্রোতা হয়ে পড়ে। নদীগুলো হলো তিস্তা, তোরসা, করতোয়া, ক্ষিরোল, ধরলা, মানসাই, আত্রাই রায়ডাক, কালজানি, মহানন্দা প্রভৃতি। এ নদীগুলোর কথা ভাওয়াইয়া ও চটকাগানে পাওয়া যায়।[১৮]

উত্তরবঙ্গের বিস্তৃর্ণ ভূভাগে অসংখ্য জনবসতি, ক্ষেতখামার, গরুমহিষ চারণের মাঠ, পলি পড়ে জেগে ওঠা নদীর চর, বিল প্রভৃতি আছে। যাতায়াতের প্রধান বাহন গরুর গাড়ি। কৃষিকাজই মানুষের প্রধান জীবিকা। জলপাইগুড়ি, দিনাজপুরের তরাই অঞ্চলে গো-মহিষ পালন ও কাঠ-খড় সংগ্রহ করে এক শ্রেণীর মানুষ জীবিকা নির্বাহ করেন।[১৯] দেশের অন্যান্য রাজবংশী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোর ভৌগৌলিক পরিবেশ বাংলাদেশের সমতল ভূমি এলাকার ভৌগোলিক পরিবেশের সাথে মোটামুটি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

তথ্যসূত্র

১. বেণু দত্তরায় (সম্পা. ও সং.), *উত্তর বাংলার লোকসংগীত* (কলকাতা: সাহিত্য অকাদেমী, ২০০২), পৃ. ১০

২ Dr. S.K. Chatterji, *ODBL*, op. cit, part-l. p-69.

৩. ড. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব* (কলিকাতা, ১৩৫৯), পৃ-৪৫

৪. ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোকসাহিত্য* (কলিকাতা : ১৯৫৪), ১ম সংস্করণ পৃ-৪৬

৫. Pierre Bessaignet, Tribes of the Northern Borders of Eastem Bengal', in *Sociel Research in East Pakistan* (Daccä : Asiatic Society of East Pakistan, 1960), p. 152.

৬. বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার বৃহত্তর ময়মনসিংহ* (ঢাকা : সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, ১৯৯২), পৃ. ৮৮

৭. Dr. Sunitikumar Chatterji, *Kirata-Jana-Krti*, 1951, p.32.

৮. রণজিৎ দেব, 'উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজ জীবন ও সংস্কৃতি', রতন বিশ্বাস (সম্পা.), *উত্তরবঙ্গের জাতি ও উপজাতি*

৯. Dr. Pierre Bessaignet সম্পাদিত এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তানের ৫নং প্রকাশনা *Social Research in East Pakistan* গ্রন্থে প্রকাশিত সম্পাদক লিখিত প্রবন্ধ, পৃষ্ঠা ১৫২

১০. W.W. Hunter, *Statistical Account of Bengal, vol-x,* (London: Trubnrer & co., 1876), p. 346.

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৭

১২. W.W. Hunter, *Statistical Account of Bengal,* vol-x, p-346-ও বাংলাদেশ সবকার, *বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার, বগুড়া* (ঢাকা : সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, ১৯৮৯), পৃ. ৬১–৬২

১৩. Govt. of Pakıstan, *Population Census of Pakistan 1961. District Census Report Rangpur, 1961* (Karachi : Ministry of Home Affairs, 1962), Part-1-v,p-1-17. Govt. of Pakistan, *District Census Report Dinajpur 1961* (Karachı: Ministry of Home Affairs, 1962), Part-1-v, pp-l-19.

১৪. *New Age Encyclopaedia* (Sydney London : Bay Books, 1983), Vol 16, p. 291.

১৫. Clarence T. Maloney, 'Tribes of Bangladesh and Synthesis of Bengali Culture', ın Mahmud Shah Qureshi (ed.), *Tribal Culture in Bangladesh* (Rajshahi: IBS, 1984), pp.5-55. Peter Mcnee, *Crucial lssues in Bangladesh* (Pasaden CA,: Willium Carey Library, 19760, p. ll.

১৬. রতন বিশ্বাস (সম্পা.), *উত্তরবঙ্গের জাতি ও উপজাতি, প্রাগুক্ত,* পৃ. ৬৩

১৭. ভারতের রাজবংশীগণ ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তদানীন্তন আসাম, বঙ্গদেশ, বিহার, বোম্বাই (বর্তমানে মুম্বাই), মধ্যপ্রদেশ, বেরার, মাদ্রাজ, ওড়িশ্যা, পাঞ্জাব ও সংযুক্ত প্রদেশের কতিপয় জাতি, কুল ও উপজাতিকে তফসিলভুক্ত জাতি বলে ঘোষণা করে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট ভারত শাসন (তপসিলভুক্ত জাতি হিসাবে ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে জারীকৃত) আদেশ অনুযায়ী তফসিলভুক্ত জাতি (schesuled caste) হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। পরবর্তীকালে 'মণ্ডল কমিশন' ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১০ বছর ধরে সর্বভারতীয় অনুন্নত জাতি গোষ্ঠীর উপর সমীক্ষা চালিয়ে ১৯৯০ সালে ভারত সরকাব প্রণীত আদেশ অনুযায়ী অন্যান্য অনুন্নত জাতির সাথে অনুন্নত জাতি হিসাবে 'রাজবংশী সম্প্রদায়' স্বীকৃতি লাভ করে। কিন্তু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে রাষ্ট্র ঔপনিবেশিক আমল থেকে অদ্যাবধি নথিপত্রে রাজবংশী সম্প্রদায়কে উপজাতি হিসাবে চিহ্নিত করে থাকে। (তথ্যের জন্য ১৮৭২ সালের আদমশুমারি রিপোর্টসহ পরবর্তী সরকারি আদমশুমারি রিপোর্টগুলো দেখুন)। বাংলাদেশ ভিন্ন ভিন্ন ভাষা–সংস্কৃতির ভিত্তিতে কোন কোন ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী বা ক্ষুদ্র জাতি (ethnic minorities) *উপজাতি* হিসাবে পরিগণিত হবে, বা উপজাতির সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য কী–হবে, সে সম্পর্কিত কোনো ব্যাখ্যা সম্বলিত সরকারি গেজেট নোটিফিকেশনে অদ্যাবধি প্রকাশিত হয় নি। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে কোন কোন জনগোষ্ঠী, কী কী বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে উপজাতি হিসাবে পরিগণিত হবে, বা বাংলাদেশে অবস্থানরত কোন কোন জনগোষ্ঠী উপজাতি হিসাবে পরিগণিত হবে সে সম্পর্কিত কোনো স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

১৮. ড. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলা লোকসংগীত : ভাওয়াইয়া* (ঢাকা : শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৯৫), পৃ. ১৯

১৯. ঐ, পৃ. ১৭

অধ্যায় ৪

রাজবংশীদের ইতিহাস

রাজবংশী সম্প্রদায়ের ইতিহাস অনুসন্ধান করতে হলে কুচবিহার ও আসাম রাজ্যের ইতিহাস খুঁজতে হবে। কারণ কোচ জাতিগোষ্ঠীর লোকজন সর্বপ্রথম কুচবিহার ও আসাম এলাকাতে বসবাস শুরু করেছিল। ব্রিটিশ শাসনকালের শুরুতেও হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত কুচবিহার রাজ্য ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় নি। সেকারণে ঐসব এলাকার জনগোষ্ঠীর ইতিহাস সম্পূর্ণভাবে জানা যায় না। এসব এলাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদগুলোতে বিভিন্ন নৃপতি রাজত্ব করেছেন। প্রাচীন মহাভারতীয় আমল থেকেই বর্তমান উত্তরবঙ্গ ও আসামে রাজ্যস্থাপনের সূত্রপাত ঘটে। এই এলাকার কিরাত দলপতি (সংস্কৃতে মঙ্গোলীয়দের 'কিরাত' জাতি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে) ঘটকাসুরকে বধ করে নরক নামক এক বিধর্মী রাজ্য স্থাপন করে কামাখ্যা মন্দিরের অভিভাবক হয়।[১] নরক পরে বানাসুরের সাথে আঁতাত করে[২] ও শিবভক্ত আর্যদের প্রতি আনুগত্য দেখায়।[৩] ফলে নরক তার পূর্বতন মিত্রদের হাতে নিহত হয়, এবং তার পুত্র ভগদত্ত উত্তরাধিকারী হয়। নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে এই রাজবংশের নৃপতিগণ 'পানি' নামক অনার্য জনগোষ্ঠীর অংশ, এবং পরবর্তীকালে 'পানিকোচ[৪] নামে অভিহিত গোষ্ঠীরই পূর্বপুরুষ, যারা কোচদের এক অ-হিন্দু জনগোষ্ঠীর অংশ।[৫] পূর্বভারতের প্রাচীনতম রাজ্যগুলোর প্রায় সব রাজাই অনার্য জনগোষ্ঠী থেকে উদ্ভুত, এবং মঙ্গোলীয় অথবা অস্ট্রালয়েড জনগোষ্ঠীর অংশ। কামরূপে বর্মণ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন পুষ্য বর্মণ (৩৫৫-৩৮০ খ্রি.)। এই বংশের শেষ রাজা যাঁর নাম ও পরিচয় জানা যায় তিনি হলেন ভাস্কর বর্মণ (৫৯৪-৬৫০ খ্রি.)। পুষ্য বর্মণ রাজা নরকের বংশধর ছিলেন। সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে বিখ্যাত চৈনিক তীর্থযাত্রী হিউয়েন সাং-এর বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, কামরূপের অধিবাসীরা খর্বাকায়, কৃষ্ণপিঙ্গল বর্ণবিশিষ্ট এবং তাদের কথ্যভাষা উত্তর ভারতের কথ্যভাষা থেকে আলাদা।[৬] বর্মণ রাজাগণও নিজেদের নৃপতি নরকের বংশধর বলে দাবি জানাতেন, এবং সমসাময়িক তাম্রশাসনে 'ম্লেচ্ছদের মহান নৃপতি' হিসাবে বর্মণদের বর্ণনা করা হয়েছে।[৭] পালবংশের রাজত্বকালে ধর্মপালের পৌত্র অরিমিত্ত কামতাপুরবাসী এক আঞ্চলিক রাজার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। অরিমিত্তের শত্রু সৈন্যরা ছিল মেচ, কোচ প্রভৃতি উপজাতি জনগোষ্ঠীর মানুষ। একথা বলা আবশ্যক যে, পালবংশের রাজাদের সর্বদাই ভারত-মঙ্গোলীয় বোড়ো গোষ্ঠীর শক্তিশালী কোচ, মেচ, কাচারি উপজাতির নৃপতিগণের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হয়েছে। সুতরাং পাল আমলে কামরূপে হিন্দুধর্ম সংস্কৃতির প্রসার ঘটে নি। ত্রয়োদশ শতাব্দীর দিকে এইসব আদিবাসী উপজাতি নরগোষ্ঠী নিজেদের মধ্যেই ক্ষমতা ও আধিপত্যের দ্বন্দ্ব যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। ডা: বুখানন মন্তব্য করেছেন যে, এই অঞ্চল কোচ, মেচ, গারো, কাচারি, রাভা, হাজং, ত্রিপুরা, ভোট এবং লেপচা কর্তৃক বিজিত হয়, যারা না ব্যবহার করেছে বাংলা

ভাষা, না গ্রহণ করেছে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম।[৮] সুতরাং কোচ–রাজবংশীরা কোন সময়কালে বাংলা ভাষা গ্রহণ করেছে এবং হিন্দু ধর্ম–সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল, সেটি বিচার্য বিষয়।

ই.এ. গেইটের মতে, কোচ রাজবংশের পিতৃপুরুষ হলেন হরিয়া মণ্ডল। তিনি ছিলেন একজন মেচ (বা কোচ)। তিনি গোয়ালপাড়া জেলার চিকনা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। এই হরিয়া মণ্ডল রাজা হাজোর দুই কন্যাকে বিয়ে করেন। তাদের ঔরসে দুই পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল। হিরার গর্ভে বিশু ওরফে বিশ্ব এবং জিরার গর্ভে শিশু।[৯] এই বিশু নিজের শৌর্য ও চাতুর্য কৌশল গুণে ভূইঞা দলপতিদের পরাজিত ও অধিনস্ত করেন, এবং পশ্চিমে করতোয়া থেকে পূর্বে বড় নদী পর্যন্ত নিজ রাজত্ব বিস্তার করেন। বিশু পরবর্তীকালে তার রাজধানী চিকনা গ্রাম থেকে সরিয়ে কুচবিহারে আনেন। ১৫১৫ খ্রিষ্টাব্দের দিকে নিজ ক্ষমতা দৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করে বিশু তাঁর রাজত্বকে উপজাতীয় ধর্ম–সংস্কৃতির বন্ধন মুক্তির জন্য মনোযোগ দেন। এই প্রক্রিয়াটিকে উপজাতীয় বন্ধনমুক্ত করার প্রক্রিয়া বলা যেতে পারে। কিন্তু প্রক্রিয়া কখনো সম্পূর্ণ হয় নি।[১০] তাছাড়া বিশুর রাজ্যে কোচ–রাজবংশীরা বিভিন্ন দূরত্বে বসবাস করে কতটুকু উপজাতীয় ধর্ম–সংস্কৃতি ছেড়ে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করতে পেরেছিল সেটিও প্রশ্নসাপেক্ষ থেকে যায়। বিশ্বসিংহ কোচ রাজবংশ প্রতিষ্ঠার পরই প্রথাগত পুরোহিত কলিতাদের বঞ্চিত করে সিলেট থেকে বৈদিক ব্রাহ্মণ এনে তাদের উপর পূজার ভার অর্পণ করেন, এবং রাজ অনুগ্রহপুষ্ট বৈদিক ব্রাহ্মণরা রাজার দৈব জন্মকাহিনী প্রচার করেন। বুখানন লিখেছেন, "(রাজার) দেবতার অংশে জন্মগ্রহণের এই প্রচারিত কাহিনীকে অনুসরণ করে যেসব কোচ হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছিল, এবং তাদের অসংস্কৃত আচরণ বর্জন করেছিল, তারা 'রাজবংশী' বা রাজার বংশধর এই পরিচয় গ্রহণ করে, এবং সেইসঙ্গে কামরূপ ও চীনের সেইসব অসভ্য উপজাতি যথা–মেচ ও হাজং যারা ধর্মে এদের অনুসরণ করেছিল তারাও এই পরিচয় গ্রহণ করে।"[১১] এস, রাজগুরু তাঁর এক আলোচনায় বলেছেন, "বিশ্বসিংহ নিজে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন এবং শিব–পার্বতীর উপাসক হন। তিনি দেবী দূর্গার পূজা সম্পন্ন করেন। সমস্ত কোচবিহারে তিনি হিন্দুদের বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন, এবং এইসব মন্দিরে পূজার জন্য মিথিলা থেকে ব্রাহ্মণ নিয়ে আসেন।"[১২] কিন্তু ডি. নাথের মন্তব্য থেকে জানা যায়, "বেশ কিছু সংখ্যক ব্রাহ্মণদের উপস্থিতি এবং রাজ পরিবারের হিন্দুধর্ম গ্রহণের মাধ্যমেই যে উপজাতীয় আদিবাসীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে হিন্দুধর্মের প্রচলন হয়েছিল সে বিষয়টি প্রমাণ করা যায় না।"[১৩]

বিশ্বসিংহের পুত্র নরনারায়ণ কুচবিহারের সিংহাসন লাভ করেন, ও পিতার অনুসরণে নরনারায়ণও শৈবধর্মে দীক্ষালাভ করেন। নরনারায়ণ হিন্দু ধর্মের ও সংস্কৃতির উত্থানকল্পে ১৫৪৬ খ্রিস্টাব্দে অহম'দের বিরুদ্ধে অভিযান চালান। কিন্তু পিচল গড়ের যুদ্ধে একদল ব্রাহ্মণ কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে তিনি ভীষণভাবে পরাজিত হন। নরনারায়ণ আবার ১৫৬২ খ্রিস্টাব্দে অহম'দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলে অহম–রাজ সন্ধি করেন, এবং তেজপুর কোচরাজ নরনারায়ণের হস্তগত হয়।[১৪] নরনারায়ণ তারপর হিন্দুধর্ম প্রসারের গতিকে আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে নেন। বৃহৎ রাজবংশ তাঁর ধর্মনীতিকে সমর্থন করে। রাজ্যের সমস্ত অধিবাসীগণের পুরাণ ও হিন্দু ধর্মশাস্ত্রাদি নির্দেশিত জাতপাতের ভাগাভাগি মেনে চলার এবং

সেই নির্দেশমত নিজ নিজ কর্তব্য এবং আচারবিধি অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। যারা এই নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করত তারা রাজা কর্তৃক কঠিন দণ্ড এবং সমাজচ্যুতি শাস্তি ভোগ করত।[১৫] অবশ্য শাস্ত্রীয় এইসব আচরণ–বিধি নরনারায়ণের মতো প্রবল পরাক্রমশালী রাজার পক্ষেও সুষ্ঠুভাবে প্রচার সম্ভব হয় নি। দরং রাজবংশাবলীতে রাজগুরু লিখেছেন, যারা উপজাতীয় ধর্ম অনুসরণ করে এবং যারা হিন্দু ধর্ম অনুসরণ করে সেইসব কোচদের নরনারায়ণ দুইভাগে ভাগ করেন। রাজা ঘোষণা করেন যে, "এই তার রাজকীয় নির্দেশ যে, সমস্ত মন্দির, যেগুলো গোঁহাই কমল আলীর বা রাজপথের উত্তরে অবস্থিত, যে–রাজপথ রাজ্যকে উত্তর ও দক্ষিণ অংশে ভাগ করেছে, সেখানে কোচ ও মেচগণ উপজাতীয় ধর্মানুযায়ী পূজা করবে, এবং যেগুলো দক্ষিণে অবস্থিত সেগুলোতে ব্রাহ্মণের অধিকার থাকবে।"[১৬]

নরনারায়ণের রাজত্বকালে রাজত্বের উত্তরার্ধে উপজাতীয় ধর্মাচার–অনুষ্ঠান প্রধান ছিল, অপরদিকে দক্ষিণার্ধে হিন্দুধর্মীয় পূজা ও আচার এত প্রসারিত ছিল যে, সেখানে ব্রাহ্মণকে পুরোহিতের পদে বরণ করা হয়েছিল। ফলে রাজশক্তির প্রশ্রয় এবং প্রবল সমর্থন পাওয়া সত্ত্বেও কোচ রাজত্বের প্রথমাংশে উপজাতীয় আদিবাসীগণের হিন্দুকরণ (Hinduization) প্রক্রিয়া মাত্র অর্ধপথে অগ্রসর হয়েছিল।[১৭] অর্থাৎ রংপুর জেলার কোচদের মধ্যে উপজাতীয় বৈশিষ্ট্যের বিলুপ্তি ব্যাপকভাবে ঘটেছিল। এ অঞ্চলের অনেক কোচই শুয়োরের মাংস খাওয়া, মদ্যপানের অভ্যাস ও বিধবার পুনর্বিবাহের প্রথা বর্জন করেন।[১৮] এদের মধ্যে যারা প্রায় সম্পূর্ণভাবে হিন্দু সামাজিক ব্যবস্থা ও আচার ব্যবহার গ্রহণ করেছিলেন, তারা কোচদের সাথে সামাজিক সম্পর্ক বজায় না রেখে নিজেদের রাজবংশী হিসাবে পরিচয় দিয়ে স্বতন্ত্র জাতিসত্তা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। কিন্তু আসামের উত্তরাঞ্চলে, নেপালে, ভূটানে এবং আরো দূরবর্তী অঞ্চলে, যেখানে হিন্দু ধর্মের প্রভাব সবচেয়ে কম পড়েছে, সেখানেই সমস্ত কোচরা নিজেদের কোচ বলে দ্বিধাহীন চিত্তে স্বীকার করেছেন। রাজা নরনারায়ণের আমলে যারা রাজবংশী নাম ধারণ করেছিলেন তাদের জন্য অনেক মন্দির নির্মিত হয়েছিল, এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আরও অনেক মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[১৯] এসব মন্দির নির্মিত হলেও পূর্বে রাজবংশীদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে বাঙালি তথা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের পৌরোহিত্য করার ঘটনা বিরল ছিল।[২০]

ইসলাম ধর্ম গ্রহণ

রাজবংশীরা ষোড়শ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। ফ্রান্সিস বুখানন (১৮০৭–১৮০৯),[২১] হাজসন (১৮৪৯),[২২] ই.টি ডাল্টন (১৮৭২)[২৩], ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার (১৮৪৯),[২৪] জি.এ গ্রিয়ার্সন[২৫] প্রমুখ গবেষকগণের লেখায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। দিনাজপুর, রংপুর ও বগুড়ার কেওট (কে–বট বা কৈবর্ত) মুসলমান রাজবংশীদের থেকে ধর্মান্তরিত বলে অনেকেই মনে করেন। বেভারলি (Beverly) ১৮৭২ সালের আদমশুমারি প্রতিবেদন সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, "১৫০০ খ্রিষ্টাব্দে (E.T. Dalton অবশ্য এই সময়কাল ১৫৫২ খ্রি. বলে মত দিয়েছেন) হাজু কুচবিহার রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর নীতি ছিল মেচ ও কাচারি উপজাতীয় অধিবাসীদের মধ্যে সংহতি সাধন, যাতে বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করা যায়। কিন্তু তার পুত্র বিশু সিংহ হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেন, এবং

তার দেখাদেখি অনেকেই সেই পথ অবলম্বন করেন। কিন্তু হিন্দু সমাজে তারা হীন কোচ ছাড়া কোনো মর্যাদার আসন না-পাওয়ায় এবং অবস্থাটি অসহনীয় মনে হওয়ায় তাদের অনেকেই অন্তজ হিন্দু অপেক্ষা ইসলাম ধর্ম গ্রহণই শ্রেয় বিবেচনা করেন।"[২৬] ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ব্যাপারে হাজসন সাহেব বলেছেন, কোচ জনসাধারণের অধিকাংশই মুসলমান হন এবং তাদের উপরতলার লোক হন হিন্দু (উভয় দলই নিজেদের অভিহিত করেন রাজবংশী বলে)। অবশিষ্ট একটা ক্ষুদ্র অংশ এখনো নিজেদের কোচ বলে পরিচয় দেন।[২৭]

জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ার্সন (G.A. Grierson) ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা করতে গিয়ে রংপুর, দিনাজপুর এলাকার রাজবংশীদের উদ্ভব বিষয়েই নয়, কিছুসংখ্যক রাজবংশী যে ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল তার প্রমাণ রংপুরের একটি রাজবংশী গানে খুঁজে পেয়েছেন। গানটি হলো—

"ভবে আসি ওরে মনাই কন্নু কি।
রোজা নামাজ সব কর আল্লাকে দিদার কর
ভবে আসি ওরে মনাই কন্নু কি।
যে জন পানকিত্ চড়ে, পাঙ্খা হিনায়, ছত্র ঢুলাই মাতে
তারো তনু খাকে খাবে, কেউ না যাবে সাতে।"[২৮]

দিনাজপুর, রংপুর ও বগুড়ায় ধর্মান্তরিত মুসলমানরা দুইভাগে বিভক্ত। হালিয়া কেওট ও জালিয়া কেওট। যারা হালচাষ করে তারা হালিয়া, আর যারা জাল দিয়ে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে তাদের জালিয়া কেওট বলেন। কেওট মুসলমান ও অন্যান্য সাধারণ মুসলমানের সংস্কৃতি ও সামাজিক রীতিনীতিতে অনেক পার্থক্য গবেষক আবদুস সাত্তার লক্ষ করেছেন।[২৯] এইসব মুসলমানদের সাথে উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানগণ বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপন করেন না বলে তিনি লক্ষ করেছেন। একটা কথা অবশ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এসব এলাকার মুসলমান রাজবংশীগণ বর্তমানে নিজেদের রাজবংশী বলে পরিচয় দেন না। বগুড়া জেলায় অনুসন্ধান চালিয়ে গবেষক ফকরুজ্জামান চৌধুরী এ সত্যতা যাচাই করেছেন।[৩০]

ক্ষত্রিয়ত্বের দাবিতে আন্দোলন

রাজবংশীদের ক্ষত্রিয়ত্ব দাবির পিছনে কী কী যুক্তি ছিল তা এ গ্রন্থের আলোচনার গোড়ার দিকে বলা হয়েছে। এবার ক্ষত্রিয়ত্বের আন্দোলনের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। কোচ-রাজবংশীরা রংপুর, দিনাজপুর, আসাম কুচবিহারের আদিবাসিন্দা হলেও মহাভারত, *পৌরাণিক গ্রন্থাবলিতে* কোথাও কোচদের ক্ষত্রিয় বলা হয় নি। *মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, মৎস্যপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, কালিকাপুরাণ* প্রভৃতিতে কামরূপ ও কুচবিহারের উল্লেখ আছে। *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে* অন্ত্যজ জাতি হিসাবে কোচ জাতির উল্লেখ আছে, কিন্তু রাজবংশী জাতির নাম পাওয়া যায় না। তাছাড়া কোচদের ক্ষত্রিয় বর্ণের উল্লেখও দেখা যায় না। উল্লেখ্য যে, পৌরাণিক সাহিত্যগুলো রচিত হয়েছে খ্রিষ্টাপূর্ব ৬০০-৭০০ অব্দে এবং মহাভারত রচনাকাল হলো খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০ অব্দের দিকে[৩১]। পরবর্তীকালে গুপ্ত যুগে, পাল আমলে, সেন আমলে, মুসলমান আমলে, এমনকি মুঘল আমলেও রাজবংশীদের ক্ষত্রিয়ত্ব দাবির পক্ষে আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। ব্রিটিশ শাসনামলে যখন

রাজবংশীদের কোচ হিসাবে গণনা করে উপজাতীয় জনগোষ্ঠী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়, তখন থেকে ক্ষত্রিয়ত্ব দাবি চেতনার প্রাবল্য লক্ষ করা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ক্ষত্রিয়ত্বের আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে, এবং এই আন্দোলন গতি লাভ করে ঐ শতকের শেষ দশকে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গুপ্ত আমলে বিজিত জনগোষ্ঠীকে ক্ষত্রিয় হিসাবে রাজকীয় স্বীকৃতি দেওয়া হতো। সম্ভবত সেই সুবাদেই এরা ক্ষত্রিয় বলে দাবি করেন। এই ধারাবাহিকতা পাওয়া যায় ষোড়শ শতাব্দীর পণ্ডিত রূপনারায়ণ রচিত *কামতেশ্বর কুলকারিকায়।* তিনি বলেছেন—

"ছিঁড়িয়ে গলার দড়ি ক্ষত্রিচিহ্ন লুপ্ত করি
প্রাণভয়ে ইতিউতি পলান্ত সকলি।
সংগ্রামক ভয় করি ভঙ্গক্ষত্রি নাম ধরি
আপনাকে মানে কেহ রাজবংশী বুলি॥"[৩২]

উল্লেখ্য যে, ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে, অর্থাৎ রাজবংশীদের ক্ষত্রিয়ত্ব আন্দোলনের পূর্বে ক্ষত্রিয়ত্বের চিহ্নস্বরূপ উপবীত (পৈতা) ধারণের কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ মেলে না।

রামায়ণের সগর রাজার রাজত্বকালে বহু ক্ষত্রিয় (?) ব্রাহ্মণ যোদ্ধা পরশুরামের দলের কুঠারের ভয়ে পালিয়ে গিয়ে জলপাইগুড়ি এলাকায় বসবাস করতে শুরু করে। ধরা পড়ার ভয়ে এরা নিজেদের ভাষা, ধর্ম ত্যাগ করে আদিবাসীদের সঙ্গে মিশে যায়। এদের আদি বংশধরগণ আর্যদের আগমণের সময় পর্যন্ত গাঙ্গেয় উপত্যাকায় বসবাস করত। পরে আর্যদের আক্রমণে পর্যুদুস্থ হয়ে এরা ছড়িয়ে পড়ে উত্তর ও উত্তর-পূর্ব বাংলার বনে ও জলায়।[৩৩] অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রংপুর পিরগাছার ইটাকুমারীর কবি রতিরাম দাসের জাগ গানে পাওয়া যায়—

"হায়রে রাজার বংশে লভিয়া জনম
পরশুরামের ভয়ে এ বড় শরম
রণে ভঙ্গ দিয়া মোরা এদেশে আইসাছি
ভঙ্গক্ষত্রি রাজবংশী এই নামে আছি।"[৩৪]

রাজবংশীরা পরশুরামের ভয়ে পালিয়ে বিভিন্ন জলাশয় তীরবর্তী এলাকায় বসতিস্থাপন করে ভাষা, ধর্ম ত্যাগ করেছিল কি না সেটি অবশ্য গবেষণা ছাড়া সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সঙ্গত নয়।

১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারিতে রাজবংশীদের কোচ হিসাবে গণনা করা হলে রাজবংশীদের ক্ষত্রিয়ত্ব দাবি আন্দোলনে রূপ নেয়। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে গণনা কর্তৃপক্ষ রাজবংশীদের কোচ হিসাবে গণনার নির্দেশ দিলে রাজবংশীদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়, ও আন্দোলন আরো গতিপ্রাপ্ত হয়। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের ৬ ফেব্রুয়ারি রাজবংশীরা সরকারি নির্দেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা করেন। এবং ১০ ফেব্রুয়ারিতে জেলা প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি পেশ করেন। তাতে রাজবংশীদের ক্ষত্রিয়ত্বের স্বীকৃতি আদায়সহ কোচদের থেকে তাদের আলাদাভাবে রাজবংশী হিসাবে গণনার দাবি ওঠে। এই দাবির প্রেক্ষিতে রংপুরের জেলা প্রশাসক ধর্মসভার মতামত আহ্বান করলে ইটাকুমারীর পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্নকে ধর্মসভার পক্ষ থেকে মতামত জানানোর ক্ষমতা দেওয়া হয়। তর্করত্ন মতামত ব্যক্ত করেন যে, উত্তর বাংলার রাজবংশীগণ ব্যুৎপত্তিগত ক্ষত্রিয়, এবং তারা অবশ্যই

ব্রাত্যক্ষত্রিয় হিসাবে স্বীকৃতিযোগ্য। কিন্তু এই দাবির স্বপক্ষে কোনো বৈদিক, পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে ১৭ ফেব্রুয়ারি জেলা প্রশাসক এক আদেশের মাধ্যমে রাজ্যবংশীদের ব্রাত্যক্ষত্রিয় হিসাবে ফিরিয়ে এনে আদমশুমারিতে স্থান দেবেন বলে আদেশ জারি করলেও ১৮৯১ এর আদমশুমারি প্রতিবেদনে রাজবংশীরা ক্ষত্রিয় মর্যাদা পান নি। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দেও আন্দোলন হয় এবং ১৯ এপ্রিল, ১৯০১ বাংলার গভর্ণর বরাবর স্মারকলিপি পেশ করলেও কোনো কাজ হয় নি। ১৯০১ সালেও রাজবংশীদের কোচদের সাথে একত্রিত করে গণনা করা হয়। এই সময়ে রাজবংশীদের ভাষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, ঐতিহ্য উদ্ধারের জোয়ার আসে, এবং ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে রংপুর ক্ষত্রিয় সমিতি গড়ে ওঠে। ১৯১৩ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জে করতোয়া তীরে রাজবংশী নেতৃবৃন্দ ক্ষত্রিয় হিসাবে উপবীত (পৈতা) ধারণ করেন, এবং রাজবংশী ক্ষত্রিয় হিসাবে নিজেদের মধ্যে স্বীকৃত হন। পরবর্তী দুই বছরে মধ্যে ১,৮২,১৫৪ জন রাজবংশী উপবীত ধারণ করেন। ১৯১১ সালের চূড়ান্ত গণনা জরিপে তারা হিন্দু জাতি হিসাবে চিহ্নিত হন। বলা আবশ্যক যে, রাজবংশীদের ক্ষত্রিয়ত্ব আন্দোলনের ফলে রংপুরের দাস পদবীধারী মানুষেরা সিংহ, বর্মণ, রায় ইত্যাদি পদবীর ব্যবহার শুরু করে নিজেদের রাজবংশী পরিচয় দিয়েছে। এভাবেই অনেক কোচ, খেন ও পলিয়া নিজেদের রাজবংশী পরিচয় দিয়েছে ; সিংহ, রায়, বর্মণ পদবী ধারণ করেছে। মৃতের সংকারের অশৌচ পালনের ক্ষেত্রে ৩০ দিনের স্থলে ১২ দিনের বিধান তৈরি করেছে।[৩৫] ক্ষত্রিয়ত্বের আন্দোলনের ফলে রাজবংশী সমাজে উপবীত গ্রহণ শুরু হয়, এবং সবাই কাশ্যপ গোত্র গ্রহণ করেন। কিন্তু বর্ণহিন্দু আইন অনুযায়ী রাজবংশীদের ক্ষত্রিয় হিসাবে স্বীকার করলে একটি ব্যাপারে আপত্তি ওঠে। সেটা হলো— এদের বিয়েকে বর্ণ হিন্দুর বিয়ের আইন অনুসারে ক্ষত্রিয় বিয়ে বলা যায় না। কারণ ক্ষত্রিয়দের মধ্যে কখনো স্বগোত্রে বিয়ে হয় না। কিন্তু রাজবংশীরা ক্ষত্রিয়ত্বের আন্দোলনকালে প্রত্যেকে কাশ্যপ গোত্র বলে প্রচার করেন। সুতরাং পূর্বে রাজবংশীদের বিয়ের ক্ষেত্রে গোত্র পরিচয়ের দরকার না পড়লেও ক্ষত্রিয় হিসাবে বিয়ের ক্ষেত্রে গোত্র বিভাগের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তখন কলকাতা হাইকোর্টের এক রুলনিশি জারির মাধ্যমে শাণ্ডিল্য, পরাশর, গৌতম, কপিল, ভরদ্বাজ, কৌশিক ইত্যাদি বারোটি গোত্র রাজবংশী সমাজের জন্য নির্ধারণ করে দেওয়া হয়।[৩৬] কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হলো রাজবংশী সমাজের প্রায় সবাই এখনো নিজেদের কাশ্যপ গোত্র বলে পরিচয় দেন, এবং স্বগোত্রে বিয়ে করে থাকেন। রাজবংশী সমাজে গোত্র বিভাগ না থাকলেও গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা দেখা যায়। এক একটি গ্রামে কয়েকটি গোষ্ঠীর লোক বসবাস করে থাকেন। একই গোষ্ঠীর বর-কনে কখনো বিয়ে হয় না। রাজবংশী সমাজে এ নিয়মের কঠোরতা লক্ষণীয়। অবশ্য তারা এ ধরনের বিয়ে কখনো কল্পনাতেও প্রশ্রয় দেন না। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগ পর্যন্ত রাজবংশী সমাজে একই গ্রামে ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীতে বিয়ে হতো। কিন্তু বর্তমান যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ও বর্ণ হিন্দুদের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বগ্রামে বিয়েটা বিরল হয়ে পড়েছে।

তথ্যসূত্র

১. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *কিরাত-জন-কীর্তি* (কলকাতা : ১৯৭৪), পি.পি. সিংহ *দি কিরাতস্ ইন এন্‌সেন্ট ইণ্ডিয়া* (নিউদিল্লি : ১৯৯০) উদ্ধৃত : শিনকিচি তানিগুচি, 'উত্তরবঙ্গ ও অসমের রাজবংশী

সম্প্রদায়, ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনশীল কাঠামো', শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিজিৎ দাশগুপ্ত, (সম্পা), *জাতি, বর্ণ ও বাঙালি সমাজ* (দিল্লী : আইসিবিএস, ১৯৯৮), পৃ ১৫৩–১৮৪

২. বানাসুর স্পষ্টতই অসুরদের নৃপতি ছিল। অনার্যদেরকে অসুর বলা হতো।

৩. অনার্য দেবতা শিবকে যে-সমস্ত আর্যরা শ্রদ্ধা করত তাদের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে।

৪. W.W. Hunter, *Statistical Account of Bengal,* vol-x, op-cit. p. 352.

৫. Buchanan Hamilton, *General View of the Histroy and Manners of Kamrup* Indian office Library, MSSEURD, 98. (Submitted in the Library 1830), p.5.6. N.N. Bose, *The Social History of Kamrup.* lst part, (Calcutta, 1922), p. 33.

৬. Tomas Watt, 'On Yung Shwang' in *Royal Asiatic Socicty* (London, 1905), 2nd part, pp.185-187.

৭. E.A. Gait, *History of Assam* (Calcutta : 1963), p.30. lst print Calcutta, 1905 & 3rd print Calcutta, 1963.

৮. Buchanan Hamilton, *General view...,op-cit,* p-12.

৯. E.A. Gait, op. cit 1963, p-46, ই.এ. গেইট দরঙ্গ রাজবংশাবলীর উপর (কুলকারিকা) ভিত্তি করে যুক্তি দাঁড় করিয়েছেন। দরঙ্গ রাজবংশী কোচ রাজবংশের একটি শাখা।

১০. শিনকিচি তানিগুচি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩–১৮৪

১১. Buchanan Hamilton, *Genral view...,*p.23-24.

১২. Saktipada Rajguru, *Medieaval Assam's Society 1224-1626* (Nawgoan, 1988). p.94

১৩. D.Nath, *History of the Koch Kingdom, 115-1615.* (Delhi, 1989), p.121-125.

১৪. আব্দুস সাত্তার, *আরণ্য জনপদে* প্রাগুক্ত, পৃ–৩৬১। Britanica *Encyclopaedia Ready Reference* (USA: Britanica Inc., 1985), p.925-926.

১৫. এস–রাজগুরু, প্রাগুক্ত, পৃ–৯২। শেখর বন্দোপাধ্যায় ও অভিজিৎ দাশগুপ্ত (সম্পা), *জাতি, বর্ণ ও বাঙালী সমাজ* থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ১৬১–১৬২

১৬. এস, রাজগুরু প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

১৭. শিনকিচি তানিগুচি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৭

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৯

২০. সমর পাল, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৯

২১. ফ্রান্সিস বুখানন হ্যামিল্টন, প্রাগুক্ত। *Statistical Account of Bengal,* Vol-x, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৬

২২. বি.এইচ. হাজসন প্রাগুক্ত, *Statistcal Account of Bengal,* Vol-x, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪৬

২৩. ই.টি. ডাল্টন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮–৯০। "The Grandson of Haju, Vishu Singh, with all the people of condition, apostatised to Hinduism, and took the name of Rajbansis; those who declined finding they were treated as vile adopted Islam. Thus the mass of the Koch people became Mohammadans and the higher grades Hindus, the latter now reject and condemn the very name of Koch, and it is bad manners of the court of the discendent of Haju to speak of the country as Koch Bihar..."

২৪. W.W. Hunter, *Statistical Account of Bengal,* Vol-x. p.346.

২৫. G.A. Grierson, *Lingustic Survey of India vol-v.* Part-l, p. 163.
"....Those Koch, who are now Hindus, are principally known under the name of Rajbangsi. But large number of them have become Mussalmans. so that mere number of people of the Rajbangsi tribe offords no idea of the number of people Koch extraction in the country."

২৬. উদ্ধৃত ফকরুজ্জামান চৌধুরী, 'রাজবংশী' প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

২৭. ঐ, পৃ. ২০

২৮. G.A. Grierson, *Linguistic Survey of India,* Vol. V, Part: 1.p.178.

২৯. আবদুস সত্তাব, *আরণ্য জনপদে,* তৃতীয় মুদ্রণ, নসাস, প্রথম সংস্করণ, পৃ. ৩৭৬

৩০. ফকরুজ্জামান চৌধুরী, 'রাজবংশী' হাসমত রশিদ (সম্পা.) *পাকিস্তানের উপজাতি,* ২য় সংস্করণ (ঢাকা : *পাকিস্তান পাবলিকেশন্স,* ১৯৬৬), পৃ ২০

৩১. নুরুল ইসলাম. 'ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা' রংপুর জেলা প্রশাসন (সম্পা), *রংপুর জেলাব ইতিহাস,* প্রাগুক্ত, পৃ.১০৭–১৪৬

৩২. সমর পাল, প্রাগুক্ত, পৃ–৯০ উদ্ধৃত, ঐ

৩৩. ফককজ্জামান চৌধুবী, 'রাজবংশী' হাসমত বশিদ (সম্পা), *পাকিস্তানের উপজাতি,* (ঢাকা : পাকিস্তান পাবলিকেশনস, ১৯৬৬), পৃ.. ১৬–২৪

৩৪. সমর পাল, প্রাগুক্ত, পৃ.. ৯০ থেকে উদ্ধৃত।

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ ১০০

৩৬. সুবোধ ঘোষ, *ভারতেব আদিবাসী*

অধ্যায় ৫

সমাজ ও সমাজ কাঠামো

পরিবার ও পারিবারিক জীবনপদ্ধতি

রাজবংশী সমাজে সাধারণত তিন ধরনের পরিবার দেখা যায়, যথা : ক) একক পরিবার (nuclear family) যেখানে স্বামী-স্ত্রী তাদের সন্তান-সন্ততি নিয়ে একত্রে বসবাস করেন খ) বর্ধিত একক পরিবার (extended nuclear family) যেখানে স্বামী-স্ত্রী তার অবিবাহিত সন্তান-সন্ততি এবং তার বিবাহিত ছেলে-বৌমা এবং তাদের সন্তান-সন্ততিসহ একত্রে বসবাস করেন, এবং গ) যৌথ পরিবার (joint family) যেখানে স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান সন্ততি এবং স্বামীর অন্য ভাই ও তাদের স্ত্রী, সন্তান-সন্ততিসহ একত্রে বসবাস করে প্রতিটি পরিবারের স্বামী-স্ত্রী ও তাদের বিবাহিত-অবিবাহিত সন্তান-সন্ততি একত্রে একই খানায় খাওয়া-দাওয়া করেন। সুখ-দুঃখ সকলে ভাগাভাগি করে নেন। একই পরিবারে স্বামী ও স্ত্রী তাদের ছোট সংসার চালানোর জন্য একত্রে কাজ করেন। স্বামী তার পৈত্রিকপ্রাপ্ত জমিতে চাষ বাস করেন, অথবা পাশ্ববর্তী খাল বিল-ঝিল-বাওড়-নদী-পুকুরে মাছ ধরেন, অথবা অন্যের ক্ষেতে শ্রম বিক্রি করে (day labourer) জীবিকা নির্বাহ করেন। একক পরিবারে স্বামীই হলো পরিবারের কর্তা ও সকল অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী। এখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কিংবা সমস্যা মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে পরিবারের একমাত্র কর্তা হিসেবে স্বামীই প্রধান ভূমিকা পালন করেন। একক পরিবার অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে পরিবার প্রধানের উপর নির্ভরশীল থাকেন। একক পরিবারের কোনো ছেলে বিবাহযোগ্য হলে তাকে পিতা-মাতা বিয়ে দেন। বিয়ের পর পিতা-মাতার সংসারে অবস্থান করলে এবং সেখানেই নব-দম্পত্তির সন্তান-সন্ততি জন্মালে এরকম পরিবারকে বর্ধিত একক পরিবার বলে অভিহিত করা হয়। তাদের সমাজে এরকম পরিবারের সংখ্যাও কম নয়, তবে বেশ কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় বিয়ের পর বেশ কিছুদিন পিতার সংসারে থাকার পর পিতার বাড়ির আঙিনাতে আরেকটি নতুন ঘর তুলে নতুন সংসার শুরু করে। এটি আরেকটি একক পরিবার হিসেবে বিবেচিত হতে শুরু করেন। একক পরিবারে সংসারের কর্তা সারাদিন আয়-বৃদ্ধিমূলক কাজে ব্যস্ত থাকে। মা-ও কিছুটা পারিবারিক আয় বৃদ্ধিতে সাহায্য করেন। যেমন-উত্তরবঙ্গের অস্বচ্ছল পরিবারগুলোতে গৃহকর্ত্রী অন্যের ক্ষেতে খামারে শ্রম-বিক্রি (wage labourer) করেন, এবং কিছু ক্ষেত্রে নিজেদের শস্যক্ষেতে কৃষিকাজ করে পরিবারকে সাহায্য করেন। তাছাড়া গৃহকর্ত্রী রান্না-বান্না, জ্বালানী সংগ্রহ, সন্তান লালন-পালনসহ সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম করেন।

যৌথ পরিবারে গৃহকর্তা তার স্ত্রী-সন্তানসন্ততিসহ অন্যান্য ভাইয়ের স্ত্রী ও সন্তান সন্ততি নিয়ে একসাথে বসবাস করেন, খানা খান। যৌথ পরিবারে যাবতীয় সাংসারিক খরচ একজনের হাত থেকে ব্যয় হয়। যিনি পরিবার প্রধান নির্বাচিত হন তিনিই এ দায়িত্ব পালন.

করেন। অন্যান্য ভাইয়েরা প্রতিদিনের উপার্জনের সবটাই পরিবার প্রধানের হাতে তুলে দেন। পরিবার প্রধান সংসারের সকলের দায়-দায়িত্ব নেন।

রাজবংশী সমাজের জ্ঞাতি পদাবলি

পিসে = ১ পিসিমা
২ কাকা = কাকিমা
৩ বাবা = ৪ মা
৫ মাসিমা = মেসো
৬ মামা = মামী
পিসতুতো ভাই, ১ পিসতুতো বোন
কাকাতো ভাই, ১ কাকাতো বোন
ভাই, নিজ, ১ বোন
মাসতুতো ভাই, ১ মাসতুতো বোন
মামাতো ভাই, ১ মামাতো বোন

ছক-১

জ্ঞাতি-সম্পর্ক ও সম্বোধনসূচক শব্দাবলি

প্রপিতামহ-প্রপিতামহী (বুড়ো-মা)
প্রমাতামহ-প্রমাতামহী (বুড়ো-মা)
পিতামহ-পিতামহী (দাদা-দিদি/ঠাকুমা)
মাতামহ (আজা/দাদু)-মাতামহী (আজী/দিদিমা)
জ্যাঠা-কাকা-পিসিমা
পিতা-মাতা
মামা-মাসী
জ্যাঠা-জেঠিমা
কাকা-কাকীমা
পিসিমা-পিসে (জামাই)
মামা-মামী
মাসীমা-মেসো (জামাই)
জ্যাঠতো-কাকাতো ভাই-বোন
পিসতুতো ভাই-বোন
মামাতো ভাই-বোন
মাসতুতো ভাই-বোন
আমি ও স্ত্রী অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী
ভাসুর-দেবর-জা
ভাই-বোন
শ্বশুর-শাশুড়ি
শ্যালক-শ্যালিকা
দাদা-বৌদি
দাদা-বৌদি
বোন-ভগ্নীপতি
পুত্র-কন্যা
শ্যালক-সালাজ
শ্যালিকা-ভাইরাভাই
ভাইপো-ভাইঝি
বোন-ভগ্নীপতি
পুত্র-পুত্রবধূ
কন্যা-জামাতা
পৌত্র-পৌত্রী
নাতি-নাতনী
নাতি-নাতবৌ
নাতনি-নাতজামাই

ছক-২

মাতৃতান্ত্রিকতা থেকে পিতৃতান্ত্রিকতায় প্রবেশ

নৃতাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক গবেষকদের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, রাজবংশীরা ষোড়শ শতাব্দীর পর থেকে যখন একটু একটু করে হিন্দু ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে, তখন থেকেই তাদের সমাজের মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে ধীর গতিতে। সেই সময় থেকেই বলা যেতে পারে তাদের সমাজ মাতৃতান্ত্রিকতা থেকে প্রিতৃতান্ত্রিকতায় প্রবেশ করে, ও সমাজ ব্যবস্থায় নারীর চেয়ে পুরুষের কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।[১] রাজবংশীরা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করার পর পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় প্রবেশ করলেও তাদের অনেক সংস্কার, বিশ্বাস, প্রথা, প্রতিষ্ঠান বহাল থাকে।[২] এদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ ও বিধবা বিবাহ প্রথা এখনো চালু আছে। তাদের মধ্যে অর্ধশতাব্দী আগেও কনেপণ প্রথা চালু ছিল। এখনো বিয়ের সময় নমুনা হিসাবে কন্যার পিতাকে কনেপণ দিয়ে সম্মান করার রেওয়াজ আছে। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বাংলার *লোকসাহিত্য* গবেষণাকালে ভাওয়াইয়াগানে নারীমনের অভিব্যক্তি বিশ্লেষণ করে বলেছেন, "ভাওয়াইয়া গানে সর্বত্রই কেবলমাত্র নারী মনের ভাবেরই অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়। ইহার কারণ...ইহা স্ত্রী প্রধান বা মাতৃতান্ত্রিক সমাজজীবন হইতে উৎসারিত হইয়াছে।"[৩] তিনি আরও বলেছেন, "উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কোচ ও রাজবংশী অভিন্ন রক্তধারার মানুষ, তারা ইন্দোমঙ্গোলীয় ভাষার ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী।"[৪] ড. ওয়াকিল আহমদ মাতৃতান্ত্রিক সমাজে নারী স্বাধীনতা বেশি, এটা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দেখেছেন যে বর্ণ হিন্দু গৃহস্থের ঘরে মেয়েলী গীত পর্যন্ত রাম-সীতা, রাধাকৃষ্ণের জীবনাধারে পরিবেশিত হয়। তাছাড়া কৌমার্য প্রেম পিতৃতান্ত্রিক হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায় সমর্থন করে না। কিন্তু উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের চটকা ও ভাওয়াইয়া গানের মধ্যে কুমারী মেয়ের ভেতরে প্রেমের যে আকুতি, বিবাহিত মহিলার পরকীয়া প্রেমের প্রতি আসক্তি, আর মাঠ-ঘাট-গৃহের আঙিনায় মেয়ের অবাধ চলাফেরা এবং সমস্ত কাজে মেয়েদের অংশগ্রহণ থেকে কোনো সন্দেহ থাকে না যে, অদূর অতীতে তাদের সমাজ মাতৃতান্ত্রিক ছিল। হরিশ্চন্দ্র পাল তাঁর এক বক্তব্যে লিখেছেন, "ভাওয়াইয়া, চটকা, জাগ ইত্যাদি গান লোকালয়ে গাইবার প্রচলন ছিল না। কৃষিকাজের অবসরে দূর মাঠে ধূ ধূ প্রান্তরে মহিষ চরাবার সময় কাশ ও নলখাগড়ার বনে লোকলয়ের বাইরেই এই গান গাওয়া হতো।"[৫] পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় লোকালয়ে এসব গান গাওয়া হলে নারীমন উচাটন হবে এই আশঙ্কায় সমাজপতিগণ এসব গান লোকালয়ে গাওয়া নিষিদ্ধ করেছিলেন। নির্মলেন্দু ভৌমিক দৈহিক পরিমাপের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত উপনীত হয়েছিলেন যে, রাজবংশীদের আর্যীভবন এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাবে কোচরাজাগণের নিষেধাজ্ঞা জারী হয় ; গ্রামের ভেতর এই বিরহভাবনা জাগানো উদাসিয়া গান গাওয়া চলবে না। এবং হয় তো নারীর কুলধর্ম রক্ষা করবার জন্যই সরাসরি নারীর কণ্ঠে বিরহ বেদনার কথা ব্যক্ত না করে পুরুষের কণ্ঠে তা ব্যক্ত করা হয়েছে।[৬]

প্রকৃতপক্ষে, এসব পরকীয়া প্রেমের গানের কথা, বিরহগান, কৌমার্য প্রেমের গানের কথা আজও নারীর মন ব্যাকুল করে তোলার জন্য এক মহৌষধ। এসব গান মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের নারী স্বাধীনতার পরিচায়ক। তাছাড়া বৃষ্টি আবাহনে হুঁদুম দ্যেও পূজা উৎসবে নারীর নগ্নতার সাথে উর্বরতা (fertility) ও উৎপাদনের (productivity) যোগসূত্র আছে।[৭] এসবের মধ্যে মাতৃপ্রধান (matriarchal) সমাজের সংস্কার বিদ্যমান। এদের সমাজে পূর্বে

গ্যাগোচ প্রথায়[৮] (companionate marriage) বিয়েতে কোনো যুবককে মেয়ের পরিবার গ্রহণ করে তাদের বাড়িতে কন্যার সাথে একসঙ্গে বসবাস করতে দিতেন। পরে যদি উপযুক্ত মনে করতেন তাহলে মেয়েকে ঐ ছেলের সাথে সামাজিকভাবে বিয়ে দিতেন। এই গ্যাগোচ প্রথায় বিয়েটা তাদের মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সাক্ষর বহন করে।

সামাজিক কাঠামো বিশ্লেষণ

রাজবংশী সম্প্রদায়ে জ্ঞাতি সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। রক্তসম্পর্কিত জ্ঞাতি এবং বৈবাহিক সূত্রে জ্ঞাতিত্ব রাজবংশী সমাজে প্রধান। জ্ঞাতি সম্পর্কিত আত্মিয়দের মধ্যে বিয়ে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। রাজবংশী সমাজে সমান্তরাল কাজিন (parallal cousin) ও আড়াআড়ি কাজিন (cross cousin)[৯] জ্ঞাতি সম্পর্কিয় লোকজনের সাথে বিয়ে হয় না। তাছাড়া পিতৃ ও মাতৃসূত্রীয় বংশের সাত–পুরুষের (seven generations) জ্ঞাতি সম্পর্কীয় লোকজনের সাথে বিয়ে নিষিদ্ধ। তবে মাতৃসূত্রীয় জ্ঞাতি সম্পর্কীয় লোকজনের ক্ষেত্রে বিয়ের ব্যাপারে এ নিয়মটা কঠোরভাবে কখনো পালন করা হয় না। তাদের সমাজে স্বামীর বড় ভাই স্ত্রীর 'ভাসুর' ও ছোট ভাই দেবর সম্পর্কের হয়। তাদের সমাজে দেবরের সাথে ঠাট্টা মশকরা চললেও ভাসুরের সাথে কথা বলা যায় না বা স্পর্শও নিষিদ্ধ। কোনো কারণে ভাসুরের সাথে ছোঁয়াছুয়ি হলে পাপ হয় এরকম ধারণাও এদের সমাজে এখনো বিদ্যমান। সমাজের বিয়ের ক্ষেত্রে বর্ণ হিন্দুদের মতো গোত্র মানা হয় না। বর্ণ হিন্দুদের মধ্যে সগোত্রে বিয়ে হয় না। রাজবংশীরা তাদের নিজেদের সমাজের বাইরে অন্য কোনো জাতির সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক করেন না। দৈবাৎ বৈবাহিক সম্পর্ক ঘটে থাকলে সেই পরিবারকে "একঘরে" করে হতো। তাদের সঙ্গে পুরো রাজবংশী সমাজ সম্পর্ক রাখত না। বর্তমানে শিক্ষার আলো প্রবেশ করার ফলে এই বিষয়টি কিছুটা শিথিল হয়ে এসেছে। জ্ঞাতি সম্পর্কের মধ্যে বিয়ের সম্পর্ক যেমন নিষিদ্ধ, তেমনি জ্ঞাতি সম্পর্কিয় ভাই–বোন বা অন্যদের সাথে যৌনমিলনও নিষিদ্ধ, সমাজে বরদাস্ত করা হয় না। সাধারণত তাদের সমাজে অজাচার সম্পর্ক ঘটে না। তবে কিছু জ্ঞাতি সম্পর্কের মধ্যে যৌন সম্পর্ক অনুমোদনযোগ্য না হলেও সমাজ ততটা কঠোরতা দেখায় না। রাজবংশী সমাজে জ্ঞাতি সম্পর্ক এত শক্তিশালী যে অন্য কোনো জ্ঞাতি গোষ্ঠীর সাথে বিবাদ হলে জ্ঞাতিগোষ্ঠীর লোকেরা একতাবদ্ধ হয়ে মোকাবেলা করেন। শিক্ষিত সমাজের চেয়ে অশিক্ষিত সমাজে গোষ্ঠীসম্পর্কটা আরো দৃঢ় ও শক্তিশালী দেখা যায়।

একই জ্ঞাতিগোষ্ঠীর ছেলেমেয়েদের মধ্যে যৌনসম্পর্ক ঘটার ক্ষেত্রে সমাজে কড়া নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। সমাজ এ ধরনের যৌনাচারকে অজাচার (incest) হিসেবে গণ্য করে। পিতৃসূত্রীয় (patrilinial) জ্ঞাতিগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এ ধরনের যৌনাচার কল্পনাতীত। মাতৃসূত্রীয় সমাজেও অনুরূপ নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তবুও দৈবাৎ যৌনসম্পর্ক স্থাপিত হলে তেমন কঠোরতা প্রদর্শন করা হয় না। তাছাড়া জ্ঞাতিগোষ্ঠীর, সেটা পিতৃসূত্রীয় কিংবা মাতৃসূত্রীয়ই হোক, উভয়ের ক্ষেত্রে ঠাট্টা সম্পর্কীয় (joking relationship), যেমন দেবর–বৌদি যৌন সম্পর্ক দৈবাৎ ঘটে গেলে সমাজ বরদাস্ত করে নেয়।

তাদের সমাজে অতীতের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় যে, তারা সবাই যৌথ (joint family) পরিবারে বসবাস করাটাকে প্রাধান্য দিত। সেখানে তাদের ছেলে মেয়ে, ভাই–বোন, দাদা–দিদিমা (grandfather and grandmother), কাকা–কাকিমা, তাদের ছেলে-মেয়ে

ইত্যাদি সবাই একসঙ্গে বসবাস করতে দেখা যেত। এখন অবশ্য যৌথ পরিবার ভেঙ্গে অনু পরিবারের (nuclear family) দিকে তাদের সমাজ ধাবিত হচ্ছে।

তাদের সমাজে আদিকালে এমনকি বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও কোনো গোত্রবিভাগ চালু ছিল না। সেকারণে তাদের সমাজে বিয়ের ক্ষেত্রে গোত্র বিষয়টি কঠোরভাবে মেনে চলা হয় না। যেটি মানা হয় সেটা হলো পিতৃসূত্রীয় কিংবা মাতৃসূত্রীয় জ্ঞাতিগোষ্ঠীর মধ্যে কোনো ছেলে–মেয়ের বিয়ে হয় না। অর্থাৎ তাদের সমাজে আন্তঃগোষ্ঠী বিয়ে নিষিদ্ধ। এক্ষেত্রে কোনো ছেলে বা মেয়েকে বিয়ে দিতে হলে অবশ্যই অন্য গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পন্ন হতে হয়। রাজবংশী সম্প্রদায়ের বাইরের কোনো সম্প্রদায়ে অর্থাৎ রাজবংশী ছাড়া অন্য কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে বিয়ে সম্পূর্ণ নিষেধ। তবে ইদানিং শিক্ষিত ছেলে–মেয়েদের বিশেষ করে ছেলেদের কেউ কেউ এই সামাজিক রীতিটি ভেঙ্গে অন্য সম্প্রদায়ে বিয়ে করছে। সে–বিয়ে অবশ্য ভালবাসার বিয়ে (love marriage), যেটি সামাজিকভাবে সমাজপতি বা পিতা–মাতা, আত্মীয়–স্বজনের মতামত নিয়ে করা হয় না। তাদের সমাজের মধ্যে একাধিক সামাজিক স্তর (social stratification) নেই, অর্থাৎ এদের সমাজে কোনো সামাজিক অসমতা (social inequality) বিদ্যমান নেই বলে বিয়ের ক্ষেত্রে স্বজ্ঞাতিগোষ্ঠী ব্যতীত অন্যান্য সকল রাজবংশী গোষ্ঠীতে বিয়ে বা অন্যান্য সামাজিক ক্রিয়াকর্মে কোনো বাধা নেই। তবে বিয়ের ক্ষেত্রে সামাজিক মর্যাদা (status), সামাজিক আধিপত্য (social domination), আর্থিক বিষয়াবলিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। সমাজে সামাজিক অসমতা নেই বলে উঁচুস্তরগামী বা নিচুস্তরগামী বিয়ের (hypergamy & hypogamy) প্রচলন নেই। তাদের সমাজে স্বামী বা স্ত্রী জীবিত থাকাকালীন দ্বিতীয় বিয়ের রেওয়াজ নেই। তবে স্ত্রীর বন্ধ্যাত্বের ক্ষেত্রে এ নিয়ম শিথিলযোগ্য। তবে স্বামী বা স্ত্রীর যে–কোনো একজনের অকাল মৃত্যু ঘটলে দুজনই পুনঃবিবাহ করতে পারেন। তাছাড়া রাজবংশী সমাজে জামাই–শাশুড়ী সম্পর্ক অনেকটা এড়িয়ে চলার নীতি (avoidance custom) অনুশীলন করে। অর্থাৎ জামাই–শাশুড়ী কিংবা জামাই–শ্বশুরের মধ্যে বিশেষ প্রয়োজনে দুএকটি বাক্য বিনিময় ছাড়া কথোপকথন লক্ষ করা যায় না। তবে জামাই শ্বশুর–শাশুড়ীকে প্রণাম করা, কিংবা শ্রদ্ধাভক্তি–সম্মান এগুলো করে থাকেন।

রাজবংশী সমাজে একরৈখিক বংশধারা (unilinial descent) চালু রয়েছে, সেটি হলো পিতৃসূত্রীয় (patrilinial), মাতৃসূত্রীয় নয়। কোচ সমাজে পূর্বকালে মাতৃসূত্রীয় বংশধারা বা মাতৃতান্ত্রিক নিয়ম নীতি থাকলেও তাদের সমাজে এটির অস্তিত্ব বর্তমানে পাওয়া যায় না।

এদের সমাজে পরলোকগত বোনের স্বামীর সঙ্গে বিবাহ অর্থাৎ শ্যালিকা বিবাহের (sororate system) অনুমোদন রয়েছে। কোনো পুরুষের স্ত্রী মারা গেলে ঐ মৃত স্ত্রীর ছোট বোনকে যদি সেই বোনটি বিবাহযোগ্য হয় তাহলে বিপত্নিক স্বামী বিয়ে করতে পারে। এইক্ষেত্রে অবশ্য সামাজিক কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তবে একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, স্বামী মারা গেলে বিধবা স্ত্রী তার দেবর বা ভাসুর (levirate system)–কে কখনো বিয়ে করতে পারে না। সমাজ কখনো এ ধরনের বিয়েকে স্বীকৃতি দেয় না। সেইক্ষেত্রে বিধবা মহিলাটি অন্য গোষ্ঠীতে তার শ্বশুর বা পিতামাতার অনুমতিক্রমে বিয়ে করতে পারেন।

এদের সমাজে কোনো সামাজিক শ্রেণী নেই বলে শ্রমবিভাজন (division of labour) দেখা যায় না। এদের সমাজে উঁচু-নিচু কোনো গোত্রবিভাগ নেই বা কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন পেশাভিত্তিক শ্রেণীও দেখা যায় না। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের প্রায় সবাই কৃষিজীবী হওয়ায় পুরুষের সাথে সাথে মহিলারাও কৃষিজ ফসল উৎপাদনে পরিবারকে সাহায্য করেন। তাদের সমাজে কিশোর-কিশোরী ছেলে-মেয়েরাও কৃষিকাজে, গৃহকাজে পরিবারকে সাহায্য করেন। পারিবারিক রান্নাবান্না, গৃহ আঙিনা, শোয়ার ঘর প্রভৃতির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও অন্যান্য যাবতীয় কাজকর্ম মহিলারাই সম্পন্ন করেন। কৃষিজ ফসল ঘরে তোলার সময় যাবতীয় কার্যকলাপে যেমন, ধান মাড়াই, শুকানো, ঘরে তোলা প্রভৃতি কাজে মেয়েরা পুরুষদের সাহায্য করেন। রান্না-বান্নার জ্বালানী কাঠ মহিলারা সংগ্রহ করেন। বৃহত্তর যশোর, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল ও ঢাকার মৎস্যজীবী রাজবংশী সমাজের মেয়েরা মাছ ধরার জাল বুনতে দক্ষ। তারা পারিবারিক মাছ ধরার কাজে ব্যবহৃত নানান রকমের জাল বুনে পরিবারকে সাহায্য করে থাকেন। ইদানিং বাজার থেকে ক্রয়কৃত জাল ব্যবহৃত হওয়ার ফলে এ ধরনের বুনন শিল্পে ভাটা পড়েছে।

আদিমকালে যূথভিত্তিক শ্রমের মতো শ্রম সংগঠন শুধু রাজবংশী সমাজে নয়, বাংলাদেশের তথাকথিত কোনো উপজাতি অভিধা চিহ্নিত সমাজে বহাল নেই। এদের সমাজে মাছ ধরার ক্ষেত্রে প্রায়ই একা সম্ভব হয় না বলে যৌথভাবে মাছ ধরার কাজ করতে হয়। যৌথভাবে উপার্জনের অর্থ তারা প্রত্যেকে সমানভাগে ভাগ করে নেন। কৃষিকাজের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে যৌথভাবে হাল চাষ, জমি নিড়ানী, ফসল কাটার কাজ প্রভৃতি করেন। এদের সমাজে এই প্রথাকে *'গাতা বেড়া'* বলে।

রাজবংশী সমাজে প্রাক-বৈবাহিক (pre-marital relationship) সম্পর্ক বর্তমানে দেখা যায় না। সাধারণত বিয়ের পরই স্বামী-স্ত্রী একত্রে জীবন-যাপন করতে পারে, তার আগে নয়। তবে পূর্বকালে বিধবা বিয়ের ক্ষেত্রে অর্থাৎ *'ঘর সোধানী বিয়ে'* বা *'ঘরে ঢোকা বিয়ে'র* ক্ষেত্রে বিধবা মহিলাটি যাকে পছন্দ করে তার ঘরে ঢুকে কয়েকদিন যাবৎ ঘর-কন্নার কাজ করত, এবং স্বামী-স্ত্রীর মতো একত্রে বসবাস করত। কয়েকদিন একত্রে বসবাস করার পর অনানুষ্ঠানিকভাবে বিয়ের সামাজিক স্বীকৃতি পেত। রাজবংশী সমাজে প্রাক-বৈবাহিক ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠলেও তা অত্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষা করে করা হয়। সমাজ এগুলো নিন্দার চোখে দেখে। দাম্পত্য জীবনে প্রকাশ্যে গভীর ভালবাসাও গোপনীয় ব্যাপার। কোনো দম্পতি যদি গভীর ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ লোক-সম্মুখে ঘটায়, তা সমালোচনার চোখে সমাজ দেখে থাকে। দম্পতির প্রকাশ্য প্রেমালাপ কিংবা হাসি-তামাশা সমাজ সহজে গ্রহণ করে না। সেকারণে কোনো দম্পতি একসাথে সিনেমা-থিয়েটার, পার্কে ভ্রমণ, চিত্তবিনোদন প্রভৃতি উপলক্ষে সাধারণত ভ্রমণে যায় না। দম্পতির পারস্পরিক সেবামূলক পরিচর্যা বা ভালবাসা সম্পর্কিত বহিঃপ্রকাশ প্রকাশ্যে তাদের সমাজে সচরাচর দেখা যায় না।

এদের সমাজ সম্বোধনের ক্ষেত্রে বর্ণ-হিন্দুদের মতোই সম্বোধন করে থাকে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য এখনো ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়, যেমন-তাদের সমাজে রমণীরা ভাসুরকে *'ঠাকুর'* (যেমন বটঠাউর, ছোটঠাউর) বলেন এবং দেবরকে *'ঠাকুরপো'* বলে সম্বোধন করে থাকে। ভাইয়ের স্ত্রীগণ ননদের বরকে *'ঠাকুরজামাই'* সম্বোধন করেন। ছেলেমেয়েরা পিসিমা

ও মাসিমার স্বামীকে 'জামাই', স্বামী-স্ত্রী তাদের নিজ নিজ শ্বশুরকে 'জামাই' বলে সম্বোধন করেন। ইদানিং অবশ্য অনেকেই শ্বশুরকে 'বাবা' বলে ডাকেন। অদূর অতীতে কাকা-কাকীমাকে খুড়ো-খুড়িমা বলে সম্বোধন করা হতো। তাদের সমাজে ছোট-ভাইয়ের স্ত্রীর সাথে সচরাচর কথা বলা নিষিদ্ধ, আর স্পর্শ দোষকে পাপ হিসাবে গণ্য করা হয়।

সম্পত্তির মালিকানা

সামাজিক প্রথা অনুসারে পিতার মৃত্যুর পর ওয়ারিশ হিসাবে পুত্ররাই সম্পত্তির মালিক হয়। কন্যারা কোনো অস্থাবর-স্থাবর সম্পত্তির মালিক হয় না। সম্পত্তি বন্টনের ক্ষেত্রে তারা দেশে প্রচলিত হিন্দু সম্পত্তি আইন মান্য করেন। *সিভিল ল আদিবাসীদের সম্পত্তি হস্তান্তর ও খায়াখালাসী বন্ধক আইন ১৯৫০-এ* গারো, সাঁওতালসহ বিভিন্ন উপজাতিদের সম্পত্তি সম্পর্কিত রাষ্ট্রীয় আইনের ব্যাখ্যায় রাজবংশীদের সম্পত্তির ব্যাপারে উক্ত আইন প্রযোজ্য হবে না বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।[১০] রাজবংশীদের পারিবারিক সম্পত্তিতে মেয়েদের কোনো হক নেই। তারা পিতা বা ভাইয়ের সংসারেই থাকে। তাকে বিয়ে দেওয়ার নৈতিক দায়িত্ব পিতা বা ভাইয়ের। সম্প্রতি রাজবংশী বিয়েতে বরপক্ষকে প্রচুর পরিমাণে যৌতুক দিতে হয়। কন্যা সন্তানরা সম্পত্তির ভাগ না পেলেও যে-পরিমাণ নগদ অর্থ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি দিতে হয় তাতে প্রায় ক্ষেত্রে কন্যার পরিবারকে সমস্যায় পড়তে হয়।

বিচার ব্যবস্থা

রাজবংশীদের প্রতিটি গোষ্ঠীর একজন বা একাধিক ব্যক্তিকে প্রধান হিসাবে মানা হয়। তার কাছে গোষ্ঠীতে সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্য সকলে সমবেত হয়ে সমস্যা পেশ করেন। তিনিই সাধারণত ছোটোখাটো বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সমাধান করেন। আর যে সমস্যাগুলো অপেক্ষাকৃত জটিল, গোষ্ঠীতে সমাধান সম্ভব হয় না সেটি গ্রামের প্রতিটি গোষ্ঠী প্রধানদের ডেকে শালিসী বৈঠক করতে হয়। তারা যাবতীয় সামাজিক সমস্যার সমাধান দিয়ে থাকেন। গোষ্ঠীপ্রধানদের গ্রামের মাথা বা মাতুব্বর বলে। কোনো সামাজিক সমস্যায় গ্রাম প্রধানদের ডাকা হয় ও শালিসী বৈঠকের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা হয়ে থাকে। তবে সামাজিক সমস্যার বাইরে কিছু সমস্যা যেমন-জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ যদি এরকম বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাধান করতে না-পারে তাহলে রাষ্ট্রীয় আইন ও বিচার ব্যবস্থার শরণাপন্ন হতে পরামর্শ দেওয়া হয়।

রাজবংশী পরিবার প্রধান বা কর্তাব্যক্তির মৃত্যু হলে তার পুত্র সন্তানরাই সম্পত্তির যোগ্য উত্তরাধিকারী হয়। উত্তরবঙ্গের অন্যান্য উপজাতীয় গোষ্ঠীর মতো এদের সমাজে মেয়েরা কখনো সম্পত্তির উত্তরাধিকারিনী হয় না তবে যতদিন পর্যন্ত মেয়ে কুমারী বা অবিবাহিত থাকে ততদিন পর্যন্ত বোনদের ভরণপোষণের এবং বৃদ্ধ মাতার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তাদের পুত্রের উপর বর্তায়। কোনো পুত্র যদি ভরণপোষণে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে গোষ্ঠীপ্রধান বা গ্রাম প্রধানগণ প্রথমে পুত্র সন্তানদের বুঝিয়ে রাজী করায়, তাতে যদি রাজী না হয় তাহলে গ্রামপ্রধানগণ ঐ পরিবারের মৃত পিতার সম্পত্তি থেকে কিছু অংশ ঐ বৃদ্ধ মাতার জন্য অলিখিতভাবে বরাদ্দ করে। ঐ সম্পত্তি থেকে উৎপাদিত শস্যাদি বা অর্থ সম্পদ থেকে বৃদ্ধ মাতা মৃত্যু পর্যন্ত ভোগ করেন। তবে এ ধরনের ঘটনা রাজবংশী সমাজে বিরল।

তথ্যসূত্র

১. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলা লোকসংগীত : ভাওয়াইয়া* (ঢাকা : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৯৫০. পৃ.. ৯ (মুখবন্ধ)

২ ঐ. পৃ. ১৫

৩. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোকসাহিত্য ৩য় খণ্ড,* (কলিকাতা, ১৯৯৫), পৃ.-২৬৩

৪. ঐ. পৃ. ২৫৭-২৫৮

৫. হরিশ্চন্দ্র পাল, 'ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে,' *লোক সংস্কৃতি গবেষণা,* শ্রাবণ-অশ্বিন ১৩৯৯, পৃ. ৭৯

৬. নির্মলেন্দু ভৌমিক, 'প্রান্ত উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া গান', *লোকসংস্কৃতি গবেষণা,* শ্রাবণ-আশ্রিন, ১৩৯৯, পৃ. ৮৯

৭. GOB, *Bangladesh District Gazetteers : Rangpur* (Dhaka : MOE, 177), p.71

৮. রাজবংশীদের সামাজিক কাঠামো বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও বয়স্ক প্রবীণ সদস্যদের সাথে আলোচনা করা হয়েছে।

৯. সমান্তরাল কাজিন হলো চাচাত ভাই, বোন, মাসতুতো ভাইবোন, আর আড়াআড়ি কাজিন হলো পিসতুতো ভাইবোন ও মামাতো ভাইবোন।

১০. বফিকুল হাসান ও মাইকেল সরেন, *সিভিল ল ও আদিবাসীদের সম্পত্তি হস্তান্তর ও খায়খালাসী বন্ধক আইন* ১৯৫০ (রাজশাহী: হাসান ল হাউজ, ১৯৯১), পৃ. ১৩

অধ্যায় ৬

সামাজিক আচার সংস্কার বিশ্বাস

প্রকৃতি ও দৈবশক্তিকে তুষ্ট বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে বস্তুগত কর্মকাণ্ড ফলপ্রসূ হবে এই বিশ্বাস থেকে রাজবংশী সমাজে আচার ও নানাবিধ সংস্কারমূলক ক্রিয়ানুষ্ঠান করা হয়। শাস্ত্রীয় ও লৌকিক দুই ধরনের আচারই রাজবংশী সমাজে বিদ্যমান রয়েছে। শাস্ত্রীয় আচারের লক্ষ্য হলো শাস্ত্রীয় বিধি-বিধান অনুযায়ী অতিন্দ্রীয় শক্তি ও দেব-দেবীকে তুষ্ট করা, এবং এর মাধ্যমে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখ-শান্তি কামনা। আর লৌকিক আচারের উদ্দেশ্য হলো শুধুমাত্র ইহলৌকিক কামনা। মেয়েদের ব্রতাচার, জন্মে-বিবাহে স্ত্রী-আচার প্রভৃতির উদ্দেশ্য হলো পার্থিব সুখ-কামনা।

এসব আচার অনুষ্ঠানের মূলে রয়েছে সর্বপ্রাণবাদের (animism) প্রতি বিশ্বাস। সর্বপ্রাণবাদের ক্ষেত্রে তিন ধরনের বিশ্বাসের অস্তিত্ব পাওয়া যায়, যথা-(i) জীবিত অথবা মৃত মানুষের আত্মায় বিশ্বাস ও তার পূজা, (ii) দেহ বা আকারবিশিষ্ট বস্তু যা বিশ্বের সাথে সম্পর্কহীন এরকম আত্মায় বিশ্বাস ও তার পূজা, এবং (iii) বস্তুর মধ্যে অবস্থিত আত্মায় বিশ্বাস ও তার পূজা।[১] নৃবিজ্ঞানী টাইলর (E.B. Tylor) সর্বপ্রাণবাদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, দেবদেবী ও অপদেবতা বশীভূত করতে মানুষ আত্মায় ও পারলৌকিক জীবনে বিশ্বাস স্থাপন করে, এবং শেষ পর্যন্ত এইসব বিশ্বাস এক ধরনের সক্রিয় উপাসনায় পরিণত হয়।[২] এসব দেব-দেবী ও অপদেবতার প্রতি ভয়-ভীতি ও কৃতজ্ঞতাবোধ থেকে বিশ্বাস আচার-সংস্কারের উৎপত্তি ঘটেছে। ভয়-ভীতি থেকে যাদের উদ্ভব, তারা হলো মৃত মানুষের সৎকারহীন আত্মা, অপঘাতে মৃত্যুপ্রাপ্ত নর-নারীর আত্মা, যারা পরিণামে প্রতিহিংসাপরায়ণ ভূত-প্রেত হিসাবে জীবিত মানুষের ক্ষতিসাধন করতে তৎপর থাকে। তাছাড়া মানুষের পূর্ব-পুরুষের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ থেকে দেবতাজ্ঞানে মানুষ টোটেমকে পূজা করে। উইলিয়াম ক্রুক দেবতার বাহন ও অবতারকে টোটেম হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। যেমন-ব্রহ্মার বাহন হংস, শিবের বৃষ, কার্তিকের ময়ূর, অগ্নির মেষ, বরুণের মীন।[৩] শিবের দেহে যে-সকল কুলচিহ্ন রয়েছে তা হলো সাপ, বাঘ ও বৃষ। অর্থাৎ তিনটি ট্রাইবের কুলচিহ্ন একটি দেবতায় একীভূত হয়েছে বলে অনুমান করেছেন মোমেন চৌধুরী।[৪] তাছাড়া মানবের গোত্রকুলনাম বলে যেসব বৈদিক ঋষিদের নাম প্রচলন আছে তা আসলে মানবেতর প্রাণীর নাম থেকে গ্রহণ করা হয়েছে বলে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মনে করেন,[৫] যেমন-কাশ্যপ গোত্রে কচ্ছপকে সেই আদি ঋষির বংশধর হিসাবে মনে করা হয়।

রাজবংশী সমাজে বর্তমানেও এমন কিছু বিশ্বাস-সংস্কার বিদ্যমান আছে যা তাদের সমাজের মানুষের সমস্যা থেকে মুক্তির অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। যেমন-উত্তরবঙ্গে এমন বিশ্বাস আছে যে, স্ত্রীলোকের মাধ্যমে রোগীকে ঔষধ সেবন নিষিদ্ধ। কারণ স্ত্রীলোক ঔষধ সেবন

করালে কোনো ফল হয় না। কোনো কোনো পরিবারে পিতা পুত্রকে ঔষধ সেবন করায় না। সেক্ষেত্রে অন্য লোককে ডেকে এনে ঔষধ সেবন করানো হয়।[৬] ভাগনেয় বধূর ছায়া মাড়ানো বা তার সাথে কথা বলা নিষেধ, এমনকি তার দিকে তাকানো বা কোনো দ্রব্য তার হাত থেকে গ্রহণ করা পাপ বলে তারা বিশ্বাস করেন।[৭] সকল ভাইয়ের স্ত্রীগণ ভাসুরকে দেখে ঘোমটা দিয়ে চলাফেরা করবেন, কখনো ভাসুরের সাথে কথা বলবেন না, ভাসুরের নাম প্রকাশ্যে কিংবা অপ্রকাশ্যে উচ্চারণ করবেন না–এটা সমাজের নিয়ম। হঠাৎ যদি ভাসুরের সাথে ছোঁয়াছুয়ি ঘটে যায় তাহলে প্রাশ্চিত্ত করার সংস্কার তাদের সমাজে বিদ্যমান। সেদিন ভাসুর উপবাস করেন, এবং পরে রাত্রে আকাশের তারা গুনে ভাত খান।[৮]

রাজবংশী সমাজে এমন বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, কোনো স্ত্রীলোক মৃত সন্তান প্রসব করলে বা স্ত্রীলোকটির সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে অল্প কিছুদিন পর মারা গেলে, পরবর্তী সন্তান জন্মানোর পর পরই কারো সাথে বিয়ে দিলে সন্তানটি আর মারা যাবে না। এই কারণে এখনো উত্তরবঙ্গে বিশেষ করে কুচবিহারে ও এদেশের বিভিন্ন এলাকায় তাদের সমাজে ২–৩ মাস বয়সের অথবা দুতিন বছরের অনেক বালক–বালিকার বিয়ে হয়। এই বিয়েকে বলে *'গাও ছুয়া করা'*।[৯] মেয়েদের মধ্যে এখনো বিশ্বাস স্থির আছে যে, রবিবারে ক্ষার বা সাবান ব্যবহার নিষিদ্ধ। কোনো সংক্রান্তির দিনে কেশ খোলা নিষেধ।[১০] পুত্র–কন্যার জন্ম তারিখে মাথায় সাবান দেওয়া বা জল দেওয়া তাদের সমাজে বারণ।[১১] রাজবংশী সমাজে রবিবারে বাঁশ ঝাঁড় থেকে কোনো বাঁশ কাটা বারণ।[১২] এদের সমাজের লোকজন কয়েক বছর আগেও অন্য কোনো জাতির বাড়িতে অন্নজল গ্রহণ করতেন না, এখনো এই নিষেধ অনেকেই মেনে চলেন। তাদের রান্নাঘর মুসলমান লোকজন স্পর্শ করলে অশৌচ হয়ে যায় এমন অনেক সংস্কার ও বিশ্বাস তাদের মধ্যে বিরাজমান। তাদের সমাজে যাত্রাশুভ, যাত্রানাস্তি, বশীকরণ, ঝাঁড়ফুক, তুকতাক, বাণমারা, বন্ধনমন্ত্র, টুকা প্রভৃতি বিশ্বাস ও সংস্কারের প্রচলন রয়েছে।

অন্যান্য আচার-সংস্কার

হুঁদুম দ্যেও রাজবংশীদের মেঘের দেবতা। চৈত্র–বৈশাখ মাসে খরার সময় রাজবংশী রমণীরা রাত্রে অকর্ষিত ক্ষেতে সবাই মিলে কলাগাছ পুঁতে হুঁদুম দ্যেও এর মূর্তি বানিয়ে নগ্ন নৃত্য করেন। এই বৃষ্টি দেবতার পূজার উদ্দেশ্যে কিছু আচার পালিত হয়। পূজার সামগ্রী হলো ১ খানা চালুন, ১ ছড়া কলা, ৫টি প্রদীপ, ধান, দূর্বা, ধুনা ও ঝাড়ফুল।[১৩] এসব পূজা সামগ্রী দিয়ে হুঁদুম দ্যেওকে পূজা করা হয়। স্থান বিশেষে গ্রামের মেয়েরা একত্রিত হয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে চাল–ডাল অন্যান্য সামগ্রী মাগন করেন। সেগুলো দিয়ে তারা পূজা উৎসব পালন করেন।

ময়মনসিংহ ও উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজে 'ব্যাঙ বিয়ে'র প্রচলন কোথাও কোথাও আছে। গ্রীষ্মকালে খরা দেখা দিলে গৃহস্থ মেয়েরা দুটো ব্যাঙ ধরে একটি গর্তে পানি ঢেলে সেখানে কৃত্রিম বিয়ে (mock marriage) দেন।[১৪] রাজশাহী জেলায় ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় "দুটি কোলা ব্যাঙকে সাজ–সজ্জা পরিয়ে, নাকে নোলক দেয়া হয়। সন্ধ্যা হলে গাঁয়ের মেয়েরা কলসীতে পানি ভরে মাঠে যায়।... বর্ষীয়সী মেয়েরা মাটিতে কলসীর পানি ঢেলে দেয় ও মাটি কর্দমাক্ত করে। পরে ব্যাঙ দুটোকে কলা গাছের খোলার বাক্সে পুকুরে ছেড়ে

দেওয়া হয়।"[১৫] আচারটির সাথে হুঁদুম দ্যেও-এর ভাবগত মিলের কথা স্বীকার করেছেন ওয়াকিল আহমদ।[১৬]

রাজবংশী সমাজের কৃষিভিত্তিক পরিবারগুলোতে গরু কিনে আনলে তাকে বরণ করে নেওয়া হয়। উত্তরবঙ্গে গরুর চারপায়ে গৃহকর্তা বা কর্ত্রী পানি ঢেলে দেন।[১৭] রাজবংশী সমাজে কোনো গাভী প্রসব করলে একমাস যাবৎ গৃহকর্ত্রী সেই গাভীর দুধ খান না। মাস শেষ হলে শনি অথবা মঙ্গলবারে স্থানীয় গ্রাম মাঙ্গলিক থানে উক্ত গাভীর দুধ কলাসহ একটি কলাপাতায় কালীমাতা ও গাজীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে, তারপর উপস্থিত সবার মধ্যে চিনি-কলা বিতরণ করেন।[১৮] অতঃপর গৃহকর্ত্রী ঐ গাভীর দুধ খেয়ে থাকেন। পৌষ মাসের শেষদিনে চালের সাথে পানি মিশিয়ে পিঠা তৈরি করে কলাপাতায় মুড়ে গরুকে খাওয়ানো হয়। এই আচারকে গরুর পিঠা খাওয়ানো বলে।[১৯] ভাল ফসলের উদ্দেশ্যে রাজবংশী সমাজে ধানের সাধ খাওয়ানো বা ধানের ফুল দেওয়া আচারের প্রচলন আছে।[২০] তাছাড়া রাজবংশী সমাজে গাস্বী,[২১] বেরা-ভাসান,[২২] ত্রিনাথপীর, বনবিবি, গাজীপীর, সত্যনারায়ণ ইত্যাদির উদ্দেশ্যে পূজা ও আচার অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এসবের উদ্দেশ্য হলো সংসারের সুখ সমৃদ্ধি ও সন্তান কামনা।

রাজবংশী সমাজে রমণীদের সুলক্ষণা-কুলক্ষণা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। সুলক্ষণা রমণী হলো তারা, যাদেব লম্বা কেশ, উন্নত বক্ষ, উজ্জ্বল ও পরিপাটি দন্ত, তীক্ষ্ণ নাক, গাত্র রং অপেক্ষাকৃত ফর্সা। অন্যদিকে যেসব রমণীর পায়ের পাতা খড়মের অনুরূপ, মাটি থেকে উঁচুতে থাকে তাকে খড়ম পেয়ে বলে। যার দাঁত চিরুনী সদৃশ্য, গাত্রবর্ণ শ্যামল ও নাক-মুখমণ্ডল দৃষ্টিনন্দন নয় তাদের কুলক্ষণা হিসাবে অভিহিত করা হয়। এ ছাড়াও স্বামীর আগে খাওয়া-দাওয়া, গোগ্রাসে অধিক খাদ্য গ্রহণ, ঝগড়াটে, খিস্তি-খেউড়কারী মহিলাকে কুলক্ষণা রমণী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এই ধরনের বিশ্বাস ওরাওঁ, সাঁওতাল ও মুণ্ডা সমাজেও লক্ষ করা যায়। কোনো শুভকাজে যাত্রা করা, বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে যাত্রাকালে, ঘর থেকে বের হওয়ার সময় কোনো কিছুতে বাধাপ্রাপ্ত হলে, পশ্চাৎ থেকে কেউ ডাক দিলে, শবযাত্রা দেখলে, ছাগলের দড়ি পথিমধ্যে আড়াআড়ি অবস্থান করতে দেখলে, কাক ডাকতে শুনলে, আগুন লাগতে দেখলে, শূন্য কলস দেখলে, বনের শৃগাল, সাপ, বিড়ালকে বামে যেতে দেখলে প্রভৃতি রাজবংশী সমাজ অশুভ বলে চিহ্নিত করেন। এতে তাদের বিশ্বাস যে, এই অশুভ বিষয় পরিহার করে না-চললে অমঙ্গল হয়, আয়-রোজগার ভাল হয় না। তারা ভাসুরের নাম উচ্চারণ করেন না। এতেও অমঙ্গল হয় বলে মনে করেন। রোগ-দারিদ্র ইত্যাদির ব্যাপারেও তাদের সমাজে কিছু সংস্কার বর্তমান রয়েছে। যেমন-সন্ধ্যাকালে ও রাত্রিবেলায় চুল আচড়িয়ে যেখানে সেখানে ফেলে রাখা, সন্ধ্যার পর উঠান ঝাড়ু দেওয়া, সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ার পর ভিক্ষুককে ভিক্ষা দান, রাত্রিবেলা নখ কাটা, শনি-মঙ্গল বারে শরীরে সাবান মাখা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় রোগ ও দারিদ্র্যের বাহক হিসেবে মনে করেন। তাছাড়া রাত্রিকালে পেঁচার ডাক, কুকুরের কান্না, অপবিত্র দেহে গোয়াল ঘরে বা রান্নাঘরে প্রবেশ, গবাদি পশু ও গৃহস্তের অকল্যাণ ডেকে আনে। কোনো গৃহস্থের বাড়িতে গলায় দড়ি থাকা অবস্থায় গুরু-ছাগল মারা গেলে গো-বোধ পড়ে বলে তারা জানান। তাছাড়া রবিবারে বাঁশ কাটা বা কোনো গাছ কাটা নিষেধ বলে অনেকেই মেনে থাকেন। হালচাষের ক্ষেত্রে রাজবংশী

সমাজে বিশ্বাস আছে যে, জমির পূর্বদিক থেকে হালচাষ শুরু করতে হয় নতুবা ফসল ভাল হয় না। কেউ ভূত-জ্বীন বা অদৃশ্য কোনো কিছু থেকে ভয় পেলে গ্রাম্য ওঝার নিকট থেকে মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে জ্বীন-ভূত তাড়িয়ে নেন ; এই প্রক্রিয়াকে 'গা ঝাঁড়া' বলে। তাছাড়া মন্ত্রপুত তেল-জল, তাবিজ-কবজ, মাদুলি ইত্যাদি রোগ সারানোর ক্ষেত্রে, স্বামী-স্ত্রী বশীকরণের ক্ষেত্রে, এমনকি রমণী বশীকরণের ক্ষেত্রেও তারা ব্যবহার করেন।

কোনো সদ্য প্রসূত গাভীকে গ্রাম্য ওঝা বা দুষ্ট ফকির, কবিরাজের হাত থেকে রক্ষার জন্য গলায় কল্কি বা চামড়ার দ্রব্যাদি বেঁধে দেয়া হয়। প্রসূতি গাভীর দুধ কম হলেও ওঝা-কবিরাজ গাভীকে বাণ মেরেছে বলে তারা মনে করেন। রাজবংশী সমাজে বিশ-পঁচিশ বছর আগেও ডাইনী বিষয়ক সংস্কার ছিল। তারা ডাইনি মহিলাকে খুব ভয় পেতেন। এখন অবশ্য কাউকে ডাইনী হিসাবে চিহ্নিত করতে দেখা যায় না। কোনো সন্তান জন্মগ্রহণ করলে বা কোনো লোক মারা গেলে রাজবংশী সমাজে জ্ঞাতিগোষ্ঠীতেই আঁচি (অশৌচ) হয়। অর্থাৎ ঐ সময়ে মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ না-হওয়া পর্যন্ত এবং সন্তান জন্মের সাতদিন অর্থাৎ 'সাতের কামান' এবং ২১ দিন পূর্ণ হলে নাপিত দ্বারা ক্ষৌরকার্য না-হওয়া পর্যন্ত অশৌচ মনে করেন। সাতের কামান হওয়ার পরে ঐ দিনে প্রসূতিকে সাত রকমের তরকারী দ্বারা রান্না করা ব্যঞ্জন খেতে দেন। এই সময়টাতে কোনো পূজা-অর্চনা, পবিত্র বা মঙ্গলজনক কাজে অশৌচ জ্ঞাতিগোষ্ঠীকে ডাকা হয় না, বা তারা সেখানে নিজেরাও যান না। অন্য গোষ্ঠীর কোনো লোক অশৌচ বাড়িতে জল পর্যন্ত স্পর্শ করেন না। স্পর্শ করলে তাকে ঠাকুর দ্বারা আচমন করে শুদ্ধি হতে হয়। এই বিষয়টি এখন অবশ্য শিক্ষিত লোকজনের নিকট কিছুটা শিথিল হয়ে পড়েছে। তবে প্রত্যন্ত অঞ্চলে অশিক্ষিত লোকজন এখনো এইসব ঐতিহ্যবাহী সংস্কার ভক্তিশ্রদ্ধা সহকারে পালন করেন। অশৌচ হলে পুরো জ্ঞাতিগোষ্ঠীর লোকজন নাপিত ডেকে ক্ষৌরকার্য সম্পন্ন করে শুদ্ধ হন, এবং সমস্ত মাটির হাড়ি-কুঁড়ি, বাসন-কোসন পরিত্যাগ করে নতুন বাসন-কোসন ও হাড়ি-কুড়িতে রান্না-বান্না করেন। এইসব বিশ্বাসের অধিকাংশগুলোই উত্তরবঙ্গের সাঁওতাল, ওরাওঁ, মুণ্ডা, মালো প্রভৃতি সমাজে বিদ্যমান রয়েছে।

গোত্র বিভাগ

গবেষক চারুচন্দ্র সান্ন্যাল রাজবংশীদের মধ্যে অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মতো টোটেম বিভাগ লক্ষ করেন নি। তাদের মধ্যে কয়েকটি উপবিভাগ দেখেছেন। যেমন-আমআউত বা রামাউত, পণ্ডিত, গদাধর ও নিত্যানন্দ। এরা রামানন্দ, নিত্যানন্দ, বিষ্ণুপদ ও মাধবাচার্যের শিষ্য। তাদের শ্রেণী বলতে চৈতন, আদিত, উদইত, কানাইয়া, পাগল, আমআউত, নিত্যানন্দ, বলরাম আছিদর, সোইত গুরু, বলাইয়া, যুগল, পণ্ডিত, ছাওয়াল, কৃষ্ণ প্রভৃতি বুঝায়।[২৩]

রাজবংশী বিয়ে[২৪]

তথাকথিত সভ্য সমাজের বিয়ের মতো রাজবংশী সম্প্রদায়ের বিয়েতে প্রথাগত ধারার ব্যাপক পরিবর্তন না ঘটলেও ধীরে ধীরে কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। যদিও তাদের বিয়ে বর্তমান ব্রাহ্মণ 'ঠাকুর' দ্বারা মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে ও বর্ণ-হিন্দুর নিয়ম মেনে বিয়ে হয়, তথাপিও বিয়ের আনুষ্ঠানিকতার ক্ষেত্রে নিজস্ব ঐতিহ্য, মেয়েলী আচার-অনুষ্ঠান, লৌকিক বিশ্বাস, নিজেদের সামাজিক বাধা নিষেধ মানা হয়। রাজবংশী বিয়ের ক্ষেত্রে এখন যেসব বিষয় খুব বিবেচনা

করা হয়, সেগুলো হলো পাত্র-পাত্রীর বংশ, বয়স, বরপণ, সামাজিক রীতিনীতি, সামাজিক স্বীকৃতি প্রভৃতি। কোনো বর-কনে যদি অভিভাবককে ও সামাজিকভাবে বসবাসকারী প্রতিবেশীগণের না-জানিয়ে গোপনে প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হয় তাহলে সমাজ ঐ বর-কনের পরিবারকে সামাজিক স্বীকৃতি না-দিয়ে নানানভাবে পরিবারদ্বয়কে সমস্যাগ্রস্ত করে তোলেন। কখনো কখনো সমাজপতিদের নিকট পরিবারের অভিভাবকগণ সমাজ ডেকে, ক্ষমা চেয়ে সকলকে খাওয়ানোর পর সমাজ তাদের বিয়েকে স্বীকৃতি দেন। সামাজিকভাবে স্বীকৃত বিয়ে না হলে ঐ নতুন বিবাহিত স্ত্রীর হাতের জল পর্যন্ত সমাজের কোনো লোক গ্রহণ করেন না। এমনকি প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ নারী-পুরুষ ও তাদের পরিবারকে *'এক ঘরে'* করা হয়।

রাজবংশীরা বিয়ের ব্যাপারে হিন্দুর দায়ভাগ মান্য করেন। একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে ক্রমোন্নতির পথে এগোলেও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত তাদের অবস্থা ছিল নাজুক। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত রাজবংশী সমাজে কনেপণ প্রচলিত ছিল। কনেপণ নিয়ে যে-বিয়ে হতো তাকে *'কইন্যা ব্যাচা বিয়ে'* বলা হয়। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে বরপণ প্রথা প্রচলিত হয়েছে। বর্তমানে বরপণ প্রথা রাজবংশী সমাজে সুবিধার চেয়ে সমস্যার সৃষ্টি করছে বেশি। রাজবংশীরা বর্তমানে পিতৃতান্ত্রিক ও পিতৃসূত্রীয় (patrilineal) সম্প্রদায়। বিয়ের পর কন্যা স্বামীর বংশের পরিচয়ে পরিচিতি লাভ করেন। তাদের মধ্যে সগোত্রে বিয়েতে কোনো বাধা নেই। পঞ্চাশ বছর আগেও রাজবংশীদের মধ্যে ৯-১০ বছরের বয়স্ক মেয়েকে ২০-২৫ বছর বয়স্ক পুরুষের সাথে বিয়ে দেওয়া হতো। বর্তমান এ ধারা পরিবর্তিত হয়ে অনেকটা আধুনিক সমাজের মতো হয়ে গেছে। বিয়ের দিন বর ও কনের বাড়িতে নাপিত ডেকে বর ও কনের নখ কেটে শৌচ করা হয়। বিয়েতে গমনের পূর্বে জলদেবীকে তাঁরা পূজা করেন। একে 'গঙ্গাবরণ' বলে। গঙ্গাবরণের জল দিয়ে বর ও কনেকে প্রত্যেকের নিজ বাড়িতে স্নান করানো হয়, কাপড়ে হলুদ মাখানো হয়। তারপর নতুন কাপড় পরিয়ে দেওয়া হয়। নাপিত বরের হাতে তামার দণ্ডবিশিষ্ট একটি ক্ষুদ্র গোলাকৃতি চাকতি (যা দর্পণ নামে পরিচিত) ও কলাগাছের শীর্ষমূল-পত্রটি কেটে ধরিয়ে দেন। কলমের ন্যায় কলাগাছের শীর্ষমূলটি তীরের প্রতীক ও দর্পণটি ঢালের প্রতীক। রাজবংশীরা মনে করেন বর যুদ্ধ করে কনেকে জয় করতে যাচ্ছে। সেজন্যে ঢাল ও তীর বরকে বিভিন্ন বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করবে। নাপিত বরের ডানহাতের কব্জীতে সাদা সুতো বেঁধে দেন। সুতোটি দেওয়া হয় বরকে কোনো অশরীরী আত্মা, ভূত-প্রেত ইত্যাদি যেন স্পর্শ না-করতে পারে। বর কনের পিত্রালয়ে গমনের পূর্বে বরকে তার মা আশীর্বাদ করেন। আশীর্বাদ করার সময় বরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "বাবা, তুমি কোথায় যাচ্ছ?" বর তখন উত্তরে বলে থাকে, "মা তোমার দাসী আনতে যাচ্ছি?" বর কনের পিত্রালয়ে যাবার পূর্বে বরের মা বা পরিবারের কেউ গ্রামমাঙ্গলিক পূজার থানে বর-কনের শুভ জীবন কামনায় মানত করে থাকেন। বিয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার পর বর বা কনের গোষ্ঠীতে কারো মৃত্যু হলে বিয়েটা অশুভ মনে করা হয়। আগে এ বিয়ে ভেঙ্গে যেত, কিন্তু বর্তমানে বিয়ে না ভাঙ্গলেও শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের পর নতুন দিনক্ষণ ঠিক করে বিয়ে দেওয়া হয়। কনের বাড়িতে বিয়ে অনুষ্ঠানে চারটি কলাগাছ দ্বারা বেষ্টিত জলপূর্ণ ঘটে আম্রপল্লব থাকে। যাকে 'ছাদনা তলা' বলে। ছাদনা তলাকে কন্যা সাতবার প্রদক্ষিণ করে, ও প্রতিবার বরের পায়ে একটি করে ফুল দেন। ঐ সময় বরকে সাদা কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখা হয়। তারপর বিয়ের অনুষ্ঠানে পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে

নানান নিয়মাবলী সম্পন্ন করেন। বর ও কনকে একখণ্ড কাপড় দিয়ে ঢেকে শুভদৃষ্টি করানো হয়। শুভদৃষ্টি অনুষ্ঠানে বর ও কনের হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডল দেখা গেলে ভবিষ্যতে দাম্পত্যজীবন সুখময় হবে বলে রাজবংশী সমাজ মনে করেন। তারপর বর ও কনের ডান ও বাম হাত জলপূর্ণ তামার কলসীর উপর স্থাপন করে আম্রপল্লব ডুবিয়ে উঠানোর পর সেই জল দ্বারা বরকনের মাথায় ও গায়ে ছিটিয়ে আশীর্বাদ করেন। অতঃপর কন্যার পিতা বা পিতৃতুল্য কেউ কন্যা সম্প্রদান করে থাকেন। কন্যা সম্প্রদানের সময় কন্যা তার বামহাতের মুষ্টিতে ইঁদুর খোঁড়া মাটি পিছন দিকে পর পর তিনবার নিক্ষেপ করেন। এর অর্থ, এতদিন পিত্রালয়ে মেয়ে যা খেয়েছে তা পরিশোধ করা। বিয়ের পরবর্তী রাতে বরের পিত্রালয়ে বর-কনে বরযাত্রীসহ উপস্থিত হন। বর-কনেকে বিভিন্ন নৃত্যের মাধ্যমে বরণ করা হয়ে থাকে। এরপর ঘরে ঢোকার পালা। ঘরে ঢোকার সময় বরের ছোট ভাই ঘরের দরজা বন্ধ রাখে। সে বলে যে, তাকে বিয়ে না দিলে সে ঘরের দরজা খুলবে না। অতঃপর বর অতি শীঘ্র তাকে বিয়ে দিবে প্রতিশ্রুতি দিলে ঘরের দরজা খুলে দেওয়া হয়। অতীতে রাজবংশী সম্প্রদায়ে আর এক ধরনের বিয়ের প্রচলন ছিল, তাকে ঘর সোঁধানী বা "ঘরে ঢোকা বিয়ে" বলে। সাধারণত আত্মীয় স্বজনের অমতে এ ধরনের বিয়ে বিধবা বা বিপত্নীকরা করতো। বিধবা মহিলাটি 'মরদ'কে বিয়ে করার আগে মরদের শোবার ঘরে ঢুকে গৃহস্থালীর কাজ আরম্ভ করে দিত। এভাবে দু'তিন-দিন থাকার পর স্বামী-স্ত্রী রূপে সমাজে স্বীকৃতি লাভ করতো। তবে এ ধরনের বিয়ে সমাজে সুনজরে দেখা হতো না। আরেক ধরনের বিয়ে রাজবংশী সমাজে প্রচলিত আছে। তাকে 'ধরা বিয়ে' বলে। এক্ষেত্রে কন্যাপক্ষ পাত্রকে ধরে এনে কনে দেখায়, কনে পছন্দ হলে এবং বরের আর্থিক অসঙ্গতি থাকলে কন্যাপক্ষ অনাড়ম্বরভাবে পুরোহিত ডেকে বিয়ে পড়িয়ে দেন। এ ধরনের বিয়েও রাজবংশী সমাজে এখন কমে গেছে।[২৫]

১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত শঙ্কর সেনগুপ্তের *বাঙালি জীবনে বিবাহ* গ্রন্থে রাজবংশীদের বিয়ের বিবরণ নিম্নরূপ—

> বিবাহের প্রাথমিক কার্য হিসেবে কোনো ঘটক বা ঘটকিনী কনেব পিতার কাছে গিয়ে জানতে চান-"তাঁর কন্যাকে অমুক বাড়িতে বিয়ে দিবেন কী না।" এই প্রস্তাব দেবার আড়াই কী তিন দিনের মধ্যে পাত্র বা পাত্রীর ঘরে যদি কোনো প্রকার অমঙ্গল বা অঘটন না ঘটে, তবে ঘটক বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আরো এগিয়ে যান। বিবাহ সম্বন্ধ উত্থাপন হবার আড়াই কী তিনদিন পর শুভদিন দেখে বরের অভিভাবকগণ পানসুপারী ও মিষ্টিদ্রব্য পাঠান কনের পিতৃগৃহে। যাঁরা এ তত্ত্ব নিয়ে যান তাঁরা যদি পথে মৃতদেহ, শ্মশান, নতুনকাটা নালা, জোঁক কিম্বা সাপ দেখেন তবে তা অমঙ্গলের লক্ষণ বিবেচনা করে ফিরে আসেন। তখন প্রস্তাবিত বিবাহ ভেঙে যায়। পক্ষান্তরে দুধ মাছ ও ফুল দেখলে লক্ষণ ভাল বলে মনে করা হয়। কন্যার বাড়িতে এসে বরপক্ষ দেনাপাওনা ঠিক করে ফেলেন। এ দিনে পানসুপারী আদানপ্রদান করা হয়। এই অনুষ্ঠানের নাম হচ্ছে দরগুয়া বা গুয়াকাটা।
>
> এই অনুষ্ঠানের পর কনের আত্মীয়-স্বজনেরা কনের পিতৃগৃহের আঙ্গিনায় সমবেত হন। কনের পিতা বিবাহ প্রস্তাবের কথা সমবেত সকলের কাছে জানান। সাধারণ সকলেই এ কাজ সমর্থন করেন। তখন অনেকে পাত্র সম্পর্কে, কনেপণ ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্যাদি জানতে চান। যদি কেউ এ বিবাহে রাজী না থাকেন তবে তাঁকেও রাজী করাবার চেষ্টা করা হয়, এবং শেষ অবধি তিনিও রাজী হয়ে যান। সকলের সমর্থন পাবার পর হয় অন্যান্য সব অনুষ্ঠান। যেমন একটি কাঁসার থালায় আধসেরের মত চাল রেখে তার উপর পাঁচটি প্রদীপ জ্বালান হয়। বরের পিতা সেই থালায় কনেপণের টাকা ও অলঙ্কারাদি রাখেন। এই অনুষ্ঠানের নাম 'নিরকিমি ছাড়া'। এটা হচ্ছে পাকা দেখা বা বাগদান করা। এ অনুষ্ঠানের পর কন্যাকে অন্যত্র বিয়ে দেওয়া যায় না।

গুয়াকাটার তিন দিনের মধ্যে যদি পাত্রীর বাড়িতে কোনো অশুভ ঘটনা ঘটে, তবে ও বিয়ে হবে না। কারুর মৃত্যু হলে, অগ্নিকাণ্ড ঘটলে অথবা ঘরের চাল বা দেওয়ালের খাম ভেঙে পড়লে তা অশুভ। অন্যদিকে কোনো শুভ ঘটনা ঘটলে সে বিবাহ শুভ হবে বলে ধরা হয়। তখন পাত্রের বাড়ি থেকে পাত্রীর বাড়িতে মাছ, ফুল, নতুন কাপড়, শাঁখা প্রভৃতি তত্ত্ব পাঠানো হয় বিয়ের আগের দিন। এদিন বর ও কনের অধিবাস। গ্রামদেবতার থানে পূজাও দেওয়া হয়। তেলহলুদ মেখে বর ও কনেকে স্নান করানো হয় বাড়ি বাড়ি থেকে 'জলবরণ' করে এনে তা দিয়ে।

পূর্বে বিয়ের জন্য সালঙ্কারা কন্যাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হত বরের ঘরে। পরদিন বর ও কনে একত্রে আসেন পাত্রীর পিত্রালয়ে। এদিন ভোজের আয়োজন থাকে। এ ভোজের নাম 'দানপারা।' 'দানপারা'র দম্পতি নিজগৃহে ফিরে আসেন। আসার সময় 'বৈরাতীরা' বরণডালা ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন। বর ও বধূর সঙ্গে কন্যাপক্ষীয় লোকজন আসেন বরের বাড়িতে। বিয়ের পর তাঁরা বরণডালা ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন বৈরাতীদের মতো।

বিবাহমণ্ডপকে বলা হয় "মাড়েয়া"। চারদিকে চারটি কলাগাছ, কলাগাছের নিচে জলপূর্ণঘট ও আম্রপল্লব থাকে। এর পশ্চিমদিকে বরযাত্রী ও অতিথি অভ্যাগতেরা বসেন। পূর্বাস্য হয়ে বর দাঁড়ান। কন্যা সাতবার তাঁকে পাক খান বা প্রদক্ষিণ করেন। পাত্রীর সখিগণ তাঁকে ধরে থাকেন ও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘোরেন। কেউ মাথার উপর ছাতাও ধরেন। সাতপাকের পর হয় "খোতিয়াবী" বা "ফুলমারামারি" অনুষ্ঠান। তারপর উভয়কে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে একখণ্ড কাপড় দিয়ে ঢেকে হয় শুভদৃষ্টি। সামনে থাকে জলপূর্ণ তামার কলসী। পরে বর ও কনের ডান ও বামহাত যথাক্রমে ঐ কলসীর উপর স্থাপন করা হয়। তখন বরের পিতা সেই কলসীর জলে আম্রপল্লব ডুবিয়ে বর ও কনের মাথায় ও গায়ে ছিটিয়ে দেন। পিতার অভাবে পিতৃস্থানীয় কেউ একাজ করেন। এই ব্যক্তি সমাজাচার অনুযায়ী "পানিছিটাবাপ" বা "ফুলবান্দাবাপ" বলে পরিচিত হন। এখন এ বিয়ে হয় কনের বাড়ি।

এই অনুষ্ঠানের পর মিতবর বা মিত্তর পূর্বদিক থেকে "মাড়োয়া"র মধ্যস্থিত কলাগাছের সামনে এসে দাঁড়ায়। সে দুহাতে কলাগাছের গোড়ায় স্থাপিত সপল্লব ঘটটি তুলে ধরে। তখন বর জিজ্ঞেস করেন–"এ ঘটে তুমি কী নিয়ে এলে?" সে উত্তর দেয়– "তোমার বিয়ের জন্য গঙ্গাজল।"

তারপর কনের পিতা গলায় গামছা, হাতে সুতা ও হরতকী নিয়ে কন্যা সম্প্রদান করেন। পুরোহিত বরের ডানহাতে এবং কনের বামহাতের চতুর্থ আঙ্গুলে কাঁসা বেঁধে দেন। বরের পিতা বা জ্যেষ্ঠভ্রাতা বা অনুরূপ কেউ সে বন্ধন ছিঁড়ে ফেলেন। এই অনুষ্ঠানের পর কনে বরের পরিবারের একজন হয়ে গেলেন। আগে পুরোহিত গ্রন্থি বাঁধেন। গ্রন্থিবন্ধনাবস্থায় উভয়ে তুলসীতলায় যান–ঈশ্বরের আশীর্বাদ কামনায়। বরের ঘরে বিয়ে হলে পরদিন পাথপিরানে কন্যা পাল্কীতে এবং বর টাট্টু ঘোড়ায় চেপে কনের পিত্রালয়ে আসেন। এখানে বরের বাড়ির সমস্ত অনুষ্ঠান পুনরানুষ্ঠিত হয়। পরেরদিন বর ও কনে চলে আসেন নিজেদের ঘরে। এর আটদিন পরে হয় "আঠোয়া" বা "আটাবিভাঙ্গা।"– এই সময় বর ও কনে একটি পিঁড়ির ওপর দাঁড়ান– বৈরাতীগণ তাঁদের স্নান করান। স্নানান্তে বিয়ের পোষাক পরিত্যাগ করে নতুন কাপড় পরেন। এ বিয়েতে পুরোহিত অথবা অধিকারীর দরকার হয়।

রাজবংশীদের বিয়ের সাথে বর্ণ হিন্দুদের বিয়ের মিল আছে। তাছাড়া রাজবংশীদের বিয়ের সাথে ওরাওঁ, সাঁওতাল ও ভিলদের বিয়ের পদ্ধতিগত মিল পরিলক্ষিত হয়।[২৬] রাজবংশী সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলন ছিল ও আছে। তাছাড়া স্বামী–স্ত্রীর মনোমালিন্য হলে ছাড়াছাড়িও হয়ে থাকে। প্রায়ক্ষেত্রে বর বধুকে বর্জন করেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বধূও বরকে বর্জন করেন। বধুকর্তৃক স্বামী বিচ্ছেদকে বলা হয় *ভাতারছাড়ি*। ভাতারছাড়ি মহিলার বিয়ে হয় বিধবা বিয়ের ঢঙে অনাড়ম্বরভাবে। স্ত্রীপরিত্যক্তা পুরুষেরও বিয়ে হয় একই ঢঙে।[২৭]

উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের মধ্যে 'ঘর জিয়া বিহা' অর্থাৎ 'ঘর জামাই' বিয়ে[২৮] আগে প্রচলন ছিল। কোনো যুবক ছেলে কোনো কন্যাকে পছন্দ করলে এবং কন্যার মাতাপিতা কর্তৃক ছেলে পছন্দ হলে বিয়ের আগেই কন্যার সাথে থেকে কাজকর্ম দেখাশুনা করতেন, এবং

কিছুদিন পর ঐ মেয়ের সাথে বিয়ের পর সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করতেন।[২৯] আর পানি ছিটা বিয়েতে যুবকের কনে পণ দেওয়ার ক্ষমতা থাকে না। বর্তমান কনেপণ প্রথা অবশ্য নেই। বর্তমান যেসব যুবক বিয়েতে খুব বেশি অর্থ খরচ করতে পারে না তারা গুরুজনদের মতানুসারে কোনো নির্দিষ্ট পাত্রীর ও কোনো গুরুজনকে তার মাথায় জল ছিটিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করেন। সাধারণত পাত্রীর মা অথবা গুরুজন স্থানীয় কোনো মহিলা পানি ছিটিয়ে দিতে দিতে বলেন, "মোর ছাওয়ার লাজ শরম সব তোক্ সঁপে দিনু।"[৩০] এই কথা বলে বিয়ে সম্পন্ন হয়।

রাজবংশী সমাজে বিয়েতে মঙ্গলঘট একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মঙ্গলঘটে ব্যবহৃত উপাদানগুলো এক একটি শুভ ধারণার প্রতীক। যেমন–কলাগাছ ও আম্রপল্লব দীর্ঘ জীবনের প্রতীক, জল জীবনের প্রতীক, ডাব বা নারিকেল প্রজনন শক্তির প্রতীক। এসব প্রতীকী উপাদানগুলো অতীত ঐতিহ্যবাহী। বিয়েতে একটা নতুন বরণ কুলা ব্যবহৃত হয়। বরণ কুলায় এক মুঠো ধান, সরিষার তেল মিশ্রিত কাঁচা হলুদ বাটা, দূর্বা ঘাস, সিঁদুর, মুখে আম্রপল্লব দেওয়া একটি জলপূর্ণ মাটির ঘট, সরিষার তেলে প্রজ্জলিত মাটির বা কাঁসার প্রদীপ, এক ছড়া ঠটি কলা, একখানা আল্পনা চিত্রিত নতুন কুলায় রক্ষিত হলে সেটি বরণ কুলা হয়। বিয়ের সময় এবং বর–কনেকে আশীর্বাদ করে বরণ করে নেওয়ার সময় বরণকুলায় রক্ষিত উপাদানগুলো ব্যবহৃত হয়। এইসব উপাদানের প্রত্যেকটির শুভ তাৎপর্য বিদ্যমান। ধান হলো জীবন ধারণ ও ধনসম্পদ বৃদ্ধির প্রতীক ; দূর্বাঘাস বংশধারা বৃদ্ধি ও বিপদে ও আকুল পাথারে যেন দূর্বাঘাসের মতো কুলের স্পর্শ পেয়ে বরবধূ বেঁচে থাকতে পারে তার প্রতীক। একছড়ি কলা হলো সন্তান ও নিরোগ জীবনের প্রতীক ; হলুদ সৌন্দর্যের প্রতীক। প্রাচীনকালে মানুষ হলুদ মেখে গাত্রচর্ম সুন্দর করার চেষ্টা করতেন। সেজ দীপ হচ্ছে অন্ধকার দূর করে আশার আলো সৃষ্টির প্রতীক ; জল ও আম্রপল্লব দীর্ঘজীবনের প্রতীক হিসাবে বিবেচিত হয়। মঙ্গলঘট ও বরণকুলার ব্যবহার্য উপাদানগুলো অনার্য আদিবাসী–উপজাতিদের যাদুবিশ্বাসের প্রতীক, যা বাংলাদেশের বিভিন্ন সমাজ উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে।[৩১]

রাজবংশী বিয়ে চৈত্র, ভাদ্র, কার্তিক, পৌষ মাসে হয় না। বড় সন্তানের বিয়ে জ্যৈষ্ঠ মাসে হয় না। বৈশাখ, ফাল্গুন, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, অগ্রহায়ণ ও মাঘে বিয়ে অনুষ্ঠিত হলে শুভ ও মঙ্গলজনক বিবেচনা করা হয়।

রাজবংশীদের বিয়ের উদ্দেশ্যে বরের বংশ ও ঘরবাড়ি দেখা, বর কনে দেখা, গায়ে হলুদ, অধিবাস, ক্ষৌরকর্ম, গঙ্গাবরণ, ক্ষীর খাওয়া, বরাণুগমনের পূর্বে কালীমায়ের থানে প্রণাম ও মানত প্রভৃতি আচার–প্রথা চালু আছে। বর কনের পিত্রালয়ে পৌঁছালে গেট ধরা, বরকে অভ্যর্থনা করে এগিয়ে নেওয়া, বর–কনের শুভদৃষ্টি, পিতা বা পিতৃস্থানীয় কোনো ব্যক্তির কন্যাসম্প্রদান, নাপিত কর্তৃক শ্লোক পাঠ, বাসর জাগা প্রভৃতি নিয়ম চালু আছে। বাসী বিয়ের সময় কৃত্রিম পুকুর তৈরি করে কড়ি খেলা, কনেকে বর বামবাহুতে ধরে কৃত্রিম পুকুর পার করানো, পাঁচ পুকুর থেকে তুলে আনা জলে বর বধূকে স্নান করানোর রেওয়াজ চালু আছে। বর বধুকে ধরে কৃত্রিম নদী পার হওয়াটা অনেক নৃতাত্ত্বিক অতীতের ছিনতাইকৃত বিয়ের সাথে তুলনা করেন। অতীতকালে অন্য গোষ্ঠী থেকে জোরপূর্বক কোনো মেয়েকে অপরহণ

করে নিজ গৃহে আনলেই স্বামীত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতো। সেইসব বিষয়ের বিবর্তিত রূপ হিসেবে কন্যা ছিনতাইয়ের অভিনয় সমাজে পরিদৃশ্যমান।[৩২]

বরাগমনে বাধাদান, বিয়েতে বিরোধ সৃষ্টির প্রয়াস, পথ ভাড়ান, গ্রন্থিবন্ধন, কন্যার পিতৃগৃহ ত্যাগের অনিচ্ছায় উচ্চস্বরে কান্না, নোয়া-সিঁদুর, ছাদনা তলা, কোলবর/কোলদরা প্রভৃতি ছিনতাইকৃত বিয়ের বিবর্তিত রূপ বলে মোমেন চৌধুরী মত প্রকাশ করেছেন।[৩৩] বরের সঙ্গে যে কোলদরা দেখা যায় নৃতাত্ত্বিকদের মতে, কন্যা ছিনতাইয়ে তার যথেষ্ট ভূমিকা ছিল।[৩৪] ছিনতাইকারী নিজ কাপড়ে কন্যাকে বেঁধে স্বগৃহে নিয়ে আসার রীতি অতীতের সাক্ষ্য বহন করে।[৩৫] বধুর হাতে খাড়ু ও বরের হাতে দর্পণ অস্ত্রের প্রতীক,[৩৬] যা দ্বারা কন্যা ছিনতাই করে আনতো। রাজবংশী ও সাঁওতাল সমাজে কন্যাপণ দিয়ে বিয়ের রীতি প্রতীকী হিসাবে এখনো চালু আছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আসাম ও কুচবিহার এলাকায় কন্যাপণ চালু ছিল সে সম্পর্কে প্রচুর তথ্যাদি আসাম জেলা গেজেটিয়ারে পাওয়া গেছে।[৩৭] কন্যার পিতা এই রীতি প্রয়োগ করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতেন, পক্ষান্তরে পাত্রের পিতা ক্রমশ গরিব হয়ে যেতেন।[৩৮]

শিশু জন্মাচার : আগে ও পরে[৩৯]

ঋতুবতী নারীই কেবলমাত্র সন্তান ধারণ করতে পারেন। তাই মেয়েরা প্রথম ঋতুবতী হলে সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান পালন করেন। ঋতুবতী নারীকে সর্বদাই অপবিত্র বলে গণ্য করা হয়। তাকে ঐ সময় কোনো মাঙ্গলিক কাজকর্মে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয় না। তার স্পর্শে সবকিছু এমনকি বাসগৃহ পর্যন্ত অপবিত্র বলে মনে করা হয়। ঋতু শেষ হলে ঠাকুর দ্বারা বিভিন্ন ধরনের আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয়। রাজবংশীদের মধ্যে স্বাধীনতাপূর্বকালে কমবয়সী মেয়েদের বিয়ে হতো। বিয়ের পর মেয়েটি ঋতুবতী হলে ঠাকুর ডেকে পুনরায় ঐ বরকনের মধ্যে দ্বিতীয় বিয়ে পড়ানোর রেওয়াজ ছিল। বর্তমানে ঋতুপূর্ব বিবাহ দেখা যায় না বলে দ্বিতীয় বিয়ের রেওয়াজ প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

সাধভক্ষণ[৪০]

রাজবংশী সমাজ বেশ কিছু বিশ্বাস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত হয়। জীবনঘনিষ্ঠ এই বিশ্বাস এখনো তাদের অনেকের মধ্যে লক্ষ করা যায় । রাজবংশী রমণী বিবাহের পর প্রথম গর্ভবতী হয়ে সাত মাসে পদার্পণ করলে একটি সুদিন-ক্ষণ দেখে রমণীকে 'সাধ' খাওয়ানো হয়। সাধ খাওয়ানো অনুষ্ঠানে রমণীকে নতুন কাপড়-চোপড় পরিয়ে থাকেন। আত্মীয়-স্বজন, কাপড়-চোপড় উপহার দেন। ঐদিন রমণীকে উপবাস রেখে 'সাধ' অনুষ্ঠানের বিভিন্ন আচার পালনের পর রমণীর মুখে 'ক্ষীর' দেওয়া হয়। এই সাধ খাওয়ানো অনুষ্ঠানটি সাঁওতাল, ওরাওঁ, মুণ্ডা, মালো সমাজেও দেখা যায়। তাদের বিশ্বাস যে, গর্ভবতী অবস্থায় রমণীকে সাধ না-খাওয়ালে সন্তানের মুখ থেকে লালা ঝরে, সন্তান লোভী হয় ও তার অকল্যাণ হয়। সাধ খাওয়ানো অনুষ্ঠানে কন্যার পিতা-মাতা ও শ্বশুর-শাশুড়ি ও প্রতিবেশী মহিলারা ধান-দূর্বা, কপালে হলুদ ফোঁটা দিয়ে আর্শীবাদ করেন, মুখে মিষ্টান্ন ও ক্ষীর তুলে দেন। সাধ খাওয়ানো অনুষ্ঠানটি সাধারণত রমণীর পিত্রালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। তারপর সন্তান প্রসব ও বিভিন্ন

আচার-নিয়ম পালন পর্যন্ত প্রসূতিকে পিত্রালয়ে থাকতে হয়। তবে এখন স্বামীর বাড়িতেও এই অনুষ্ঠানটি হয়ে থাকে। পিত্রালয়ে এসময় মা-বাবার যত্ন-স্নেহ বেশি পেয়ে থাকেন। কারণ মাতার দৈহিক মানসিক প্রভাব বর্তায় তার গর্ভজাত সন্তানের দেহমনে।

কোনো বিবাহিত মহিলা অন্তঃসত্তা হলেই তার উপর পারিবারিক ও সামাজিকভাবে কিছু বিধি নিষেধ আরোপিত হয়। এই সময় রাজবংশীরা ভূত-প্রেতকে খুব ভয় পান। মহিলার গৃহের বাইরে যাওয়া ও চুল ছেড়ে বেড়ানো নিষিদ্ধ। তারা বিশ্বাস করেন এসব করলে ভূত-প্রেত মহিলার ও বাচ্চাটির ক্ষতি করবে। রাজবংশী সমাজে দাইমা বা অভিজ্ঞ বৃদ্ধারা সন্তান ডেলিভারী করান। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ছয়দিন পর্যন্ত আশৌচ পালন করেন। রাজবংশীদের ভাষায় এটাকে আচি বলে। এই ছয়দিন মা তার সন্তানকে নিয়ে পরিবারের অপেক্ষাকৃত অবহেলিত জায়গাতে থাকেন, জায়গাটি কাপড় বা বেড়া (fense) দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। এই সময় মা ও সন্তানকে সাধারণত ছোঁয়া নিষেধ। এসময় বাচ্চাকে গোদুগ্ধ বা বুকের দুধ খাওয়ানো হয়। পূর্বে রাজবংশী মায়েরা বাচ্চাকে বুকের শাল দুধ খাওয়াতো না, এখন খাওয়ায়। মাকে সরিষার তেল বা ঘিয়ে ভাজা দ্রব্যাদি খেতে দেওয়া হয়। ঐ সময় প্রসূতির কোনো মাছ-মাংস খাওয়া নিষেধ। বাচ্চাকে কাজল পরানো হয় ও সার্বক্ষণিকভাবে লৌহজ দ্রব্যাদি বাচ্চার স্পর্শে রাখা হয়। তা না-হলে বাচ্চাকে ডাইনী বা ভূত-প্রেত ক্ষতি করতে পারে বলে তাদের বিশ্বাস। অশৌচ অবস্থায় ষষ্ঠ রাতটি বাচ্চার জন্য একটি বিশেষ রাত। ঐ রাতে বাচ্চার কপালে তার সমস্ত জীবনের ভাগ্য লিপিবদ্ধ হয়। ঐ রাতে মাও তার বাচ্চার জন্য ভগবানের নিকট কল্যাণ কামনা করেন। সপ্তম দিনে নাপিত ডেকে নখ খুঁটে শৌচ হয়, স্নান করানো হয় ও যাবতীয় দ্রব্যাদি ধৌত করা হয়। তারপর একুশদিন পূর্ণ হলে বাচ্চার মাথামুণ্ডন করা হয় ও পূর্ণশৌচ হয়। এই একুশদিন পর্যন্ত মায়ের রান্না করা বা রান্নাঘর স্পর্শ করা নিষিদ্ধ। বর্তমান রাজবংশীদের শিক্ষিত ও আর্থিক সচ্ছল পরিবারের লোকেরা মহিলার সন্তান ধারণের পর থেকে সন্তান প্রসব পর্যন্ত অভিজ্ঞ ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়ে থাকেন। এসব নিয়ম ও রেওয়াজেও কিছুটা পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে।

রাজবংশী সমাজে বিবাহিত মেয়েদের সন্তান ধারণে দেরি হলে নানাবিধ টোটকা চিকিৎসার আশ্রয় নিতে দেখা যায়। তারা গ্রাম মাঙ্গলিক থানে মানত করেন, থানের ধুলো শরীরে ও পেটে মালিশ করেন। এবং সাধুসন্ত ও কবিরাজের চিকিৎসা, জলপড়া, গাঁ ঝাড়া, ফুলঝাড়া ইত্যাদির আশ্রয় নিয়ে থাকেন। কোনো কোনো দম্পতির দীর্ঘদিন সন্তান না হলে কার্তিকের মূর্তি তৈরি করে ঠাকুর দ্বারা কার্তিক পূজা করেন। কার্তিক পূজার সময় সন্তান কামনায় রমনীগণ খুব কান্নাকাটি করেন, বৈশাখের প্রথম দিনে শিবপূজা (শিবলিঙ্গে পূজা) দেন ও সন্তান কামনায় করুণ আর্তি জানান। এছাড়া ভোগরাজ ও মহানমযজ্ঞের সময়ও সন্তান পিয়াসী পিতামাতা সন্তান কামনায় ঠাকুরের নিকট খুব কান্নাকাটি করেন।

সন্তান প্রসবে বিলম্ব হলে বা বেদনা হলে গ্রাম্য ওঝার জলপড়া, বৃক্ষের শিকড় বেঁধে দেওয়া, স্বামীর ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি ধৌত পানি খাওয়ার রেওয়াজ আছে। সন্তান প্রসবের পর বাঁশের চোঁচ (তেইল) দিয়ে নাড়ী কাটা হয়। ফুল হওয়ার পর পার্শ্ববর্তী বাগানে সেটা পুঁতে রাখা হয়। তারা নবজাতকের মুখে মধু দেন, এবং নবজাতক শিশুকে পরিচ্ছন্ন করানো হয়। তারপর সন্তানের শুদ্ধতা, দীর্ঘজীবন ও মঙ্গল কামনায় নাপিতের ব্যবহার, আঁচি পালন, মায়ের থানে মুখে ভাত ইত্যাদি অনুষ্ঠান পালন করার রীতি আছে।

মৃত্যু-আচার[৪১]

রাজবংশী পরিবারের কেউ যদি মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়েন, কিংবা দীর্ঘদিন যাবৎ রোগে ভোগেন তাহলে তার জন্য কবিরাজ ডেকে তার কানে 'কালার ঘরের নাম' প্রবেশ করান। 'কালার ঘরের নাম' দিলে মৃত্যু পথযাত্রী ব্যক্তিটির যন্ত্রণা লাঘব হয় বলে তাদের বিশ্বাস। তাছাড়া মৃত্যুর আগে 'ঘাটের কড়ি পরিশোধ' কল্পে গ্রাম মাঙ্গলিক থানে ষোলআনা পয়সা উৎসর্গ করেন। তাদের মধ্যে এরকম বিশ্বাস আছে যে, যমদূতকে পারানির কড়ি না দিলে মৃতুযাত্রীকে পরকালের পথে নিতে চান না। সেজন্য তারা পারানির কড়ি পরিশোধ করেন। যখন মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময় আসে তখন সাধু বা গোঁসাই প্রকৃতির ব্যক্তিকে ডেকে এনে মৃত্যু পথযাত্রীর কানে 'হরে কৃষ্ণনাম' প্রবেশ করানো হয়। কোনো মৃত ব্যক্তি যদি কৃষ্ণনাম না শুনে মৃত্যুবরণ করেন তাহলে মৃতব্যক্তির আত্মা নরকভোগ করে ও কষ্ট পায় বলে বিশ্বাস প্রচলন আছে।

রাজবংশী সমাজে কোনো লোক মারা গেলে পরিবার প্রধান সমস্ত গ্রামের রাজবংশীদের জানান। তারা এসে শবাধার তৈরি করেন ও আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ সেরে শ্মশানে নিয়ে যান। এসময় মৃতের পরিবার থেকে শব নামিয়ে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে শবদাহ করে অথবা কবর দেন। কবর দেয়াকে তারা মাটি দেওয়া বলে। 'মাটি দেওয়ার' সময় রাজবংশী শবযাত্রীরা প্রত্যেকে বাম হাত দিয়ে তিন মুঠো মাটি কবরের উপর দিয়ে দেন।

মৃত্যুর দশদিন পর, যেসব লোক শবদাহ অনুষ্ঠানে যোগ দেন তাদের জন্য চিড়া, মুড়ি, চিনি, দই ইত্যাদি খাদ্য পরিবেশনের মাধ্যমে একটি অনুষ্ঠান পালন করা হয়। রাজবংশী ভাষায় তাকে 'দশা' বলে। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে মৃত ব্যক্তির সকল পুত্র মস্তকমুণ্ডন করে সাদা ধুতি পরিধান করেন, শ্রাদ্ধের মন্ত্র উচ্চারণ করেন, শ্রাদ্ধ সেরে থাকেন। মন্ত্রোচ্চারণে ঠাকুর সাহায্য করে থাকেন। শ্রাদ্ধে আতপ চাল, সিদ্ধ চাল, কলা, ফুল, কলাপাতা, কলার খোলা, গামছা, কাপড় ও অন্যান্য শ্রাদ্ধেয় দ্রব্যাদি প্রয়োজন হয়। ব্রাহ্মণ ঠাকুর এসময় গৃহস্থকে গো-দান, জমিদান, অর্থদান, খাটদান ইত্যাদির দাবি করেন। এবং সাধ্যমতো রাজবংশী পরিবার শ্রাদ্ধেয় আত্মার সঙ্গতির জন্য ঠাকুরকে উৎসর্গ করেন।

রাজবংশীদের শব দাহও করা হয়। শবদাহ করার আগে শবকে সাত কলস নদীর জলে স্নান করানো হয়। শবদেহে তেল হলুদ মাখানো হয়, তারপর সাজানো চিতায় আগুন দেওয়া হয়। যিনি মারা যান তার পুত্র-সন্তান তাকে চিতায় তোলার পূর্বে মুখাগ্নি করে থাকেন। সম্পূর্ণরূপে পুড়ে ছায় হয়ে গেলে রাজবংশীরা শশ্মানের পিছন দিকে না তাকিয়ে গ্রামের দিকে অগ্রসর হন। গ্রামে এসে প্রত্যেকে নাপিত দ্বারা ক্ষৌরকার্য করে, স্নান সেরে, হাত-পায়ে আগুনের স্পর্শ দিয়ে গৃহে প্রবেশ করেন। শবদাহের ক্ষেত্রে চাকমা, ত্রিপুরা, হাজংদের সাথে রাজবংশী সমাজের মিল পাওয়া যায়। কলেরা, বসন্তে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলে কিংবা অপমৃত্যু ঘটলো রাজবংশীরা শবদাহ না-করে কবর দেন। কবরে উত্তর দক্ষিণ লম্বালম্বি উপুড় করে শায়িত করে তার উপর মাটি দিয়ে ঢেকে দেন। ছোট বাচ্চা, যাদের দুধের দাঁত পড়ে নতুন দাঁত গজায় না, তাদের জলে ভাসিয়ে দেওয়ার রীতি আছে। এটি চাকমাদের সাথে মিল আছে। কোনো রাজবংশী সদস্য মারা যাওয়ার দিন থেকে ১২ দিন পরে হয় শ্রাদ্ধানুষ্ঠান। রাজবংশীরা পূর্বে একমাসে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করত। পঞ্চাশ বছর পূর্বে থেকে ক্ষত্রিয়ত্ব দাবি করার

ফলে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান বারো দিন পর করার রেওয়াজ চালু হয়েছে। এখনো মানিকগঞ্জ ও টাঙ্গাইলের কালিয়াকৈর এলাকায় একমাস পর শ্রাদ্ধ করার রীতির প্রচলন আছে। মৃতের জ্ঞাতিগোষ্ঠীর সবাই এই একমাস তেল ও মাছ–মাংস স্পর্শ করেন না। কিন্তু বর্তমান এই নিয়ম শিথিল করা হয়েছে। শ্রাদ্ধের পর জ্ঞাতিভোজ অনুষ্ঠান হয়। জ্ঞাতিভোজ অনুষ্ঠানে প্রথমে মৃতের উদ্দেশ্যে রান্নাকৃত সমস্ত খাবার নিবেদন করে গৃহের বাইরে অকর্ষিত ভূমিতে খাবার রেখে আসা হয়, এবং একটি মশাল জ্বালিয়ে রাখা হয়। রাজবংশীরা বিশ্বাস করেন যে, মশাল নিভিয়ে অন্ধকারে আত্মা বিভিন্ন রূপ ধারণ করে (যেমন–কুকুর, বিড়াল, শিয়াল ইত্যাদি) হাজির হয়ে সমস্ত খাবার খেয়ে যায়। যদি ঐ খাবার কোনো জীবজন্তু না খায়, তাহলে তারা বিশ্বাস করে নেয় যে, শ্রাদ্ধেয় আত্মার সদ্‌গতি হয় নি। আত্মা কষ্ট পাচ্ছে। মহিলাদের কেউ কেউ মৃত আত্মা হাজির হয়ে ঐ রেখে আসা খাবার খাওয়ার দৃশ্য দেখেছে বলেও প্রচার করে থাকেন।

তথ্যসূত্র

১. Maria Leach (ed.), *Standard Dictionary of Folklore Mythology and Legends* (Newyork : Funk and Wangalls 1949), p.62.
২ Edward Burnett Tylor, *Primitive Culture,* Vol. 1 (London : John Murray, 1891), p. 426
৩. Willium Crooke, *The Popular Religion and Folklore of Northern India (Westminister* : Archibald. Constable 1896), p.156.
৪. মোমেন চৌধুরী, *বাংলাদেশের লৌকিক আচার–অনুষ্ঠান : জন্ম ও বিবাহ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮), পৃ. ৩
৫. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *লোকায়ত দর্শন* (কলিকাতা : নিউ এজ পাবলিশার্স, ১৯৬৩), পৃ. ২৮২–২৮৩
৬. রণজিৎ দেব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮
৭. ঐ. পৃ. ৬৮
৮. ঐ, পৃ. ৬৮
৯. ঐ, পৃ. ৬৮
১০. ঐ, পৃ. ৬৮
১১. ঐ. পৃ. ৬৮
১২ এবনে গোলাম সামাদ, *নৃতত্ত্বের প্রথম পাঠ,*
১৩. মোহাম্মদ আব্দুল হাফিজ, 'যাদুবিদ্যার দিগদিগন্ত', *সাহিত্যিকী,* (১৩৭ বসন্ত সংখ্যা), পৃ. ১৫৪
১৪. ওয়াকিল আহমদ, *লোককলা প্রবন্ধাবলী,*
১৫. মোহাম্মদ আব্দুল হাফিজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪–১৫৫
১৬. ওয়াকিল আহমদ, *লোককলা প্রবন্ধাবলী,* প্রাগুক্ত, পৃ.–১৭৯
১৭. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলার লোকসংস্কৃতি*
১৮. এই আচারটি গবেষকের ব্যক্তিগত সংগ্রহ। ঝিনাইদহে কালীগঞ্জ থানার একটি রাজবংশী গ্রাম থেকে সংগৃহীত।
১৯. এই আচারটি গবেষকের সংগ্রহ। কালীগঞ্জ থানার রাজবংশী গ্রাম থেকে সংগৃহীত। 'গরুর পিঠা খাওয়ানো' আচার দেখুন ওয়াকিল আহমদ, *বাংলার লোকসংস্কৃতি,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬১
২০. আবদুস সাত্তার, *আরণ্য জনপদে,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৫
২১. জসিম উদ্দীন, *জীবনকথা,* ১ম খণ্ড (ঢাকা : পলাশ প্রকাশনী, ১৯৬৪), পৃ. ১৬
২২ *লোকসাহিত্য,* সপ্তম খণ্ড, বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত, (ভূমিকা), ১৩৭৬, পৃ. ১৫

২৩. শঙ্কর সেনগুপ্ত, *বাঙালি জীবনে বিবাহ* (কলিকাতা : ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশনস, ১৯৭৪), পৃ. ৪৫৩
২৪. শঙ্কর সেনগুপ্ত, ঐ, পৃ. ৪৫২–৪৫৭
জেলা গেজেটিয়ার রংপুর, ১৯৭৭–এর ৬৬–৬৭ পৃষ্ঠায় রাজবংশী বিয়ের ব্যাপারে বলা হয়েছে : The system of 'companionate marriage' of the Rajbansi caste is known as *gagoch*. By this practice a young man is received into a family and cohabits with a girl of the household with the view of being accepted as a husband if the arrangement is suitable, and in the meantime he works for his prospective father-in-law. The marrige of widows is customary and attachments not amounting to formal marriage are also entered into by widows or divorced women. These are mainly of two kinds. In the *ghar Dhoka* types the woman betakes herself to the man to whom she has taken a fancy and is accepted by him. In the *dangua or pushua* relationship a widow, particularty if she has property, will secure to herself a protection. Many social and religious customs were common to Rajbansi and ordinary people among Muslims. For example, the Rajbansi *dargooah* marriage ceremony is the same as he Muslim *gooah-pan kata;* the bridal platform, *marwa*, decorated with plantain trees, is used by both communities.
২৫ Abdus Sattar, *In the Sylvan Shadows* (Dhaka: Sakib Brothers, 1971), pp.103-111.
২৬. ঐ
২৭. শঙ্কর সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ, ৪৫৭
২৮. রতন বিশ্বাস (সম্পা.). প্রাগুক্ত পৃ. ৬৭
২৯. ঐ, পৃ. ৬৭, এবং শঙ্কর সেনগুপ্ত, *বাঙালি জীবনে বিবাহ,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৬
৩০. রণজিৎ বিশ্বাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭
৩১. আবদুল হক চৌধুরী, *চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮), পৃ. ২৩১
৩২ R.H. Hutchinson, *Eastern Bengal and Assam District Gazetters : Chittagong Hill Tracts* (Allahbad, India : 1909), p. 32.
৩৩. মোমেন চৌধুরী, *বাংলাদেশের লৌকিক আচার অনুষ্ঠান : জন্ম ও বিবাহ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮), পৃ. ১৪৭
৩৪. Earnest Crawley, *The Mystic Rose* (London : McMillan & Co., 1902), p.339.
৩৫. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, '*কালকেতু উপাখ্যান*', মুহম্মদ আব্দুল হাই ও আনোয়ার পাশা (সম্পা), (ঢাকা : স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৬৭), পৃ. ১৮০–৮১
৩৬. বঙ্কিমচন্দ্র মাহাত, *ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য* (মেদিনীপুর : উষা মাহাত, ১৯৭৮), পৃ. ১৯২
৩৭. B.C. Allen, *Assam District Gazetteers*, Sylhet vol. II. (Calcutta : 1905), p. 97
৩৮. B.C Allen, *Assam District Gazetteers,* Vol.VI, (Kamrup, 1905), p.107.
৩৯. সাধন কুমার বিশ্বাস, গ্রাম–বাদুরগাছা, বারোবাজার, কালিগঞ্জ, শিক্ষা–এইচ.এস.সি, বয়স–৩৬ এর কাছ থেকে সংগ্রহ।
৪০. ঐ
৪১. ঐ

অধ্যায় ৭

ধর্ম ও পূজাপার্বণ

ধর্ম মানবজীবনে অপরিহার্য ও অপরিত্যাজ্য বিষয়। ধর্মীয় আচার-সংস্কার-বিশ্বাস অনুযায়ী প্রতিটি জাতির যাবতীয় আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি গড়ে ওঠে। ধর্মবোধ ও বিশ্বাসের বিভিন্নতার জন্য একই ভূখণ্ডে পাশাপাশি বসবাসকারী একই জাতির জীবনাচরণে পার্থক্য দেখা যায়। রাজবংশী সম্প্রদায় সুদীর্ঘকাল বিভিন্ন জনজাতির সাথে পাশাপাশি বসবাস এবং বর্ণ হিন্দুদের ধর্ম সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও পুরোপুরিভাবে বর্ণ হিন্দুর ধর্ম গ্রহণ করেন নি, আবার তাদের অতীতকালের ধর্মীয় বিশ্বাস যেমন-পূজা উপলক্ষে গ্রাম মাঙ্গলিক থানে পশুবলী, নদ-নদীকে দেবতা জ্ঞানে পূজা-অর্চনা, বড় বৃক্ষকে দেবতাজ্ঞানে তেল-সিঁদুর মাখিয়ে প্রণাম ও প্রার্থনা জানানো প্রভৃতি ত্যাগ করে নি। রাজবংশী জীবনের মঙ্গলবোধ, শ্রেয়োবোধ অতীত ধর্ম বিশ্বাসেই তাদের মধ্যে জাগ্রত।[১]

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে বিশ্ব সিংহ ও তাঁর পুত্র নরনারায়ণের সময়ে রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু ধর্মবিশ্বাস ছড়িয়ে পড়ে, বলা যেতে পারে রাজবংশীদের অনেকেই ঐ সময়কালে হিন্দু ধর্মাবলম্বী হয়ে পড়েন। কিন্তু উপজাতীয় নামধাম, চাষবাস ব্যবস্থা, আচার-বিশ্বাস-সংস্কার, রীতি-নীতি ইত্যাদি ত্যাগ করেন নি। ষোড়শ শতাব্দীর পর একটু একটু করে তাদের উপজাতীয় নাম-ধাম ত্যাগ করে হিন্দু ভাবাপন্ন হয়ে পড়েছে। ঐ সময় থেকেই রাজবংশীরা হিন্দু ও মুসলমান দুটি দিকে বিভক্ত হয়ে উভয় সম্প্রদায়ের আনুগত্য পোষণ করেছেন,[২] হিন্দু-মুসলমান বাঙালি সমাজের সাথে মিশে যেতে সচেষ্ট হয়েছেন। কিন্তু ইসলাম ধর্ম গ্রহণকৃত ভাগটি মুসলমান সমাজে প্রায় মিশে যেতে পারলেও হিন্দু ধর্মাবলম্বী রাজবংশী জনগোষ্ঠী আজো আচার-বিশ্বাসে-সংস্কারে, সংস্কৃতিতে, অতীত ধর্ম বিশ্বাসে কিছুটা প্রাচীনপন্থী হওয়ায় উপজাতি হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছেন।

রাজবংশীদের আরাধ্য দেবতা মহাদেব, কালী ও মনসাদেবী। সামাজিক মঙ্গলসাধন, ফসল বৃদ্ধিকেন্দ্রিক বেশ কিছু লৌকিক পূজা উত্তরবঙ্গের ও দেশের অন্যান্য এলাকার রাজবংশী সমাজ করে থাকেন। রাজবংশী সমাজে কৃষিকেন্দ্রিক যে-সমস্ত পূজা উৎসব প্রচলিত আছে সেগুলো হলো তিস্তাবুড়ি, গাবুনা, মালক্ষ্মী, বুড়া-বুড়ি, বৈশাখী, আষাঢ়ী, সেবা, আমাতি, ধানের ফুল আনা, যাত্রাপূজা, ভাণ্ডালী, শিয়াল ঠাকুর, ব্যাঙ বিয়া, নয়া খৈ, পুষুসা, গোরক্ষনাথ, গমীরা ঠাকুর, হুঁদুম দ্যেও প্রভৃতি।[৩] জীবজন্তুর হাত থেকে রক্ষার জন্য যেসব পূজা-আরাধনা রাজবংশী সমাজের বিভিন্ন এলাকায় প্রচলন আছে সেগুলো হলো মহাকালঠাকুর, ভাণ্ডালী, শালেশ্বরী, বিষহরি, শিয়ালঠাকুর প্রভৃতি। তাদের বিশ্বাস আছে যে, নবান্ন উৎসবের সময় শিয়ালঠাকুরের পূজা না দিলে শিয়ালঠাকুর মানুষকে সবংশে ধ্বংস করেন।[৪]

রাজবংশী সমাজে বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন ধরনের কালীপূজার প্রচলন দেখা যায়, যেমন—তারাকালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, বুড়িকালী, শ্যামাকালী, পাঁচকালী, পেটকাটি-কালী, ভদ্রাকালী, কাঁচাকালী প্রভৃতি।[৫] কালীপূজার অঞ্চলভেদে এত ভিন্ন ভিন্ন নাম কেন তার কারণ অনুসন্ধান সাপেক্ষ। শিশুর দীর্ঘজীবন ও রোগমুক্তি কামনা, সন্তান কামনা, গ্রাম অপদেবতার কুদৃষ্টি এড়ানো, গাভীর দুগ্ধ বৃদ্ধি উপলক্ষে বৃক্ষোপাসনা, গ্রাম মাঙ্গলিক থানে মানত, গাছে ভারা বন্ধন (টুকরো ইট গাছের শিকড়, খোড়ল প্রভৃতিতে বেঁধে দেওয়া), ঢিলদেবতার বন্ধন প্রভৃতির প্রচলন রাজবংশী সমাজে লক্ষ করা যায়। রাজবংশী সমাজে মদনকাম ঠাকুরের পূজা করা হয় বাঁশ পুঁতে, হুঁদুম দ্যেও-এর পূজা করা হয় কলাগাছ পুঁতে নির্জন মাঠের অন্ধকারে। তারা সত্যপীর, সত্যনারায়ণ ঠাকুরের পূজা, বেরা ভাসান, বনদেবতা, বনবিবি, শালেশ্বরী, মাশান, জকা প্রভৃতির পূজা করেন।

উত্তরবঙ্গে বিশেষ করে কুচবিহার ও দার্জিলিং এলাকায় রাজবংশী ভাষার মন্ত্রের সাহায্যে নিজস্ব পুরোহিত সন্ন্যাসী পূজার মন্দিরে সন্ন্যাসীকাটা পূজা করেন। সামাজিক মঙ্গল বিধানের জন্য পুরোহিত বা আধিকারী দুই শ্রেণীর ; চক্রাধারী ও পাত্রধারী। চক্রাধারীরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন, ও বংশানুক্রমিক পূজার অধিকারী হন। পাত্রধারীরা এক পুরুষ পূজার অধিকারী। রাজবংশী সমাজে ওঝা, দেওসী, ভৌরিয়াগণ রোগ নিরাময় করেন বলে তাদের শ্রদ্ধা-সম্মান করা হয়।[৬] বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে কোনো পুরোহিত শ্রেণী নেই।

রাজবংশী সমাজে প্রাচীনকাল থেকেই ব্রতকথার প্রচলন রয়েছে। আশা-আকাঙ্ক্ষানিষ্ঠ বিশেষ ধর্মাচারণের নাম ব্রত। এসব ব্রতের প্রত্যেকটির সাথে ভিন্ন ভিন্ন কাম্য ফলদাতা দেবতার সম্পর্ক থাকে। রমণীগণ মনোবৃত্তির তাড়নায়, সন্তান লাভ ও পারিবারিক সুখ-সমৃদ্ধি কামনায় ব্রত পালন করেন। অতীতে প্রকৃতির উপর মানুষের কোনো ধরনের নিয়ন্ত্রণ ছিল না, দৈবনির্ভরতা ছিল পুরোমাত্রায়। সেকারণে দৈবশক্তির কোপ থেকে রক্ষা পেতে ও কৃপা লাভের আশায় রমণীগণ লৌকিক দেব-দেবীর কাছে মানত করতেন ও আরাধনা করতেন। গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলে বর্তমান কিছু ব্রত লোপ পেয়ে থাকলেও এখনো রাজবংশী সমাজে সাইটোল পূজা, সুবচনী পূজা, ধরম ঠাকুর, ষাট পূজা, কাতি পূজা প্রভৃতি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন।

সুবচনী পূজা[৭] : সুবচনী পূজা করে থাকেন শুভ কামনায়। সাধারণত বিয়ের পরে বরকনের উদ্দেশ্যে পান-সুপারী, চিনি ইত্যাদি দ্বারা সুবচনী পূজা করা হয়। এই পূজা মহিলারা করেন। খুব ভোরে লোক চলাচলের পথের মাঝখানে গোবর-মাটি দিয়ে লেপে সেখানে মঙ্গলঘট বসানো হয়। মঙ্গলঘটে তেলকাজল দিয়ে দেবতা প্রতিষ্ঠিত করেন। অতঃপর মঙ্গলঘটে জলভরে দূর্বা-ধান ও আম্রপল্লব দেওয়া হয়। এখানে বর কনের উদ্দেশ্যে সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করা হয়। তাছাড়া হারানো জিনিস প্রাপ্তি ও অন্যান্য মঙ্গল কামনায়ও মহিলারা এই পূজা করে থাকেন।

সুবচনী কোনো পৌরাণিক দেবী নয়, তাদের বিশ্বাসের দেবী, শুভ কামনার ফলদাত্রী। সুবচনী মূর্তিকে পশ্চিমমূখী করে স্থাপন করা হয়। কখনো কখনো ঘটে তেল-হলুদ দ্বারা মূর্তি প্রতিস্থাপন করে ঘটস্থাপন করা হয়। মূর্তির সামনে একটি কচি কলাপাতা রাখা হয়, কলাপাতার মাঝখানে একটি কাটারী বা চাকু অর্ধেকটা পুঁতে দেওয়া হয়। একটি জলঘট লাল কাপড়ে মুড়ে, জলঘটে দুটো পানপাতা ও সুপারী রেখে ঘটের উপর আমের পল্লব দিয়ে

বসিয়ে দেওয়া হয়। পূজা সুর্যোদয়ের পূর্বে শুরু হয়ে সূর্য উঠার পরও কিছুক্ষণ চলে। শনি মঙ্গলবার এই পূজার উৎকৃষ্ট দিন হলেও অন্যান্য বারেও এটা করা হয়। পূজা শেষে পূজার ঘট গৃহিণী এলোচুলে মাথায় নিয়ে বাস্তু ঘরে নিয়ে রাখেন। গৃহিনীরা অন্যান্য সমাগত এয়োতীদের মাথায় পূজার তেল, কপালে পূজার সিঁদুর ও হাতে পূজার পান-সুপারী দিয়ে আর্শীবাদ কামনা করেন। এই ব্রতটি যশোর, ঝিনাইদহ, ফরিদপুরসহ উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। এই পূজার ব্রতকথাগুলো এয়োতীরা শ্রবণ করেন। পূজার প্রথমে সৃষ্টিতত্ত্ব, দ্বিতীয় ভাগে পূজা আদায়, তৃতীয়ভাগে সুবচণীর জন্মকথা, চতুর্থ ও শেষভাগে পূজা প্রচারের আচার পালিত হয়। এই ব্রত কথার কাহিনীটি হলো-এক ব্রাহ্মণীর পুত্র রাজার খোঁড়া হাঁস খেয়ে ফেলায় পুত্র বন্দী হয়। ব্রাহ্মণী তখন তার পুত্রকে ফিরে পাওয়ার আশায় সুবচণী দেবীর নিকট মানত করেন। সুবচণী হাঁস বাঁচিয়ে দেন, ও দেবীর নির্দেশে রাজা তাঁর কন্যাকে ঐ ব্রাহ্মণীর পুত্রের সাথে বিয়ে দেন। এই ব্রতে নারীর শুভকামনাগুলো ফলবতী হয়। ব্রতকথাগুলো কোথাও কোথাও গানের ঢঙে গাওয়া হয়ে থাকে। এই পূজায় মেয়েরাই অংশগ্রহণ করেন।

ধর্ম ঠাকুর বা ধরম্ ঠাকুর[৮] : উত্তরবঙ্গে রাজবংশীগণের মধ্যে ধর্মঠাকুর অত্যন্ত প্রাচীন দেবতা। ধর্মঠাকুর পূজা অনুষ্ঠিত হয় বৈশাখ মাসে। এ মাসে হয় বলে বৈশাখ মাসকে ধর্ম মাস বলা হয়। একাদশী, চতুর্দশী ও পূর্ণিমাতে এই পূজা হয়। শেষ পূজা হয় বৈশাখের সংক্রান্তিতে। কেউ কেউ ভাদ্র মাসে পূজা করে থাকেন। পূজার উপকরণ সব সাদা। সকালে তুলসীতলায় ধর্ম ঠাকুরের পূজা দেওয়া হয়। এই পূজার উপকরণ হলো-জলঘট, আম্রপল্লব, হাঁসের ডিম, মানত হিসাবে থাকে সাদা পায়রা বা সাদা হাঁস বা সাদা পাঁঠা। প্রথমে ঘট বসিয়ে, আম্রপল্লব দিয়ে ঘটে ধর্ম ঠাকুরের প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয়। মানত থাকলে কেউ কেউ মূর্তি বসিয়েও পূজা দেন। পূজা শেষে মানতের সাদা পায়রা বা হাঁস বা পাঁঠা ধর্ম ঠাকুরের নামে ছেড়ে দেওয়া হয়। ধর্মঠাকুরের নিকট সবাই পুত্র কন্যা, সংসারের মঙ্গল কামনা করে থাকেন। এই পূজায় ব্রতকথা হিসাবে সিংহরাজের রূপকথায় বন্ধ্যানারীর পুত্র কামনার কথা আছে। রাজবংশীরা মনে করেন যে, ধর্মঠাকুর থেকেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের সৃষ্টি। এই ঠাকুরের ঘাম থেকে আদ্যাশক্তি প্রকৃতি সৃষ্টি হয়েছে।

কার্তিক পূজা বা কাতি পূজা[৯] : রাজবংশী সমাজে কার্তিক পূজা প্রায় সর্বত্র প্রচলিত। এই পূজা *স্কন্দপুরাণে* উল্লিখিত কার্তিক পূজার ব্রতকথার কাহিনী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই লৌকিক পূজার উদ্দেশ্য হলো পুত্রসন্তান কামনা। ব্রতকথার কাহিনীতে *স্কন্দপুরাণে* শিবায়নে শিবের সাথে লাচনারীর প্রণয়ের কথা আছে। কিন্তু কাতি পূজার ব্রতকথায় শিবের সঙ্গে মেচ বা ভুটিয়া নারীর সাথে প্রণয়ের কথা বিদ্যমান। কাহিনীটির একটি সংলাপ হলো :

"খেলা ছেড়ে উঠি যায় শিব তখন মেচপাড়া নাগিয়া
মেচ পাড়ার মেচেনী, ভোট পাড়ার ভূটনী নিয়া যায় শিবোক্ টানিয়া।"[১০]

এই কার্তিক পূজায় সন্তান কামনা ও ব্রতকথা যশোর অঞ্চলেও দেখা যায়।

সাইটোল পূজা[১১] : সাইটোল পূজায় দেব-দেবীর আবাহন, ঘট সাজানো সিঁদুর, রূপ দান, স্বর্গ থেকে দেবগণের আগমনে ফুল ও সব্জী অর্পিত হয়। সাইটোলের জন্মলাভ ব্রত কথার মাধ্যমে বর্ণিত হয়। এই কাহিনীতে ভাওয়াইয়াগানের চিত্রে স্বামীর বাণিজ্যে যাওয়া

নিষেধ–এই উপদেশ পাওয়া যায়। সাইটোল পূজায় গৃহকর্ত্রী গীদালীদের (যারা গান করে) আমন্ত্রণ জানান। তারা গান–বাজনা ও নৃত্য করেন। সাইটোল পূজায় রাজবংশী রমণীগণ সন্তান কামনা করেন।

রাজবংশী সমাজে রমণীদের মুখে মুখে ব্রতকথার প্রচলন রয়েছে। এই ব্রতকথাগুলোর মধ্যমে যেমন সমাজের রমণীগণ সন্তান কামনা, ফসল বৃদ্ধি কামনা, সাংসারিক সুখ–সমৃদ্ধি কামনা করেন, তেমনি রাজবংশী সমাজের গতি প্রকৃতি, ক্রিয়াকলাপের একটি চিত্র পাওয়া যায়।

রাজবংশী কুমারী ও নবোঢ়া রমণীদের নিকট ভাদ্রমাসের অষ্টম চাঁদের জিতুয়া বা ভাদু উৎসবে পিঠা–পায়েশ তৈরি করে বাচ্চাদের খাওয়ানো ওরাওঁদের করম পূজার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।[১২] এসব ধর্ম বিশ্বাস, আচার, পূজা–অর্চনার, ব্রতককথার মূল উৎস যাদুবিদ্যা। রাজবংশীদের মধ্যে যাদুবিদ্যা তন্ত্রমন্ত্রের প্রভাব জীবনের নানা স্তরেই যেমন— সন্তান জন্মে, রোগব্যাধি চিকিৎসায়, শুভাশুভ কামনায় ও সুফল প্রাপ্তির আশায় সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়।

মনসা পূজা : স্বর্পদেবী মনসার পূজা করেন স্বর্পাঘাত থেকে রক্ষাকারীনী দেবতা হিসাবে, আবার সর্পকে প্রজনন দেবতার প্রতীক হিসাবেও অনেক পণ্ডিত বর্ণনা করেছেন।[১৩]

রাজবংশীরা মনসা বা সর্পদেবীর পূজাকে '*সাপঘট পূজা*'ও বলেন। সাধারণত ভাদ্র মাসের শেষ দিনে বাস্তুঘরের মেঝেতে দুটি 'সাপঘট' (বাজার থেকে কুমারদের তৈরিকৃত সাপমূর্তির ঘট ও অন্যান্য ঘট ক্রয় করা হয়) স্থাপন করা হয়। অন্য ঘট তিনটি বা পাঁচটি বসানো হয়। মূলঘটে অবশ্য সেজু গাছের পাতা ব্যবহৃত হয়। সেজু বৃক্ষে মনসা দেবী অধিষ্ঠিত এই বিশ্বাসে সেজু বৃক্ষের কচি পল্লব জলপূর্ণ ঘটে স্থাপন করা হয়। পূজায় ধান, দূর্বা, কলা, আতপচাল, চিনি, গোদুগ্ধ প্রভৃতি উপকরণ ব্যবহৃত হয়। ব্রাহ্মণ ঠাকুর এ পূজা মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে সম্পন্ন করেন। এ পূজা শেষে ব্রাহ্মণ ঠাকুরের পায়ে আবাল–বৃদ্ধবণিতা ষাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন। এই পূজায় ধন–সম্পদ বৃদ্ধির কথা আছে। তাছাড়া পূজার কাহিনীতে আছে, একজন গৃহিণী স্বপ্ন দেখেন যে, মা মনসা তার নিকট দৈববাণী করছে যদি আমার পূজা করিস তাহলে ধন–সম্পদে–সন্তানে তোর গৃহ ভরে দেব। আর যদি আমার পূজা না করিস তাহলে দংশনের মাধ্যমে সবংশে নির্বংশ করব। সেই থেকে রাজবংশীরা মা মনসার পূজা করে থাকেন।

লক্ষ্মী পূজা[১৪] **:** লক্ষ্মীর আঁড়ি পেতে, লক্ষ্মীর ঝাঁপিকে লাল কাপড়ে মুড়ে, বাস্তুঘরের মেঝেতে প্রদীপ জ্বালিয়ে ধান–দূর্বা দ্বারা এ পূজা করা হয়। লক্ষ্মী পূজা করা হয় ধন–ধান্যে পূর্ণতার আশায়। ব্রাহ্মণ ঠাকুর এই পূজা করেন গৃহস্থের মঙ্গল কামনায়।

রাজবংশীরা যেসব দেবদেবীর পূজা করে থাকেন তার উপর গবেষণা করেছিলেন ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে স্যার হার্বার্ট রিজলী। রংপুরের রাজবংশীদের উপর তিনি গবেষণা করে দেখেছিলেন যে, রাজবংশীরা বর্ণহিন্দুদের দেব–দেবীর পূজা অর্চনায় শ্রদ্ধা–সম্মান করেন ও অনেক দেব দেবীর পূজা তারাও নিষ্ঠার সাথে করেন। তাছাড়া তাদের নিজস্ব আরো কিছু দেবদেবীর পূজা করে থাকেন। সেগুলো হলো–কালী, বিশহরি, মনসা, গ্রাম্যপূজা, তিস্তাবুড়ি বা বাস্তুপূজা, বলিভদ্র ঠাকুর, কুড়াকুড়ী দেবদেবীর পূজা। আর পেত্নি, ডাকিনী–যোগীনি, হুঁদুম দ্যেও ইত্যাদির পূজাও তারা করেন।[১৫] বাস্তুপূজা তারা করে থাকেন গৃহকর্তার সুখ–সমৃদ্ধি ও রোগমুক্ত নতুন জীবন প্রাপ্তির জন্য। প্রতিবছর বৈশাখ (এপ্রিল–মে) মাসে দিনে দুবার করে

বাস্তুপূজার ঘটে ফুল-জল-তুলসিপাতা নিবেদন করা হয়। এটি গৃহকর্ত্রী করেন। তাছাড়া ঘরে প্রবেশের সময় বাস্তু পূজা করা হয়। এই সময় বাস্তুভিটায় কাদা-গোবর মিশ্রিত একতাল মাটি একটি কর্তিত বাঁশের মাথায় বাস্তু দেবতার উদ্দেশ্যে লাগানো হয়। এই পূজায় ব্রাহ্মণ বাস্তুদেবতার উদ্দেশ্যে দুধ-চিনি-আতপচালের রান্নাকৃত ক্ষীর নিবেদন করেন। রাজবংশীরা বিশ্বাস করেন যে, এটি যদি না করা হয় তাহলে গৃহস্থের নানান ধরনের রোগ ও দূর্যোগ ভোগ করতে হয়। এছাড়া গৃহস্থের মঙ্গলের জন্য জ্যৈষ্ঠ মাসের (মে-জুন) কোনো এক শুভদিনে কোনো কোনো পরিবার সত্য নারায়ণের পূজা করেন। এই পূজা ব্রাহ্মণ দুধ, চিনি, কলা ও ময়দা দ্বারা নৈবদ্য তৈরি করে সত্য নারায়ণ দেবতাকে নিবেদন করেন। আর সারারাত ধরে পূজার বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান পালিত হয়। পেত্নি-যোগীনি পূজা করেন মহিলা, সন্ন্যাসী বা বালকেরা। পৌষ মাসে (ডিসেম্বর-জানুয়ারী) গৃহস্থের বাড়ির আঙ্গিনায় একটি ছোট মাটির জলঘট (পাত্র) রাখা হয়। তাতে দূর্বা ঘাস, কলা স্থাপন করে হলুদ দিয়ে ঘটটিতে দেবতার প্রতিকৃতি আঁকা হয়। ঘটটিতে তেল-কাজল দেওয়া হয়।[১৬]

হ্যাঁচড়া-প্যাঁচড়া পূজা[১৭] : রাজবংশীরা হ্যাঁচড়া-প্যাঁচড়া পূজা করে থাকেন ঘা-পাঁচড়া, গুটি বসন্ত বা অন্যান্য রোগ থেকে মুক্ত থাকার জন্যে। এই পূজা করলে ঐসব থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব বলে তারা বিশ্বাস করেন। বাড়ির আঙিনায় কোনো কুলগাছকে ঘিরে অনূঢ়া মেয়েরা ও বালক-বালিকারা ফুল দেয়ার জন্য কাদা দিয়ে গোলাকৃতির বেদী তৈরি করেন। আর সারা অগ্রহায়ণ মাসজুড়ে ভোর ও সন্ধেবেলায় সেখানে চাপাফুল, শেওড়ার মুকুলিত বোল বেদীতে স্থাপন করেন। তারপর ঐ বেদীকে ঘিরে বালক-বালিকা ও অনূঢ়া মেয়েরা দুলে দুলে গান গায়। বিভিন্ন গান শেষে (হ্যাঁচড়া পূজার জন্য কিছু বিশেষ গান তারা গেয়ে থাকেন, যে গানের বিশেষ কোনো তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যায় না) পূজার বেদীতে রাখা ফুল কুলগাছের গোড়াতে প্রতিদিন রেখে দেন। মাস শেষের দিন তারা কাদার তৈরি বেদী ও মাসব্যাপী দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গকৃত ফুলপাতা বাচ্চারা তুলে নিয়ে, নদীতে ফেলে দিয়ে, স্নান করে, শৌচ হয়। ঐদিন তারা ভাত-ডাল-নিরামিষ রান্না করে ; তারপর তা মাঠের তেমাথায় মাটি ও গোবর দ্বারা লেপন করে বনবিবির উদ্দেশ্যে খাবার দেন। অবশেষে বাড়ি ফিরে গোষ্ঠীর সবাই মিলে আনন্দসহকারে একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করেন। এই পূজা সম্পর্কে রাজবংশী সমাজে একটা শ্লোক আছে—

"যে করবে হ্যালা ফ্যালা
তার চোখদে 'বেরোবে ঢ্যালা।"

চড়ক পূজা[১৮] : চড়ক পূজায় রাজবংশীরা খুব আনন্দোৎসব করেন, এই পূজা হয় চৈত্র মাসের শেষদিনে। চৈত্র মাসে গ্রাম্য বালক-বালিকাদের দিয়ে একটা গানের দল তৈরি করা হয়। সারা মাসব্যাপি চলতে থাকে গান ও নাচ শেখানোর রিহার্সেল। চৈত্র মাসের শেষ সাতদিন বা তিনদিন অবশিষ্ট থাকতে তারা এই বালক-বালিকার গানের দল নিয়ে রাজবংশী বসবাসকারী বিভিন্ন গ্রামে বের হন। এইসব দলে ত্রিশ থেকে শতাধিক পর্যন্ত লোক থাকেন। রাজবংশীরা এই দলকে '*দেল তোলা*' বলে। রাজবংশী যুবক ও কিশোররা এই দলে ভিড়ে রং মেখে সং সেজে গাজন নাচেন। যুবকরা শাড়ী-ব্লাউজ পরে মহিলা সাজেন। তাদের 'গৌরী' বলে। গ্রাম্য মোড়লরাও এই সাজ করে থাকেন। যুবকদের 'সন্ন্যাসী' বলে। সম্ভবত রাজবংশীদের এই গাজন নাচ থেকে প্রবাদ বাক্য 'অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট' সৃষ্টি হয়েছে।

গাজন নাচ শেষে বালক–বালিকারা (কখনো কখনো কিশোর–কিশোরীদেরও এ গানের দলে দেখা যায়) 'রাধাকৃষ্ণের মানভঞ্জন', 'রাজা হরিশচন্দ্র', 'চণ্ডিদাস রজকিনী' ইত্যাদি পালাগান করে থাকেন। এইসব গানে মণিপুরী রাসনৃত্যের বাদ্যযন্ত্রের মতো ঢোল, খোল–কর্ত্তাল, হারমোনিয়াম, মৃদঙ্গ, বাঁশী ইত্যাদির সুরের মূর্চ্ছনায় দর্শকদের আবিষ্ট করে। চৈত্র মাসের শেষদিনে এইসব দল নিজ নিজ গ্রামে ফিরে যায়। শুরু হয় চড়ক পূজার আয়োজন। চড়ক পূজায় পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে পূজা করেন। গ্রাম্য ওঝা সুর তুলে নেচে নেচে চড়ক পূজার গান গান। এই গান পয়ার ছন্দে রচিত। গ্রামের প্রতিটি রাজবংশী বাড়িতে চড়ক (চড়ক গাছের কাণ্ড কেটে বিশেষভাবে নকশাকৃত দুই মাথা সুঁচালো ধরনের কাঠ) নাচান ও কাদামাটি করেন। এগুলো করে থাকেন গ্রামের মঙ্গল কামনায়। চড়ক পূজায় রাজবংশীরা সন্ন্যাসী সেজে, উপবাস থেকে চড়ক পূজার বিভিন্ন ধরনের আচার–অনুষ্ঠান পালন করেন। পূজা শেষে কাদা দ্বারা শিবলিঙ্গ তৈরি করে সেখানে মহিলারা দুধ ও ফুল–বেলপাতা উৎসর্গ করে থাকেন। মহিলারা এখানে সন্তান কামনা করেন। বৈশাখ মাসের পহেলা দিনে গ্রাম মাঙ্গলিক পূজার থান তলায় মেলা বসে। ঐদিন সমস্ত গ্রামের লোকজন একত্রে খাওয়া দাওয়া করেন। রাজবংশী সমাজে বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে চড়ক দেবতা নদীর মধ্যে নিমজ্জিত অবস্থায় থাকে। চৈত্র মাসে চড়ক দেবতা ঢাক–ঢোলের বাজনা শুনে নদী থেকে ডাঙ্গার উঠে আসে। তাদের কেউ কেউ নাকি চড়ককে ডাঙায় জীবন্ত হয়ে উঠে আসতে দেখেছেন। চড়ক পূজা অবশ্য অন্যান্য কোনো কোনো আদিবাসীরাও করে থাকেন। (চড়ক পূজার শ্লোক ও পূজা পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন পরিশিষ্ট–৪)

চড়কপূজা উপলক্ষে সন্ন্যাস কাণ্ড, মুখোশনৃত্য, পুতুল নাচ প্রভৃতি নানারকম আমোদ–প্রমোদের অনুষ্ঠান দেখা যায়। বৈশাখ মাসের প্রথম দিন চড়ক পূজার মেলা বসায়। মেলার মাঝখানে একটি গাছ পুঁতে সন্ন্যাসী ঘুরানো হয়। ঘুরানোর জন্যে আরো কিছু সন্ন্যাসী নির্দিষ্ট থাকে। গাছের অগ্রভাগ চারদিকে ঘুরতে পারে এমন আরেকটি কল সংযুক্ত আড়াআড়ি গাছ থাকে। ঐ গাছের উভয় দিকে থাকে ঝুলন্ত দড়ি। একদিকে ঝুলন্ত দড়ির মাথায় বড়শির মতো লৌহশলাকার 'কালভূস' নামক একপ্রকার কড়া বাধা থাকে। সিদ্ধি ও গাঁজা খেয়ে নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা সন্ন্যাসীদের পিঠের চামড়া ফুড়ে কালভূস গেঁথে দেওয়া হলে ঝুলন্ত সন্ন্যাসীরা শূন্যের উপর চড়কগাছ ব্যাপীয়া ঘুরতে থাকেন।[১৯]

গাইটে পূজা[২০] : 'গাইটে পূজা' রাজবংশীদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পূজা। গ্রাম মাঙ্গলিক পূজার থানে অগ্রহায়ণ ও ফাল্গুন মাসের শেষ মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয়। সব রাজবংশী গ্রামে অবশ্য এই পূজা অনুষ্ঠিত হয় না। যেসব গ্রামে 'জাগ্রত কালীর থান' নেই সেখানে এই পূজা হয় না। কোনো কোনো গ্রামে গ্রাম মাঙ্গলিক পূজার থানকে জীবন্ত বা জাগ্রত কালীদেবীর থান বলে তারা বিশ্বাস করেন। তাই বিভিন্ন গ্রাম থেকে জাগ্রত কালীর থানে অগ্রহায়ণ ও ফাল্গুন মাসের শেষ মঙ্গলবারে রাজবংশীরা পূজা দিতে আসেন। ঐদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রচুর লোকের সমাগম হয়। রাজবংশীরা রোগ থেকে আরোগ্যলাভের কামনায়, আর্থিক উন্নতি কামনায় বা যে–কোনো বিপদ–আপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার কামনায় ঐ পূজার থানে মা–কালীর উদ্দেশ্যে মানত করেন। তারপর অভিষ্ট পূরণ হলে গাইটে পূজায় রাজবংশীরা মানত শোধ করেন। তাদের মানতের মধ্যে ছাগবলিদান, বুক চিরে রক্তদান, মস্তক মুণ্ডন করে চুলদান, মা–কালীকে স্বর্ণদান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। গাইটে পূজায় রাজবংশীদের একটি দল

থান তলার সম্মুখে হরির নাম সংকীর্তন করে থাকেন। সংকীর্তন করতে করতে থান তলার চতুর্দিক তিনবার প্রদক্ষিণ করেন। এই সময় যুবক ছেলেরা প্রচণ্ড শব্দে ঢাক বাজায় ও নাচতে থাকে। এতে কেউ কেউ সংজ্ঞাহীনও হয়ে পড়েন। গ্রাম মাঙ্গলিক পূজার ঠাকুরই এই পূজা অনুষ্ঠানে মন্ত্র পাঠ করেন। পূজা শেষে পূজার উদ্দেশ্যে নিবেদিত আতপচাল, কলা, চিনি, বাতাসা প্রভৃতি রাজবংশীদের প্রতিটি বাড়িতে বিশেষ যত্ন ও শ্রদ্ধাসহকারে বিতরণ করা হয়। প্রতিটি রাজবংশী সদস্যই এই খাবার যত্নসহকারে খেয়ে থাকেন। এই খাবার মঙ্গলের প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। তাছাড়া অগ্রহায়ণ মাসের পূজা শেষে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত তিন মাসব্যাপী রাজবংশীদের কির্ত্তনীয়া দল সারা গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে বাড়িতে হরিনাম সংকীর্তন করে বেড়ান। গ্রামের মঙ্গল সাধনই এর মূল উদ্দেশ্য। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সারা বছরই গ্রাম মাঙ্গলিক পূজার থানে ঠাকুর দ্বারা শনি–মঙ্গলবার পূজা করা হয়। এর উদ্দেশ্যও মঙ্গল সাধনা। ঠাকুরকে মাসোহারা দিতে হয়। রাজবংশীরা সারা বছরই গ্রামমঙ্গলের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের পূজা করলেও রাজবংশীদের মধ্যে গোষ্ঠীভিত্তিক দ্বন্দ্বের বিলুপ্তি ঘটে না। কখনো কখনো রাজবংশী সমাজে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকট আকার ধারণ করতে দেখা যায়।

ত্রিনাথ পূজা বা ত্রিনাথের মেলা[২১] : রাজবংশীরা ত্রিনাথ পূজা বা ত্রিনাথের মেলা করেন। কবে থেকে এ পূজা শুরু করেছিল তা আজ আর হয়ত জানা সম্ভব নয়। ত্রিনাথ পূজা উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের মধ্যে তেমন একটা দেখা যায় না। দক্ষিণবঙ্গের রাজবংশী, তীয়র, মালো, চণ্ডালরা এই পূজা করেন। এই পূজায় আনুসঙ্গিক ব্যয় বলা হয়ে থাকে তিন পয়সা। যারা পূজা করবেন তারা এক পয়সা খরচ করেন গাঁজা কিনতে, এক পয়সা পানের জন্য, আর এক পয়সা সরষের তেলের জন্য। সত্যি সত্যিই এই পূজা অত্যন্ত কম খরচে সম্পন্ন করা যায়। এই পূজার ঘরের মাঝখানে থাকে বড় একটি প্রদীপ। ঘরে ঢুকে তারা প্রদীপের গোড়ায় তেল ঢালেন। প্রদীপের তিনটি সলতে পাকিয়ে একটি করা হয়। সেটি জ্বলতে থাকে। অন্য জিনিসগুলো সবাই রাখেন একটি থালার উপর। এই পূজায় গানবাজনা চলে আর গাঁজার কল্কে সেজে চলে গাঁজা সেবন। পূর্বে মদও খাওয়া হতো। গ্রাম্য ওঝা পাঠ করেন পাঁচালী। প্রদীপের তেল শেষ না হওয়া পর্যন্ত পাঁচালী পাঠ ও শ্রবণ চলতে থাকে। প্রদীপ নিভে গেলে সবাই যে যার বাড়িতে ফিরে যায়। এর জন্য কোনো নির্দিষ্ট দিনক্ষণ নেই। সমাবেশ হয় রাতের বেলা। কারো মানতের অভিষ্ট পূরণ হলে, কারো বা বালামুসিবত দূর করার জন্য অথবা অতীতের কোনো সংকট নিরসনের জন্য অনুষ্ঠিত হয় এ ধরনের পূজা।[২২]

এরা নদীকে গঙ্গাদেবী জ্ঞানে ও বড় বৃক্ষকে সংকট নিরসনের দেবতাজ্ঞানে পূজা–অর্চনা করে থাকেন, যেটি বিভিন্ন উপজাতীয় গোষ্ঠীর মধ্যে দেখা যায়। রাজবংশীদের আচার অনুষ্ঠান ও উৎসবের মধ্যেই তাদের সাংস্কৃতিক জীবনধারার ভিন্নতা প্রস্ফুটিত। আধুনিক সভ্যতার যুগে এসব আচার–অনুষ্ঠান ও উৎসব শিক্ষিত ও শহুর ঘেঁষা লোকজন পালন না–করলেও গ্রামাঞ্চলে আজো এসব আচার–উৎসব ভক্তি সহকারে পালন করা হয়।

তথ্যসূত্র

১. GOB, *District Gazetteer: Rangpur 1977,* op.cit.
There are two great sects of the Hindus, the Sakta and the Vaishnaba, but Siva is also generally worshipped. The Rajbansis who form the bulk of the Hindu population, prefer to be Vaishnabas but the religion they practise is

not free from aboriginal rites. Thus one of the forms in which Sakti is worshipped is Chandi Unlike Durga, Chandi is painted red and may be worshipped throughout the year. This form of Sakti puja is peculiar to the district. *Buri* or *Burichandi,* the presiding deity of rivers and hats, is one of the Koch godilings, but is worshipped by the Rajbansis also. When represented only by a floral crown, and not by an image, she may be worshipped without the ministrations of a Brahman. This circumstance is regarded as a sign of the aboriginal character of this puja. Another example is the *Charak puja.* Sivaite rite commonly practised in the district. The worship of Dharma hold a prominent place in the religious observances of the people. *Dharma* is the omnipresent and omniscient god of justice and the sun is regarded as his emblem. Sunday is a special day of fasting and is known as God's day (deobar) and in times of stress as Rajbansi appeals to the sun for justice. Vishnu is worshipped by all Rajbansis and the Gita of Gobinda Misra, an early teacher of the Vasihnab cult, which is in the Rajbansi dialect, is held in the highest veneration. In addition to the principal Hindu deities, the Rajbansis worship many rural (gramya) and local god, chief of whom are *Sonarai,* the god of wild animals, *Gorakhnath* the god of cow-herds, *Hudum-Deo* the rain-god, *Manadan-kam* the god of generation, *Bolaram* the plough-god and *Bisahari* the snake-goddess.
Abus Sattar, *In the Sylvan Shadows. op. cit.,* P.105-106- এ বলা হয়েছে : The precise form of Hindusim followed by the Rajbansis seems to vary in different parts of the country according to the influences to which they are subjected. In Rangpur they profess to be Vaishnabas, while in Darijeeling, where Tantric ideas are perhaps more prevalent, their favourite goddess is alleged to be *Kali, Bisahari* or *Manasa, Garami, Tistu Buri, Hunuman, Bindur Tulsi, Rishi Kishto, Pethani, Jogini, Hudum Deo, Bahasto or Bahustho, Balbhadra Thakur* and *Kura Kuri* are mentioned as among their minor gods. Some curious particulars of their worship deserve mention here.

...The household god, *Bahasto* or-*Bahustho,* is worshiped in Baisakh (April-May) twice daily and at other times whenever a family enters a new house. A round hump of clay made smooth to smearing it with cow dung is set up at the foot of a bamboo to represent the god, and to this offerings of rice are made which are eaten by the worshippers. If this duty is neglected, disease or some similar calamity is believed to befall the family. To Satya Narayan, whom the Muslims revere under the name of Satya Pir, fresh milk, wheat flour, plantains and sugar are offered by the Brahmans who serve the caste on an auspicious day in Jaistha (May-June). For this god wheat flour is said to be essential and no substitute is admitted.

Balibhadra Thakur is propitiated at sowing time under the form of a yoked plough, before which the worshippers prostate themselves and do homage as at the shrine of a eregular divinity. The germination of the seed is deemed to depend on the due performance of this ceremony. Seven months after child-birth, when the child is viven rice to eat for the first time, Shati (probably a variant of Shasthi) is worshipped with offerings of Kantal, plantain, atab rice, and the leaves of the *bel* and *tulsi.* Rude image of the goddesses are made by the Mali caste in the form of cylindes of sola about seven inches high, roughly mouled into human form and mounted on the backs of sola duchks. The cult of Kura-Kuri is confined to women and children. During the month of Poush (December-January) a small earthen pot (ghot) is set up in the yard, offerings of durba grass, plantain and turmeric are laid on it, and it is smeared with vermilion and oil. *Pethani* and *Jogini* are worshipped only by women, Sanyasi only by boys."

২ ওয়াকিল আহমদ, *বাংলার লোকসংস্কৃতি,* দ্বিতীয় সংস্করণ

৩. রণজিৎ দেব, 'উত্তরবঙ্গের সমাজজীবন ও সংস্কৃতি', রতন বিশ্বাস (সম্পা.), *উত্তরবঙ্গের জাতি ও উপজাতি*

৪. ঐ. পৃ ৭১

৫. ঐ, পৃ. ৭১

৬. ঐ. পৃ. ৭২

৭. ঐ, পৃ. ৭৩

৮. ঐ, পৃ. ৭৫

৯. ঐ, পৃ. ৭৪

১০. ঐ, পৃ. ৭৪

১১. ঐ, পৃ. ৭৪–৭৫

১২ আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার *লোকসাহিত্য,* ১ম খণ্ড, ৩য় সংস্করণ, (কলিকাতা : ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৬২), পৃ. ৪০

১৩. লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।

১৪. ঐ

১৫. H.H. Risley, *Tribes and Castes of Bengal* (Calcutta : 1891) pp. 498-499.

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ–৪৯৮–৪৯৯

১৭. সীতারানী, গ্রাম–চান্দুটিয়া, ডাকঘর–আমদাবাদবাজার, যশোর, বয়স–৩৬, পেশা–গৃহিণী–এর কাছ থেকে সংগৃহীত।

১৮. লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।

১৯. ভবরায়, *বাংলার লোকবৃত্ত ও লোকসংস্কৃতি বিচিত্রা* (কোলকাতা : জয়দুর্গা লাইব্রেরী, ১৪০৮), পৃ. ১

২০. লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।

২১. জেমস্ ওয়াইজ, *পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ,* ২য় ভাগ, ফওজুল করিম (অনু.)

২২ আবদুস সাত্তার, *আরণ্য জনপদে,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৬–৩৭৫

অধ্যায় ৮

অর্থনৈতিক জীবনধারা

অর্থনীতির উপর সমাজজীবনের প্রতিচ্ছবি নির্ভরশীল। অর্থনীতি সমাজ ব্যবস্থার রূপ রূপান্তর ঘটায়। একটি জাতির সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ও জীবনের মানোন্নয়নে অর্থনীতির ভূমিকা অপরিহার্য। রাজবংশীদের অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক ও মৎস্যভিত্তিক। স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনব্যবস্থার জন্য কৃষি ও মৎস্যচাষভিত্তিক গ্রামজীবন সমগ্র জাতির চেয়ে সীমিত গোষ্ঠীর প্রতি অধিক অনুগত।

রাজবংশী ধনী ও দরিদ্র পরিবারের আর্থনীতিক অবস্থা একরকম নয়। ব্যাপক পার্থক্যপূর্ণ অবস্থা চোখে পড়ে। উত্তরবঙ্গে কৃষিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থায় রাজবংশী কৃষকেরা পূর্বে মহাজনের নিকট থেকে ঋণ নিতো। ফসল ঘরে তোলার পর সেই ঋণ পরিশোধ করতো। সুদের চিত্রটি ছিল একশ' মণ ধান ধার নিলে পরিশোধের সময় সুদসহ ১২৫ মণ ধান পরিশোধ করতে হতো। সুদের এই হার তৎকালীন সমাজে কম ছিল বলে কৃষকগণ এই 'সোয়াই প্রথা'য় ধার নিতো। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত Mclagan Committee-র রিপোর্ট হতে এ তথ্য জানা যায়। এছাড়া 'মূলী ঋণ' ও ভূতালী ঋণ-এর প্রচলন ছিল। মূলী ঋণ হলো দেনাদারের গৃহীত ঋণ শস্য দ্বারা পরিশোধ করা, আর ভূতালী ঋণ হলো কৃষকদের ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত মহাজনের জমিতে বেগার খাটতে হয়। বেগার খাটতে অস্বীকার করলে সমস্ত ধারকৃত অর্থের উপর শতকরা ২৫ টাকা হারে সুদ প্রদান করতে হতো।[১]

উত্তরবঙ্গে পূর্বে কৃষিকাজের মধ্যে ফলমূল, গোলমরিচ, সুগন্ধিপুষ্প ও কমলালেবু উৎপাদন করা হতো। এই এলাকায় আফিং ও গাঁজার চাষ হতো, পরবর্তীকালে নীল চাষ শুরু হয়েছিল। তাছাড়া কাঁঠাল, কলা, নারিকেল প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হতো। প্রচুর পরিমাণে মাছ ধরা হতো, এবং সেই মাছ-শুকিয়ে বাইরে বেচাকেনা হতো। ষোড়শ শতাব্দীতে র‍্যালফ ফীচ্ এই অঞ্চলে ভ্রমণকালে কার্পাস বস্ত্র ও মৃগনাভি পাওয়া যেত বলে উল্লেখ করেছেন।[২]

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন বুখানন উত্তরবঙ্গের উপর সমীক্ষা করেন, তখন গতানুগতিক ব্যবস্থায় বন-জঙ্গল কেটে, পুড়িয়ে পরিষ্কার করে, কোদালের সাহায্যে আবাদী জমি তৈরি একটি পদ্ধতি হিসাবে দাঁড়িয়েছিল, এবং তখন থেকে লাঙলের সাহায্যে উত্তরবঙ্গে রাজবংশীরা আমন ধান চাষ শুরু করেছিল।[৩] সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে রংপুর, দিনাজপুর এলাকায় দূর্ভিক্ষের সময় যেসমস্ত কোচ-রাজবংশীগণ মৎস্যজীবী ছিলেন তারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যেমন-বৃহত্তর ঢাকা, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, যশোর, মানিকগঞ্জ ও ময়মনসিংহ এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিলেন। উত্তরবঙ্গ ভিন্ন দেশের অন্যত্র বসবাসকারী রাজবংশীগণ সেকারণেই সম্ভবত কৃষিকাজের পাশাপাশি মাছ ধরে,[৪] মাছ চাষ ও বিক্রির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করেন। রাজবংশী সমাজে যারা প্রান্তিক ও ভূমিহীন কৃষক তারা

অন্যের বা অন্য কোনো কাজে দৈহিক শ্রম বিনিময়ের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করেন। তাছাড়া দেশে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে অব্যাহত উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসাবে এনজিওগুলো আয়বর্ধনমূলক বিভিন্ন কর্মসূচী চালু ও ঋণ প্রদান করায় রাজবংশী সমাজের বৃহত্তর অংশ ঐ এনজিওগুলো প্রদত্ত ঋণচক্র ও উন্নয়ন কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত হয়ে, বিভিন্ন পেশা অবলম্বনের মাধ্যমে কেউ কেউ অর্থ উপার্জনে ব্যাপৃত রয়েছেন। বাংলাদেশের রাজবংশী সম্প্রদায়ের সমাজে বিনিময়, বন্টন, বেচাকেনার প্রথা (exchange, redistribution, market exchange sytem), বাণিজ্যের ধারা (trade system), মুদ্রার ব্যবহার, জমির মালিকানা ও মালিকানার ধরন বৃহত্তর বাঙালি সমাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। রাজবংশী সমাজের পিতা–মাতাগণ সন্তান লালন–পালন করে কর্মক্ষম করে তোলার পর পৌঢ় বয়স থেকেই সন্তানের আয়ের উপর নির্ভরশীল হয়ে জীবন কাটানোর স্বপ্ন দেখেন, ও অধিকাংশ পিতামাতা পুত্রসন্তানদের উপর নির্ভরশীল হয়ে জীবন–যাপন করেন। নিজেদের প্রয়োজনে তারা ধান, পাট, আখ, ডাল, শাক–সবজি ইত্যাদি উৎপাদন করেন। কিছু কিছু পরিবার পাট, আখ, ধান স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে পরিবারের অন্যান্য খরচ সংকুলান করেন।

জীবিকা অর্জনের উৎস[৫]

রাজবংশীদের জীবিকা অর্জনের প্রধান উপায় হলো কৃষিকাজ ও মাছ ধরা। মৎস্যজীবী রাজবংশীরা দলবেধে বসতি এলাকা ছেড়ে বহু দূরেও মাছ ধরার বিভিন্ন সরঞ্জাম নিয়ে মাছ ধরতে যান। এটি সাধারণত রাজবংশী পুরুষরা করেন। এই জীবিকা অর্জনের উপায় কিছুটা যাযাবর জীবনের মতো। তবে বর্তমান গ্রাম ছেড়ে বহু দূরে মাছ ধরে বিক্রি করা বা সেখানে মাসের পর মাস থাকাটা বিরল হয়ে পড়েছে। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় টিকে থাকতে বিভিন্ন পেশার সাথে কেউ কেউ নিজেদের নিয়োজিত করছেন। দুইশত বছর ধরে বিভিন্ন গবেষক তিয়র, বাগদীদের জীবিকা অর্জনের পন্থাও এক রকম উল্লেখ করে রাজবংশীদের সাথে কোচ, পলিয়া, তিয়র, বাগদী, খেন জাতিগোষ্ঠীর রক্ত সংমিশ্রণ ঘটেছে বলে মনে করেছেন। তবে রক্ত মিশ্রণের যে প্রমাণ মেলে, তেমনি একথাও স্বীকার করা আবশ্যক যে, রাজবংশীদের ধর্মীয় দেব–দেবী, আচার–ব্যবহার, উৎসবাদি ইত্যাদি সংস্কৃতির সাথে বর্তমানেও ঐসব জাতি–গোষ্ঠীর দেব–দেবী, আচার–আচরণ উৎসবাদির পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়। একথা বলা যায় যে, ঐসব জাতিগোষ্ঠী থেকে কিছু লোকজন নিজেদের রাজবংশী হিসাবে পরিচয় দিয়ে তাদের জীবন চর্যার আচার–আচরণ ত্যাগ করে রাজবংশীদের ধর্ম ও সংস্কৃতি গ্রহণ করেছেন। দক্ষিণবঙ্গসহ পাবনা, মানিকগঞ্জ এলাকার রাজবংশীরা কৃষি কাজের পাশাপাশি মাছ ধরেন, ও মৎস্য উৎপাদনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করেন। টাঙ্গাইল, গাজিপুরের কালিয়াকৈর এলাকার রাজবংশীরা মৎস্যজীবী ও দিনমজুর। এই জীবিকা নির্বাহের ধরন তাদের পূর্ব পুরুষের অতীত সাক্ষ্য বহন করে। বৃহত্তর রংপুর, দিনাজপুর এলাকার রাজবংশীরা বর্তমানে প্রায় কেউই মাছ ধরার সাথে জড়িত নেই। তাদের মধ্যে অনেকে প্রান্তিক চাষী ও শ্রমজীবী কৃষক হিসাবে জীবন–যাপন করেন। খুব কম সংখ্যক লোক চাকুরি বা অন্যান্য পেশার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করেন।

রাজবংশীরা যেসব এলাকায় বসবাস করেন সেসব এলাকায় আমন ধান ও ইরি ধান তারা প্রচুর পরিমাণে ফলায়। অন্যান্য শস্যের মধ্যে ধান তারা প্রচুর পরিমাণে ফলায়। তাছাড়া অন্যান্য শস্যের মধ্যে পাট, তামাক, তরি-তরকারী, ভূট্টা, ডাল, তৈলবীজ, লঙ্কা, কচু প্রভৃতি তারা ফলায়। অবস্থাসম্পন্ন সচ্ছল পরিবারগুলো এগুলো থেকে উদ্বৃত্ত অংশ বিক্রি করে সংসারের অন্যান্য খরচ মিটান। রাজবংশীদের যে ফসলি জমি আছে তা পাশ্ববর্তী বাঙালি সমাজের মতো গতানুগতিক ধারায় চাষ করে থাকেন। চাষে ব্যবহৃত হয় লাঙল, গরু, ইত্যাদি। আর জমির নিংড়ানী, ফসল কর্তন, রোপন ইত্যাদি কাজগুলো তারা নিজ হাতে সম্পন্ন করে থাকেন।

রাজবংশীদের অধিকাংশ পরিবার ভূমিহীন ও অল্প জমির মালিক হওয়ায় প্রায় সারা বছর তারা বাজার থেকে খাদ্যশস্য ক্রয়ের উপর নির্ভরশীল। উত্তরবঙ্গে আশ্বিন-কার্তিক মাসে কোনো কাজ থাকে না, তখন মানুষের গৃহে খাদ্যশস্যের ঘাটতি দেখা দেয়। ফলে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জীবনে নেমে আসে তখন ভয়ংকর মঙ্গা। এসময় অনেক পরিবারকে অনাহারে-অর্ধাহারে কাটাতে হয়। সারা বাংলাদেশের রাজবংশীরা কৃষিকাজে শ্রমিক হিসাবে এবং নিজ ক্ষেতে শ্রমের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন করেন। উৎপাদনের পাশাপাশি কিছু গৃহ-পালিত পশুপাখি পালনের মাধ্যমে বাড়তি কিছু অর্থ উপার্জন করে থাকেন। যেমন-জীবনধারণে স্বনির্ভরশীলতা কিংবা সচ্ছলতা আনয়নের জন্য তারা বাড়িতে হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগল ইত্যাদি পালন করেন, এবং গৃহসংলগ্ন এক চিলতে বাগানে বিভিন্ন শাক-সবজি মরিচ, তরি-তরকারী চাষ করেন। তবে রাজবংশীরা অধিকাংশই দরিদ্র হওয়ার ফলে কৃষি জমিসহ ভিটে মাটি পর্যন্ত বিক্রি করে তারা সহায় সম্বলহীন হয়ে পড়ছেন। পার্শ্ববর্তী প্রভাবশালীগণ এ সুযোগ নিয়ে তাদের জমি-জমা তুলনামূলকভাবে কম দামে কিনে নেন।

তথ্যসূত্র

১. রণজিৎ দেব, 'উত্তরবঙ্গের সমাজজীবন ও সংস্কৃতি', রতন বিশ্বাস (সম্পা.), *উত্তরবঙ্গের জাতি ও উপজাতি*
২ ঐ, পৃ. ৬৯
৩. শিনকিচি তানিগুচি, 'উত্তরবঙ্গ ও অসমেয় বাজবংশী সম্প্রদায় এবং ভূমি ব্যবস্থায় পরিবর্তনশীল কাঠামো', শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিজিৎ দাশগুপ্ত (সম্পা.) *জাতি, বর্ণ ও বাঙালি সমাজ* (কলিকাতা : আই.সি, বিএস., ১৯৯৮), পৃ. ১৭৬
৪. ফকরুজ্জামান চৌধুরী 'রাজবংশী', হাসমত রশিদ (সম্পা.), *পাকিস্তানের উপজাতি*, (ঢাকা : পাকিস্তান পাবলিকেসন্স, ১৯৬৬) ২য় সংস্করণ, পৃ. ২০
৫. লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।

অধ্যায় ৯

দৈনন্দিন জীবন-পরিচয়

আইন ও রাজনীতি

কোনো জাতির সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রাজনীতির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে রাজনীতির ব্যবহার, প্রচার, রাজনৈতিক সংস্কৃতি (political culture) যেমনরূপে পাওয়া যায়, পূর্বকালে সেরূপ ছিল না। ঔপনিবেশিক শাসনামলের (colonial period) পূর্বে রাজবংশী অধ্যুষিত উত্তররবঙ্গের জনপদগুলোতে দু-একজন সম্রাটের কর নেওয়ার খবর ইতিহাসে পাওয়া গেলেও এসব এলাকার জনপদগুলো রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা ও আইনকানুন দ্বারা পরিচালিত হতো না। এসব এলাকার এক একটি জনপদে এক বা একাধিক সমাজপতি দ্বারা সামাজিক সমস্যা, অপরাধ ইত্যাদি সমাধান করা হতো। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যখন উত্তরবঙ্গের উপর নৃতাত্ত্বিক গবেষণা শুরু হয় তখন ইংরেজ শাসনকার্যের আওতায় এইসব এলাকাকে অনুন্নত জনপদ হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়, এবং শাসন ব্যবস্থার আওতাভুক্ত হয় আরো অনেক পরে। *Anthropological Dictionary*-তে ট্রাইবের (tribe) সংজ্ঞায় যে রাজনৈতিক ব্যবস্থার কথা উল্লিখিত আছে বর্তমান বাংলাদেশে শুধু নয়, পৃথিবীর দু'একটি অঞ্চল ছাড়া কোথাও সম্পূর্ণ সেরকম রাজনৈতিক ব্যবস্থা চালু নেই। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা দ্বারা প্রতিটি সমাজ পরিচালিত হচ্ছে।

রাজবংশী সমাজ সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার আওতাভুক্ত হয়ে পড়ে ব্রিটিশ শাসনামলে। অবশ্য তার আগে মুসলিম শাসনামলে কোনো কোনো শাসককে তারা কর দিতেন বলে ইতিহাসে প্রমাণ মেলে। ষোড়শ শতাব্দীতে তাদের বংশোদ্ভূত রাজা বিশ্ব সিং ও নরনারায়ণের অধীনে তাদের আইন ও শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হতো। বর্তমান বাংলাদেশের অন্যান্যদের শাসন ব্যবস্থার মতো রাজবংশীরাও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার আওতাভুক্ত। তবে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সমস্যা, সামাজিক অনুষ্ঠান এখনো তারা গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজপতিদের নেতৃত্বে সমাধান ও সম্পন্ন করে থাকেন। তাদের সমাজে কেউ রাষ্ট্রীয় আইন বহির্ভূত কোনো কার্যকলাপ জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ঘটালে সচরাচর সামাজিকভাবে সমাজপতিদের নেতৃত্বে তা মীমাংসা করা হয়। দেশের জাতীয় রাজনীতিতে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দু'একজন চেয়ারম্যান মেম্বর নির্বাচিত হতে দেখা গেলেও এম.পি নির্বাচনে রাজবংশী সম্প্রদায়ের কাউকে অংশগ্রহণ করতে তেমন একটা দেখা যায় না। তবে জাতীয় নির্বাচনে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিয়ে থাকেন, যদিও স্থানীয় বিপক্ষ নেতৃবৃন্দের চাপ ও হুমকি সর্বদা তাদের তটস্থ রাখে।

বিদ্রোহ ও আন্দোলন

উত্তরবঙ্গের রাজবংশীরা ক্ষত্রিয়ত্বের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে একটি বড় ধরনের সামাজিক আন্দোলন করেছেন। এখনো উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় ক্ষত্রিয় সমিতি রয়েছে। বৃহত্তর যশোরের রাজবংশী সমাজে বিংশ শতাব্দীর নব্বই দশকে শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নকল্পে একটি সামাজিক সংগঠন বিভিন্ন রাজবংশী অধ্যুষিত গ্রামে সচেতনামূলক সভা ও বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করেছিল। উত্তরবঙ্গে সংঘটিত সকল প্রগতিশীল আন্দোলন, মুক্তি সংগ্রামের যাবতীয় কর্মকাণ্ডে রয়েছে বিশাল গৌরবময় অবদান। ১৭৭২ সালের জনউত্থান, ১৭৮৩ সালে কৃষক বিদ্রোহ, ১৮৫৭ এর স্বাধীনতা সংগ্রাম, ১৯০৫ থেকে স্বদেশী আন্দোলন, ১৯৩০ এর আইন অমান্য আন্দোলন, তেভাগার লড়াই এবং সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধে রাজবংশীদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ছিল। এসময়ে রাজবংশী যুবকদের অনেকেরই পাক-হানাদার বাহিনী গুলি করে হত্যা করেছে। তাছাড়া উনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকের নীল বিদ্রোহে তারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিল বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়।[১]

টোটকা চিকিৎসা

বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হলেও তারা চিকিৎসার ক্ষেত্রে পুরানো ধ্যান-ধারণার প্রতি বিশ্বাস অটুট রেখেছে। এখনো তাদের সমাজে মারাত্মক কোনো রোগ না-হলে তারা আধুনিক এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার শরণাপন্ন হন না। আধুনিক চিকিৎসার সাহায্য না নেওয়াটা শুধু যে আর্থিক অসঙ্গতি তা নয়, পুরাতান পদ্ধতিতে যেমন-গাছ-গাছড়া, ঝাঁড়ফুক ইত্যাদি চিকিৎসার প্রতি তাদের রয়েছে গভীর বিশ্বাস।

সাধারণত মানুষ অসুস্থ হলে মানসিকভাবে দূর্বল হয়ে পড়েন, এবং কুসংস্কারের শিকার হন। এসকল পুরাতন ধারণার মধ্যে রয়েছে রোগ চালান দেওয়া যায় এমন ধারণা, নবজন্ম ও পুনর্জন্ম বিষয়ক ধারণা, আকস্মিক কিছু বিশেষ ব্যাপারে যেমন-রং, সংখ্যা, সৌর ও চান্দ্রপ্রভাব, জাদু, অঙ্গুরী, দামীপাথর, ইতরপ্রাণীর শরীরের বিশেষ অঙ্গ, নানান দরবেশ, নামের দোহাই, গাছ-গাছড়া সংক্রান্ত পুরাতন ঐতিহ্যবাহী ধারণা, দুষ্টচক্ষু ইত্যাদি। রাজবংশী বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের মুখ থেকে এখনো শোনা যায় যে, তাদের পূর্বপুরুষেরা ভূত-প্রেত দৈত্যদানব চলাফেরা করতে দেখেছেন, মেঘের মধ্যে দেবতা লুকিয়ে থাকতে দেখেছেন, বাতাসে তার কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছেন। একজন মানুষের রোগ অন্য মানুষের শরীরে চালান করা যায়, কিংবা কোনো সুস্থ বাচ্চার মাথার চুল কেটে অন্য অসুস্থ বাচ্চার তাবিচ-কবচ বা মাদুলিতে ব্যবহার করলে অসুস্থ বাচ্চা ভাল হয়ে যায়, ও সুস্থ বাচ্চাটি অসুস্থ হয়ে যায় এরকম ধারণা এখনো তাদের মধ্যে বর্তমান। রোগ যে শুধু মানুষ থেকে মানুষে চালান করা যায় তাই নয়, তা প্রাণীদেহেও চালান করা যায়। কিছু কিছু যাদুবিশ্বাস এখনো রাজবংশীদের মধ্যে খুব প্রচলিত, যেমন-কারো শরীরে কোনো চর্মরোগ হলে অনেক সময় নানান ধরনের জিনিস দিয়ে স্পর্শ করালে চর্মরোগ সেরে যায়। যেমন, কোনো মানুষের যদি চোখে অঞ্জনি ওঠে, তাহলে তাদের মধ্যে বিশ্বাস আছে যে, কোনো বাচ্চার নুনু (penis) স্পর্শ করালে তা সেরে যায়। তাছাড়া বাতের ব্যথা বা অন্যান্য কিছু রোগ সারাতে পূর্ণীমা, একাদশী ইত্যাদি তিথিতে উপবাস অথবা নিশিপালন এর ব্যবস্থা রাজবংশী সমাজের কারো কারো মধ্যে লক্ষ করা যায়। এই উপবাস বা নিশিপালনের ব্যবস্থা রোগবৃদ্ধি বা রোগসৃষ্টি না হওয়ার জন্য। ঠিক এমনিভাবে দৈবিক অথবা

ব্যক্তিক প্রভাব রোগ সৃষ্টির বা রোগ নিরাময়ের কারণ হতে পারে এমন ধারণা থেকে তাবিজ, কবজ ইত্যাদির উদ্ভব হয়েছে। তাবিজগুলো রোগ নিবারণ অথবা দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা।

বর্তমানে রোগ নিরাময়ের জন্য যেসমস্ত চিকিৎসার আশ্রয় নেওয়া হয়, সেগুলো হলো :

১. বাসক পাতার রস সর্দিকাশি ও ফুসফুসের রোগ সারায়। পুরানো হাঁপানি রোগে বাসকপাতার রস, তুলসী পাতার রস, গোলমরীচের গুড়া, মধু ও সোরা মিশিয়ে খাওয়ায়। এতে রোগী হাঁপানী থেকে মুক্তি পায়।

২. শরীরের কোনো স্থান কেটে গেলে বা ঘা হলে রসুন, সরিষার তেল এবং কালোজিরা একত্রে গরম করে ক্ষত স্থানে লাগালে উপকার হয়। আবার ছেঁড়া কাপড়ের পাকানো সলতে পুড়িয়ে ক্ষত স্থানে ছ্যাকা দিলে সেরে যায়।

৩. শরীরের কোনো স্থান সামান্য কেটে গেলে তুলসী পাতা বা জার্মনীর পাতা হাতে ডলে তা ক্ষতস্থানে লাগালে সেরে যায়। সেকারণে রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে তুলসী পাতা ব্যবহার করা হয়।

৪. গোবরে শেলার (Abics Spectabis) পাতার রস রাজবংশীরা হজমকারক ও হাঁপানির ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করেন।

৫. মুখে অরুচি বা পিত্ত বমি হলে নিমপাতা ভেজে খেলে মুখের অরুচি কেটে যায়।

৬. আধ-কপালী হলে কপালের যে দিকে ব্যথা-যন্ত্রণা সেদিকে আধ-কপালী সুপারি বেঁধে দিলে উপকার হয়।

৭. গলা ব্যথা হলে গোলমরিচ চিবিয়ে খেয়ে ফেললে গলা ব্যথা উপশম হয়।

৮. কুকুরে কামড়ালে তেলপড়া, জলপড়া বা গুড়পড়ার ব্যবহার আছে। এতে দশদিন পর্যন্ত কোনো আমিষ খাওয়া নিষেধ করা হয়।

৯. দাঁতে ব্যথা-বেদনা হলে ডালিম গাছের শিকড় যে-পাশে বেদনা সে-পাশের কানের সাথে সুতায় বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।

১০. মাথা ব্যথা বা চোখে ব্যথা হলে ছোট মাদুলীতে কালী মায়ের থানের মাটি পুরে মাথায় চুলে বেঁধে রাখলে সেরে যায় বলে তারা বিশ্বাস করেন।

১১. কারো মূল্যবান দ্রব্যাদি চুরি গেলে বা হারিয়ে গেলে তা প্রাপ্তির জন্য ফকির, কবিরাজের আশ্রয় নিতে দেখা যায়। কবিরাজ বা ফকির লাঠিচালান, নখচালান, বাটি চালান, ঝাঁটা চালান, সরিষা চালান বা চাউল পড়া, অগ্নিবাণ রক্তবমি বাণ প্রভৃতির আশ্রয় নেন।

১২. ভূত-প্রেত, জীন-পরী প্রভৃতির অশরীরী আত্মা সাধারণত কিশোরী-যুবতী-রমণীর দেহে আসর করে। সাধারণত পূজার থান, শ্মশান, বন-বাগান প্রভৃতিতে ভরদুপুরে বা কাকসন্ধ্যায় কাউকে পেলে ঐসব আত্মা ভর করে। সেক্ষেত্রে ফকির, কবিরাজের বিভিন্ন চিকিৎসা ও তাবিজ কবচের ব্যবহার আছে।

১৩. দূর্বাঘাস চিবিয়ে সদ্যকাটা-স্থানে প্রলেপ দিলে রক্ত বন্ধ হয় এবং ঘা শুনিয়ে যায়।

১৪. ত্রিফলা অর্থাৎ হরিতকি, আমলকি ও বহেরা ভিজিয়ে পানি খেলে পিত্তনাশ হয়, এবং পেট ঠাণ্ডা থাকে। সমাজে এর ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

১৫. গায়ে জোঁক ধরলে জোঁক যদি টেনে না ছাড়ানো যায় তবে মুখের কাছে কিছু লবণ ছেড়ে দিলেই জোঁক সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়ে এবং মারা যায়।

১৬. জলডুমুর গাছের সাদা কষ নালি বা চিটেগুড়ের সঙ্গে মিশিয়ে উরুতে (বেদনা হলে) মালিশ করলে সেরে যায়। তাছাড়া কুচ্‌কি ফুললে সাতিয়ান গাছের কষ কুচকিতে লাগালে সেরে যায়।

১৭. আকন্দ গাচের পাতায় ঘি মিশিয়ে চুলোর উপরে সামান্য গরম করে বুকে সেঁক দিলে নিউমোনিয়া রোগ সেরে যায়।

১৮. উলট কম্বল গাছের পাতা বা ডাল কেটে পানিতে ভিজিয়ে রেখে বাসি পেটে সেই পানি খেলে গ্যাস এবং ধাতু দৌর্বল্য দুটোরই উপকার হয়।

১৯. নিমের ডাল দিয়ে বা পাতার গুড়ো দিয়ে দাঁত মাজলে পাঁইওরিয়া রোগ সারে।

২০. বটের পাতার রস দাঁতের গোড়ায় দিলে দাঁত–নড়া বন্ধ হয়।

২১. ধুতুরার রস কোমরে ঘসলে বাত সারে। তবে খেলে বিপদ হয়।

২২. মুড়ি ধোয়া পানি খেলে বমি বন্ধ হয়।

২৩. আদার রস পেট ফাঁপা বন্ধ করে এবং বমিও বন্ধ করে।

২৪. গন্ধভাঁদাল গাছের ডগা বেটে বড়ি করে খেলে হজম শক্তি বাড়ে।

২৫. গলা বা গাল ফোলা রোগে চুন ও চিনি মিশিয়ে মালিশ করলে সেরে যায়।

২৬. চুনের পানি খেলে পেট ফাঁপা ও ঢেকুর বন্ধ হয়।

২৭. কালোজিরা বাটা অথবা সরষে বাটা খেলে সর্দির উপকার হয়।

২৮. ঘূর্ণি–পোকা কলার ভিতরে পুরে খেলে মাথা–ঘূর্ণন বন্ধ হয়। বদ্ধ জলাশয় বা পুকুরে এই ধরনের পোকা পাওয়া যায়। জোছনা পোকা কলার ভিতর পুরে সেই কলা মন্ত্র পড়ে খেলে রাতকানা রোগ সারে।

২৯. বিষ–পিঁপড়া বা বোলতায় কামড়ে দিলে চুন লাগালে বিষ নিরাময় হয়।

৩০. চোখে অঞ্জনি বা 'আইনুনি' হলে কথা বলা বা হাটা শেখেনি এমন ছেলে–সন্তানের পুরুষাঙ্গ ছুঁইয়ে দিলে সেরে যায়।

৩১. মাথায় মরামাস হলে মশুরীর ডালের জলদ্বারা পরিষ্কার করলে 'কেতর বন্ধ হয়। ('কেতর এক প্রকারের শ্বেত পদার্থ। ঘনসর্দির মতো। সাধারণত ঠাণ্ডা থেকে এ রোগের উদ্ভব ঘটে।)

৩২. শিশুর সর্দি লাগলে চাঁদিতে অর্থাৎ মস্তিষ্কে মাইয়ের দুধ লাগিয়ে দিলে সর্দি সারে।

৩৩. দুধে স্তন স্ফীত হয়ে টনটন করলে ঘর পরিষ্কার করার শণের ঝাড়ু ছুঁইয়ে দিলে ব্যথা আর থাকে না।

৩৪. প্রসবের পর কালোজিরা বাটা কিংবা কালবাউশ মাছ খেলে প্রসূতির দুধ বৃদ্ধি হয়।

৩৫. চোখে অঞ্জনি হলে অর্জুন গাছ জড়িয়ে ধরে বলতে হয়, 'আইনুনী ভাই, অর্জুন গাছ গলায় জড়াই, আমার আইনুনী নাই'। তবেই সারে।

৩৬. গলায় মাছের কাটা ফুটলে বিড়ালের লেজ ধরে মাফ চাইতে হয়। শুকনো ভাত বা শুকনো চিড়া গিলে ফেললে কাটা নেমে যায়।

৩৭. দুইজনের মাথায় গুতো লেগে ব্যথা পেলে ছোট করে আর একবার গুতো দিলেই আর ব্যথা থাকে না।

৩৮. গায়ে আচিল হলে মামার গামছা দিয়ে গা মুছলে আচিল সেরে যায়। তাও যদি না সারে তবে চুল দিয়ে আচিলের গোড়ায় শক্ত করে গিট দিয়ে রাখলে কয়েক দিনের মধ্যে আঁচিল আপনা থেকেই পড়ে যায়।

৩৯. প্রতি রাত্রে শিশুর জ্বর আসলে চামচিকের হাড় বেঁধে দিতে হয় নতুবা বাদুরের উচ্ছিষ্ট ফল খাইয়ে দিলে আর জ্বর থাকে না।

৪০. ঘাড়ে বেদনা হলে বালিশ রোদে দিতে হয়। অথবা শনিবারে মঙ্গলবারে যে শিশুর জন্ম হয় সেই শিশুর ঘাড় মালিশ করলেও ঘাড়ের বেদনা সারে। ৪-৫ বছরের শিশু প্রতি রাত্রে পায়খানা করলে সে রান্নাঘরের চুলা তিনবার ডিঙালে রাত্রে পায়খানা করা সারে।

৪১. মায়ের স্তন চুলকালে শিশুর অসুখ হওয়ার লক্ষণ।

৪২. শিশু ছেলে-মেয়ে হঠাৎ ভয় পেলে তাকে ভরা কলসীতে 'বাউলী' বা বেড়ি পুড়িয়ে পানিতে ডুবিয়ে সেই পানি খাইয়ে দিতে হয়, অথবা সেই পানি ঘরের চালে ফেলে দিয়ে পানির নিচে আতঙ্কিত ছেলে মেয়েকে দাঁড় করিয়ে দিলেই আর কোনো ক্ষতি হয় না।

৪৩. প্রসূতি আতুর ঘরে অসুখ হলে কামার বাড়ির লোহা ডোবানো পানি এনে স্নান করিয়ে দিলেই অসুখ থাকে না।

৪৪. শিশুর শরীর খারাপ বা স্বাস্থ্য খারাপ হলে মাটির হাড়িতে পানি ভরে তার মুখে পাত্র দ্বারা ঢেকে খড় পুড়িয়ে আগুন ধরিয়ে পাত্রসহ খড়ের উপর উপুড় করলে শরীর খারাপ ভাল হয়। একে 'হেড়ে' দেওয়া বলে।

৪৫. আতুড় ঘরে শিশুর জিহ্বায় সাদা সাদা দাগ পড়ে, এবং একে 'ফাঁকাপড়া' বলা হয়। মধু জিহ্বায় মেখে দিলেই তা সেরে যায়।

৪৬. পানে চুন বেশি হলে যদি জিহ্বা পুড়ে যায়, তবে সরষের তেল মেখে দিলে ম্যাজিকের মতো কাজ করে।

৪৭. এক অণ্ডকোষ বৃদ্ধি পাওয়া শুরু হলে শনিবারে, মঙ্গলবারে যে টিকটিকি সকালবেলা পূর্বদিকে মুখ করে থাকে সেই টিকটিকির লেজের অগ্রভাগ কলায় পুরে খাইয়ে দিলে রোগ ভাল হয়।

৪৮. জোনাকি পোকা কলার ভিতরে পুরে খাওয়ালে রাতকানা রোগী ভাল হয়।

৪৯. হরিতকির মাঝখানে ছিদ্র করে গলায় ঝুলিয়ে রাখলে বসন্ত হয় না।

৫০. দুধ-চোরা গাভী ঠিকমতো দুধ না দিলে ব্রাহ্মণের পরিত্যক্ত পৈতা গাভীর গলায় বেঁধে দিলে ঠিকমতো দুধ দেয়।

৫১. শয্যাশায়ী রোগীর শিয়রে পোঁটলা বেঁধে চাউল রেখে সেই চাউল দিয়ে ভাত রেঁধে খাওয়ালে অসুখ ভাল হয়।

৫২. আঁতুড় ঘরে শিশুর শিয়রে লাঙ্গলের ফাল বা লৌহজ দ্রব্যাদি না রাখলে শিশুর অমঙ্গল হয় বা ভূত-প্রেতে পায়।

৫৩. গাভী বাচ্চা প্রসব করতে দেরি করলে অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে তুলে রাখা ধানের খড় খাইয়ে দিলেই তাড়াতাড়ি বাচ্চা হয়।

৫৪. সুন্দর ছেলে-মেয়েদের যদি কেউ চোখ লাগায় বা নজর করে, তবে সঙ্গে সঙ্গে তার গায়ে থু থু দিতে হয় নইলে অসুখ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৫৫. ভাত খাওয়ার সময় যদি কেউ চোখ লাগায়, বা নজর করে তবে পেটের অসুখ হওয়ার সম্ভাবনা। সেক্ষেত্রে থালার নিচে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেই আর অসুখ হয় না।

৫৬. বিছানায় প্রস্রাব করলে প্রস্রাবের স্থানে লবণ ছিটিয়ে সেই লবণ প্রস্রাবকারীকে দিয়ে চাটিয়ে নিলে আর রাত্রে সে বিছানায় প্রস্রাব করে না।

৫৭. ভাজা মাছ বা ভাজা পিঠা খেয়ে কোথাও যাত্রা করতে নেই। যাত্রা করলে অপবেদতায় 'আসর' করে বলে বিশ্বাস। তাতেও অসুখ হওয়ার ভয় থাকে। সেক্ষেত্রে যাত্রাকালে বাম পায়ের গোড়ালি থেকে বাম হাত দিয়ে ধূলো এনে মুখে মুছে নিয়ে যাত্রা করলে আর ভয়ের কারণ থাকে না।

৫৮. হস্তরেখা দেখে কেউ যদি অশুভ ইঙ্গিত করে তবে সঙ্গে সঙ্গে কচু গাছ কেটে ফেলতে হয়। তাহলেই অশুভ ভাব কেটে যায়।

৫৯. শিশু–সন্তান যদি ঘন ঘন কাঁদে তখন বলা হয় তার 'ড্যানা' উঠেছে। সেক্ষেত্রে শিশুকে চিৎ করে শোয়াতে হয় মাটিতে মেলে দেওয়া দুই পায়ের উপর। অতঃপর শিশুর গলায় ভাল করে তেল মালিশ করে শিশুকে কানের কাছে দুই হাত দিয়ে চাপা দিয়ে উঁচু করে ধরে বলতে হয় 'ওই যে তোর মামার বাড়ি'। তিনবার এরূপ করলেই আর 'ড্যানা'–উঠা থাকে না।

৬০. শোল মাছ, গজার মাছ বা টাকি মাছের মাথা পুরুষ ছেলেদের খেতে দেওয়া হয় না। এতে ছেলের ক্ষতি হয় বলে বিশ্বাস আছে।

দৈনন্দিন জীবনে শুভাশুভ নীতিমালা

মানুষের জীবনে নানাবিধ সমস্যা, বিপদ, দূর্ঘটনা–দুর্যোগ হঠাৎ হঠাৎ দেখা দেয়। মানুষ এসব সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে কিংবা এড়িয়ে চলতে চায়। সংসারজীবনে মানুষের এসব সমস্যা সংকুল অভিজ্ঞাতার হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে সংস্কারপ্রবণ মন কিছু শুভাশুভ নিয়ন নীতি মেনে চলে। যেমন–যাত্রাশুভ, যাত্রানাস্তি, জ্যোতিষগণনা, খনার বচন প্রভৃতি বিষয়াদি মানুষ মেনে চলে। এগুলোর বাস্তব প্রভাব থাকুক বা না থাকুক মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব যে আছে তা বোধ করি সকলেই স্বীকার করবেন। রাজবংশীদের জীবনে যেসব শুভাশুভ বিষয়াদি প্রভাব বিস্তার করে আছে, বর্তমান গবেষক তা লক্ষ করেছেন। সেগুলো নিম্নরূপ :

১. দশমীযুক্ত মঙ্গল মাস দগ্ধা বলে তারে, সর্ব দিকে যাত্রা করা নিষেধ।

২. দ্বিতীয়া যুক্ত শনিবারে উত্তরে যাওয়া নিষেধ।

৩. শুক্রবারে দক্ষিণে যাত্রা করা নিষেধ।

৪. রবিবারে পশ্চিমে যাত্রা করা নিষিধ।

৫. সপ্তমী যুক্ত বুধবারে সর্বদিকে যাত্রা করা নিষেধ।

৬. একাদশী যুক্ত সোমবারে পূর্ব দিকে যাত্রা নিষেধ।

৭. গৃহস্থ বাড়িতে এক নাগাড়ে কুকুর ডাকলে সে গ্রামের বা গৃহস্থের অমঙ্গল আশঙ্কা করা হয়। কারণ বিশ্বাস করা হয় যে, কুকুর তা দেখেই এইরূপ চিৎকার করে থাকে।

৮. রাত্রে কোনো বাড়িতে পেচা ডাকলে সে পরিবারের অমঙ্গল সন্নিকট বলে মনে করা হয়। পেচার ডাক শুনতে পেলে বাড়ির মেয়েরা চুলার আগুনে লৌহশলাকা উত্তপ্ত হতে দিলে সে–দোষ কেটে যায় বলে তারা বিশ্বাস করে।

৯. ভোরে বাসি ঘরে ঝাড়ু দেওয়ার আগে পুরুষকে কোনো কাজে যেতে হয় না। বাসিঘর থেকে কোথাও যাত্রা অমঙ্গল। বাসি ঘর ঝাড়ু দেওয়া, জঞ্জাল সামনের দরজা দিয়ে বাইরে ফেলা গৃহস্থের জন্য অমঙ্গলকর। সেজন্যে কোনো জরুরি কাজে কেউ ভোরবেলায় বাইরে গেলে ঘরের দরজায় জলের ছিটা দেওয়া হয়।

১০. গৃহস্থ ঘরে ভোজ্য দ্রব্য বা টাকা পয়সা না-থাকা বা কম হওয়াকে বাড়ন্ত হাওয়া বলা হয়।

১১. কোনো গৃহস্থ অন্য গৃহস্থের ঘর থেকে বাতি জ্বালিয়ে আনতে গেলে কিছু আনুষ্ঠানিক নিয়ম পালন করতে হয়। কারণ সরাসরি বাতি জ্বালিয়ে অন্য গৃহস্থের ঘরে আগুন নিতে দেওয়া ভাল নয়। কোনো গৃহস্থের ঘর থেকে কুপি জ্বালিয়ে আনতে গেলে প্রথমে ঐ গৃহস্থের ঘরের কুপি থেকে নিজের কুপিটি জ্বালিয়ে নিয়ে তাদের কুপিটি নিভিয়ে দিতে হয়। অতঃপর নিজের জ্বালানো কুপি থেকে সে গৃহস্থের কুপিটি জ্বালিয়ে দিয়ে নিজের জ্বালানো কুপিটি নিয়ে আসতে হয়।

১২. রাত্রিকালে মাথা আঁচড়ান ভাল নয়। রাত্রিকালে মাথা আঁচড়ালে আয়ু কমে যায় বলে তারা বিশ্বাস করে।

১৩. মাথা বা গালে হাত দিয়ে বসা ও দু'হাত পেছনে দিয়ে এক হাতে অপর হাত ধরে চলাফেরা করাকে দুর্ভাগ্যের লক্ষণ বলে মনে করা হয়।

১৪. পরিবারের স্ত্রীলোকেরা পুরুষকে হাট-বাজার থেকে চুন আনার ফরমায়েশ দেবার সময় চুন শব্দের পরিবর্তে পানে খাওয়া দই আনতে বলেন। তেমনি হলুদ না বলে রঙ আনতে বলেন, সূচ আনতে বলেন না, হাট-বাজারে যাওয়ার সময় চুন আর সূচের নাম তারা অশুভ বলে মনে করেন।

১৫. সাঝেঁর প্রদীপ জ্বালানোর পর কারো সাথে টাকা পয়সা লেনদেন করা ভাল নয়।

১৬. মাথা আঁচাড়ানোর সময় চিরুণী হাত থেকে পড়ে গেলে সে পরিবারে অতিথির আগমন হয় বলে বিশ্বাস আছে।

১৭. রাত্রিকালে আয়না দেখা ভাল নয়। রাত্রে আয়নায় মুখ দেখলে অমঙ্গল হয়। তাছাড়া ভাঙ্গা আয়নায় মুখ দেখলে আয়ু কমে যায়, ও রোগক্রান্ত হয়।

১৮. কোনো আলোচনার মধ্যে টিকটিকি টিক্ টিক্ করে শব্দ করলে সে আলোচনা সঠিক বলে ধারণা করা হয়।

১৯. রাত্রিকালে গাছের পাতা ছেঁড়া বা গাছ কাটা দূষণীয়।

২০. পরিবারের বউদের স্বামী, ভাসুর, শ্বশুর-শ্বাশুড়ির নাম নেওয়া দূষণীয়।

২১. ধান-চাল মাপার আড়ি, সেরী, ওজনের দাঁড়ি-পাল্লা, কুলা, চালুনিতে পা লাগা দূষণীয়। পা লাগলে সেগুলোকে প্রণাম করতে হয়।

২২. দুধ আর আনারস এক সাথে খেলে সাপের বিষের মত বিষক্রিয়া হয় বলে তারা মনে করেন।

২৩. পায়ের উপর পা দিয়ে নাড়া দরিদ্রতা আনে বলে বিশ্বাস।

২৪. রাত্রিকালে সাপকে দড়ি বলতে হয়। কাউকে সাপে কাটলে কাটি ঘা হয়েছে বলতে হয়। নতুবা তাকে বাঁচানো যায় না বলে বিশ্বাস আছে।

২৫. স্বামী বা স্ত্রী যমজ কলা খেলে যমজ সন্তান হয় বলে বিশ্বাস করা হয়।
২৬. কোথাও যাত্রাকালে কেউ পিছু ডাকলে কার্যসিদ্ধি হয় না। কিন্তু ছেলে কোথাও যাত্রাকালে মা পিছু ডাকলে যাত্রা শুভ হয় বলে বিশ্বাস করা হয়।
২৭. বিবাহিতা মেয়েরা চুল খোলা রাখলে স্বামীর আয়ু কমে বলে বিশ্বাস করা হয়।
২৮. মামা ভাগ্নে–ভাগ্নিকে মারলে হাত কাঁপা রোগ হয় বলে বিশ্বাস।
২৯. কারো বাম চোখ নাচলে রোগাক্রান্ত হবে বলে বিশ্বাস। ডান চোখের উপরিভাগ নাচলে অর্থ ক্ষয় ঘটবে বলে মনে করেন।
৩০. রাত্রে পাটার বুকে উতা, কুলার বুকে চালুনী রাখলে গৃহস্থের অমঙ্গল হয় বলে বিশ্বাস।
৩১. বিবাহিতা মেয়েদের পিতৃগৃহ থেকে রবিবারে শ্বশুর বাড়ি যাওয়া ভাল নয়। চৈত্র, পৌষ ও ভাদ্র মাসে পিতৃগৃহে গেলে সেই মাসে শ্বশুর বাড়ি ফিরতে হয়।
৩২. বিবাহিতা মেয়েদের পিতৃগৃহ থেকে শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার দিন গোসল করা ভাল নয়।
৩৩. অবিবাহিত ছেলে–মেয়েরা পা লম্বা করে রেখে ভাত খেলে তাদের শ্বশুর বাড়ি দূরে হয়। অর্থাৎ দূরবর্তী এলাকায় তাদের বিয়ে হয় বলে বিশ্বাস।
৩৪. ঘর বা উঠান ঝাড়ু দিয়ে আবর্জনা দক্ষিণ দিকে নিয়ে রাখা ভাল নয়।
৩৫. ভাঙা আয়নায় মুখ দেখলে গরিব হয়ে যায় বলে বিশ্বাস আছে।
৩৬. শৈশবে হাঁড়ি–পাতিলের সরায় করে কোনো কিছু খেলে গোঁফ–দাড়ি গজায় না বলে ধারণা করা হয়।
৩৭. চিতল পিঠার বুক খেলে মার বুক খাওয়া হয় বলে বিশ্বাস করা হয়।
৩৮. চুল্লিতে আগুন জ্বালানোর পর সামান্য লবণ ছিটিয়ে পোড়ালে তরকারি অধিক স্বাদ হয় বলে তারা মনে করেন।
৩৯. যে নারী পান খেয়ে জিহ্বার ডগা দেখে সে নারীর স্বামীর ছ'মাসের আয়ু দুদণ্ডে ফুরায়।
৪০. শনি–মঙ্গলবারে তৈরি ঝাঁটা ও পৈচ্ছার হাড়ি–পাতিল রাখার বেতের তৈরি গোলাকার রিং–এর বাতাস কোনো লোকের গায়ে লাগলে রোগ হয় বলে মনে করা হয়।
৪১. চন্দ্র গ্রহণের সময়ে ভাত খেলে পেট–কামড়ি হয় বলে বিশ্বাস আছে।
৪২. চন্দ্র গ্রহণের সময় কোনো গর্ভবতী স্ত্রীলোক কোনো কিছু কাটা–ছেঁড়া করলে তা তার গর্ভস্থ সন্তানের উপর প্রতিফলিত হয়। সে সন্তান কোনো না কোনো অঙ্গহীন বা খুঁত হয়ে জন্মগ্রহণ করে বলে তারা বিশ্বাস করেন।
৪৩. ভাগ্নে–ভাগ্নীরা মামার বাড়ির পোড়া ভাত খেলে তাদের বিয়েতে বৃষ্টি হয় বলে বিশ্বাস আছে।
৪৪. কেউ কোনো কিছু খাওয়ার সময় কাশি উঠলে তার কথা কেউ মনে করছে বা তাকে কেউ গালি দিচ্ছে বলে বিশ্বাস করা হয়।
৪৫. কুকুর গা–ঝাড়া দিয়ে রোগ–বালাই দূর করে বলে বিশ্বাস। কুকুর গা–ঝাড়া দেওয়ার সাথে সাথে নিকটবর্তী লোকেরা থু থু না ফেল্লে সে–রোগ বালাই তাদের ধরে বলে বিশ্বাস।
৪৬. ভিক্ষুককে এক সাথে খাওয়ানো ও ভিক্ষা দেওয়া গৃহস্থের জন্য ভাল নয় বলে তারা বিশ্বাস করেন।

৪৭. বাইরের কেউ গৃহস্থের ঘরে যে-দরজা দিয়ে প্রবেশ করে, চলে যাবার সময় সেই-দরজা দিয়ে তাকে বের হয়ে যেতে হয়। নইলে সে গৃহস্থের বউ পালিয়ে যায় বলে তারা বিশ্বাস করেন।
৪৮. ব্যাঙের মুখ বর্ষা ডাকে। ব্যাঙ ডাকলে বৃষ্টি হয় বলে বিশ্বাস আছে।
৪৯. স্বল্পায়ূ ও মৃত বৎসার পরবর্তী জীবিত সন্তানের ধর্ম প্রভাবিত কোনো নাম না রেখে তুচ্ছ বস্তর নামে নাম রাখা হলে তাদের সন্তান দীর্ঘজীবী হয় বলে বিশ্বাস।
৫০. কাগজ পোড়ালে লেখাপড়া হয় না বলে তারা বিশ্বাস করেন।
৫১. ঘরের মেঝে বা দেওয়ালে যে-কোনো কিছু দিয়ে দাগ কাটাকাটি করলে সে পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলে বিশ্বাস আছে।
৫২. রাত্রিবেলা নখ কাটা ভাল নয়।
৫৩. লৌহ দণ্ড বা দা-ছুরি নিয়ে রাত্রিকালে চলাফেরা করলে ভূত-প্রেতে ক্ষতি করতে পারে না বলে বিশ্বাস করা হয়।
৫৪. নাতি কোথাও যাত্রাকালে পিতামহী বা মাতামহী তার গায়ে থু থু ছিটিয়ে দিলে তার অমঙ্গল হয় না বলে বিশ্বাস।
৫৫. গৃহস্থের বাড়িতে কাক ডাকলে তাদের দুরবর্তী বা প্রবাসী আপনজন বিপদাপন্ন হয়েছে বলে বিশ্বাস করা হয়।
৫৬. পথ চলতে কেউ হোচট্ বা আছাড় খেলে মনে করা হয় যে তাকে কেউ গালি দিচ্ছে।
৫৭. শুক্লপক্ষে কোনো পরিবারে লোক মারা গেলে সে পরিবারের সৌভাগ্যের সূচনা হয় বলে বিশ্বাস। আর কৃষ্ণপক্ষে যে-পরিবারের লোক মারা যায় সে-পরিবারের দুর্ভাগ্য সমাগত বলে বিশ্বাস। তাছাড়া কৃষ্ণপক্ষ মারা গেলে পরিবারে সবাই ভূতের ভয়ে থাকে। বাড়ি নাকি থমথম করে।

চিকিৎসা ব্যবস্থা[২]

রাজবংশী সমাজ আধুনিক চিকিৎসার পাশাপাশি বর্তমানেও ব্যাপকভাবে আদি প্রথাগত বিশ্বাসের ভিত্তিতে লৌকিক ঔষধ-পথ্যের আশ্রয় নিয়ে থাকে। তাদের সমাজে ওঝা গুণিনের ঝাড়-মন্ত্র, জ্যোতিষীর তাবিজ-কবচ, ধাত্রীর তেলমালিস, কবিরাজের গাছ-গাছড়ার ঔষধ-নির্যাস শরীরে মালিশ, পুরুতের ঝাড়-ফুঁক ইত্যাদি ব্যাপকভাবে চালু আছে। এর পিছনে তাদের সমাজের আবহমান কালের বিশ্বাস সংস্কার কাজ করে। তারা মানতের জন্য দূর-দুরান্তে গমন করেন। এখানে দারিদ্র বা অজ্ঞানতা কারণ নয়। প্রাচীন প্রথা, সংস্কারই প্রধান কারণ। তাদের সমাজে যারা লোকচিকিৎসা ব্যবস্থা এখনো চলমান রেখেছেন তারা হলেন—ওঝা, গুণীন, বেদে, ধাত্রী, পুরুত, সাধু-সন্ন্যাসী, জ্যোতিষী, হাতুড়ে, বৈদ্য প্রমুখ। তাদের সমাজে নারীদের আর্থিক পরনির্ভরতা, দৈহিক-মানসিক দূর্বলতার কারণে স্নায়ুর উপর যে চাপ পড়ে তার ফলে নারী মনোবৈকল্যজনিত নানা রোগে ভোগে। তখন তারা রোগের আসল কারণ চিহ্নিত করতে না পেরে গাছ-গাছড়ার পাতা-বাকল-কাণ্ডের নির্যাস সেবন, তাবিজ-কবচ ধারণ, শরীর বন্ধন ইত্যাদি চিকিৎসার আশ্রয় নেন। এসব ক্ষেত্রে ওঝা-গুণীন-কবিরাজ এসে প্রথমে মন্ত্র পড়ে রোগীর গায়ে ফুঁ দেয়, ঝাড়-ফুঁক শুরু করে। ঝাড় মন্ত্রের নানা পদ্ধতি আছে—পানিপড়া, তেলপড়া, মাটিপড়া, ফুলঝাড়া, গাছঝাড়া, হাতঝাড়া, সুতাঝাড়া,

চালুনঝাড়া, সুতা বন্ধন প্রভৃতি। এইসব চিকিৎসা গা–ছমছম, ভয় পাওয়া থেকে শুরু করে সাপে কাটা রোগের বিষ নামানো পর্যন্ত সমস্ত রোগের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, এবং সমাজ শ্রদ্ধার সঙ্গে তা বিশ্বাস করেন। তারা চিকিৎসায় তাবিজ–কবজ, মাদুলি, আংটি, বালা, উল্কি, তামার ও রবারের তার অঙ্গে ধারণ করেন। দারুটোনা, তুক্তাক্ চিকিৎসায় মন্ত্রপুত তাবিজ–কবজ তাদের কাছে অব্যর্থ ঔষধ। তাদের বিশ্বাস যে, দেব–দেবীর উল্কি সকল প্রকার বিপদ থেকে তাদের রক্ষা করে। কালীমাতার থান বা গ্রাম–মাঙ্গলিক থানের মাটি, ধূলি অব্যর্থ মহৌষধ বলে তারা বিশ্বাস রাখেন। তবে তারা এসবের পাশাপাশি কঠিন অসুখ হলে আধুনিক এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার আশ্রয় নিয়ে থাকেন। তারা কালী মার থান ধুয়া জল বা যে বৃক্ষে মা–কালী অধিষ্ঠিত বলে তারা বিশ্বাস করেন সেই গাছ ধুয়া জলও রোগ নিরাময়ের জন্য পান করেন।

রাজবংশী নাচ

নাচ–গান অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতো এদের জীবনের সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নাচ–গানের মধ্যে দিয়েই তারা সমস্ত দিনের ক্লান্তি অবসাদ দূর করেন, মুছে ফেলেন জীবন যন্ত্রণা, খুঁজে পান আনন্দ; ভালবাসার সুখ–দুঃখ নাচ–গানের মাধ্যমে তারা প্রকাশ করেন। তাদের মধ্যে বর্তমান যে–সব নাচ–গান প্রচলিত তার মধ্যে দুএকটি এখনো তাদের অতীত ঐতিহ্য বহন করে। এ গানগুলোর মধ্যে কিছু বিশ্বাস ও সংস্কার বিদ্যমান আছে। বাংলাদেরশের উত্তরাঞ্চলে বিশেষ করে রংপুর জেলার হুঁদুম দ্যেও অনুষ্ঠানে রাজবংশী কৃষক রমণীরা রাত্রিবেলায় অকর্ষিত ক্ষেত্রে নগ্ন হয়ে নৃত্য করেন।[৩] ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, উত্তরবঙ্গের কোচ কৃষক–রমণীদের মধ্যে হুদুম দ্যেও নৃত্যগীতের অনুষ্ঠানটির প্রচলন আছে।[৪] শরৎচন্দ্র মিত্র জলপাইগুড়ি জেলার রাজবংশী সমাজ নিরীক্ষণ করে হুঁদুম দ্যেওকে কেন্দ্র করে নৃত্যগীত ও আচারের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, রাজবংশী মেয়েরা ঘুরে ঘুরে নগ্ন হয়ে নাচেন। তিনি বলেছেন যে, রাজবংশীদের বিশ্বাস হুঁদুম দ্যেও নগ্নতাকে ভয় করে, ফলে বৃষ্টির দেবতা হুদুমা বৃষ্টি বর্ষণ করে ক্ষেতের ফসল সবুজ করে তুলবে।[৫] স্থান বিশেষে এ নৃত্যের স্থানে কলাগাছ পুঁতে অথবা মাটির মূর্তি তৈরি করে, মূর্তি বা কলাগাছকে ঘিরে নগ্ন হয়ে নৃত্য করেন। এই নৃত্যের একটি অংশ হিসাবে মেয়েদের মধ্যে কেহ পুরুষ, কেহ স্ত্রী সেজে পাড়ায় পাড়ায় হুদুম–হুদুমার গান[৬] গেয়ে বেড়ান। গানগুলোর ভাষা অশ্লীল। মেয়েরা নৃত্যসহ গান করতে করতে বাড়িতে ঢুকলে গৃহস্বামী পলায়ন করেন তারপর মেয়েরা একসঙ্গে নৃত্যগীত শুরু করেন। প্রতি বাড়িতে চাউল ও অন্যান্য দ্রব্যাদি মাগনের দক্ষিণাস্বরূপ গ্রহণ করেন। এভাবে রাত্রি যাপনের পর মেয়েরা মাঠে গিয়ে কেউ পলাই দিয়ে মাছ ধরেন, কেউ রোপা–গাড়েন, আবার কেউ নৃত্যগীত শুরু করে দেন।[৭] বিশেষজ্ঞদের মতে, নগ্নতার বিষয়টি যৌনমিলন ও উৎপাদনের (productivity) সাথে সম্পর্কিত। নগ্নতার বিষয়টি বিশ্বের অন্যান্য ট্রাইবাল সমাজেও পরিলক্ষিত হয়।[৮] রাজবংশী সমাজে এ নৃত্য কোনো পুরুষ বা পুরুষ শিশু পর্যন্ত দেখা নিষিদ্ধ। তাদের মধ্যে সংস্কারবদ্ধ ধারণা আছে যে, যদি কোনো পুরুষ ব্যক্তি চুরি করে সেই নাচ দেখে তবে সে হয় অন্ধ হয়ে যাবে অথবা পৃথিবীতে চিরদিনের জন্য বৃষ্টি নামবে না।[৯]

রাজবংশী সম্প্রদায় হিন্দু ধর্মাবলম্বী হওয়ায় তাদের প্রতিটি নাচই বলা যায় আচারমূলক (ritual)। ব্রতনাচ তাদের মধ্যে অন্যতম। ব্রতনাচে সংসার ধর্মে, পরিবারের সুখ সমৃদ্ধির কামনা ব্যক্ত করা হয়। লৌকিক ধর্মাচারণে গাজন–নাচ, কীর্তন নাচ, ব্রত নাচ, ধুপ নাচ, প্রভৃতির প্রচলন আছে। বিভিন্ন পূজা পার্বনে যেমন–দূর্গাপূজা, কার্তিক পূজা ও কালী পূজার রাজবংশী যুবক ও রমণীরা কখনো বিধবা ও বৈরাগীরা ধূপদানীতে ধূপ জ্বালিয়ে হাতে নিয়ে ঢাক–কাঁসরের তালে নৃত্য করেন তাকে ধুপ নাচ বলে অভিহিত করা যায়।

হুদুম নাচে দেহ বিক্ষেপ ছাড়া বিশেষ কোনো নাচের মুদ্রা দেখা যায় না। অঙ্গভঙ্গীর মাধ্যমে বৃষ্টি আহবান ও বৃষ্টি পড়ার দৃশ্যের চিত্রকল্প নৃত্যের মাধ্যমে প্রদর্শনই তাদের কাজ। নৃত্যের সঙ্গে যে গান পরিবেশিত হয় তাতে বৃষ্টি–দেবতার প্রার্থনা সত্যিই কীর্তিত হয়। হুদুমা মেঘের দেবতা বরুণের আঞ্চলিক নাম।[১০]

রংপুরের কোনো কোনো অঞ্চলে চৈত্র বৈশাখ মাসে খরা দেখা দিলে গ্রামের মেয়েরা একত্রে হয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে চাল–ডাল মাগন করেন। মেয়েদের মধ্যে একজন 'রাজা' হয় ও একজন 'রাণী'। রাজা রাণীর মাথায় একজন ছেড়া ছাতা বা গ্রাম্য মাথাল ধরেন। অপর একজন ভাঙা টিন বাজায় ও সাথে মেয়েরা গীত গান ও নৃত্য করেন।[১১]

অগ্রহায়ন ও ফাল্গুন মাসের শেষ মঙ্গল বার গ্রাম মাঙ্গালিক থানে গাইটে পূজার সময় থানের সামনে রাজবংশী সমাজের কির্ত্তনীয়াগণ হরিনাম সংকীর্তণ ও নৃত্য করেন। তারা এসময় গ্রাম মাঙ্গলিক থানকে ঘিরে নৃত্য করতে করতে তিনবার প্রদক্ষিণ করেন। রাজবংশী যুবকেরা এসময় গ্রাম মাঙ্গলিক থানকে ঘিরে নৃত্য করতে থাকেন। নৃত্যের সময় তারা মাতেয়ারা হয়ে পড়েন। মাতোয়ারা যুবকের মধ্যে দু'চারজন উচ্চশব্দে ড্রাম বাজান। নৃত্য চলাকালীন কোনো কোনো যুবক সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন।

রাজবংশী সমাজে শুভ বিবাহের পরদিন যখন বধূকে নিয়ে বর তার নিজ গৃহে ফিরে আসেন তখন বরের বাড়িতে বধূকে বরণ করার জন্য রাজবংশী রমণীগণ বধূবরণ নৃত্য করে থাকেন। রাজবংশী রমণীগণ ধান, দূর্বা, ফুল ইত্যাদি বর–কনের মাথায় বরণ করতে করতে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় আর্শীবাদ করেন। এসময় নৃত্যে পারদর্শী কোনো কোনো রমণী থালা নৃত্য, রেকাবী নৃত্য ও কলস নৃত্য করেন।

রাজবংশী সমাজে শিবপূজার গাজন নৃত্যের সময় রং মেখে সঙ সেজে রাজবংশী যুবকেরা বিভিন্ন ভঙ্গিতে নৃত্য করেন। যুবকেরা মহিলারূপ ধারণ করেন। তাদের গৌরী বলে। কিশোর–কিশোরীরা ঐতিহ্যবাহী নৃত্যের পোষাক পরে নৃত্য করেন। এসব নৃত্যের মূদ্রায় রাধা–কৃষ্ণের মান–অভিমান, চণ্ডিদাস–রজকিনির প্রেম প্রভৃতি প্রকাশ পায়। এসব নৃত্যের সময় গানও গাওয়া হয়ে থাকে। শিবপূজার গাজন নৃত্য অবশ্য বৃহত্তর উত্তরবঙ্গে বর্তমানে বিলুপ্তির পথে। তবে যশোর, সাতক্ষীরা, পাবনা এলাকায় বর্তমানেও দেখা যায়।

আরেক ধরনের নৃত্য রাজবংশী সমাজে প্রচলন আছে। সেটাকে কাদামাটি নৃত্য বলে। রাজবংশী জনগণ তাদের পারিবারিক মঙ্গল কামনায়, মা–কালীর নিকট কোনো সমস্যা থেকে মুক্তি কামনায় এবং গ্রামের মঙ্গল কামনায় ভোগরাজ শেষে গ্রামব্যাপী প্রতিটি বাড়িতে উঠোনে জল ঢেলে কাদামাটি নৃত্য করেন, ও হরিনাম সংকীর্তন করে থাকেন।

বাদ্যযন্ত্র

রাজবংশী সমাজে যেসব বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হতো, এর মধ্যে এখনো অনেকগুলো বাদ্যযন্ত্র গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত আছে। দোতারা, খঞ্জরিকা, ঢাক, ঢোল, ঝিঞ্জিরি, জম্ফ, তবলা, খোমক প্রভৃতি।[১২] তাছাড়া কিছু কিছু এলাকায় মন্দিরা, মোহরী, রামবেনা, মোঞ্চরা, উপাঙ্গ, খুরে, রামশিঙ্গা এখনো প্রচলিত আছে।[১৩] আধুনিক সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে রাজবংশী জনগণ যেমন গান-বাজনায় উন্নয়ন ঘটিয়েছে ,তেমনি তাদের বাদ্যযন্ত্রেও এসেছে পরিবর্তন। এখন প্রায় প্রতিটি রাজবংশী সমাজে হারমোনিয়াম, তবলা, বাঁশী, করতাল, খোল প্রভৃতি দেখা যায়। তাদের সমাজের দুয়েকজন দেশে জাতীয় অনুষ্ঠানে তালিকাভুক্ত শিল্পী হিসাবে গান গেয়ে থাকেন। আবদুস সাত্তার রংপুর, দিনাজপুর এলাকার রাজবংশীদের উপর গবেষণা করে বলেছেন, রাজবংশীদের গানে যেসব বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয় তন্মধ্যে সারিন্‌জা, বেনা, ধলকী এবং দোতারা প্রধান।[১৪] বর্তমান রাজবংশী সমাজে এসব বাদ্যযন্ত্রের সবগুলোর অস্তিত্ব পাওয়া যায় না।

গৃহের ধরন ও নির্মাণ উপকরণ

উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের বস্তিতে বসবাস করতে দেখা যায় না। সাধারণত গ্রামগুলোতে জমি-জোত নিয়ে তারা বসবাস করেন। এদের বহির্বাটি, ভিতরবাটি, দেবদেবীর স্থান, রান্না ঘর, গোয়ালঘর থাকে।[১৫] উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের বাড়ির বাহিরের উঠোনের পাশে কালীমূর্তি ও মনসা দেবীর দুইখানা ছোট পূজার ঘর দেখতে পাওয়া যায়।[১৬] একে ঠাকুরানীর ঘর বা থান বলে পরিবারিক দেবতার থান হিসাবে বাস্তুঘর থাকে। বাস্তুঘর উত্তরপাশে দক্ষিণমুখী করে স্থাপন করে বাঁশের মাথা লাল কাপড়ে মুড়ে ঘরের পূর্বদিকে পরিস্কার বাঁশদণ্ড মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়।[১৭] একে তারা বাস্তুদেবতা মনে করেন।

যশোর, ঝিনাইদহ, ফরিদপুর, পাবনার রাজবংশী গ্রামগুলোতে সাধারণত খুব ঘনবসতি লক্ষ করা যায়। তাদের ঘরগুলোতে সাধারণত মাটির দেওয়াল ও ছন, টিন বা টালি দ্বারা ছাদ বা চাল তৈরি করা হয়। বাঁশের বেড়া, টিনের ছাপড়া, বাঁশের বেড়ার দরজার ঘরও কম নয়। সাধারণত একটি রাজবংশী পরিবারের প্রধান ঘর বা শোবার ঘর এক কামরাবিশিষ্ট একটি ঘরই হয়। পরিবারের স্বামী-স্ত্রী ও ছোট সন্তান-সন্ততি নিয়ে ঐ এক কামরা বিশিষ্ট ঘরটিতে তারা থাকেন। পরিবারের বৃদ্ধ-পিতা বা কিশোর ছেলেরা বারান্দায় ঘুমায়। যেসব পরিবারের বিবাহযোগ্য মেয়ে থাকে, তাদের জন্য ঘরে ছেড়ে দিয়ে বাবা-মা বারান্দায় ঘুমায়। খুব কম সংখ্যক পরিবারে, বিশেষত অবস্থাসম্পন্ন পরিবারে একাধিক বসতি ঘর থাকে। রাজবংশী সমাজে একটি করে ছোট্ট রান্নাঘর থাকে। রান্না ঘরগুলো কখনো মূল ঘর থেকে আলাদা, আবার কখনো কখনো মূল ঘরের সঙ্গে লাগোয়া দেখা যায়। এছাড়া তাদের অধিকাংশ পরিবারের কৃষিকাজের গরু ও গাভী পালনের জন্য গোয়াল ঘর, কম সংখ্যক পরিবারের গোলাঘর দেখতে পাওয়া যায়। গোয়াল ঘরগুলো সাধারণত বাড়ির এক পাশে খোলা-মেলা অথবা বাঁশের বেড়া দিয়ে তৈরি হয়। যেসমস্ত পরিবারে ব্যবসায় করে ইদানিং অর্থ সমৃদ্ধি

ঘটেছে, তাদের দুই-তিন কামরা বিশিষ্ট মূল ঘরটি ইটের তৈরি দেখা যায়। তবে ইট নির্মিত ঘরের সংখ্যা শতকরা পাঁচ ভাগের অধিক নয়। একটি বা কয়েকটি পরিবার মিলে একটি টিউবওয়েল ব্যবহার করেন। অধিকাংশ লোক উন্মুক্ত মাঠে, বাগানে কিংবা রাস্তা, নদীনালার পার্শ্বে মলত্যাগ করেন।[১৮] শতকরা পাঁচ থেকে দশ ভাগ পরিবারে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা আছে। তাদের সমাজে স্নানাগার বিরল।

ব্যবহার্য দ্রবাদি

রাজবংশী সমাজে গৃহব্যবহার্য দ্রব্যাদি অতি সাধারণ। তাদের সৌখিন দ্রব্যাদি, আসবাবপত্র খুবই কম, নেই বললেই চলে। ইদানিং অবশ্য দুই-একটি পরিবারের কর্তা সৌখিন দ্রব্যাদি ও আসবাবপত্র ব্যবহার করছেন। তাদের সাধারণ তৈজসপত্রের মধ্যে চৌকি, কাঁথা, কাঠের বা টিনের বাক্স, মাটি বা এ্যালুমিনিয়ামের হাড়ি-পাতিল, কাঁসা বা স্টিলের থালা-বাসন, শিকা, পাটি, পিঁড়ি, হাতা, খুন্তি, দা, কাস্তে, কাটারি, ছুরি, কোদাল, কুড়াল ইত্যাদি। চাষি পরিবার ব্যবহার করে লাঙল, জোঁয়াল, মই, দড়ি, পাঁচনি, দাউলি, নিড়ানী, গাড়ি, বিঁদে, প্রভৃতি। মৎস্যজীবী পরিবারের সাধারণত থাকে নানান রকমের জাল, বানা, ঘুনি, চারো, পাটা, কোঁচ, হোঁচা, পলই, চাকজাল, বিন্তি, তেকাঠি, পচ্‌কা, ডোঙা, হাল, পাল, মাস্তুল, দাঁড়, সেউতি, লগি, চোইড়, বৈঠা, মাকু, চরকা প্রভৃতি। সৌখিন দ্রব্যাদির মধ্যে সাইকেল, ঘড়ি প্রধান। দুএকটি পরিবারে টিভি, খাট, চীনা মাটির বাসন-কোসন ইদানিং ব্যবহৃত হচ্ছে। তাছাড়া গৃহকাজে ব্যবহৃত দেলকো, চাঙারি, ধামা, খুঁচি, বালতি, কলস, কোলা, জালা প্রভৃতি তাদের সমাজে ব্যবহার করা হয়। খুব কম লোক গায়ে মাখা সাবান ব্যবহার করেন। তারা ১০-১৫ বছর আগেও বহুল পরিমাণে খৈল, এটেল মাটি ও একপ্রকার ক্ষার দ্বারা চুল ও শরীর মার্জন করত।[১৯] তারা পচনকৃত সুপারী (মজা গুয়ো) খেয়ে থাকেন পানের সাথে।[২০] উত্তরবঙ্গের স্ত্রীলোকেরা পূর্বে এণ্ডির কীট প্রতি পালন করতেন এবং সূতো প্রস্তুত করে বয়ন করতেন।[২১] এখন আর রাজবংশী স্ত্রীলোকেরা বস্ত্র বয়ন করেন না।

বিংশ শতাব্দীর আশির দশক পর্যন্ত ডাল ও নানাবিধ তরিতরকারি রান্না ও পরিবেশনের ক্ষেত্রে চামচের পরিবর্তে নারিকেলের মালার তৈরি উড়কির ব্যবহার ও শুকনা, পরিষ্কারকৃত ঝিনুকের ব্যবহার ছিল। এখনো দুএকটি পরিবারের ঐতিহ্যবাহী এসব দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। খাওয়ার জন্য পাথরের থালা ও কাঠের থালার ব্যবহার দেখা যেত। এখন অবশ্য এগুলো বিরল। মাটির তৈরি পোড়ানো প্রদীপের ব্যবহার, বসার জন্য তালপাতা বা খেজুর পাতার 'চাটকোল' ব্যবহার এখনো বহুল বিদ্যমান। সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে যেমন বৌভাত, শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের জ্ঞাতিভোজ উপলক্ষে খাওয়ার পাত্র হিসেবে কলাপাতা বা পদ্মপাতার ব্যবহার ঐতিহ্যবাহী, যা এখনো বহুলভাবে প্রচলিত। যেকোনো মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের প্রসাদ বিতরণের ক্ষেত্রে পাতার ব্যবহার লক্ষণীয়। অন্য কোনো পাত্রে প্রসাদ দেওয়ার রীতি নেই। পূজা-পার্বণ, সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানের কিংবা কোনো বিশেষ দিনে গোবর দিয়ে উঠান লেপা ও আলোমাটি দিয়ে ঘর-বাড়ি লেপা-মোছা একটি ঐতিহ্যবাহী সংস্কার। গোবর ও মাটি এদের জীবনে পবিত্রতার সাথে জড়িত।

ব্যবহার্য ধাতুদ্রব্য ক্রয়ের সামর্থ বহুপূর্বে রাজবংশীদের ছিল না বলে অনেকে লাউয়ের কলসী (লাউয়ের বশ), বাঁশের খুরি বা চোঙা ব্যবহার করতেন। স্বর্ণালঙ্কারের পরিবর্তে স্ত্রীলোকেরা দস্তার খাড়ু, গলায় প্রবালের মালা ব্যবহার করতেন। মধ্যবিত্ত ঘরের রমণীরা রৌপ্য অলঙ্কার ব্যবহার করতেন।[২২] রাজবংশীদের ব্যবহার্য দ্রব্যের মধ্যে আরো রয়েছে খচ্চি, ফেলটি, টাকু, মাকু, চালি, চরাট, জুঁতি, শোলা, বড়শি, আখের ফুলের কাঠি, জালের কাঠি, জালের রঙের জন্য গাবের রং, আঠা ইত্যাদি।

খাদ্যাভ্যাস[২৩]

রাজবংশীরা খাদ্যাখাদ্যের ব্যাপারেও অনেক বিধিনিষেধ পালন করে থাকেন। হিন্দুধর্ম গ্রহণের পর থেকেই খাদ্যাখাদ্যের ব্যাপারে পুরাণের নিয়ম-আচার এরা মানার চেষ্টা করে থাকেন। তবে এগুলো ধর্মে অধিক নিষ্ঠাবান পবিবারগুলোতেই বেশি পালিত হয়। মাঘ মাসে তারা মুলা খায় না, ঐ সময় মূলাকে তারা গরুর শিং এর সাথে তুলনা করেন। তাদের খাদ্য বাঙালির খাদ্য তালিকার অনুরূপ হলেও তারা বিশেষ কিছু মাংস জাতীয় খাবার গ্রহণ করেন, যা বর্ণহিন্দুরা সামাজিকভাবে গ্রহণ করেন না। সেগুলোর মধ্যে শূকর, কচ্ছপ, কুচে, কাঁকড়া বিভিন্ন জলজ পাখি, ছাগল, ভেড়া, হাঁস-মুরগীর মাংস প্রধান। বর্ণ হিন্দুদের অনেকেই ইদানিং এসব মাংস খেয়ে থাকেন বলে শোনা যায়। রাজবংশীরা দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য দ্রব্য খায়। প্রত্যেক বাড়িতে চিড়া, মুড়ি, খৈ প্রায় প্রতিটি উৎসব অনুষ্ঠানে তৈরি করেন। বিচিত্র রকমের পিঠা, পুলি, পাটিসাপটা, পায়েস প্রভৃতি তৈরি হয়। পৌষ সংক্রান্তিতে এইসব পিঠা পায়েস তারা খুব আনন্দসহকারে খান। তারা বিরানি, কোরমা-পোলাউ, পরোটা এসব খাবার পারিবারিকভাবে তৈরি করেন না। শিক্ষিত পরিবারের মধ্যে এগুলো ইদানিং তৈরি হয়। গ্রামের রাজবংশী পরিবারগুলোর কাছে পান্তাভাত এখনো খুব প্রিয় খাবার। পান্তাভাতের সাথে বাসি তরকারি ও গুড়, পাটালি, কলা প্রভৃতি খান। এদের পুরুষেরা নেশা দ্রব্যাদির মধ্যে প্রায় সবাই বিড়ি, সিগারেট পান করেন। এদের মধ্যে শ্রমজীবী কিছু লোক গাঁজা, ভাঙ দ্বারা নেশা করেন। মহিলাদের মধ্যে খুব বয়স্করা সিগারেট, বিড়ি, তামাকের গুড়া (তামাকু) নেশা দ্রব্য হিসাবে ব্যবহার করেন। বর্তমান সধবা মহিলারা বা যুবতীরা নেশা দ্রব্য গ্রহণ করেন না। উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের ভাত প্রধান খাদ্য হলেও পূর্বে কাউন, চিনার ভাত ও পয়রার গুড়ো (যবের ছাতু) অন্যতম খাবার ছিল। উত্তরবঙ্গের রাজবংশীরা শুটকি মাছ পূর্বে বেচা-কেনা করতো। সেজন্য এই এলাকার লোকজন শুটকি মাছ খেতে বেশ ভালবাসে। কিন্তু দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের রাজবংশীরা শুটকি মাছ খান না।

পরিধেয় বস্ত্রাদি[২৪]

রাজবংশী সমাজে এখনো আর্থিকভাবে গরিব পরিবারগুলো পুরানো ধাঁচে পুরুষেরা সাদা থান কাপড়ের নেংটি পরেন। উত্তরবঙ্গ ছাড়া অন্যান্য অঞ্চলের রাজবংশী মহিলারা একটি মাত্র কাপড় শরীরে পেচিয়ে পরে থাকেন। সম্পদশালী ও শিক্ষিত রাজবংশী মেয়েরা বাঙালিদের মতো শাড়ী-ব্লাউজ, পেটিকোট প্রভৃতি পরিধান করেন। বাঙালিদের সাথে মিশে তারা পোশাক পরিচ্ছদে বেশ উন্নত হয়ে উঠেছেন।

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী মহিলারা পাঁচ হাত লম্বা ও আড়াই হাত চওড়া একখানা মাত্র শক্ত রঙিন কাপড় বুকের উপর বেঁধে হাটু পর্যন্ত ঝুলিয়ে ব্যবহার করেন। এই কাপড়কে রাজবংশী ভাষায় 'ফোতা'[২৫] বলে। ঐতিহ্যবাহী এই ফোতা পরার চলন এখনো ঠাকুরগাঁ ও দিনাজপুর জেলায় দেখতে পাওয়া যায়। কোনো কোনো অঞ্চলে বুকে বাঁধার এ কাপড়কে 'বুকুনি' বলে। আগে ধনী কোচ–রাজবংশী মেয়েরাও এই বুকুনি বাঁধতেন। সেইকারণে এদের সমাজে এখনো এরকম একটি কথা প্রচলন আছে–'হাঁজার টাকার কুচুনি তাও বান্ধে বুকুনি'।[২৬] রাজবংশী যুবকরা লুঙ্গি পরেন ; এরা লুঙ্গিকে 'থামি'ও বলেন। সাধারণত নিম্নবিত্ত পরিবারের মহিলারা, এমনকি সচ্ছল পরিবারের মেয়েরাও স্যাণ্ডেল পরা বিলাসিতা মনে করেন। শীতের সময় রাজবংশী মেয়েরা উলেন চাদর, ছেলেরা সোয়েটার, চাদর ইত্যাদি গায়ে দেন। বর্তমানে শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা আধুনিক পোশাক পরিধান করেন।

রাজবংশী গহনা

গহনার মধ্যে রূপার গহনার প্রাধান্য ছিল। স্বর্ণালঙ্কারের পরিবর্তে স্ত্রীলোকেরা দস্তার খাড়ু ও গলায় প্রবালের মালা ব্যবহার করতেন।[২৭] হাতে কাঁচের চুড়ি ও সধবা মহিলা হাতে শাঁখা ব্যবহার করেন ও সিঁথিতে সিঁদুর দেন। অবশ্য তাদের শাঁখা–সিঁদুরের ব্যবহার কবে থেকে চালু হয়েছিল তা আজ আর জানার উপায় নেই। মধ্যবিত্ত ঘরের রমণীরা রোপ্য অলঙ্কার পরতেন। রোপ্য অলঙ্কারের মধ্যে ছিল কোমর বিছা, গলার হার, আর্মলেট, বাজুবন্দ, পায়ের নুপুর, পায়ের আঙুলের আংটি, হাতের আংটি, কানের রিং ইত্যাদি। ষোড়শ শতাব্দীতে র‍্যালফ ফিচ কোচ সাম্রাজ্য পরিদর্শনের পর বর্ণনা করেছেন, "এখানকার অধিবাসীদের কান আশ্চার্য রকম লম্বা। কম বয়সে কান বড় করার কৌশল এরা প্রয়োগ করেন।"[২৮] আধুনিক কোচরা কানে ধাতব বালার গোছা পরে কান লম্বা করার প্রক্রিয়া ত্যাগ করলেও গারোদের মধ্যে এখনো এ গহনার প্রচলন রয়েছে। ইদানিং রৌপ্য অলঙ্কার খুব কম দেখা যায়। রাজবংশীদের স্বচ্ছল ও শিক্ষিত পরিবারগুলোতে বর্তমানে স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার করতে দেখা যায়।

শিল্পকাজ ও কুটির শিল্প[২৯]

বাংলাদেশের উপজাতীয় সমাজগুলো পরিবর্তনবিমুখ নয়, তবে তাদের পরিবর্তনের ধারা বা গতি বৃহৎ জাতির তুলনায় ধীর। রাজবংশী সমাজে স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশ সময়ে এই পরিবর্তনের ধারা পূর্বের তুলনায় গতিশীল। যেকারণে উত্তরবঙ্গ ও দেশের অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা রাজবংশী সমাজে কিছু শিল্পকাজ ঐতিহ্যবাহী এবং কিছু শিল্পকাজ বা কুটির শিল্পের কাজ সাংস্কৃতিক পরিব্যাপ্তির (cultural diffusion) মাধ্যমে রাজবংশী সমাজে স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। যে–সমস্ত শিল্পকাজ তাদের সমাজের মেয়েরা চর্চা করেন সেগুলো হলো : নক্শা অঙ্কন (sketch painting), সূচীকর্ম (embroidery), বয়নশিল্প (weaving) প্রভৃতি।

মেয়েরা লক্ষ্মীপুজা, সরস্বতী পূজা, মনসা পূজা ইত্যাদিতে খড়িমাটি, চালের গুড়া, ফুল প্রভৃতি দ্বারা ঘরের মেঝে, দেওয়াল, কুলা, পিঁড়ি, দরজা, পূজার বেদী, লক্ষ্মীর সরা, কলস, লক্ষ্মীর ঝাঁপি প্রভৃতিতে সুন্দর সুন্দর আল্পনা ও নকশা চিত্র অংকন করেন। তারা লক্ষ্মী পূজায় লক্ষ্মীর পদচিহ্ন অঙ্কন করেন। তাছাড়া বিভিন্ন পূজার ঘট, কলস ইত্যাদিতে তেল-হলুদ প্রভৃতি দিয়ে দেবতার প্রতীক অঙ্কিত করেন। রাজবংশী সমাজে শিবের গাজন নৃত্যে বিভিন্ন ধরনের মুখোশ পরে, ও রং মেখে ছদ্মবেশ ধারণ করে, বুড়া-বুড়ি, সঙ, ঘোড়া সেজে নৃত্য করেন। রাজবংশীদের মধ্যে যারা বৈরাগী-বোষ্টমি হয়, ভেগ ধারণ করেন তারা চন্দন, তিলক ও উল্কি ধারণ করেন। তাদের সমাজে বিয়ে অনুষ্ঠানে বরকনের কপালে চন্দন দেন। তেল সিন্দুর দিয়ে গাঁছে ফোটা অংকন করে মহিলারা পাট, সুতা, পুতি, কড়ি, কাদাপোড়ানো গুটি দিয়ে নকশি শিকা তৈরি করেন। রঙিন সুতা, পাট, রঙ প্রভৃতি দ্বারা নক্শি পাখা তৈরি করেন। এছাড়া নানা ধরনের সুতো দ্বারা রমণীরা সূচীকর্ম যেমন-নকশি কাঁথা, লেপকাঁথা ইত্যাদি তৈরি করেন। মেয়েরা লক্ষ্মী ও সরস্বতী পূজার ব্রতে আলপনা তৈরি করেন। এসব আল্পনাতে যেসব চিত্রকল্প অঙ্কিত হয় তা লৌকিক ও পৌরাণিক দেবদেবীর। তবে এসব আল্পনাব্রত ব্রতের স্থান ছেড়ে কুলা, ডালা, পাটি, পিঁড়ি, দেওয়াল, ঘট প্রভৃতিতে ছড়িয়ে পড়েছে। এসব শিল্পকর্ম ও কুটির শিল্পের কাজ নৃতাত্ত্বিক, ভাষাতাত্ত্বিক, ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ।

নৈমিত্তিক খেলাধুলা আমোদ-প্রমোদ[৩০]

মানুষের চিত্তবিনোদনের বহু উপায়ের মধ্যে খেলাধুলা অন্যতম। খেলাধুলার মাধ্যমে যেমন নির্মল আনন্দ পাওয়া যায়, আবিষ্ট মনের মুক্তি ঘটে, তেমনি শরীর সুস্থ ও সবল হয়। তাদের সমাজে কোনো কোনো খেলার উৎসমূলে ধর্মীয় চেতনা লুপ্ত থাকে। কোনো খেলায় লোক-বিশ্বাস ও মন্ত্রশক্তির প্রভাবও নিহিত থাকে, যেমন বৃষ্টি আবাহনমূলক ছড়ায় আকাশের মেঘকে আবাহন করা হয়। এতে যাদুশক্তির প্রভাব থাকতে পারে। যেমন "আয় বৃষ্টি ঝেঁপে ধান দেবো মেপে।" ধাঁধার খেলার মাথা খাটাতে হয়। কোনো কোনো খেলায় গণিত চর্চার সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন-বাঘবন্দী, ষোলগুটি, আয়টানা বিবিয়ানা, হাডুডু, গুটগুট, চেঙ্গুপাইট, ভেটাপাইট, ডাণ্ডাপাইট, তেপাইতা, মোগল-পাঠান, চোর-চোর, চি-বুড়ি, গোল্লাছুট, দাড়িয়াবান্দা, ডাংগুলি, বলি খেলা, এককা দোক্কা, কড়ি খেলা, কানামাছি ইত্যাদি। শ্রমসাপেক্ষ ও শ্রমহীন খেলার মধ্যে আগডুম-বাগডুম, রাজ্যর কোটাল, আয়টানা-বিবিয়ানা, কানামাছি, ইত্যাদি রয়েছে। তাছাড়া আনুষ্ঠানিক খেলা কাদামাটি, পানির খেলা, ঘুড়ি উড়ানো ছেলেমেয়েদের প্রিয় খেলা। বড়দের যেসব খেলা প্রিয় তা হলো তাস, হাডুডু, ফুটবল, দাবা, কেরামবোর্ড ইত্যাদি। ইদানিং অবশ্য ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন খেলা জনপ্রিয়তা পাচ্ছে।

কানামাছি খেলায় ছেলে-মেয়েরা ছড়া কেটে থাকে-'আনি মানি জানি না, পরের ছেলে মানি না।" আবার আয়টানা বিবিয়ানা খেলায়, "আয়টানা বিবিয়ানা, ডাক্তার বাবুর বৈঠকখানা, ডাক্তার বাড়ি যাইতে পান সুপারী খাইতে, পানের আগায় মরিচ বাটা, ইস্কাপনের ছবি আঁটা", কিংবা আগডুম বাগডুম খেলায় ছড়া কেটে ছেলে মেয়েরা নির্মল আনন্দ উপভোগ করে।

পদবীধারণ[৩১]

পদবীধারণের ক্ষেত্রে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত বর্মণ, মণ্ডল পদবী ছাড়া অন্য কী কী পদবী ব্যবহার করতেন, বা আদৌ নামের সাথে পদবী ব্যবহার করতেন কি-না, কিংবা বর্মণ, মণ্ডল পদবী কবে থেকে ব্যবহার শুরু হয়েছে তার সন্ধান পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে যে, ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কোচ রাজা বিশু তার উপজাতি নাম ত্যাগ করে বিশ্বসিংহ নাম ও পদবী ধারণ করেন। তারপর থেকে রাজবংশীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে শুরু হয় পদবী ধারণ। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই-তিন দশক পর্যন্ত রাজবংশীরা নতুন নতুন পদবী গ্রহণ করেছেন, ছেড়েছেন পুরানো পৈত্রিক পদবী। রাজবংশীদের মধ্যে এখন যেসব পদবীর ব্যবহার লক্ষ করা যায়, সেগুলো হলো বর্মণ, রায়, সিংহ, বিশ্বাস, মণ্ডল, রাজবংশী প্রভৃতি। অবশ্য সাম্প্রতিককালে রংপুর, ঠাকুরগাঁ, দিনাজপুর এলাকাতে নতুন করে পদবী পরিবর্তনের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। রাজবংশী হিসাবে পরিচয় দিলে বা পুরাতন পদবী ব্যবহার করলে অনেকেই নিম্নবর্গের আদিবাসী হিন্দু বা উপজাতীয় হিন্দু বলে মনে করেন। বাঙালি মনে এই ধরনের তাচ্ছিল্যের মনোভাব থেকে নিজেদের রক্ষার জন্যই সম্ভবত শুরু হয়েছে নতুন করে পদবী বদলের পালা।

সামাজিক উৎসব

রাজবংশীদের প্রধান প্রধান উৎসবের মধ্যে বৈশাখের প্রথম দিনে বাড়ির আঙিনায় তুলসীতলায় খুব অল্প জায়গায় নিড়ানী (hoe) দ্বারা মাটি খুঁড়ে ধান বীজ বপণ করা হয়। তাকে 'শিবের মুঠ' বলে। তারপর তারা মাঠে ফসল বুনতে যান। হেমন্তকালে ধান রোপন করার সময় 'গোচরপণা' পালন করেন। নতুন ফসল তোলার সময়, 'নবন খাওয়া', ও 'ধানের ফুল দেওয়া' বা 'ধানের সাধ খাওয়া' উৎসব পালন করেন।[৩২] 'ধানের সাধ খাওয়া' উৎসবটি হয় আশ্বিন মাসের শেষ দিনে। ঐদিন ভোর বেলায় ছেলে-মেয়েরা ঘুম থেকে উঠে কুলো ও লাঠি নিয়ে তালে তালে বাজাতে বাজাতে মাঠের দিকে দৌড়ে অগ্রসর হয়। এই সময় তারা বলতে থাকে :

"আশ্বিন গেল, কাত্তিক গেল
মা ষষ্ঠী গভ্যে (গর্ভে) গেল
ধান তুমি সাধ খাওরে হো॥"

আবার

"আগ শুওর হট যাওক
পোকা মাকড় দূর যাওক
সবার ধান আওল বাওল
আমার ধান শুদ্ধ চাউল
ধান তুমি সাধ খাওরে হো॥"

মাঠ থেকে ফিরে এসে ভোর বেলাতেই স্নান করে আগুনে হাত-পা সেঁকে জামাকাপড় পরিধান করে জমানো তাল বিচির শাঁস খেয়ে থাকেন।

রাজবংশীরা পিতা-মাতার পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনার 'কৈনাগৎ' পালন করেন। পুত্র সন্তান লাভের আশায় ভাদ্র মাসের অষ্টম চাঁদের রাতে 'জিতুয়া' বা 'ভাদু উৎসব'

পালন করেন। ভাদু উৎসবে তারা পিঠা পায়েশ রান্না করে খেয়ে থাকেন। এই ভাদু উৎসব ও পশ্চিমবঙ্গের ভাদু উৎসব এক নয়, উৎসবের আচার ও ধরন সম্পূর্ণ আলাদা।

চৈত্র-বৈশাখ মাসে রাজবংশীরা বৃষ্টি কামনায় 'হুদুমা' বা 'হুদুম দ্যেও' উৎসব পালন করেন। হুদুমা বৃষ্টির দেবতা। নৃত্যের মাধ্যমে ও জাগরণী গান গেয়ে বৃষ্টি নামানো এই উৎসবের উদ্দেশ্য। এই রাতের নাচের সময় কোনো পুরুষের অংশগ্রহণ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। তাদের বিশ্বাস পুরুষেরা দর্শক হলে সেই পুরুষের মারাত্মক ক্ষতি হবে। সেইকারণে তিন মাসের ছেলে শিশুকেও এই নাচের সময় নিয়ে যাওয়া হয় না। চৈত্র মাসের অমাবশ্যা রাত্রিতে এই উৎসব পালন করা হয়। গ্রামের বিবাহিত, অবিবাহিত মেয়েরা অকর্ষিত ক্ষেতে কল্পিত লাঙল, জোঁয়াল ও শস্যবীজ নিয়ে গমন করেন। সেখানে উপস্থিত হয়ে তারা অনাবৃত শরীরে, চুল ছেড়ে বিভিন্ন ঢঙে নাচতে থাকেন। তাদের সংস্কারবদ্ধ ধারণা যে, কোনো পুরুষ যদি এই নাচ দেখেন তাহলে সে অন্ধ হয়ে যাবে, অথবা আকাশ থেকে বৃষ্টি নামবে না। অনেক রাত-ধরে জাগরণী গান গেয়ে, নৃত্য করে, তারপর তারা কাপড়-চোপড় পরিধান করে নিজ নিজ গৃহে ফিরে যান। এখনো রাজবংশীদের মধ্যে জাগরনী গানে ও নাচে মাঠ মেতে ওঠে। তবে নাচের ক্ষেত্রে শালীনতা এসেছে। নৃত্যের সঙ্গে যে-সব গান পরিবেশিত হয় তাতে বৃষ্টি দেবতার প্রশংসা স্তুতিই কীর্তির হয়।[৩৩] এদের সমাজে বিভিন্ন ধরনের উৎসবের অঙ্গ হলো নৃত্যগীত, রাত্রি জাগরণ ও ব্রতকথা শ্রবণ।

রাজবংশী বাড়ির আশে-পাশে যদি দাওয়া জিগিনী তাল ও তেঁতুল গাছ থাকে, তবে তাবা এসব অমঙ্গলের চিহ্ন বলে মনে করেন। এ সম্পর্কে রাজবংশী সমাজে ছড়ার প্রচলন রয়েছে। যেমন—

"দাওয়া জিগিনী তেঁতুল তাল
কি করিতে পারি মুঁই সোনামুখী বিড়াল।"[৩৪]

এসব গান, শ্লোক, ছড়া একদিকে যেমন লোক সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ, তেমনি রাজবংশী জীবন ও সংস্কৃতির অন্তরঙ্গ আলেখ্য।

জ্ঞান-বিদ্যা-বুদ্ধি

রাজবংশী সমাজের লোকজনের জ্ঞান ও বিদ্যা বুদ্ধি বৃহত্তর সমাজের লোকজনের মতোই। তবে অশিক্ষার কারণে এদের সমাজে বয়স্ক মহিলারা ও অশিক্ষিত মেয়েদের মধ্যে কুড়ি হিসাবে গণনা রীতি এখনো লক্ষ করা যায়। বর্তমান শিক্ষার হার শতকরা ৩৮ ভাগ। বাকি ছেলে-মেয়েরা গৃহকর্মের হিসাব-নিকাশ মৌখিকভাবে চালিয়ে নিতে পারেন। তবে যোগ-বিয়োগ, গুণ-ভাগের মাধ্যমে হিসাব-নিকাশে ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা পিছিয়ে, তবে ধাত্রী বিদ্যায় পারদর্শী মহিলাও রাজবংশী সমাজে বিদ্যমান। তারা শিশু পরিচর্যার নিয়ম-কানুনেও মোটামুটি পারদর্শী। তাদের সমাজে সামাজিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড মৌখিক সিদ্ধান্ত মোতাবেক ও প্রথাগতভাবে সম্পন্ন হয়। সাধারণভাবে সামাজিক উন্নয়নের জন্য বা কোনো বড় ধরনের যৌথ সম্পদ পরিচালনার জন্য কোনো নিয়মকানুন, নীতিমালা নেই; নেই কোনো উন্নয়নমূলক কমিটি। রাজবংশী সমাজের দুএকটি গ্রামে অবশ্য এসব দিকে এগিয়ে আছে।

এদের সমাজে নারী ও পুরুষেরা পরম বৈষ্ণবের কাছ থেকে শরীর ও মন শুদ্ধ করার জন্য মন্ত্রের মাধ্যমে দীক্ষা-শিক্ষা নেন। এতে পরলোকে মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে বলে তারা বিশ্বাস করেন। তারা বিশ্বাস করেন যে, বৈষ্ণব বা গুরুদেবের পদস্পর্শ করে প্রণাম এবং পা ধোয়া (চরণামৃত) জল পান করলে ইহলোকে সুখ-সমৃদ্ধি ও পরলোকে শান্তি পাওয়া যায়। তাদের সমাজে শিশু-কিশোররা বড়দের প্রতি দুহাত তুলে জোড়হাতে নমস্কার, পায়ে হাত দিয়ে প্রণামের মাধ্যমে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে থাকে, ও বড়দের আশীর্বাদ গ্রহণ করে। বড়রাও ছোটদের প্রতি স্বাভাবিকভাবে স্নেহশীল। তারা আশীর্বাদের জন্য 'বেঁচে থাকো', 'দীর্ঘজীবি হও', 'বড় হও' ইত্যাদি ধরনের বাক্যে আশীর্বাদ করে থাকেন। তবে রাজবংশী সমাজের নারী-পুরুষ অন্তরে যতটা ভালবাসা-স্নেহ-শ্রদ্ধাবোধ পোষণ করেন, ততটা ভাষার মাধ্যমে কিংবা কাজের মাধ্যমে প্রকাশ (express) করতে পারেন না। সমাজের বড়দের কাছ থেকে ছোটরা আদব-কায়দা, সৌজন্য (courtesy) প্রদর্শনের কায়দা-কানুন শিখে নেয়। তারা কলহপ্রিয় নয়। পার্শ্ববর্তী অন্যান্য সমাজের সাথে তারা শান্তিপূর্ণ ও সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে বসবাস করেন। পার্শ্ববর্তী অন্যান্য সমাজের সাথে ও আন্তঃসমাজের লোকজনের মধ্যে জমিজমা সংক্রান্ত বিষয়ে কলহ মাঝে মধ্যে ঘটে থাকে। তবে তাদের সমাজের সচরাচর বড় ধরনের কোনো প্রতিহিংসামূলক (violence) কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয় না।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিশেষ করে সত্তরের দশকের পর বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব সাফল্য পৃথিবীকে একটি বৈশ্বিক গ্রামে (global village) পরিণত করেছে। বিশ্বায়নের (globalizalion) কল্যাণে বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব সাফল্য বাংলাদেশ প্লাবিত হয়েছে। সেই সংস্পর্শ কৃষি, স্বাস্থ্য, চিকিৎসার ক্ষেত্রে ও অন্যান্য প্রযুক্তিগত উন্নয়নের (technological development) ক্ষেত্রে যে-উন্নয়ন ঘটেছে তার সুবিধাদি রাজবংশী সমাজও ভোগ করছে। স্যাটেলাইট গণমাধ্যমগুলোর কল্যাণে শুধু বাঙালি সংস্কৃতিই নয়, বিশ্ব সংস্কৃতির সামগ্রিক হাওয়া রাজবংশী সমাজের ভেতর-বাহিরে সাংস্কৃতিয়ায়ন (acculturation) ঘটিয়েছে। সুতরাং বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এনে বলা যায় যে, বাঙালি ও বিদেশী সমাজ সংস্কৃতি দ্বারা কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রভাবিত হয়ে ধীরে ধীরে তাদের সমাজ ও সংস্কৃতি পরিবর্তিত রূপ পরিগ্রহ করছে।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা

বিংশশতাব্দীর নব্বই দশকে বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে নিঃসন্দেহে শিক্ষা সম্প্রসারণের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী, অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ পর্যায়ে মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষা ও উপবৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি বাংলাদেশে একটি বড় ধরনের পদক্ষেপ। গণতান্ত্রিক আদর্শে অনুপ্রাণিত বাংলাদেশে সকল নাগরিকের জন্য শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা সমান। এই পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে রাজবংশী সমাজের ছেলে-মেয়েরা বর্তমান বেশি সংখ্যক স্কুলগামী হয়েছে। তবে রাজবংশী সমাজে পরিবেশ ও বসবাসের অবস্থা তাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে বড় ধরনের বাধা। সমাজের অধিকাংশ পিতা-মাতা অশিক্ষিত, খুব কম সংখ্যক পিতা স্বল্প শিক্ষিত। শিক্ষিত মাতা তাদের সমাজে বিরল। সুতরাং বাড়ির মধ্য থেকে শিক্ষা বিষয়ে তেমন কোনো বুদ্ধিদীপ্ত অনুপ্রেরণা এসব স্বল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত পরিবারের শিশুরা পায়

না। অশিক্ষিত এবং শিক্ষা বিষয়ে অনাগ্রহী গোষ্ঠী–সমাজে বসবাস করার ফলে শিশুদের শিক্ষা বিষয়ে উৎসাহিত করে না। এদের সমাজে কৃষিকাজ ও মৎস্যচাষ বা ধরা প্রধান পেশা হওয়ায় উপার্জনের জন্য পরিবারে অল্প বয়সের ছেলেদের কাজে পাঠাতে বেশি আগ্রহবোধ করেন। তাছাড়া ঐসব শিশুদের পারিবারিক কাজে সাহায্য করতে হয়। এদের সমাজে মৌখিক ভাষা বাংলা হওয়ার ফলে রাষ্ট্রীয় শিক্ষাক্রমে ছেলে–মেয়েদের ভাষাগত কোনো সমস্যা হয় না। বাংলাদেশে সরকারিভাবে যেসব আদমশুমারি প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোতে উপজাতীয় গোষ্ঠীর শিক্ষা সংক্রান্ত বিস্তারিত কোনো তথ্যাদি পাওয়া যায় না। এদের শিক্ষার জন্য সামাজিকভাবে তেমন উৎসাহ প্রদান করে না। ফলে যারা বিচ্ছিন্নভাবে লেখাপড়া শিখে চাকুরি পায় তারা সমাজের মূলস্রোতে মিশতে নানানভাবে সমস্যাগ্রস্ত হয়। তাদের সমাজে শিক্ষিত শ্রেণী, বলা যেতে পারে, গোষ্ঠীচ্যুত শ্রেণীতে পরিণত হচ্ছে। সমাজের নেতৃস্থানীয় অশিক্ষিত–অল্প শিক্ষিত লোকজন শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের সামাজিক কাজকর্ম, উৎসব অনুষ্ঠানে, সমস্যা নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদান করেন না। এমনকি তাদের সাথে কোনোরকম যোগাযোগ বা পরামর্শ করারও প্রয়োজনবোধ করেন না, ফলে সমাজের নেতৃস্থানীয় সমাজপতিদের হেজিমনিক (hegemonic attitude) মনোভাবের প্রতি শিক্ষিত শ্রেণী বৈরি মনোভাব ও অনিহা পোষণ করেন। এই হেজিমনিক মনোভাব কিছু কিছু রাজবংশী গ্রামে প্রকট আকার ধারণ করেছে। তবে কোনো কোনো গ্রামে এধরনের মানসিকতা পরিলক্ষিত হয় না। পরিশেষে বলা যায় যে, স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশ সময়কালে এদের সমাজে শিক্ষার হার দ্রুতগতিতে বেড়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

বেশ কতকগুলো জাতিগোষ্ঠীর শিক্ষার হার জাতীয় গড় হারের তুলনায় (চাকমা, মণিপুরী, গারো, বম, তনচংঙ্গ্যা) বেশি। তবে রাজবংশীদের শিক্ষার হার জাতীয় গড় হারের তুলনায় কম। যে সমাজে শিক্ষার হার যতটা কম, বলা হয়ে থাকে, সে সমাজ ততটা অনগ্রসর। যদি শুধুমাত্র শিক্ষা–দীক্ষায় কোনো এলাকায় একটি জাতিগোষ্ঠীর উন্নয়ন ঘটে, তবে একই জাতিগোষ্ঠী হওয়া সত্ত্বেও অন্য এলাকার সেই জাতির আর্থ–সামাজিক উন্নয়নে পার্থক্য পরিলক্ষিত হবে।

বর্তমান গ্রন্থকার রাজবংশীদের দুটি গ্রাম সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ ও জরিপ করেছেন শুধু শিক্ষা সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য। তাদের সমাজের বয়স্ক লোকজন গ্রন্থকারকে জানিয়েছেন যে, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ পূর্বকালে তাদের সমাজে শিক্ষার হার ছিল খুবই কম, এবং সেটা ৪% এর বেশি হবে না। এবং তার মধ্যে আবার নারী শিক্ষার হার ছিল খুবই নগণ্য, ০.৫% এর বেশি নয়। পরবর্তীকালে সে–মোতাবেক তাদের সমাজের শিক্ষার হার সন্তোষজনক। কিন্তু যথেষ্ট ভাল একথা বলা যায় না। এখনো তাদের সমাজের বয়স্ক লোকজন কৃষিকাজে দিন–মজুরি হিসেবে, মৎস্যজীবী হিসেবে কাজ করেন। এসব পেশায় শিক্ষার তেমন প্রয়োজন হয় না বলে তারা তখন লেখাপড়া শেখে নি। এখনো রাজবংশী সমাজে পুরুষদের শিক্ষার হার মহিলাদের হারের চেয়ে বেশি। তাদের সমাজের নারী শিক্ষার পশ্চাৎপদতার কারণ হলো অল্প বয়সেই মেয়েদের সাংসারিক নানান কাজে জড়িত হতে হয়। তাদের সমাজে নারী শিক্ষাকে নিরুৎসাহিত করা হয়। তাছাড়া অল্প বয়সে বিয়ে, অল্প বয়সে মা–হাওয়া, দারিদ্র ইত্যাদি কারণে তাদের সমাজের নারী শিক্ষার হার কম।

টেবিল

সমীক্ষিত দুটি গ্রামের রাজবংশী জনগণের শিক্ষার হার

(বন্ধনীর মধ্যে সংখ্যা শতকরা হার নির্দেশ করে)

শিক্ষা	লোক সংখ্যা	অক্ষব জ্ঞান সম্পন্ন	স্বাক্ষব জ্ঞান সম্পন্ন	১ম–৫ম	৬ষ্ঠ ১০ম	এস.এস. সি.	এইচ.এস. সি	বি.এ	এম.এ ও তাব উপবে
পুরুষ	৪১০	২০৩	৭৫	৭৭	৭৫	১৬	১৫	৩	৬
	(৫০.৮৭)	(৪৫.৮২)	(২৭.২৭)	(৫০.৩৩)	(৭০.০৯)	(৮৪.২১)	(৯৩.৭৫)	(৫০.০)	(১০০)
মহিলা	৩৯৬	২১৪	৪০	৭৬	৩১	৩	১	৩	০০
	(৪৯.১৩)	(৫৯.২৮)	(৭২.৭৩)	(৪৯.৬৭)	(২৯.৯১)	(১৫.৭৯)	(৬.২৫)	(৫০.০)	
সর্বমোট	৮০৬	৪৪৪	৫৫	১৫৩	১০৭	১৯	১৬	৬	৬

উৎস : *বাদুবগাছা, ঝিনাইদহ এবং মঠবাড়িয়া, যশোব গ্রাম দুটিতে মাঠ জবিপে প্রাপ্ত তথ্য।*

রাজবংশী সমাজে নিরক্ষরতার হার বর্তমান শতকরা ৬২ ভাগ, এবং শিক্ষিতের হার শতকরা ৩৮। তাদের সমগ্র জনগণের মধ্যে ৫৩% পুরুষ শিক্ষিত যেখানে ৭১% মেয়ে অশিক্ষিত এবং কেবলমাত্র ৫.৮৩% রাজবংশী ছেলে-মেয়ে এস.এস.সি পাস ও তার পরে পড়াশুনা করছে। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েদের হার খুব কম। এ-দুটি গ্রামে এম.এ. পর্যন্ত পড়েছে এমন মেয়ে একটাও পাওয়া যায় নি।

তথ্যসূত্র

সমব পাল, 'জেলার অধিবাসী', জেলা প্রশাসন (সম্পা.), *বংপুর : জেলা ইতিহাস*

২. নিমাই চন্দ্র বিশ্বাস, গ্রাম : চান্দুটিয়া, ডাকঘর—আমদাবাদ বাজার, যশোব, শিক্ষা—৫ম শ্রেণী, পেশা—কবিবাজি। বয়স —৬৮

৩ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *লোকাযত দর্শন* (কলিকাতা : নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৬৩), পৃ.. ৪১৩

৪. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলাব লোকসাহিত্য*, ৩য় খণ্ড (কলিকাতা : ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৬৫), পৃ. ৭২৮

৫. Saratchandra Mitra, 'On the Silaris or Hilaris of Eastern Bengal' *Jaurnal of Departmental Letter,* Vol.xv, (Calcutta : IDL, 1927), p 13

৬. মোহাম্মদ আব্দুল হাফিজ, 'যাদুবিদ্যার দিগদিগন্ত', *সাহিত্যিকী* (১৩৭৪ বসন্ত সংখ্যা), পৃ. ১৫৩

হুদুমার গান-১

'কাল ম্যাঘোক পূজো মাও মুঁই
কালা কইতর দিয়।
ধওলা ম্যাঘোক পূজো মাও মুঁই
ধূপ সেন্দুর দিয়া।
কি ম্যাঘোরাজ জমিনে বইষ্যো গিয়া।
তোমার নরনোক মরেছে ম্যাঘোরাজ
জল জল বলিয়া।
এক আড়া জল দে ম্যাঘোরাজ
পিরথিমি ছিটিয়া।'

ঐ, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ১৭ (বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত)।

হুদুমার গান-২
'হিল হিলায়ছে কোমরাটা মোর
শিব শিবাযাছে গাও।
কোণঠে কিনা গেইলে এলা হুদুমাব দ্যাখ্যা পাও।
পাঁটানী খান পড়েছে খসিয়া
আইসেক রে হুদুমা দেওয়া,
তোব বাদে মুই আছ বসিযা।'

৭. মোহাম্মদ আব্দুল হাফিজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪
৮. Saratchandra Mitra, JDL Vol xv, p 13 এবং ওযাকিল আহমদ, *লোককলা প্রবন্ধাবলী*
৯. আব্দুস সাত্তাব, 'আদিবাসী নৃত্য', হাফিজ বশিদ খান (সম্পা.) *বাংলাদেশের উপজাতি ও আদিবাসী : অংশীদারিত্বের নতুন দিগন্ত* (চট্টগ্রাম : বাংলাদেশ উপজাতি ও আদিবাসী ঐতিহ্য পর্ষদ, ১৯৯৩), পৃ. ৫৫
১০. ঐ, পৃ. ৫৫
১১ অনুষ্ঠানেব বিববণটি বাংলা একাডেমীর নিযমিত সংগ্রাহক মোহাম্মদ সাইদুব–এর সংগ্রহ থেকে। উদ্ধৃত ওয়াকিল আহমদ, *লোককলা প্রবন্ধাবলী*,
১২. বণজিৎ দেব, *উত্তরবঙ্গেব রাজবংশী : সমাজজীবন* ও সংস্কৃতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯
১৩. ঐ
১৪. আব্দুস সাত্তাব, *আবণ্য জনপদে* (তৃতীয় মুদ্রণ
১৫. বণজিৎ দেব, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৬–৬৭
১৬. বণজিৎ দেব, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৬–৬৭
১৭. রণজিৎ দেব, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৬–৬৭
১৮. বণজিৎ দেব, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৬–৬৭, এবং লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।
১৯. ঐ পৃ. ৬৯
২০. ঐ পৃ. ৬৯
২১. ঐ, পৃ. ৭০
২২. রণজিৎ দেব, *উত্তববঙ্গের রাজবংশী : সমাজজীবন ও সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৯
২৩. লেখকেব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।
২৪ লেখকেব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।
২৫. বণজিৎ বিশ্বাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭
২৬. ঐ
২৭. ঐ
২৮. ফককজ্জামান চৌধুবী, 'রাজবংশী' হাসমত রশিদ (সম্পা.) *পাকিস্তানের উপজাতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬–২৪
২৯. লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।
৩০. ঐ
৩১. ঐ
৩২. আব্দুস সাত্তাব, *আরণ্য জনপদে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৬–৩৭৫
৩৩. আব্দুস সাত্তার, 'আদিবাসী নৃত্য' হাফিজ রশিদ খান (সম্পা), *বাংলাদেশেব উপজাতি ও আদিবাসী : অংশীদারিত্বের নতুন দিগন্ত* (চট্টগ্রাম : বাংলাদেশ উপজাতি ও আদিবাসী পর্ষদ, ১৯৯৩), পৃ. ৪৯–৬৬।
৩৪. আব্দুস সাত্তাব, *আরণ্য জনপদে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৫–৩৭৬।

অধ্যায় ১০

রাজবংশী ভাষা ও সাহিত্য

রাজবংশী ভাষা

ষোড়শ শতাব্দীতে কোচ রাজবংশীগণ যারা রাজা নরনারায়ণের অনুসারী তারা তাদের পূর্ব ধর্ম ত্যাগ করে বর্ণ হিন্দুদের দিকে ঝুঁকে পড়ে। হিন্দু সংস্কৃতি ও ভাষার প্রভাবে রাজবংশীরা তাদের ভাষার বৈচিত্রকে ধরে রাখতে পারেন নি, হারিয়ে ফেলে কালক্রমে কামরূপী বাংলা গ্রহণ করেছিলেন। তবে, রাজবংশী সম্প্রদায়ের সমাজ ও সংস্কৃতি অনুসন্ধান করলে এদের ভাষার একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। এই বৈশিষ্ট্যটি পাওয়া যায় রংপুর, দিনাজপুর, কুচবিহার, আসাম এলাকায়; বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকায় বিশেষ ক রে যশোর, ঝিনাইদহ, ফরিদপুর, মানিকগঞ্জ, টাঙ্গাইল, গাজীপুরে এই বৈশিষ্ট্যের বিলুপ্তি ঘটে গেছে। রাজবংশীদের প্রকৃত ভাষার সন্ধান করতে হলে তাদের আদি বাসস্থান উত্তরবঙ্গে সন্ধান করতে হবে। বর্তমান রাজবংশীদের ভাষা সম্পর্কে ড. সুধীর করণ এক প্রবন্ধে বলেছেন, "নৃতাত্ত্বিক বিচারে প্রাথমিকরূপে রাজবংশী, কোচ ও অন্যান্য সম্প্রদায় ভোটবর্মী হলেও রাজবংশী লোকভাষায় কিন্তু তার কোনো চিহ্ন নেই।"[১] জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ার্সন (G.A Grierson) তাঁর *Linguistic Survey of India* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "ঢাকা থেকে ব্রহ্মপুত্র নদী পার হয়ে যখন আমরা রংপুর ও উত্তর-পূর্বের জেলাগুলোতে আসি তখন রংপুরি ভাষার সাক্ষাৎ পাই।" তিনি এ ভাষাকে রাজবংশী ভাষা বলেছেন।[২] ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর *The Origin and Development of the Bengali Language* গ্রন্থে রাজবংশী ভাষাকে কামরূপী ভাষা বলে অভিহিত করেছেন।[৩] ভাষাতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিকগণের মতানুযায়ী রাজবংশীরা বোড়ো ভাষা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এদের ভাষার সাথে কোচ, পলিয়া ভাষার বহু মিল রয়েছে। তবে রাজবংশীরা আদি ভাষা হারিয়ে বর্তমানে আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলেন। তাদের বাংলা ভাষার বিকৃত উচ্চারণের কথা ফকরুজ্জামান চৌধুরী[৪] ও আবদুস সাত্তার[৫] উল্লেখ করেছেন। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ রাজবংশী সম্প্রদায়ের ভাষার ব্যাপারে মত প্রকাশ করেছেন যে, কামরূপী উপভাষার একটি বিভাষা রংপুরী বা রাজবংশী শাখাকে উদীচ্য অর্থাৎ বরেন্দ্রী শাখার একটি প্রশাখা বলে গণ্য করা উচিত।[৬] সুকুমার সেন[৭] অবশ্য রাজবংশী ভাষা সম্পর্কে একটি মন্তব্য এভাবে করেছেন, রংপুর, দিনাজপুর, কুচবিহার, ডুয়ার্সের আশেপাশের ভাষা যেমন সরকি, রাজবংশী, চা বাগানের ভাষা এবং স্থানীয় অন্যান্য মিশ্রভাষা যেমন—নেপালী বাংলা, বিহারী-বাংলা, কোচ-বাংলা, মুণ্ডা-বাংলা ইত্যাদি তথা এতদঅঞ্চলের জনঅভিবাসন ও ভাষামিশ্রণ রাজবংশী ভাষাকে প্রভাবিত করেছে।[৮] অবশ্য সাম্প্রতিককালে বিশেষত মোঘল-ব্রিটিশ ও তার পূর্বাগত জনগোষ্ঠীর মিশ্রণ, তার আগেও ভোট-চীনা গোষ্ঠীর কিংবা পূর্বাগত জনগোষ্ঠীর

সংস্পর্শে রাজবংশী ভাষা ক্রমপরিবর্তিত হয়েছে। তবে, মূল কথা হলো, প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও তাদের ভাষার মিশ্রণ সত্ত্বেও চর্যাপদ পূর্বকাল থেকেই এদের সমাজে আর্য ভাষা–সংস্কৃতির প্রবল প্রভাব রাজবংশী ভাষাকে বর্তমান রূপ দিয়েছে।

রাজবংশী বা রংপুরের উপভাষায় অঘোষ মহাপ্রাণ তালব্য ব্যঞ্জণ 'ছ' এবং উষ্ম দন্ত্য 'স', ঘোষ স্বল্পপ্রাণ তালব্য 'জ' এবং উষ্ম দন্ত্য 'য', নাসিক্য দন্ত্য 'ন' এবং পার্শ্বিক 'ল' ঘোষ অল্প প্রাণ দন্ত্য 'দ' এবং ঘোষ মহাপ্রাণ দন্ত্য 'ধ' ধ্বনির মধ্যে ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়।[৯] রাজবংশীতে কর্তায় বহুবচনে 'গুলা' 'গিল' যেমন–বালকগুলা। সম্বন্ধের বহুবচনে 'ঘর'– চাকরের ঘর। কর্মকারকে 'ক' এবং সম্বন্ধে 'কার'–বালককার !অপাদানে 'অত' 'ওত'– বালকত। ক্রিয়াপদের রূপ, প্রথম পুরুষ বর্তমান ও পুরাঘটিত 'ও' যথা–মুঁই আছে। অতীতে 'নু' আছিনু। ভবিষ্যতে 'ম' 'মু', 'মো' যথা থাকিমু, থাকিম, থাকমো, থাকম্। দ্বিতীয় পুরুষের অতীতে 'লু' 'ল্লু' ভবিষ্যতে 'বু', যেমন–তুই কাইল্লু, তুই করবু। পূর্ববঙ্গীয়তে কর্মে এরে, 'রে' বাপোরে। সম্বন্ধের বহুবচনে 'গো' ছাকরগো, তাগো। কর্মের বহুবছনে 'বারে', আমাররে, তোমরারে। আপাদানে 'অ', 'ত' দিল, গলত ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।[১০]

রাজবংশীরা চাকমাদের মতো বিকৃত বাংলায় আঞ্চলিক ঢঙে কথা বলেন। তাদের সাংস্কৃতিক জীবন ধারার সাথে যেমন আসাম, কুচবিহার, দার্জিলিং প্রভৃতি অঞ্চলের সংস্কৃতির মিল পাওয়া যায়, তেমনি ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ঐসব অঞ্চলের সাথে অনেকাংশে মিল পরিলক্ষিত হয়। ডক্টর গ্রীয়ারসনের মতে রংপুর দিনাজপুর অঞ্চলের ভাষার সাথে রাজবংশী ভাষার পুরোমাত্রায় মিল রয়েছে।[১১] রাজবংশীরা বৃহত্তর বোড়ো ভাষা পূর্বে ব্যবহার করলেও কয়েকশ বছর পূর্বে থেকে তারা বাংলা ভাষার দিকে ক্রমশ আকৃষ্ট হয়েছে। আজ তাদের সমাজে বিচ্ছিন্ন শব্দ ছাড়া বোড়ো ভাষার (বেটা ছাওয়াল, বেটি ছাওয়াল– পুত্রকন্যা নির্দেশকৃত শব্দ) সম্পূর্ণ গঠন কাঠামো ও ব্যাকরণের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য। ডক্টর ল্যাথাম কোচ জাতির ব্যবহৃত এরকম পনেরটি শব্দ খুঁজে বের করেছেন।[১২] সেগুলোর তিনটি আসাম, দুটি বাংলাদেশ অঞ্চলে ও অবশিষ্টগুলো উভয় এলাকায় ব্যবহৃত হয়। তবে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ভাষায় এখনো অনেক বোড়ো শব্দ ব্যবহৃত হয়।

প্রত্যেক আঞ্চলিক ভাষাতেই পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বিভিন্ন জনপদের ভাষার প্রভাব থাকে। সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাওঁ, হো জাতিগোষ্ঠীগুলোর ভাষার মধ্যেও বাংলা, হিন্দী, তেলুগু, তামিল, উড়িয়া ভাষার সংমিশ্রণ লক্ষ করা যায়। রাজবংশীদের ভাষার মধ্যেও এসব ভাষার শব্দ মিশে আছে।[১৩] (রাজবংশী ভাষার বিভিন্ন অঞ্চলের নমুনা পরিশিষ্ট ২–ক ও খ–এ দেখুন)।

রাজবংশী সাহিত্য

সাহিত্য একটি জাতির সংস্কৃতির জীবন্ত ধারা। সাহিত্যে জীবনের বহু মূল্যবান উপাদান লুকিয়ে থাকে। তাই জাতিতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্বের ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণে সাহিত্য একটি মূল্যবান উপাদান। কাহিনী, সঙ্গীত, গাঁথা, বিশ্বাস, নাট্য, গীতিকা, গান, বারমাসী, ছড়ামন্ত্র, ধাঁধা, প্রবাদ, প্রবচন, শ্রুতি প্রভৃতি সাহিত্যের উপাদান। কাহিনীর মধ্যে রূপকথা, পুরাকথা, ব্রতকথা প্রভৃতি ভাগ আছে। রাজবংশী সঙ্গীতের মধ্যে রয়েছে জাগরনি ভাওয়াইয়া, জাগ,

গাজন, হুঁদুমাগান প্রভৃতি। কাহিনী ও সঙ্গীতের উৎসকাল ও উৎসস্থান জানা না গেলেও রাজবংশী সমাজে এগুলোর সমাদর ও প্রচলন রয়েছে। কাহিনী, ব্রতকথা এখনো রাত্রে মহিলারা একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসে বলেন ও শ্রবণ করেন। গানগুলোর মধ্যে শিরালীগান, হুঁদুমাগান, ব্রতগান, হ্যাঁচড়াগানগুলো মেয়েরা গেয়ে থাকেন। মেয়েদের এসব গান তাদের সমাজে অতীত ঐতিহ্যবাহী। কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি ভাল ফসল ফলানোর উপর নির্ভরশীল। খরা, মহামারী, অতিবৃষ্টিরোধে ধর্ম-সংস্কার-আচারমূলক হুদুমা গানের প্রচলন আছে। মেঘকে হুঁর্দুম দ্যেও কল্পনা করে তাঁর নিকট রাজবংশী রমণীগণ রাত্রে অকর্ষিত ক্ষেতে নগ্নভাবে নাচ-গান করে, ও পানি ঢেলে নকল চাষের অভিনয় করেন।

ময়মনসিংহ এলাকায় কোচ-রাজবংশী সমাজের জীবন চিত্র-পাওয়া যায় ময়মনসিংহ গীতিকায়।[১৪] ব্রাহ্মণ রাজা পরশুরামের কুঠারের ভয়ে ক্ষত্রিয় রাজবংশীগণ পালিয়ে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জলাশয় ও জঙ্গল এলাকায় আশ্রয় নেয়, এবং তারপর থেকেই তারা মৎস্যজীবিকা গ্রহণ করেছে-এরকম লোককাহিনীর বিশ্বাস রয়েছে।[১৫] এছাড়াও নানান ধরনের ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানব, ডাইনী, নদী-পাহাড়-পর্বত প্রভৃতির গল্প কথা, রূপকথা প্রচলিত আছে। এগুলো বংশ পরম্পরায় লোকমুখে সামাজিক, রাজনৈতিক, কাল্পনিক ও লৌকিক নানান বিষয়ে গুরুগম্ভীর, হাস্য কৌতুকপূর্ণ রসাত্মক লোকনাট্য, যাত্রাপালা, পালাগানের প্রচলন রয়েছে। চৈত্র মাসের শিবের গাজন ও চড়ক পূজার উদ্দেশ্যে তারা এসব লোকনাট্য ও পালাগানের আসর বসান। এসব পালাগান ও যাত্রাগানের মধ্যে রাজা হরিশ্চন্দ্রের জীবনী, ইংরেজদের অত্যাচারের কাহিনী, রাবনবধ পালা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া রাম-সীতা, রাধা-কৃষ্ণ, নিমাই-সন্ন্যাস, বেহুলা লক্ষ্মীন্দর প্রভৃতির পালাগান পরিবেশিত হয়। এসব পালাগানে, যাত্রাগানে সরল ও স্বাভাবিক জীবনের আনন্দ-বেদনা, অত্যাচার-পীড়ন, সংগ্রাম প্রতিবাদ, প্রেম, বিরহ, লোভ-লালসা, ভোগ-যৌনতা প্রভৃতির বিচিত্র-রূপ প্রতিফলিত হয়।

রাজবংশী সমাজে ছেলে ভুলানো ছড়া, খেলার ছড়া, পরিবারিক-সামাজিক, ব্যক্তিকেন্দ্রিক ছড়া, ঐন্দ্রজালিক-আচার অনুষ্ঠানমূলক ছড়া, ব্যঙ্গ বিদ্রুপাত্মক ছড়া প্রভৃতির প্রচলন রয়েছে। ব্রত, গাজন, মাগন, বৃষ্টি, বন্যা, ফসল ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে রাজবংশী সমাজে আচার-অনুষ্ঠানমূলক ছড়ার প্রচলন আছে। খেলার ছড়া খেলা উপলক্ষে, ব্রতের ছড়া ব্রতপার্বণ উপলক্ষে, মন্ত্রের ছড়া, যাদুটোনা, বশীকরণ ক্রিয়ানুষ্ঠান তাদের সমাজে চর্চিত হয়। তাছাড়া মন্ত্র, মন্ত্রের ছড়া, বৃষ্টি আবাহনের ছড়া, ঝড় থেকে রক্ষার ছড়া, প্রার্থনা প্রভৃতি তাদের সমাজে খুঁজে পাওয়া যায়। ঝড়-শিলা-বৃষ্টি হলে তাদের সমাজের বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে—

'ভ্যান্নার খুঁটি তালাপাতার ছাউনি মা
রক্ষে কর দোহাই মা-কালী, দোহাই মা-কালী।'[১৬]

আবার মন্ত্র বা মন্ত্রের ছড়া হাড়-মচকানো সারাতে তাদের ওঝা বা কবিরাজদের মুখে উচ্চারিত হয় ; জল-পড়া, লতা পড়া ভাঙ্গা বা মচকানো স্থানে বেঁধে দেওয়া হয়।

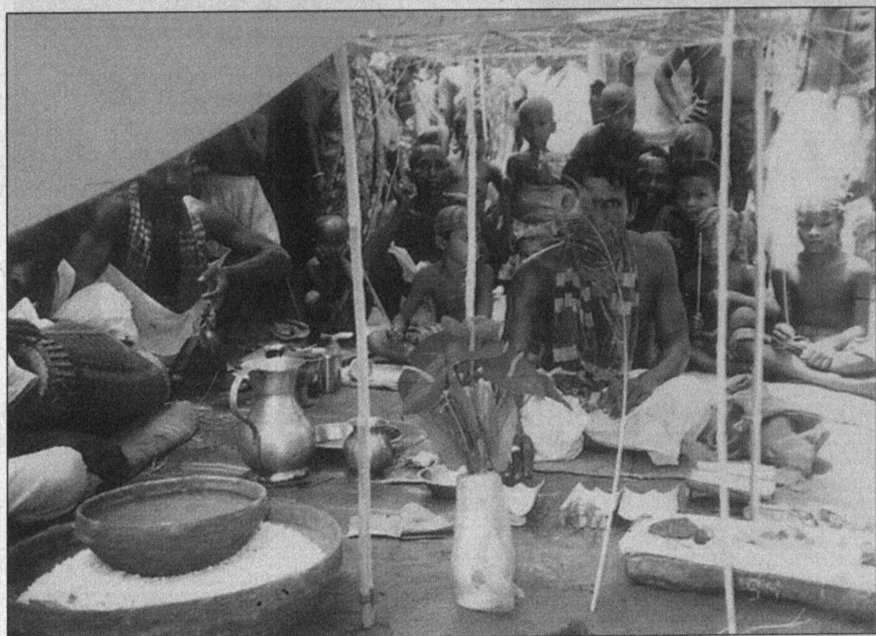
একটি মন্ত্র এরকম 'রাম-লক্ষ্মণ-সীতা দেও ছেড়ে'[১৭]-এই বাক্য উচ্চারণ করা হয় এবং লৌহজ দ্রব্যাদি যেমন ছুরি, কাস্তে প্রভৃতি দ্বারা মাটিতে দুটি সোজা দাগ ও তার উপর ক্রশ চিহ্নিত দাগ দেওয়া হয়। এতে হাড় জোড়া-লাগা বা মচকা উপশম হয় বলে তারা বিশ্বাস করেন।



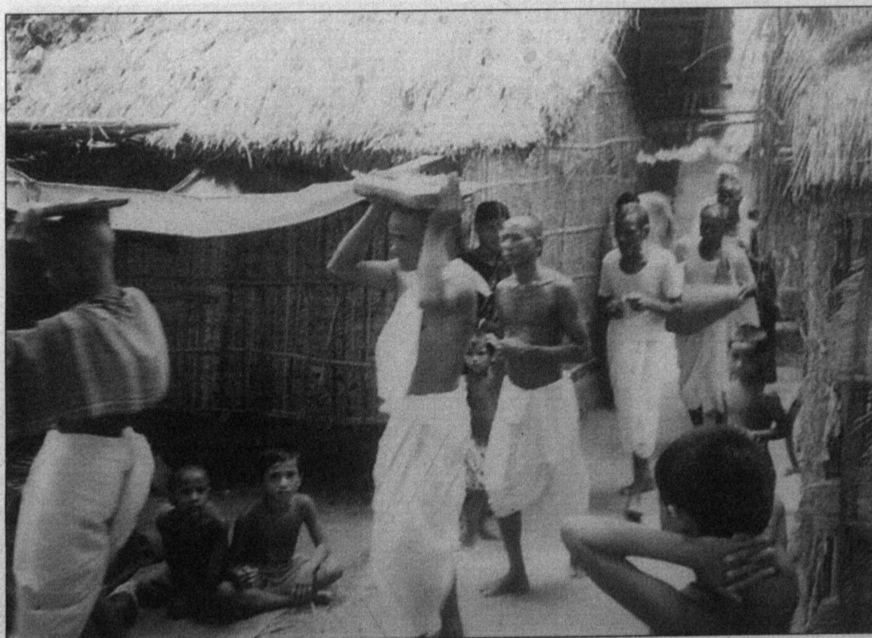
মাঠে কর্মরত শ্রমজীবী নারী-পুরুষ (গড়েয়া, ঠাকুরগাঁও)



গৃহ নির্মাণে নিজেরাই (চাঁচড়া, যশোর)



শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের মূলপর্ব (লস্করা, গড়েয়া, ঠাকুরগাঁও)



শ্রাদ্ধের আনুষ্ঠানিকতা (লস্করা, গড়েয়া, ঠাকুরগাঁও)



পরিবেশ-১ (চাঁচড়া, যশোর)



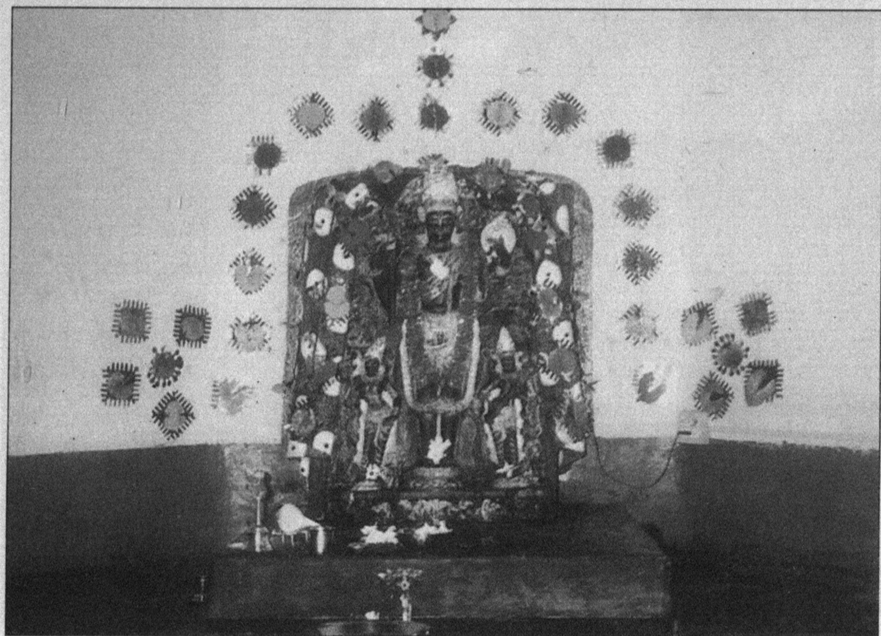
পরিবেশ-২ (চাঁচড়া, যশোর)



পরিবেশ-৩ (চাঁচড়া, যশোর)



কর্মরত নরী-পুরুষ (চাঁচড়া, যশোর)



বিষ্ণুমন্দির (শ্যামসুন্দর গড়েয়া মঠ, লস্করা, ঠাকুরগাঁও)



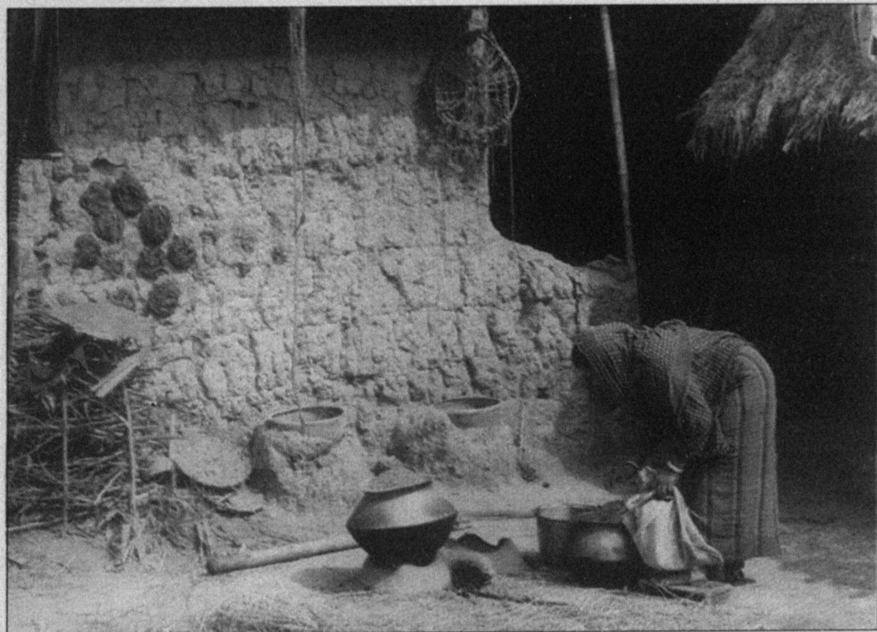
দশমাথা বিশিষ্ট কালীমূর্তি (নীলফামারী)



ঐতিহ্যবাহী পোশাক 'বুকুনি' পরিহিত বৃদ্ধা (লাউথুতি, সুখানপুরী, ঠাকুরগাঁও)



বাঁশের 'মাচাং' ঘর (নীলফামারী)



গৃহকর্মরত নারী (কোচবিহারপাড়া, মহাদেবপুর, নওগাঁ)



মৎস্যজীবী রাজবংশী পুরুষ (চাঁচড়া, বর্মনপাড়া, যশোর)

বিবাহিত রমণীর প্রথম সন্তান গর্ভে সাত মাসের সময়ে সাধভক্ষণ অনুষ্ঠানে ছড়া মন্ত্র, প্রার্থনার মাধ্যমে আশীর্বাদ করা, ধানের সাধভক্ষণও রাজবংশী সমাজে দেখা যায়। ধানের সাধভক্ষণের ছড়ার ৪টি চরণ হলো :

আশ্বিন যায় কার্তিক আসে,
সকল শস্যের গর্ভ বসে।
রামের হাতে গুমা
ধান হইস তিন দুনা[১৮]—ময়মনসিংহ

ভূত–প্রেত দৈত্য দানব ইত্যাদির ভয় থেকে মুক্ত থাকার জন্য সুতো পড়া কিংবা ভূত–প্রেতের ভয় থেকে রক্ষার জন্য গা–ঝাড়া মন্ত্র এদের সমাজে চালু আছে। ঝাড়া মন্ত্র হলো :

মণিমুক্তা দোলো মা মনসার গলে।
আমাকে দেখিয়ে ভূত পিশাচ না চলে।
ডাক–ডাকিনী ভূত–প্রেত তোমরা পঞ্চ ভাই
আমার শরীরে আসে কারো সাধ্য নাই।
কাঙ্গুরি কামাক্ষা মা চণ্ডির আজ্ঞা হাড়িঝিরি পা।
দোহাই মা কংকালী, দোহাই মা ফুল্লরা, দোহাই মা কালী।[১৯]

এরকম বহু বন্ধনমন্ত্র রাজবংশী সমাজে প্রচলিত আছে। যেমন, সর্পবন্ধনমন্ত্র, গৃহবন্ধন মন্ত্র, মাছের কাঁটা গলায় বিঁধলে তা নামানো মন্ত্র, বিষ নামানো মন্ত্র, বশীকরণ মন্ত্র, বাণমেরে কাউকে ক্ষতি করার মন্ত্র, নারী পুরুষের ভালবাসা–প্রেম গাঢ় করার মন্ত্র প্রভৃতি প্রতিষেধক হিসাবে রোগীর শরীরে প্রয়োগ করা হয়। এইসব মন্ত্রের মধ্যে যাদুগুণ (magic power) আছে। এর মাধ্যমে অশুভ শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ ও বশ করে রোগীর রোগ সারানো সম্ভব বলে তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন।

রাজবংশী সমাজে কুকি, গারো, কোচ, মুরং প্রভৃতি উপজাতিদের সমাজে প্রচলিত ধাঁধা'র মতো ধাঁধা'র প্রচলন রয়েছে। ছোটনাগপুরে ওরাওঁ উপজাতির বিয়ে অনুষ্ঠানে যেমন ধাঁধা জিজ্ঞাসা করা হয়, ঠিক তেমনি রাজবংশী সমাজের বিয়ে অনুষ্ঠানে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করা হতো, এখন অবশ্য কমে গেছে। এদের সমাজে এখনো ছেলে–মেয়েরা বিভিন্ন ধরনের ধাঁধা জিজ্ঞাসা করে আনন্দ উপভোগ করেন।

রাজবংশী সমাজে প্রবাদ প্রচলিত আছে। তবে এসব প্রবাদ কে, কখন রচনা করেছিল তা না জানা পর্যন্ত বলা সম্ভব নয় এগুলোর সবই রাজবংশী সমাজের সম্পদ কি–না। তবে একটি দেশের প্রকৃতি, পরিবেশ, সমাজ–সংস্কৃতি, ধর্ম, জাতীয় জীবনের নানান ধারা, ইতিহাস–ঐতিহ্য প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে রচিত প্রবাদ প্রবচন তাদের সমাজ ও সংস্কৃতির বাস্তব চিত্রের প্রতিফলন ঘটে। বাংলায় ব্যবহৃত যেসব প্রবাদ–প্রবচনের প্রচলন আছে তার অনেকগুলো রাজবংশী সমাজের খেটে খাওয়া মানুষ স্বাভাবিক জীবন চর্চার ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকেন। (রাজবংশী সাহিত্যের বিস্তারিত তথ্যাদি পরিশিষ্ট ৩–এ দেখুন।)

তথ্যসূত্র

১. সুধীর কুমার করণ, *সীমান্ত বাংলার লোকযান* (কলিকাতা : ১৩২১)
২ রণজিৎ দেব, 'উত্তরবঙ্গের রাজবংশী : সমাজজীবন ও সংস্কৃতি', *উত্তরবঙ্গের জাতি ও উপজাতি,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪

৩. রণজিৎ দেব, উত্তরবঙ্গের রাজবংশী : সমাজজীবন ও সংস্কৃতি', রতন বিশ্বাস (সম্পা.), *উত্তরবঙ্গের জাতি ও উপজাতি*

৪. ফকরুজ্জামান চৌধুরী, 'রাজবংশী', হাসমত রাশদ (সম্পা.), *পাকিস্তানের উপজাতি* (ঢাকা : পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ১৯৬৬), পৃ. ১৬–২৬

অধ্যায় ১১

রাজবংশী সঙ্গীত

সঙ্গীত জন্মগত স্বভাবের সূত্রেই সমগ্রকে উদ্দীপিত অনুপ্রেরিত করার ঐন্দ্রজালিক হাতিয়ার। গান গেয়ে, নৃত্য করে মানুষ এক সময় কৃপণ প্রকৃতির অবরুদ্ধ ঐশ্বর্য ভাণ্ডারের দ্বার খোলার চেষ্টা করেছিল।[১] প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই মানুষ তার জীবিকার প্রয়োজনে, চিত্তবিনোদনে, পালা-পার্বণ-অনুষ্ঠানে ও ধর্মীয় বিশ্বাসে নৃত্যের সাথে পরিবেশিত হত গান। হয়ত সেই থেকেই পূজা-প্রকৃতি প্রেমকেন্দ্রিক গানগুলো তাদের সমাজে গাওয়া হয় অন্তর থেকে। গানগুলো উৎসবকেন্দ্রিক, ব্রতকেন্দ্রিক কিংবা ঘটনাকেন্দ্রিক বলা যায়। বিবাহ-উৎসবে, ঋতু উৎসবে, ফসলকাটা উৎসবে, দেব-দেবীর পূজা-পার্বণে, বিরহকাতর প্রেমিক-প্রেমিকার উদ্দেশ্যে এই গানগুলো গাওয়া হয়। গানগুলোর মধ্যে ভাওয়াইয়া, চটকা, মৈষাল-মাহুত বন্ধুর গান, মদনকাম, সোনারায়ের গান, পালাটিয়াগান, হুঁদুম দ্যেও-এর গান, কাতিপূজার গান, বারমাসি গান, হ্যাঁচড়া পূজার গান, আতি (রাত্রি) জাগার গান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও রাজবংশী সমাজে দেহতত্ত্ববিষয়ক গীত, রাধাকৃষ্ণের প্রেমের গান, শিবের গাজনের গান, ধামগান, বিষহরা দেবী বা সত্যপীরের গান উল্লেখযোগ্য।

তাদের সমাজে ধর্মীয় দেব-দেবীকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করার উদ্দেশ্যেই শুধু এসব ধর্মীয় গানগুলো গাওয়া হয় না, বৃষ্টি আবাহনের জন্য, ফসল ফলানো ও বৃদ্ধির জন্যও বৃষ্টির দেবতা হুঁদুম দ্যেও এর গান[২] গাওয়া হয়। হুঁদুম দ্যেও-এর গানের মতো একই উদ্দেশ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার বান্টু জাতির মধ্যে বৃষ্টি আবাহনের উদ্দেশ্যে উলঙ্গ হয়ে নাচে ও গান গায়।[৩] গ্রীসের প্রজনন শক্তির দেবতা দিঅনিসাসকে কেন্দ্র করে শস্যপূজার গান ও উপাসনার উল্লেখ পাওয়া যায়।[৪] রাজবংশী রমণীর বিরহকাতর হৃদয়ের আর্তি প্রকাশ পায় ভাওয়াইয়া গানে; চটকা গানেও করুণ সুর প্রতিধ্বনিত হয়। তাদের রমণীদের পরকীয়া হৃদয়ের আর্তি এই পরকীয়া গানটিতে ফুটে উঠেছে :

"বালুতে রান্ধিনু বালুতে খানু
সাগরে ভাসানু হাড়ি।
বিয়ার স্বামী মরিলে মাছ ভাত আমি খাইমরে
বন্ধু মরিলে হইম রাড়ি।"[৫]

এদের সমাজের মৈষাল বন্ধুর গান, মাহুত বন্ধুর গানগুলো এদেশের সকল শ্রেণীর মানুষকে স্পর্শ করে। মৈষাল বন্ধুর গানগুলোতে স্বামী-স্ত্রীর বিরহকাতর প্রাণের কথাই শুধু নয়, পরকীয়া প্রেমের সৌন্দর্যও প্রকাশিত হয় এসব গানে। যেমন—

"আজি ছাড়িয়া না যান চ্যাংরা মৈষাল রে।
মইষের পিটিৎ চড়িয়া মৈষাল

ছিড়েয়ে কাশিয়ার ফুল।
আষাঢ়ো শ্রাবণ মাসে নদী
হুলাস্থূল রে।"[৬]

রাজবংশী রমনীর হৃদয়ে স্বামীর প্রতি অগাধ ভালোবাসার নিদর্শন পাওয়া যায় তাদের গানের মধ্যে। রমণীর মনের করুণ আকুতি ও বিরহ্ ঝরে পড়ে বিভিন্ন প্রকার ভাওয়াইয়া গানে।

রাজবংশীরা বন-দেবতার পূজা-পার্বণে গান গেয়ে, আচার-অনুষ্ঠান পালন করে আনন্দে মাতোয়ারা হয়েছে যেমন, তেমনি করে হিংস্র জীবজন্তুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রার্থনাও জানিয়েছে। এসব বনদেবতার মধ্যে বাঘের দেবতাকে কেন্দ্র করে সোনা রায়ের গান, ভাণ্ডামী পূজার গান, হাতি পূজা, কুমারী পূজা, মহারাজার পূজায়ও গান গাওয়া রাজবংশী সমাজের ধর্মেরই একটা অঙ্গ। সেকালে অনিষ্টকারী দেবতার কোপ এড়াতে এদের সমাজে গ্রামদেবতার উদ্দেশ্যে গাওয়া হতো—

"বাপো দোহাই দিনু তোক্।
গাবুর বয়সে দেখা না পায় তোক্।"[৭]

দক্ষিণবঙ্গে বৃহত্তর যশোর এলাকার রাজবংশী সমাজে হ্যাচড়া পূজার গান, গাজনের গান ও রাত্রী জাগরণের গান উল্লেখযোগ্য। হ্যাঁচড়া পূজার গানগুলো মহামারী, পাঁচড়া, ওলাওঠার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য গাওয়া হয়। আর মেয়েলীব্রত রাত্রী জাগরণের গানে প্রকাশ পায় বৃষ্টির প্রার্থনা, গ্রামের মঙ্গল ও পরিবারের সুখ-সমৃদ্ধি কামনা।

রংপুরে যেসব হুদুমা গান প্রচলিত রয়েছে তার মধ্যে একটি হুঁদুমা গান এরকম :

"হিল হিলাইছে কোমরটা মোর শিরা শিরাইছে গাও।
কোনঠে কি না গেইলে এলা হুদুমার দেখা পাও।
পটানী খান পড়েছে খসিয়া,
আইসেক রে হুদুমা দেওয়া
তোর বাদে মুই আছ বসিয়া।"[৮] —রংপুর

রাজবংশী সমাজে কৃষিজ ফসল উৎপাদনে, সন্তান কামনায় উর্বরতার দেবতা শিবকে কেন্দ্র করে শিবের গাজন, শিবের বন্দনা গান লোকোৎসব পালিত হয়। শিবপার্বতির গার্হস্থ্ জীবনের চিত্র গাজন গানে প্রস্ফুটিত হয়। যেমন—

"ধান লাড় ধান লাড়, গৌরী আউলাইয়া মাথার কেশ।
জল চাইলে না দেও জল এই বা কোন দেশ?
নেও ঝাড়ি নেও পানি দেও পানি, দেশ কোন নিন্দ?"[৯] —ময়মনসিংহ

আবার চৈত্র মাসের শিবপূজা উপলক্ষে রাজবংশী সমাজে যে 'চৈতে দেল' উৎসব পালিত হয় সেখানে শিবের বন্দনা গীত এরকম :

"এস আলোকে বরণে মধুর ওই পবনে কাঞ্চন চরণে,
মম হৃদি মাঝে আলোকে।
এস দ্বীনের দ্বীনহীন অকেজো দ্বীন হীন
মম হৃদি মাঝে আলোকে।"[১০]—ঝিনাইদহ

মালদহ এলাকাতে শিবকে কেন্দ্র করে তাদের সমাজে বৃষ্টির আকুতি প্রতিধ্বনীত হয়। তাদের একটি গীতের চরণ :

"শিব, তোমার লীলা খেলা কর অবসান,
বুঝি বাঁচে না আর জান।
অনাবৃষ্টি কর‍্যা সৃষ্টি, মাটি করল্যা নষ্ট হে
দৃষ্টি থাকতে কষ্টি কইর‍্যা, দেখছ না কি কষ্ট হে।"[১১]—মালদহ

এগুলো ছাড়াও ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রপাত থেকে ফসল রক্ষায় শিরালীগান, ধানের সাধ খাওয়ানোর গান, গোরক্ষনাথের শিরনী প্রভৃতির আচার ও গান রাজবংশী সমাজে পালিত হয়।

মা-কালীর থানে রাত্রি জাগরণী গানের মধ্য দিয়ে রাজবংশী রমণীরা গ্রামের, পরিবারের মঙ্গল কামনা করেন। মঙ্গল কামনার একটি গান নিম্নরূপ :

"হ্যাড়ে দেয় চ্যাছে-ছুঁলে হ্যাড়েনি দেয় ছাড়া
স্বর্গের ঐ পঞ্চ কন্যা দিয়ে দেয় আল্পনা
বুড়ি পান-গুয়ো সাজাই-সুবর্ণের ঐ থালে
ঝারি মেজে দিব জল মা তোমার ঐ চরণে
পঞ্চ প্রদীপ জ্বেলে দিই মা তোমার ঐ চরণে।"[১২] —ঝিনাইদহ

এসব জাগরণী গানে তাদের বৈষয়িক চেতনা, কল্যাণ কামনা ও ধন-সম্পদ বৃদ্ধির কামনা নিহিত। রাজবংশী সমাজে জাগরণী গানেও বৃষ্টি কামনার সন্ধান নিম্নলিখিত গানটিতে পাওয়া যায় :

"মেঘ নাই মেঘ নাই মেঘের আন্ধারী
কালো মেঘে তারা বাজাইরে বাঁশী
ঐ দেখা যায় তুলসীর মন্দিরে
ধরা ছড়া যেন বৈরাগীর বেশে
একটু খানি বিলম্ব করো রে,
কালীর মাথায় ছাতি ধরে আসিগে।"[১৩]—ঝিনাইদহ

এভাবে প্রথম পাঁচ চরণে পরপর হরিঠাকুর, শীতলা ঠাকুর, বারাসে ঠাকুর ও পঞ্চদেবতার মাথায় ছাতি ধরার কথা গানের সুরে প্রকাশ পায়। এই জাগরণী গান থেকে বুঝা যায় রাজবংশীগণ কালী, হরিঠাকুর, শীতলাঠাকুর, বারাসেঠাকুর প্রভৃতির পূজা ও ভক্তি-শ্রদ্ধা করেন। হ্যাঁচড়া পূজা করা হয় কলেরা, বসন্ত, পাঁচড়া ইত্যাদির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। হ্যাঁচড়া পূজার গানগুলো সাধরণত বালক-বালিকা, কিশোরী-তরুণী মেয়েরা গেয়ে থাকে। হ্যাঁচড়ার একটি গান হলো :

"পায় দুয়োর দে ওঠে লো সেই নানান গাছের লতা
লো সেই নানান গাছের লতা
আগে যদি জানতাম লো সেই করুণারো কথা
শালার নলদে বাঙালি, শালার পানের কাঙালি
আগে যদি জানতাম লো সেই পানের এত কড়ি
লো সেই পানের এত কড়ি

রাস্তার মুড়োয় দোকান দিয়ে বেচতাম ধিরি ধিরি
শালার নলদে বাঙালি, শালার পানের কাঙালি।" —ঝিনাইদহ।

রাজবংশী সমাজের এসব ঐতিহ্যবাহী গানে সংসারের মঙ্গল, গ্রামের মঙ্গল কামনা, নারীর বিবাহিত-সংসার জীবনের কর্মাচার, সুখ-দুঃখের নানান কথা ও ভাব পাওয়া যায়।

এদের সমাজের গানগুলো আধুনিক বাদ্যযন্ত্রের তাল, লয়ে ও ক্লাসিক্যাল সুরে গাওয়া হয় না। গানগুলো সাদামাটা ও অলঙ্কারহীন, কিন্তু চাঁদের মোহনীয় আলোয়, ফুলের গন্ধে, বর্ষায়-বসন্তে সমবেত কণ্ঠে যখন গানগুলো গীত হয়, তখন এক অপরূপ দ্যোতনায় পরিবেশ মুখরিত হয়। অধ্যাপক নির্মল কুমার বসু উপজাতীয় এসব গান সম্পর্কে যে মূল্যবান বক্তব্য প্রকাশ করেছেন তা সত্যিই তাদের জীবনের অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ। অধ্যাপক বসুর ভাষায়, "Poems of this nature are not recited but always sung; and the feelings and sentiments which they express, as well as the dances which accompany them, help to add a touch of beauty to the plain joys and sorrows of existence."[১৪]

রাজবংশী সমাজে-সংস্কৃতিতে-জীবন-মননে-বিশ্বাসে কত যে সাহিত্যের উপাদান লুকায়িত রয়েছে তা বোধকরি গভীরে প্রবেশ করলেই বোঝা সম্ভব। তাদের সমাজ ও সংস্কৃতিতে, জীবন ও মননে যেসব সাহিত্যের উপাদান মিশে আছে তা প্রাচীন বাঙালা সাহিত্যের উপাদানের সঙ্গে বহুলভাবে সংশ্লিষ্ট। যেসব সাহিত্য বিশেষ করে উত্তরবঙ্গ, ত্রিপুরারাজ্য, নেপাল ও আরাকান রাজসভা থেকে সৃষ্ট, সেসব সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল প্রধানত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মকলহ বা স্ব স্ব ধর্ম প্রভাব স্থাপন করার উদ্দেশ্যে। সেইসব সাম্প্রদায়িক ও গৌণ প্রভাব বিশ্লেষণপূর্বক রাজবংশীদের জীবনে-মননে-বিশ্বাসে যেসব সাহিত্য প্রভাব লক্ষ করা যায়, সেগুলো হলো বৌদ্ধ প্রভাব, শৈব প্রভাব, শাক্ত প্রভাব (যেমন, মনসা, চণ্ডি) প্রভৃতি। এছাড়াও পরবর্তীকালে হিন্দু ধর্মাবলম্বী হওয়ার ফলে পৌরাণিক প্রভাব, বৈষ্ণব ও গৌরাঙ্গ প্রভাবের সন্ধান পাওয়া যায়।

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজে মানিক চাঁদ ও গোপিচন্দ্রের গীতের প্রভাব আছে। এগুলোতে বৌদ্ধ প্রভাবের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে। শূন্যপূরাণে যে ধর্মপূজা বা ধরম পূজার কথা পাওয়া যায় তা এদেশের রাজবংশী, ডোম, পোদ, কৈর্তব্য, বাগদি প্রভৃতি জাতিসত্তার লোকজন ভক্তি শ্রদ্ধা করেন। রামাই পণ্ডিত ব্রাহ্মণ হয়েও শূণ্যপুরাণে ব্রাহ্মণবিরোধী ক্রিয়া করেছিলেন। চর্যাপদে হাড়িপা (হাড়ি), ডোম্বিপা (ডোম) শবরীপা (শবর) প্রমুখ পদ রচয়িতাগণ হীন জাতির পণ্ডিত বলে ধারণা হয়, যদিও ভাষাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকগণ তাদের হিন্দু বর্ণের পণ্ডিত হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণের প্রারম্ভের ভাব ও ভাষায়ও অহিন্দুর গন্ধমাখা ছিল। তিনি ধর্মঠাকুর ভিন্ন আর কাউকে নমস্কার করেন নি।

রাজবংশী সমাজে এখনো যেসব ডাক, পুরুষের বচন, খনার বচন প্রভৃতির প্রচলন লক্ষ করা যায় তা বৌদ্ধযুগের রচনা বলে আবিষ্কৃত হয়েছে। সেন রাজাগণ বৌদ্ধপাল রাজাদের পরাভূত করে রাজ্য অধিকার করার পর শৈব ধর্ম সম্প্রসারিত হয়। শৈব ধর্মের প্রভাবে ধর্মঠাকুরের স্থলে শিবের আগমন ঘটে। এই শৈব ধর্মের শিব ও ভগবতীকে কেন্দ্র করে রাজবংশী সমাজ ও ধর্মীয় জীবনে শিব ও ভগবতী পূজা এখনো মহাসমারোহে পূজিত হয়।

শৈব প্রভাবের পর রাজবংশী সমাজে যেসব লৌকিক দেব-দেবীর অনুপ্রবেশ ঘটেছে, এবং অদ্যাবধি যত্নসহকারে পূজিত হয়, তাঁরা হলেন শীতলা, বিষহরা মনসা, মঙ্গলচণ্ডী ও ষষ্ঠী। মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যে উল্লিখিত এসব দেব-দেবী জনমনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিল বলেই হয়ত এগুলোকে পৌরাণিকিকরণ করা হয়েছে।[১৫] রাজবংশী জীবন ও সাহিত্যে লৌকিক দেব-দেবীর আবির্ভাবের কাহিনী, পূজা-অর্চনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে। এছাড়া রাজবংশী সমাজে প্রচলিত আদি ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় ও যাদুপ্রভাবজাত লৌকিক সঙ্গীত ও সামাজিক অনুষ্ঠানে প্রচলিত গানগুলো সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, তাদের ধর্ম প্রভাবজাত সঙ্গীতগুলো যেমন—হুঁদুম দ্যেও এর গান, হ্যাঁচড়া পূজার গান, জাগগান, মনসার গান, সোনারায়, গোরক্ষনাথের গান, ষষ্ঠীমঙ্গলের গান এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে প্রচলিত সাধভক্ষণের গান, শিশুর ক্ষৌরকর্মের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত গান, বিয়ের গান প্রভৃতি সম্পূর্ণ আলাদা সমাজ-সংস্কৃতির সন্ধান দেয়। রাজবংশী সমাজে ও জীবনে যেসব লোককাহিনী-ব্রতকথা, পুরাকাহিনী, রূপকথা প্রভৃতির অস্তিত্ব বর্তমান রয়েছে, সেগুলো যেমন তাদের জীবনের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে, তেমনি এদেশে তারা আদি অধিবাসী-এ বক্তব্যের সমর্থন যোগায়। লোকনাট্যগুলোর অধিকাংশই পৌরাণিক কাহিনী সমর্থনে রচিত হয়েছে। এছাড়াও ধর্মীয় আন্দোলন, ইংরেজ শাসন ও অত্যাচারের কাহিনী নিয়ে রচিত লোকনাট্যকগুলো তাদের সমাজে সমাদৃত। তাদের লোকনাটকগুলোর মধ্যে রয়েছে 'রাজা হরিশ্চন্দ্রের শ্মশান মিলন', 'রাধা-কৃষ্ণের মানভঞ্জন', 'শ্রীকৃষ্ণের নৌকাবিলাস', 'নিমাই-সন্ন্যাস', 'বেহুলা-লক্ষ্মীন্দরের পালা', 'বিজয়-বসন্ত' প্রভৃতি। তন্ত্রমন্ত্র, প্রবাদ-প্রবচন, লোকসংস্কার লোকবিশ্বাস, চিকিৎসাব্যবস্থা, ছড়াসাহিত্য, ধাঁধা প্রভৃতি তাদের সমাজ ও সংস্কৃতির চিত্র উদ্ধারে গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে যেমন সমাদরযোগ্য, তেমনি সাহিত্যরসে সমৃদ্ধ।

রাজবংশীদের নিজস্ব যেসব সঙ্গীত তা নিঃসন্দেহে লোকসঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত। এসব সঙ্গীতের পারিসরিক প্রসারণ (spatial diffusion) ঘটেছে। তবে যেসব অঞ্চলে এসব সঙ্গীতের উদ্ভব ঘটেছিল তার উৎপত্তির কারণ খুঁজলে এর পিছনে একটি সমাজতাত্ত্বিক ও ভৌগোলিক যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। এসব সঙ্গীত কোনো ব্যক্তিমানুষের সৃষ্টি প্রতিভার গুণে বিকশিত হয়েছে, এবং তারপর সমাজে বংশানুক্রমে লালিত হয়েছে, এবং একসময় হয়ত সেগুলো পরিব্যাপ্ত হয়েছে পার্শ্ববর্তী অন্য সমাজে। তবে সঙ্গীত যে-অঞ্চলে প্রথম উৎপত্তি হয় সেই অঞ্চলের পরিবেশের প্রভাব বিরাজ করে।

নিয়ানডার্থাল মানুষের মধ্যে লোককৃতি চর্চার সাক্ষ্য[১৬] থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, সমসাময়িক কালেই নৃত্য-সঙ্গীতের উদ্ভব হয়েছে।[১৭] তবে রাজবংশীদের মধ্যে লৌকিক দেবদেবীর অর্চনায় গান, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ভয়ভীতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যেসব গান পাওয়া যায়, সেসব গানের সাথে মধ্যযুগীয় সাহিত্যের উপাদানের সাথে কিছু মিল পাওয়া যায়। এ থেকেই স্পষ্টভাবে বলা যায় মধ্যযুগীয় সাহিত্য পরবর্তী সময়কালেই কিছু কিছু গানের উদ্ভব ঘটেছে। গানগুলোর মধ্যে রয়েছে সোনারায়ের গান, গোরক্ষনাথের গান, বনবিবির তুষ্টির গান, ত্রিনাথের গান, হ্যাঁচড়া পূজার গান, জাগগান, চড়ক পূজায় শিবের স্তুতিগান, মনসা পূজার গান, লক্ষ্মী পূজার স্তুতি প্রভৃতি। তবে বৃষ্টি আবাহনের উদ্দেশ্যে যে হুঁদুমা নৃত্য ও গানের প্রচলন অদ্যাবধি চলে আসছে, তার ধরন, যাদুপ্রভাব ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করলে

বুঝা যায় যে হুঁদুম দ্যেও এর উদ্দেশ্যে নৃত্য ও গান বাংলা ভাষার প্রাপ্ত প্রাচীনতম গ্রন্থ চর্যাপদেরও পূর্বে কোনো এক অজ্ঞাত সময়কালে সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া রাজবংশীদের বর্তমান জীবনের সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে যেসব গান মিশে যাচ্ছে সেসবগুলোর মধ্যে রয়েছে বৈষ্ণব পদাবলী, কীর্তন, শাক্ত ও বাউল গান, ধুয়ো গান, পৌরাণিক পালাগান প্রভৃতি। বিয়ে উপলক্ষে ধাঁধার প্রচলন, ফসল কাটার সময় আনন্দ উপভোগ ও ক্লান্তি দূর করার জন্য ধাঁধার ব্যবহার, এবং বিয়ের গীত রাজবংশীদের মধ্যে কবে থেকে প্রচলন হয়েছে তা সঠিকভাবে জানা না গেলেও এটা বলা যায় যে, এগুলো আদি ঐতিহ্যবাহী। ষোড়শ শতকে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবে কীর্তনের জনপ্রিয়তা ও রামনামের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়।[১৮] চৈতন্যপ্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম ও মঙ্গলকাব্যগুলোতে বিধৃত অনার্য দেবীর উপাসনা কালক্রমে আধ্যাত্মবাদে রূপান্তরের মাধ্যমে হিন্দু ধর্মে মিশে যায়। আর লৌকিক দেবদেবীকে আশ্রয় করে যেসব কাহিনী প্রচলিত রয়েছে তা মঙ্গলকাব্যে পাওয়া যায়। এছাড়া রাজবংশী সমাজজীবনে যে শনির পাঁচালী, কবিগান, ভাবগান প্রভৃতি লোকসঙ্গীতের প্রচলন রয়েছে তা সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে উদ্ভূত হয়েছিল, যা কালক্রমে রাজবংশীদের জীবনের সঙ্গে মিশে গেছে।

উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে উদ্ভাবিত musicology বিংশ শতাব্দীর ত্রিশ-চল্লিশের দশকে নৃতত্ত্বের সাথে মিশে Ethnomusicology তে রূপলাভ করে।[১৯] বাংলা লোকসঙ্গীতের আলোচনায় ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য[২০] সর্বপ্রথম নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলার লোকসঙ্গীতের জাতিতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিতে প্রয়াসী হয়েছেন। পরবর্তীকালে ড. আশরাফ সিদ্দিকী,[২১] মুহম্মদ আবদুল হাই[২২], রওশন ইয়াজদানী[২৩], সামীয়ুল ইসলাম[২৪] অধ্যাপক আবদুল হাফিজ[২৫], প্রভাত কুমার গোস্বামী[২৬], সুধীরকুমার করণ,[২৭], দীলিপকুমার মুখোপাধ্যায়[২৮] জাতিতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন।

বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে উপজাতিদের অবদান কম নয়। ভৌগোলিক ও জাতিতাত্ত্বিক দিক থেকে বিচার-বিশ্লেষণ না-করা গেলে সেসব সমাজের সভ্যতা সংস্কৃতির বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক পরিচয় তুলে ধরা সম্ভব নয়। রাজবংশীদের সঙ্গীত সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে।

রাজবংশীদের সঙ্গীত প্রধানত দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। (ক) ধর্মীয় ও যাদুপ্রভাবজাত সঙ্গীত, এবং (খ) ধর্মনিরপেক্ষ সঙ্গীত।

ক) ধর্মীয় ও যাদুপ্রভাবজাত সঙ্গীত

১. যাদুপ্রভাবজাত প্রার্থনামূলক সঙ্গীত : লৌকিক দেবতার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের পশুপ্রাণীর আক্রমণ, জরাব্যাধি, যেমন-বসন্ত, কলেরা প্রভৃতির আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রার্থনামূলক সঙ্গীত গাওয়া হয়। বাঘাই সিরনি, বনবিবির, হুঁদুমার গান, হ্যাঁচড়া পূজার গান, জাগগান, সোনারায়, গোরক্ষনাথের গান, মনসার, গান, মেছেনি-তিস্তা বুড়ির গান প্রভৃতি যাদুভাবজাত প্রার্থনামূলক সঙ্গীত।

২. ধর্মাচারমূলক সঙ্গীত : রাজবংশীদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে, গ্রাম মাঙ্গলিক পূজা-উপলক্ষে, পূজার থানের সম্মুখে ও সামাজিক মঙ্গল কামনায় গৃহে গৃহে এই সঙ্গীত পরিবেশ করা হয়। যেমন-চৈতেদেল উপলক্ষে চড়ক পূজার গান, ত্রিনাথের গান, ভাবগান, কীর্তন গান ইত্যাদি ধর্মাচারমূলক সঙ্গীতে যাদুর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়।

৩. **কৃষিব্রতমূলক সঙ্গীত:** কৃষিজ ফসল পোকা-মাকড়ের হাত থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে এই সঙ্গীত গাওয়া হয়। যেমন-কার্তিক পূজার বা কাতি পূজার গান, ষাট পূজার গান, হাট ঘুরনীর গান ইত্যাদি কৃষিব্রতমূলক সঙ্গীত।

খ) ধর্মনিরপেক্ষ সঙ্গীত

১. কর্মউদ্দীপনামূলক সঙ্গীত : কর্মে উদ্দীপনা ও প্রেরণাযোগানোর উদ্দেশ্যে মাঠে ঘাটে এই গান গাওয়া হয়। এই গানগুলো অবশ্য গ্রামীণ গানের আসরেও গাওয়া হয়। যেমন— ধুয়ো গান।

২. প্রেমমূলক সঙ্গীত : সহজাত প্রবৃত্তির তাড়নায় প্রেমজ অনুভূতি থেকে এসব গান গাওয়া হয়। হৃদয়ের বিরহ, বিরাগ, মান-অভিমান, গোপন-অভিমান প্রভৃতির উদ্দেশ্যে এসব গান সৃষ্টি হয়েছে, যেমন—ভাওয়াইয়া চটকা, ক্ষীরোল ইত্যাদি।

৩. আচার-সংস্কারমূলক পারিবারিক সঙ্গীত : পারিবারিক জীবনে রাজবংশীরা বিভিন্ন ধরনের আচার-উৎসবের উদ্দেশ্যে এই সঙ্গীতগুলো গেয়ে থাকে, যেমন—সাধভক্ষণ, বিবাহ সঙ্গীত, রজঃসংক্রান্তির গান, অন্নপ্রাশনের গান প্রভৃতি।

যাদুপ্রভাবজাত প্রার্থনামূলক সঙ্গীত : রাজবংশীদের জীবন দর্শনে লক্ষ করা যায় যে, তারা প্রকৃতির কাছে নিজেদের সমর্পণ করেছেন। প্রকৃতির বিভিন্ন বিপর্যয়, পশু-প্রাণীর হাত থেকে রক্ষার জন্য তারা শ'শ' বছর ধরে সোনারায়ের গান গেয়ে থাকেন। তাছাড়া গোরক্ষনাথ, হুঁদম দ্যেও এর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা সঙ্গীতও গেয়ে আসছেন। অতি প্রাকৃত শক্তির কাছে তাদের যে নম্র মনোভাব তা যুগ যুগ ধরে বিধৃত হয়েছে, তাদের আচার-আচরণে, ধর্মীয় চেতনায়, বিশ্বাস সংস্কারে ও উৎসব অনুষ্ঠানে।

মানুষের ধ্যান-ধারণা, আচার-সংস্কার, পূজা-পার্বণ ও উৎসব অনুষ্ঠান তাদের মনোজ বিশ্বাস-সংস্কার থেকে উৎসারিত হয়। বিশ্বাস মূলত দু ধরনের। প্রথমত ধর্মীয়, দ্বিতীয়ত যাদুবিদ্যা প্রভাবিত।[২৯]

রোগব্যাধির হাত থেকে নিজেদের রক্ষা, তার প্রকোপ থেকে মুক্তিলাভ এবং জীবজন্তুর হাত থেকে রক্ষা পেতে আগেকার মানুষেরা অপদেবতার আত্মা কল্পনা করতো। অশিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত মানুষজন এইসব লৌকিক দেব-দেবীর কল্পনা ও পূজাচারের উদ্ভব ঘটিয়েছেন। এই সব দেব-দেবী প্রকৃতি ও চরিত্রের দিক দিয়ে মানবকেন্দ্রিক।[৩০] এই লৌকিক দেব-দেবী মানবীরূপে আরোপিত হয়ে সময়ের বিবর্তনে ধীরে ধীরে দেবত্ব লাভ করেছে।

হুঁদুম দ্যেও-এর গান : রাজবংশী সঙ্গীতের মধ্যে যে-সঙ্গীত এখনো আদিম ঐতিহ্যবাহী হিসাবে সমাজে প্রচলিত রয়েছে , সেটি হলো হুঁদুম দ্যেও এর উদ্দেশ্যে নৃত্যগীত। হুঁদুম দ্যেও বৃষ্টির দেবতা। প্রকৃতিতে চৈত্র্য-বৈশাখ মাসে খরা-অনাবৃষ্টি দেখা দিলে রাজবংশী মেয়েরা বিশেষ করে বিধবা মহিলারা বিবসনা হয়ে নৃত্যসহ গীত পরিবেশন করতেন। এ নৃত্যগীতের উদ্দেশ্যে হলো হুঁদুম দ্যেও দেবতাকে খুশি করা। হুঁদুম দ্যেও এর উদ্দেশ্যে যে-গান পরিবেশিত হয় তা যাদুপ্রভাবজাত। এগুলো তাদের সমাজের চিরন্তন ধর্মীয় বিশ্বাস প্রকৃতি পূজার প্রত্যক্ষ প্রভাব বহন করে চলেছে। হুঁদুম দ্যেও এর উদ্দেশ্যে নিবেদিত বৃষ্টি আবাহনী সঙ্গীত নিম্নরূপ :

গান–১ "আয় আয় হুদুমাও
আয় ঝাড় তোর শো শেয়া
মেঘ নিয়া যা ভাসেয়া
হুদুমা নিলে নাঙল জোয়াল
হুঁদুমী নিলে মই—
আধ ঘাটাতে যায় হুদুমী
চিতর হয়া পইল।"[৩১]

গান–২ "আয়রে দেওয়া গর্জি/ধান চাল যাক ভিজি
আয়রে দেওয়া শো শেয়া মাং নিয়া যাক ভাসেয়া
আয়রে দেওয়া ডাকিয়া/ধান চাল যাক ভাসিয়া
আয়রে দেওয়া ডাকিয়া/দই চিড়া দেং মাখিয়া"।[৩২]

গান–৩. "হিল হিলায়ছে কমরটা মোর/শির শিরায়াছে গাও।
কোণঠে কিনা গেইলে এলা/হুদুমার দেখা পাও।
পাটানী খান পড়ছে খসিয়া,
আইসেক রে হুদুমা দেও/তোর বাদে মুঁই আঁছ বসিয়া।"[৩৩]

গান–৪ "কালো ম্যাঘোক পূজো মাও মুঁই/কালা কইতর দিয়া।
ধওলা ম্যাঘোক পূজো মাও মুঁই/ধূপ সেন্দুর দিয়া
কি ম্যাঘোরাজ জমিনে বইষ্যো গিয়া।
তোমার নরনোক মরেছে ম্যাঘোরাজ/জল জল বলিয়া।
এক আড়া জল দে ম্যাঘোরাজ পিরথিমি ছিটিয়া
কি ম্যাঘোরাজ জমিনে বইষ্যো গিয়া[৩৪]।"

গান–৫ "হুঁদুম দ্যাওরে হুদুম দ্যাও এক ছলকা পানি দ্যাও
ছুঁয়ায় আনি নাই পানি ছুঁয়ায়–ছুঁতি বারা পানি
কালা ম্যাঘ ধওল ম্যাঘ ম্যাঘ সোদর ভাই।
এক ঝাঁক পানি দ্যাও গা ধুবার চাই।"

গান–৬ "হুঁদুমা আয় আয় আয়রে হাল বহাবার যাই
তোক কি আরো কবার নাগে তোরে কি ফমে নাই॥
হুদুমা আয় আয় আয়রে... ।"

গান–৭ "আসিল হুদুমা দ্যাও দুয়ার ছাড়িয়া দ্যাও
বেটা ছাওয়া নোকলা তমরা পালাও রে পালাও।"

গান–৮ "আগ–দুয়ারী কে রে, পাছ দুয়ারী কে রে—
আসিছে হুদুমা দুয়ার খুলিয়া দে রে—"

গান–৯ "হুদুম হুদুম হুদুম রে, হুদুম কি কাম করে রে
ক্যাশ দিয়া ঘর ছায়া হুদুম ভিজি মরে রে।"

গান–১০ "হুদুম দ্যাওরে হুদুম দ্যাও হাগি আচ্ছি পানি দেও
হামার দ্যাশত নাই পানি হ্যাগা টিকার বারা পানি॥"

গান–১১ "ওঠ হুদুম চৈতন হান চক্ষু মেলি চাও
আগুনে না পোড়া গেইছে মোর সর্ব গাও
ওরে ম্যাঘ কালা ম্যাঘ দুইজনে সোদর ভাই
হুদুম চেতন হইছে এলা এ্যাও ধুয়রা বাড়ি যাই।"

গান–১২ "থাক থাক বিটিলা হুঁদুম/বরিসা ছয়খান মাস
কি নব দূর্গা হুঁদুম রে।
চরোতে বসিয়া হুঁদুম দেখে/চতুর দিকে
কি নব দুর্গা হুঁদুর রে
এবার যদি দোন ওঠে তোর/নিজের মামিক দিয়া
কি নব দূর্গা হুদুম রে
এবার যদি দোন ওঠে তোর/নিজের বইনক দিয়া
কি নব দূর্গা হুঁদুম রে।
এই চান্দে বিটিলা হুঁদুমের নাম কি
কি নব দুর্গা হুঁদুম রে।"[৩৫]

বনবিবি বা বন দূর্গার গান : বন বা অরণ্যের অধিপতি হিসাবে বনবিবি বা বন দুর্গাকে কল্পনা করা হয়েছে। বনবিবি বা বনদুর্গা পৌরাণিক দুর্গার একটি লৌকিক রূপমাত্র।[৩৬] বনদেবী, বনবিবি বা বনদুর্গা এরা অভিন্ন। বিভিন্ন এলাকার বনদেবীকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করে থাকে। বনের দেবদেবী ও পীর–পীরানীকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে বনবিবির মুরগী মানত ও শিরনী, বনদেবীর ব্রত প্রভৃতি আচার–অনুষ্ঠানের। এই আচার অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে বনদুর্গার গান, যেমন :

"লাম লাম বনদুর্গা, ষাইট শেওড়ার নীচে
কি মনে লামিবাম আমি শাড়ী নাই আমার সঙ্গে।
সইয়ারে পাঠাইয়া দিছি, নশী বাজারের শ'রে।
শাড়ী যে আনিছেন সইয়ায় সিপিরায় বইলে।
লাম লাম বনদুর্গা, ষাইট শেওড়ার নীচে।"[৩৭]

বনবিবির আচার–অনুষ্ঠান ও গান শেষে রাজবংশীদের মধ্যে গোষ্ঠীভিত্তিক চেতনায় গোষ্ঠীর সকল বাড়ি থেকে চাল–ডাল–সবজী মাগন করে রান্না–বান্না করে একত্রে বসে খাওয়া হয়, ও আনন্দ উৎসব করা হয়। এই আচারটি ঝিনাইদহ জেলার একটি গ্রাম থেকে গবেষক প্রত্যক্ষ করেছেন।

সোনারায়ের গান : উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের মধ্যে সোনারায় ব্যাঘ্রদেবতা হিসাবে পূজিত হয়। জঙ্গলবেষ্টিত অঞ্চলে ঠাকুর সোনারায়কে সন্তুষ্ট করার জন্য এই গান গাওয়া হয়।

এগুলো অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক গান। সোনারায় লৌকিক দেবতা। সোনাপীর বা সোনারায় অভিন্ন দেবতা। রংপুরে, দিনাজপুরে প্রচলিত সোনারায়ের পাঁচালীতে সোনারায়ের অলৌকিক জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। গোয়ালিনী যশোদা ধর্মঠাকুরের পূজা করে তার গর্ভে প্রবেশ করেন। সন্তান ভুমিষ্ঠ হলে পরে তার নাম রাখা হয় সোনারায়।[৩৮] এটি একটি অবাস্তব কল্পনা। উত্তরবঙ্গের জাগগানে সোনাপীর ও মানিক পীরের সন্ধান পাওয়া যায়। শরৎ চন্দ্র মিত্র

মনে-করেন, সোনারায়ের প্রতিপত্তি বাড়ানোর জন্য ভক্তরা অধিক প্রভাবশালী মানিক পীর নাম একসঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন।[৩৯]

রংপুর জেলার প্রচলিত জাগগানে ও পীরাচারে তাঁকে বাঘের দেবতা হিসাবে কল্পনা করা হয়। সোনারারের গানে আছে :

"বাঘে সব নাম লইয়ে ডাকেরে
ও ঠাকুর সোনারায়ে বাঘ সব ডাকে।
বাড়ি বাড়ি বেড়াই ঠাকুর হরিনাম দিয়া।"[৪০]

সোনারায় প্রকারান্তরে গোরক্ষক দেবতা হিসাবে পূজিত। বাঘের আক্রমণ থেকে তিনি গরু বাছুরকে রক্ষা করেন। কোনো কোনো অঞ্চলে রাজবংশীরা সোনারায়কে রোগশোকের ত্রাণকর্তা হিসাবে পূজা করেন। তাদের বিশ্বাস, সোনারায়ের অভিশাপে রোগের প্রাদুর্ভাব হয়, এবং দয়া-অনুগ্রহে তা দূরীভুত হয়। রংপুর-দিনাজপুরে প্রাপ্ত জাগগানে পাওয়া যায়—

"এই না সোনা রায়কে যে করিবেক হেলা
গলায় গবফুল নামব, চক্ষে-নামবে ঢেলা।।
ঢেলা নয় কেবলত গায়ে আয়ব জ্বর।
এই জ্বরে কাঁপুনী মায়ের দহিব অন্তর।।"[৪১]

যশোর, ঝিনাইদহ অঞ্চলে রোগ-বালাই, বালা-মুচিবৎ দূর করার জন্য হ্যাঁচড়া পূজা করা হয়। এই হ্যাঁচড়া পূজার শেষে সোনারায়ের উদ্দেশ্যে উপর্যুক্ত গানটি ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে গাওয়া হয়—

এই না সোনারায়কে যে করিবে হেলা
তার গলায় হবে গলগণ্ড চোখদে' বেরোবে ঢেলা।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে সোনাবায়ের গান গেয়ে গোরক্ষা, বৃদ্ধি ও সংসারে সমৃদ্ধি কামনা করা হয়।

নিম্নে সোনারায়ের গান যা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় এখনো প্রচলন রয়েছে তা উল্লেখ করা হলো :

"ঠাকুর সোনা রায়রে রূপা রায়ের ভাই
বাঘের পৃষ্ঠে চরিয়া আমরা
মইষের দুগ্ধ খায়
ঠাকুর সোনা রায়রে।
(নাচারী) হায় বিধিরে
আছে রে, দুধের ভাণ্ড, ফেলাইল ভাঙ্গিয়া
পিপিরায় পর্যন্ত দুগ্ধ না খায় ভুলিয়ারে।
গোয়ালিতে বাড়ুক গরু
ভাণ্ডারোতে ধান
দেওয়ালী দরবারে গিরি
পাউক ফুল জল রে।।

সত্যঠাকুর সোনারায় গাইরস্ত দেওরে বর
ধনে বংশে বারুক গিরি চন্দ্রে দিবঙ্কর।
গোলাভরা হউক ধান্য, তোষাভরা কড়ি
দুগ্ধবতী গাভী হউক সুখে রবে গিরি।
পুত্রবধু দারা সোদর সদা সুখে রয়
আশীর্বাদ করিয়া যায় ঠাকুর সোনারায়।"[৪২]

হ্যাঁচড়া পূজার গান[৪৩] : বৃহত্তর যশোর এলাকার রাজবংশী অধ্যষিত গ্রামগুলোতে অগ্রহায়ণ মাসের শুরু থেকে শেষ দিন পর্যন্ত হ্যাঁচড়া পূজা শিশু-কিশোর কিশোরীরা করে থাকে। এই হ্যাঁচড়া পূজার উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন ধরনের রোগ, ঘা–পাঁচড়া, ওলাওঠা, কলেরা প্রভৃতি থেকে নিজেদের রক্ষা করা। তাছাড়া পূজার শেষে অগ্রহায়ণ শেষ হলে বনবিবিকে ভোগ দেওয়ার উদ্দেশ্য শিশু-কিশোর-কিশোরীরা যে-গান পূজাবেদীর চারিদিকে বৃত্তাকারে বসে গায়, তার সাথে উক্ত উদ্দেশ্যের কোনো সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। সম্ভবত নিছক আনন্দ উপভোগের উদ্দেশ্যেই এই গানগুলো গাওয়া হয়ে থাকে। গবেষক সংগৃহীত হ্যাঁচড়া পূজার কয়েকটি গান সন্ধ্যা ও সকালে গীত হয় :

সান্ধ্য গান–১

"পায় দুয়োরদে ওঠে লো সেই নানান গাছের লতা
লো সেই নানান গাছের লতা
আগে যদি জানতাম লো সেই করুনারো কথা
শালার নলদে বাঙালি, শালার পানের কাঙালি।
আগে যদি জানতাম লো সেই পানের এত কড়ি
লো সেই পানের এত কড়ি
রাস্তার মুড়োয় দোকান দিয়ে বেচতাম ধিরি ধিরি
শালার নলদে বাঙালি শালার পানের কাঙালি।
পায় দুয়োর দে ওঠে লো সেই নানান গাছের লতা
লো সেই নানান গাছের লতা।
আগে যদি জানতাম লো সেই করুনারো কথা
শালার নলদে বাঙালি, শালার সুবোরির কাঙালি।
আগে যদি জানতাম লো সেই সুবোরির এত কড়ি
লো সেই সুবোরির এত কড়ি।
রাস্তার মুড়োয় দোকান দিয়ে বেচতাম ধিরি–ধিরি
শালার নলদে বাঙালি, শালার সুবোরির কাঙালি।
পায় দুয়োর দে ওঠে লো সেই নানান গাছের লতা
লো সেই নানান গাছের লতা।
আগে যদি জানতাম লো সেই করুনারো কথা
শালার নলদে বাঙালি, শালার চুনির কাঙালি।
আগে যদি জানতাম লো সেই চুনির এত কড়ি

লো সেই চনির এত কড়ি
রাস্তার মুড়োয় দোকান দিয়ে বেচতাম ধিরি ধিরি
শালার নলদে বাঙালি শালার চুনির কাঙালি॥"

সান্ধ্য গান–২

"ঘোর লাটুম ঘোর
সোনার কমলা লাটুম কোমরে ঘাগর।
ঘুরতি ঘুরতি যাইরে লাটুম কুমোর পাড়া দিয়ে
কুমোর পাড়ায় গেলি লাটুম, কুমোররা বলে বোসো।
বোসবো না, দাঁড়াব না হ্যাঁচড়া ঠাকুরীর হবেন পুজো ঘট দিয়ে এসো।
ঘোর লাটুম ঘোর
সোনার কলমা লাটুম কোমরে ঘাগর।
ঘুরতি ঘুরতি যায়রে লাটুম তেলি পাড়া দিয়ে
তেলি পাড়ায় গেলি লাটুম, তেলিরা বলে বোসো।
বোসবো না, দাঁড়াব না হ্যাঁচড়া ঠাকুরীর হবেন পুজো তেল দিয়ে এসো।
ঘোর লাটুম ঘোর
সোনার কমলা লাটুম কোমরে ঘাগর।
ঘুরতি ঘুরতি যায়রে লাটুম মালি পাড়া দিয়ে
মালি পাড়ায় গেলি লাটুম, মালিরা বলে বোসো।
বোসবো না, দাঁড়াব না হ্যাঁচড়া ঠাকুরীর হবেন পুজো ফুল দিয়ে এসো।
ঘোর লাটুম ঘোর
সোনার কমলা লাটুম কোমরে ঘাগর।
ঘুরতি ঘুরতি ঘুরতি ঘুরতি যায়রে লাটুম ছুতোর পাড়া দিয়ে
ছুতোর পাড়ায় গেলি গেলি লাটুম, ছুতোররা বলে বোসো।
বোসবো না, দাঁড়াব না হ্যাঁচড়া ঠাকুরীর হবেন পুজো আসন দিয়ে এসো।
ঘোর লাটুম ঘোর
সোনার কমলা লাটুম কোমরে ঘাগর।
ঘুরতি ঘুরতি যায়রে লাটুম ঘোষ পাড়া দিয়ে
ঘোষ পাড়ায় যায়রে লাটুম, ঘোষরা বলে বোসো।
বোসবো না, দাঁড়াব না হ্যাঁচড়া ঠাকুরীর হবেন পুজো দুধ দিয়ে এসো।"

সান্ধ্য গান–৩

"কলাতলায় গলা জল মাছ খলবল করে, মাছ খলবল করে
ঐ আসতেছে মারোনি খ্যাপলা হাতে করে, খ্যাপলা হাতে করে
থাক, থাক আমরা আইসে মারবানে য্যামন ত্যামন করে, য্যামন ত্যামন করে।
কলাতলায় গলা জল মাছ খলবল করে, মাছ খলবল করে
ঐ আসতেছে ধরনী খালোই হাতে করে, খালোই হাতে করে
থাক, থাক আমরা আইসে করবানে য্যামন ত্যামন করে, য্যামন ত্যামন করে।"

সান্ধ্য গান–৪

"রায় রায় ভাটোয় লো রায় রায়
রায়'র মাথায় লম্বা চুল
গেঁথে দিলাম চাঁপা ফুল॥' (৩ বার)
তারপর সবশেষে–
একমুঠ সর্ষে দুই মাঠ সর্ষে
হ্যাঁচড়া ঠাকুর বিদায় দাও
যার যার বাড়ি সেই সেই যাও।"

হ্যাঁচড়া পূজায় সান্ধ্যকলীন শেষ গানটিতে সোনারায়ের উদ্দেশ্যেই চাঁপাফুল নিবেদন করা হয়েছে। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, উত্তরবঙ্গই শুধু নয়, বৃহত্তর যশোর, ফরিদপুর, মানিকগঞ্জ, পাবনা এলাকার রাজবংশীগণ সকলেই সোনারায়ের উদ্দেশ্যে গান গেয়ে নিজেদের মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা জানায়।

প্রভাতকালীন হ্যাঁচড়া গান–১

"পাতি ডুগ ডুগ পাতি ডুগ ডুগ পিতলেরো কান্দা
অমুকগের সাত বউ জলে রয়েছে বন্দা॥"

এই গানের বিভিন্ন কলিতে বিভিন্ন পাড়া, গ্রাম, জাতি উল্লেখ করে তাদের সাতবউ জলে বাঁধা রয়েছে বলে গীত হয়। এই গানে কমপক্ষে ৫টি কলি গীতাকারে গাওয়া হয়।

প্রভাত কালীন গান–২

"বেলা উদয়রে বেলা উদয়রে বাওন পাড়াডা পাছ করে'
বাওন পাড়াগের এত ঠাট অতি বিহানে করে স্যাত (স্নান)।
বেলা উদয়রে বেলা উদয়রে মালি পাড়াডা পাছ করে'
মালি পাড়াগের এত ঠাট অতি বিহানে করে স্যাত।
বেলা উদয়রে বেলা উদয়রে কুমোর পাড়াডা পাছ করে'
তেলি পাড়াগের এত ঠাট অতি বিহানে করে স্যাত।
বেলা উদয়রে বেলা উদয়রে কামার পাড়াডা পাছ করে'
কামার পাড়াগের এত ঠাট অতি বিহানে করে স্যাত।"

বাস্তুদেবতা বা বাস্তুপূজার গান : বাস্তুদেবতা বসতবাড়ির দেবতা। তারা নতুন গৃহ নির্মাণের সময় বাস্তুদেবতার পূজা করেন। বাস্তুদেবতার উদ্দেশ্যে দুধ উথলিয়ে আলো চালের ক্ষীর রান্না করে সমবেত সবাইকে প্রসাদ হিসাব খেতে দেন। বসত বাড়ির উন্নতি ও ধনধান্যে পূর্ণ হোক গৃহস্তের গোলা, এমনতর বিশ্বাসে তারা বাস্তুদেবীর পূজা করেন। এই পূজার আচার হিসাবে যেসব গানের প্রচলন রয়েছে, তা হলো :

"আমি শুভক্ষণে দিলাম পূজা
বাস্তুদেবতার পায়
জমি জিরাত সবই যে ভাই
হেনারই দয়ায়।"[৪৪]

ধর্মীয় চেতনাপ্রসূত ও যাদুপ্রভাবজাত আরেকটি গান হলো :

"স্বর্গের হাড়িয়া, হাড়িয়া হাড়িয়ারে
মঞ্চে লামিয়া খোলা চার্চ্যাদে
স্বর্গের হাড়িয়া হাড়িয়া, হাড়িয়ারে।"[৪৫]

ষষ্ঠী ব্রত বা ষষ্ঠী পূজার গান : ষষ্ঠী ঠাকুরানীর উপর রাজবংশী রমণীদের অগাধ, অনড়, অটল বিশ্বাস। সন্তান দাত্রী হিসাবে, সন্তান রক্ষাকারী হিসাবে ষষ্ঠীপূজার কোনো বিকল্প তাদের নারীদের নিকট নেই। নারীদের লৌকিক জীবনে ষষ্ঠী বিরাট জায়গা দখল করে আছে। যেমন–দু'চার মাসের শিশুরা অনেক সময় ঘুমের মধ্যে হেসে বা কেঁদে ওঠে। তখন রাজবংশী মায়েরা বলেন যে মা ষষ্ঠীর সাথে উক্ত সন্তানের কথাবার্তা চলছে। ষষ্ঠী যখন বলে যে খোকা/খুকির মা মারা গেছে, তখন তা মিথ্যে মনে করে শিশু হেসে ওঠে, আর ষষ্ঠী যখন বলে যে, খোকা/খুকির বাবা মারা গেছে তখন তা সত্যি ভেবে কেঁদে ওঠে। শিশু ঘুমালে তার বুকের উপর একখণ্ড বস্ত্র দেওয়া হয় ; সেটিকে ষষ্ঠীর বস্ত্র বলা হয়। তা শিশুর রক্ষাকবচ। এটি থাকলে শিশুকে ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানব স্পর্শ করবে না বলে তারা বিশ্বাস করেন।

ষষ্ঠীকে কেউ কেউ পৌরাণিক দেবী বলে চালানোর চেষ্টা করেছেন। আবার অনেকেই ষষ্ঠীকে অনার্য সমাজের দেবী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। ষষ্ঠী প্রজনন দেবী। *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে, দেবীভাগবত* বা কৃতানন্দের *তন্ত্রসারে* ষষ্ঠীর যে নানান ধ্যান-মন্ত্র আছে সেগুলো অবশ্যই আদিম ষষ্ঠীর পৌরাণিক ছোপ লাগানো হয়েছে বলে দৃঢ় বিশ্বাস হয়। যাহোক, কৃতরাম দাসের *ষষ্ঠীমঙ্গলের* ব্রতকাহিনীটা হলো—সায় বেনের লোভীপুত্রবধু ষষ্ঠীপূজার নৈবদ্য খেয়ে ফেলেছিল। কালো বিড়াল ঐ নৈবদ্য খেয়ে ফেলেছে বলে মিথ্যা দোষ দিয়ে অপমান করায় কালো বিড়ালও সাতবার আঁচিঘর থেকে সাত পুত্রকে চুরি করে নিয়েছিল। শেষবারে অনেক কাকুতি-মিনতি করার পর ষষ্ঠী লোভীপুত্রবধুকে তার সন্তানগুলো ফিরিয়ে দিয়েছিল।[৪৬] কৃষ্ণদাসের কাব্যে তিনি বলেছেন, বেড়াল তার অংশ তার অপমান চলবে না। কাব্যে উল্লেখ আছে —

"কালিয়ে বিড়াল যত মোর অংশ তারা।
অপমান করিলে বালক হবে হারা
মিছে করি নাহি দেউ বিড়ালের দোষ
পুত্র মারিলে মোর হবে বড় রোষ।।"[৪৭]

এখনো রাজবংশী ও অন্যান্য নিম্নবর্গের কোনো কোনো হিন্দু সমাজে বিড়াল মারে না। বিড়াল মারলে বিড়ালের ওজনে সোনা দিতে হতো বলে কথিত হয়। এখনো সোনার পরিবর্তে লবণ দেওয়ার সংস্কার প্রচলন রয়েছে।

বাংলা অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের ষষ্ঠী পূজার প্রচলন দেখা যায়। সুতিকা ষষ্ঠী বা আতুড় ষষ্ঠীতে কোনো মন্ত্র বা ফুল-ফল, নৈবদ্য লাগে না। কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতীক নেই। ধরনী (ধাইমা) এই পূজা করেন। এই পূজায় কামনা করা হয়—

"সন্তান যেন সুস্থ থাকে ভালভাবে বাঁচে
পোয়াতির কষ্ট না হয়, রোগ-ব্যাধি না আসে।"

ষাট ষষ্ঠীতে শিশুজন্মের ছয়দিনের দিন পুকুরঘাটে পূজা করা হয়। একখানা নতুন বাঁশের ডালায় এক টুকরো গোবর ও কাঁচামাটির পিণ্ডতে তেল সিঁদুর মাখানো হয়। সেখানে সন্তান ও জননীর প্রতীক হিসাবে থাকে শিল-নোড়া। ধরনী এগুলো হলুদ গোলানো জল দ্বারা ধুয়ে দেন। তারপর নাপিতের কাছ থেকে নখ কেটে শৌচ হন।

একুশ্যে ষষ্ঠী সন্তান জন্মের একুশ দিন হলে করা হয়। এই পূজা তাদের সমাজের ধরনী (ধাইমা) করেন, কোনো ব্রাহ্মণ পুরোহিত লাগে না। ঘরের ঈশান কোণে দেবীর উদ্দেশ্যে ঘট পেতে পূজা হয়। ঘটের পাশে রাখা হয় শিল নোড়া। একুশে ষষ্ঠী পূজা শেষে একুশে কামানের শৌচ হয়। এই দিন থেকে প্রসূতি সংসারের রান্নাবান্নার কাজে যোগ দেন।

সত্যনারায়ণের ব্রত ও পাঁচালী গান : বাংলায় ইসলামের আবির্ভাবের পরে লৌকিক দেবদেবীর অনুকরণে লৌকিক পীর-পীরানির প্রতি একটি শ্রেণী বিশ্বাস করতে শুরু করেন। সত্যপীর, সত্যনারায়ণ, মানিকপীর, গাজীপীর প্রভৃতির উৎপত্তি এভাবেই হয়েছে। সত্যনারায়ণ, সত্যপীরের জন্মকথা, উপাখ্যান, মাহাত্ম্য ও মানত প্রায় অভিন্ন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ কবি কঙ্কন[৪৮]কে সত্যপীরের আদি লেখক হিসাবে উল্লেখ করলেও কবিচন্দ্রকে[৪৯] (১৬শ শতকের শেষভাগ) সত্য নারায়ণের পাঁচালী কাব্যের আদি কবি হিসাবে ধরা হয়। পরবর্তীকালের সত্যপীরের পাঁচালীর কবিরা হচ্ছেন : কবি বল্লব, ঘনরাম, রামেশ্বর ভট্টাচার্য, দ্বিজ বিশ্বেশ্বর, ফকির চাঁদ, কবিকাঞ্চন, দেবকীনন্দন, শিবচন্দ্র সেন ও ভারতচন্দ্র প্রমুখ।[৫০]

সত্যপীর বা সত্যনারায়ণ লৌকিক, পৌরাণিক, না-কি ঐতিহাসিক চরিত্র, সত্যপীরের উৎসস্থান বাংলায়, না কি বহির্বাংলায়, এ নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ সত্যপীরকে *স্কন্দপুরাণ ও বৃহদ্ধর্মপুরাণের* রেবা খণ্ড ও উত্তর খণ্ডে উল্লিখিত সত্য নারায়ণের সাথে অভিন্ন[৫১] দেখিয়ে পৌরাণিকীকরণের চেষ্টা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, সত্যপীর পৌরাণিক দেবতা বা ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব নয়। সত্যপীর বা সত্য নারায়ণ বাংলার হিন্দু ও ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষের কল্পিত দেবতা মাত্র।[৫২]

হিন্দু ধর্মাবলম্বী রাজবংশীরা ব্রাহ্মণ পুরোহিত ডেকে এই পূজা করেন। পুরোহিত থান তৈরি করেন, আল্পনা দেওয়া কাঠের পিঁড়ির উপর বিছিয়ে দেন নতুন সালু। তারপরে রাখে শালগ্রাম শিলা। পিঁড়ির চারকোণে পুঁতে দেন চারটি শরকাঠি। প্রতিটি শরকাঠিতে থাকে তাল গাছের লাল পাতাব পতাকা, পৈতার সুতা বেড় দেন চারটি কাঠিতেই। চৌকো স্থানটি সত্যনারায়ণের আটন। আটনের সামনে ঘটস্থাপিত হয়। ঘটে থাকে আম্রপল্লব ও জল। নৈবদ্য হিসাবে কাঁচাপাকা মিষ্টি, ফলমূল, খাঁটি গোদুগ্ধ, আখের গুড়, পাকা কলা আর আটা গুলে তৈরি নৈবদ্যকে বলা হয় সত্য নারায়ণের সয়। সত্যরায়ণের মোকাম লাগে পাঁচটি। আটনের মাঝে একটি, চার কোণায় চারটি। মোকাম তৈরি হয় পাঁচটি পান, পাঁচটি সুপারী বা হরিতকি, পাঁচটি পাকা কলা, একটি পৈতা, পাটালী ও পয়সা দিয়ে। শাস্ত্রমতে পূজা হয়—

"ওঁ ধ্যায়েৎ সত্যং গুণাতীতং গুণত্রয় সমন্বিতং।
লোকনাথং ত্রিলোকেং পীতাম্বর ধরং বিভূম"॥

পূজা শেষে সত্য নারায়ণের ব্রত কথা পাঁচালী শোনে ব্রতিনীগণ।

**"একদা বৈকুণ্ঠ ধামে চিন্তে নারায়ণ
মর্তে কলহ সকল ধর্মের কারণ॥**

মিলাতে সকল ধর্ম কামনা আমার
সত্যপীর রূপে আমি হব অবতার।।
ফকিরের দেশে আমি ধরায় যাইব।
পরধর্ম রীতিশিক্ষা এবার করিব।।
সত্যপীরে যেবা পূজে সিন্নির সহিত
ধনে জনে পূর্ণ বাবা করেন বিহিত।।"[৫৩]

সত্যনারায়ণের পাঁচালী, মনে হয়, ষোড়শ শতাব্দী ও তৎপরবর্তীকালে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি সৃষ্টির জন্য এসব পাঁচালীর মাধ্যমে-'বাঙালির ধর্মীয় দর্শন ভিন্ন নয় বরং এক'-তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

সত্যপীরের কথা গ্রন্থে আছে——

"কলিতে যবন দুষ্ট হৈন্দবী করি নষ্ট
দেখি রহিম বেশ হৈলা রাম।"[৫৪]

আবার বামাই পণ্ডিত তাঁর শূণ্যপুরাণে বলেছেন—

"ব্রহ্মা হৈল মোহাম্মদ বিষ্ণু হৈলা পেকাম্বর
আদম্ব হৈল সুল পানি।।
গনেশ হৈলা গাজী কার্তিক হৈলা কাজী
ফকির হইল্যা জতমুনি।।"[৫৫]

হিন্দু কবিগণ রচিত সত্যপীর বা সত্যনারায়ণের রূপ বর্ণনার মঙ্গলকাব্যের লৌকিকদেব দেবীর সুস্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মনসা যেমন সর্প দেবী, চণ্ডী যেমন পশুদের দেবী, শিব কৃষককুলের দেবতা, তেমনি সত্যপীর বা সত্যনারায়ণ সন্তানহীনের সকল অন্যায় ও শনির দৃষ্টি বিনাশকর্তা। কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য সত্যপীরের স্বরূপ বর্ণনার বলেছেন-'সত্য সত্য সত্যপীর সর্ব্ব সিদ্ধিদাতা।[৫৬]

তিস্তাবুড়ি পূজার গান : দিনাজপুরের রাজবংশী রমণীগণ তিস্তাবুড়ি পূজা করেন, এবং পূজার সময় তাঁর উদ্দেশ্যে গান করেন। চৈত্র-বৈশাখ মাসে খাঁ খাঁ রোদে যখন মাঠঘাট পুড়ে যায়, তখন পূজা হয়। রমণীরা মাটির ডেলা দিয়ে তিস্তাবুড়ির প্রতীকী মূর্তি তৈরী করেন। রাখেন একটি ডালার উপর। মূর্তিতে সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে দইমাখা আতপ চাল ও ফুল ছড়িয়ে দেন। একটা সাদা কাপড় দিয়ে প্রতীকটাকে ঢেকে কোলে করে, মাথায় করে বাড়ি বাড়ি পূজার মাগন নিতে যায়। [৫৭] আর সেখানে সমস্বরে গান গায়—

গান—১ "আইসো মা বইসো ঘরে স্যাবা দিছি তমার তরে
হাল হাতিয়ার সুখখো শান্তি তমার চরণে।।"[৫৮]

গান—২ "তিস্তাবুড়ি নামে রে-বাজে হীরামন বাঁশিরে
তিস্তাবুড়ি সালাম দে, তিস্তাবুড়ি সালাম দে।"[৫৯]

গৃহিণীরা গান শুনতে শুনতে ছুটে এসে বালতিতে করে জল ঢেলে দেন। একটি ধোয়া মোছা পিঁড়ি পেতে দেন। সঙ্গে সঙ্গে গৃহিণী থালায় করে আতপ চাল, দুধ, ফুল প্রভৃতি দিয়ে তিস্তাবুড়ি প্রতীককে বরণ করেন। এসময় গান করেন নানা ভঙ্গিতে—

গান—৩ "দুয়ারে আগত বালি গে সরু আলীর ডীঘি
সেই না ডীঘিব ঘাটোতে বালি গে অয়হা ছিলান করে।
ছিলান করিতে বালি গে হারাইল নাকের নতোয়া
হারাইল হারাইল নতোযা বালিগে হাম দিনো গড়েয়া।"[৬০]

নাচ–গান শেষে ব্রতিদের হাতে পান সুপারী দেওয়া হয়। খুশি হয়ে আনন্দে আটখানা হয়ে গান ধরেন তিস্তাবুড়ি সেজেছে সোনার খড়ম বেজেছে।[৬১]

বৃহত্তর যশোর, ফরিদপুর জেলার রাজবংশীগণ তিস্তাবুড়ি পূজো প্রথার মতোই চৈত্র–বৈশাখ মাসে কাদামাটি নৃত্য–গান করে ও সাদা কাপড়ে আচ্ছাদিত প্রতীকীতে ফুলজল প্রেরণ করেন ও মিষ্টিমুখে করান। তবে সেখানে এইসব গানের পরিবর্তে চৈতন্য দেবের গুনগান ও কৃষ্ণনাম কীর্তিত হয়।

জাগগান[৬২] : রাজবংশীরা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে রাত্রিবেলা জেগে প্রতিটি গ্রামের গ্রামমাঙ্গলিক থান বা কালীথান ও হরি ঠাকুরের থানের সামনে জাগগান গেয়ে থাকেন। এই জাগ গানগুলোর উদ্দেশ্য হলো বৈষয়িক উন্নতি সাধন, গৃহপালিত জীবজন্তুর প্রাণ রক্ষা ও বংশবৃদ্ধি। মনসা দেবীর উদ্দেশ্যে গান করা হয় সর্পভয় থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে। রাজবংশীরা এই জাগগানের মাধ্যমে কালী মা, হরিঠাকুর, শীতলা ঠাকুর, বারাসে ঠাকুর ও পঞ্চদেবতার পায়ে শ্রদ্ধা নিবেদনসহ পূজা করে থাকেন। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ মতামত দিয়েছেন যে, উল্লিখিত দেবদেবীগণ প্রাকৃতিক শক্তির বিবর্তনের মাধ্যমে মানব সমাজে দেবদেবীতে রূপান্তরিত হয়েছে।[৬৩]

জাগগান–১ "আসর বন্দনা গান
হ্যাড়ে দেয় চাচ্ছে ছুঁলে হ্যাড়েনি দেয় ছাড়া
স্বর্গের ঐ পঞ্চকন্যা দিয়ে যায় আল্পনা
বুড়ি পান গুয়ো সাজায় সুবর্ণের ঐ থালে
ঝারি মেজে দিবো জল মা তোমার ঐ চরণে
পঞ্চ প্রদীপ জ্বেলে দিই মা তোমার বাসর ঘরে।"

গান–২ "জাগগান (আড়ি তোলা)
ডান হাতে ডাইনো নড়ি মাগো মাথায় ধানের আড়ি
ধীরে ধীরে যেও মাগো ছুতোরগেও বাড়ি
ছুতোরগের বাড়ি গেলি মাগো কী কী বরণ দিলে
ধনে বংশে বজায় রেখো মাগো ছুতোর-গেরও বাড়ি।
ডান হাতে ডাইনো নড়ি মাগো মাথায় ধানের আড়ি
ধীরে ধীরে যেও মাগো কামারগেরও বাড়ি
কামারগের বাড়ি গেলি মা পাবা পূজার খড়গ
কামারগের বাড়ি গেলি মাগো কী কী বরণ দিলে
ধনে বংশে বজায় রেখো মাগো কামারগেরও বাড়ি।
ডান হাতে ডাইনো নাড়ি মাগো মাথায় ধানের আড়ি
ধীরে ধীরে যেও মাগো নাপিতগেরও বাড়ি
নাপিতগের বাড়ি গেলি মা পাবা পূজোর মিষ্টি

নাপিতগের বাড়ি গেলি মাগো কী কী বরণ দিলে
ধনে বংশে বজায় রেখো মাগো নাপিতগেরও বাড়ি।
ডান হাতে ডাইনো নাড়ি মাগো মাথায় ধানের আড়ি
ধীরে ধীরে যেও মাগো পালেগেরও বাড়ি
পালেগের বাড়ি গেলি মা পাবা পূজার ঘট
পালেগের বাড়ি গেলি মাগো কী কী বরণ দিলে
ধনে বংশে বজায় রেখো মাগো পালেগেরও বাড়ি।
ডান হাতে ডাইনো নাড়ি মাগো মাথায় ধানের আড়ি
ধীরে ধীরে যেও মাগো মালিগেরও বাড়ি
মালিগের বাড়ি গেলি মা পাবা পূজার ফুল
মালিগে বাড়ি গেলি মাগো কী কী বরণ দিলে
ধনে বংশে বজায় রেখো মাগো মালিগেরও বাড়ি।"

গান–৩ "মেঘ নাই মেঘ নাই মেঘেরো আন্ধারি
কালো মেঘে তারা বাজায়রে বাঁশী
ঐ দেখা যায় তুলসীর মন্দিরে
ধরা ছড়া যেন বৈরাগীর বেশে
একটু খানি বিলম্ব করো রে
কালীর মাথায় ছাতি ধরে আসি গে।
মেঘ নাই মেঘ নাই মেঘের আন্ধারি
কালো মেঘে তারা বাজায়রে বাঁশী
ঐ দেখা যায় তুলসীর মন্দিরে
ধরা ছড়া যেন বৈরাগীর বেশে
একটু খানি বিলম্ব করো রে
হরিঠাকুরের মাথায় ছাতি ধরে আসি গে।
মেঘ নাই মেঘ নাই মেঘের আন্ধারি
কালো মেঘে তারা বাজায়রে বাঁশী
ঐ দেখা যায় তুলসীর মন্দিরে
ধরা ছড়া যেন বৈরাগীর বেশে
একটু খানি বিলম্ব করো রে
শিতলা ঠাকুরের মাথায় ছাতি ধরে আসিগে
মেঘ নাই মেঘ নাই মেঘের আন্ধারি
কালো মেঘে তারা বাজায়রে বাঁশী
ঐ দেখা যায় তুলসীর মন্দিরে
ধরা ছড়া যেন বৈরাগীর বেশে
একটু খানি বিলম্ব করো রে
বারাসে ঠাকুরের মাথায় ছাতি ধরে আসিগে।
মেঘ নাই মেঘ নাই মেঘের আন্ধারি

কালো মেঘে তারা বাজায়রে বাঁশী
ঐ দেখা যায় তুলসীর মন্দিরে
ধরা ছড়া যেন বৈরাগীর বেশে
একটু খানি বিলম্ব করো রে
পঞ্চ ঠাকুরের মাথায় ছাতি ধরে আসিগে।"

গান–৪ "চাঁদ উঠেছে গৌরব করে তার সঙ্গে উঠেছে তারা
এমন সুন্দর রাধে ওমা আমার কৃষ্ণ কেন কালো
কৃষ্ণ কালো আমার ভাল কৃষ্ণ মোটুকী করেছে আলো
নাই মোলামের ঢেঁকি আমার পদ্মের পাতার কুলো।"

গান–৫ "সন্ধ্যে বেলায় পেতেছি আসন
আমার কালী মার ঐ আশাতে
আমার এই আসনে আসিও সকালে
আমার এ আসনে বসিও সকালে
কালীমা তোর কী এমন কঠিনরে মন
কাইন্দে ফিরে গেল তোর ভক্তগণ।"

মনসা পূজার জাগগান : পূর্বকালে মানুষ সবসময় সর্পভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থাকত। সাপের ভয়ে ভীত সমাজ অনন্যোপায় হয়ে সর্পদেবীর কল্পনা করেছে। সাপের দেবীই হলো মনসা। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের *মঙ্গলকাব্যে* মনসার কাহিনী ও পূজাচার লিপিবদ্ধ আছে। শ্রাবণ মাসের বর্ষণমুখর শেষ সাত বা তিন দিন আগে মনসা দেবীর উদ্দেশ্যে ঘটস্থাপন ও ঘট পাতা হয়। মাসের শেষদিন পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই মনসা দেবীকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে মনসার জাগ সঙ্গীত। জাগ সঙ্গীতের নমুনা নিম্নরূপ :

মনসার জাগ গান–১

"ভাসতে ভাসতে আইলোরে নৌকা
আমার কালীমার ঘাটে
ও নৌকা ছুঁয়ো না।
সেই না নৌকায় আছে আমার কালী পূজার আসন
ও নৌকা ছুঁয়ো না।
ভাসতে ভাসতে আইলোরে নৌকা
আমার হরি ঠাকুরের ঘরে
ও নৌকা ছুঁয়ো না।
সেই না নৌকায় আছে আমার কালী পূজার আড়ি
ও নৌকা ছুঁয়ো না।
ভাসতে ভাসতে আইলোরে নৌকা
আমার মনসা দেবীর ঘাটে
ও নৌকা ছুঁয়ো না
সেই না নৌকায় আছে আমার মনসা পূজার ঘট
ও নৌকা ছুঁয়ো না।

মনসার জাগগান–২

"যে না বরে বাঁচেরে আমার
ভোলা মহেশ্বর
সেই না বরে বাঁচে আমার
সোনার লক্ষ্মীন্দর।।
শূল পানি শিব দূর্গা
কৈলাসেতে বাস
মনসা তাদের পাশে রহেন বারমাস।।
মনসা দেবীর দয়ায়
লক্ষ্মীন্দর পায় প্রাণ
সপ্তডিঙ্গা মধুকর পাইয়া চান্দর
গায় দেবীর গুণগান।"[৬৪]

ধর্মাচারমূলক সঙ্গীত : রাজবংশী জীবনের মর্মমূলে যেসব গান প্রোথিত রয়েছে সেগুলো তাদের প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস, দর্শন, ধ্যান–ধারণা প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে রচিত। এসব গান তাদের জীবনের ভাব ও ভাষা, ধর্ম ও কর্মের, বিশ্বাস ও বোধের সাথে ওতোপ্রাতোভাবে মিশে আছে। প্রকৃতপক্ষে ধর্মাচারমূলক গানগুলো তাদের জীবনযাত্রায়, প্রাত্যহিক ক্রিয়াকলাপের বিচিত্র অভ্যাস আচরণের একটি কাব্যময়, ও ছন্দময় প্রকাশ। গানগুলোর সব কথাই সাবলীল ও স্বতঃস্ফূর্ত।[৬৫]

চড়ক পূজা উপলক্ষে চৈতে দেলের গান : পশ্চিমবঙ্গের গম্ভীরা পূজা বা শিবের গাজন চড়ক পূজারই রকমফের। চড়ক পূজায় শিবের বিয়ে, শিবলিঙ্গপূজা প্রভৃতি করা হয়। সেই শিব অনার্যদের দেবতা। ঈশ্বরের সৃজন, পালন ও সংহার এই ত্রিশক্তি যথাক্রমে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব এই তিন দেবতারূপে পরিচিত। ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু পালন করেন, ও শিব ধ্বংস করেন। আর্যদের ভারত আগমনের পূর্বে ভারতের আদিম জনগোষ্ঠীর দেবতা শিব খুব প্রভাবশালী ছিলেন। তাই আর্য সমাজে *শিবপুরাণ* ও *লিঙ্গপুরাণে* শিব স্বয়ং ঈশ্বররূপে বন্দিত হয়েছে।[৬৬] সেকারণে আজো শিবের গাজন, শিবলিঙ্গ পূজা, চড়কপূজা, বাংলার অনার্য আদিবাসী, উপজাতিদের মধ্যে আড়ম্বর সহকারে পালিত হয়। চৈত্রমাসের শেষদিকে চড়ক পূজা উপলক্ষে হিন্দু ধর্ম প্রভাবান্বিত অনার্য আদিবাসী সমাজে চৈতে দেল উৎসবে শিবের বন্দনা গীত গাওয়া হয়। শিবের বন্দনা গীত—

"এস আলোকে বরণে মধুরও পবনে কাঞ্চন চরণে
মম হৃদি মাঝে আলোকে
এস দ্বীনের দ্বীনহীন অকেজো দ্বীনহীন
ভাঙ্গা বীণ সেই বীণ
বাজে কিনা বাজে আলোকে।
মম হৃদি মাঝে আলোকে।" —ঝিনাইদহ।

চড়ক পূজার বিশেষ বিশেষ অঙ্গ হলো কুমারী পূজা, জলন্ত অঙ্গারের উপর হাঁটা, কাঁটা আর ছুরির উপর লাফানো, বাণফোঁড়া, শিবের বিয়ে, অগ্নি–নৃত্য, চড়ক গাছে দোলা, খেজুর

গাছের কাটার উপর হাঁটতে হাঁটতে খেজুর ভাঙ্গা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। চড়কপূজার বিভিন্ন কাণ্ডে *মঙ্গলকাব্যে* চড়ক পূজা উপলক্ষে পয়ারছন্দে বর্ণিত যে পূজা-আচার ও সৃষ্টি রহস্য বর্ণিত হয়েছে তা ঢাক, ঢোল, মৃদঙ্গসহ বাজনার তালে তালে গীত হয়।

চড়ক পূজা কত প্রাচীন তা সঠিকভাবে বলা কঠিন। *লিঙ্গপুরাণ, বৃহদ্ধর্মপুরাণ* ও *বৃহ্মবৈবর্তপুরাণে* শিবারাধনা প্রসঙ্গে নৃত্যগীতের উল্লেখ থাকলেও চড়কপূজার উল্লেখ পাওয়া যায় না।[৬৭] পরবর্তীকালের মঙ্গলকাব্যে চড়কপূজার আচার অনুষ্ঠানের উল্লেখ দেখা যায়। শিব প্রভাবশালী দেবতা বলে বর্তমানে কোনো কোনো আর্য হিন্দুরা শিবের পূজা ও আরাধনা করে থাকেন। (চড়ক পূজায় বালাদারের শ্লোক ও পূজা-পদ্ধতি পরিশিষ্ট ৪-এ দেখুন)

ত্রিনাথের গান : সারা ভারতবর্ষে নাথমার্গের প্রচার প্রসারলাভ করে ১১৮৪ খ্রিষ্টাব্দের দিকে।[৬৮] তখন ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ব্যাপক। অবশ্য কেউ কেউ বলেন, নাথমার্গের উৎপত্তি বৌদ্ধ ধর্মের বাইরে, কিন্তু কালের চক্রে তা বৌদ্ধ ধর্মে পরিণতি লাভ করেছিল। নবম-দশম ও একাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের যে ধর্মান্দোলন আত্মপ্রকাশ করেছিল তাতে নাথপন্থীদের গুরু অনার্য যোগীগণের হাত ছিল।[৬৯] নাথপন্থী যেসব শিষ্য ছিল তারা সকলেই তৎকালীন সময়ে বৌদ্ধ ধর্মের সংস্পর্শ লাভ করেছিল। সেই নাথদের শিষ্যরা সাধারণত নিম্ন শ্রেণীর লোক ছিল, যথা-হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি। পরবর্তীকালে পার্শ্ববর্তী বাংলা, ভূটান প্রভৃতি অঞ্চলে মূল বৌদ্ধ ধর্ম মন্ত্রযান, বজ্রযান, কালচক্রযান, লামাইজম (Lamaism) দৈত্য পূজা প্রভৃতির সাথে মিশে বিকৃত হয়ে পড়েছিল। সেকারণে নাথমার্গ পরবর্তীকালের বিকৃত বৌদ্ধধর্ম ও তান্ত্রিক হিন্দু ধর্মের সম্মিলনে একটি নতুন রূপ পরিগ্রহ করে,[৭০] যা আজও সমাজের নিম্নকোটি মানুষের মধ্যে টিকে আছে। রাজবংশীরা ত্রিনাথের গান বা ত্রিনাথের পূজা কবে থেকে শুরু করেছিল তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে বৃহত্তর যশোর ও ফরিদপুর এলাকায় গবেষণাকালে জানা যায় যে, স্মরণাতীত কাল থেকে এসব এলাকার রাজবংশী ও মালোরা ত্রিনাথের পূজা ও পূজা উপলক্ষে গান গেয়ে থাকেন। ত্রিনাথের গান, যা আসরে গাওয়া হয় তার একটি হলো—

"ওরে সাধুরে ভাই
দিন গেলে ত্রিনাথের নাম লইও, লইও নামটি পরম যতনে।
আমার ঠাকুর ত্রিনাথ যে বাড়িতে যাই
কোনো অভাব থাকে না তার সুখে দিন যায়। (২)
সারাদিন করো ভাইরে গৃহধর্মের কাজ
সন্ধ্যা হলে লইও ঠাকুর ত্রিনাথের নাম। (২)
ত্রিনাথের নাম লয়ে যেবা বনে যায়
সর্পে নাহি দংশে তারে বাঘে নাহি খায়। (২)
আমার ঠাকুর ত্রিনাথের দেখে যেবা আড় নয়নে চায়
অস্ত্র শলা দিয়ে তার চক্ষু হানে যমরায়। (২)
আমার ঠাকুর ত্রিনাথের দেখে যেবা করে হেলা
গলায় হয় তার গলগণ্ড চোখ দিয়ে বেরোয় ঢেলা। (২)
কাঁসা নয়রে পিতল নয়রে পুরোনো হয়ে যাবে

আমার ত্রিনাথের নাম লইলে নতুন সোনা পাবে। (২)
ভাটি গাঙে দিলাম জবা উজান কেন ধাই
না জানি কোনো অপরাধ করেছি রাঙা পায়।"৭১

ত্রিনাথের পূজার সময় আসরেও ত্রিনাথ ঠাকুরভক্তগণের আগমন হলে এই গানটি প্রথমে গাওয়া হয়।

"আসরেতে কর আগমন,
ত্রিলোকের জীবন প্রভূ কর আগমন।
আমি অতি মূঢ় মতি না জানি ভজন।
ত্রিনাথ রূপে প্রভু বসিলেন আসনে
জয়, জোকার দেও সবে তোমরা নারীগণে।।"৭২

দেহতত্ত্ব বা ভাবসঙ্গীত : যুগ যুগ ধরে মানুষ সঙ্গীতের মাধ্যমে স্রষ্টার অনুগ্রহ পেতে চেয়েছে। সঙ্গীত সাধনার মধ্য দিয়ে গুরু-গোঁসাই সাধন-ভজনের মাধ্যমের ঈশ্বরের নৈকট্য লাভে সচেষ্ট হয়েছে। দেহতত্ত্ব বা ভাব সঙ্গীতে ঈশ্বরের নৈকট্য লাভের চেষ্টা, বা জগৎ সংসারের ত্রিতাপ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভের কামনা প্রকাশিত হয়েছে। দেহতত্ত্ব বা ভাব সঙ্গীতে রূপক, যমক, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, প্রতীক, অনুপ্রাস, বিরোধাভাস প্রভৃতি অত্যন্ত সপ্রতিভভাবে লক্ষ করা যায়। রাজবংশী সমাজে যারা সঙ্গীত সাধনা করেন, যারা গ্রামের মঙ্গল সাধনায়, পরিবারের মঙ্গল কামনায়, আত্মিক উন্নতির লক্ষ্যে বিভিন্ন আসরে গান করে তারাই এ দেহতত্ত্ব বা ভাবতত্ত্বের গান চর্চা করেন। রাজবংশী কির্তনীয়াগণ বা সাধু-গোঁসাই-বৈষ্ণবপন্থীগণ এসব গান গান, তার মাহাত্ম্য জনসমক্ষে আলোচনা-পর্যালোচনা করেন। তবে তাদের মধ্যে দেহতত্ত্ব বিষয়ক গান হিসেবে লালন শাহের গান, পাঞ্জু শাহের গান, সিরাজ শাহের গানও স্থান করে নিয়েছে। নিম্নে তাদের সমাজে বহুল প্রচলিত ভাবগান প্রদত্ত হলো, যে গানের রচয়িতা তাদের সমাজেরই একজন ভাব কবির।

ভাবতত্ত্ব গান-১

"পাপির ভাগ্যে এমন কি আর হবে রে
দেখ দেখ মনু রায়, ওহে মন আমার
সাধুর বাজার কি আনন্দ ময় রে।
ওরে মন সাধুর বাতাসে
বনের কাষ্ঠ হয় রে চন্দন, স্বর্ণ হয় পরশে
হেন সাধুর প্রতি ভক্তি নাইরে যার
আমি না জানি তার ভাগ্যে কি আছে রে।।
যেখানে হয় সাধুর বাজার, অসাধুর নাই অধিকার
করতেছে সুক্ষ্ম বিচার সত্যের আইন ধরে
অধম কাঙাল শরৎ বলে, এ জনম গেল বিফলে
আমার এ দেহ সাধুর সেবায় লাগলো না রে।।"৭৩

ভাবতত্ত্ব গান-২

"আমার হাত ধরে লয়ে চলো চৈতন্য গোঁসাই
আমার ব্যথার ব্যথিত দুখ-দরদী এদেশে আর বন্ধু নাই। (২)

যখন ছিলাম মাতৃ গর্ভেতে
কত প্রতিশ্রুতি করেছিলাম তোমার সাক্ষীতে
এখন মায়াময় সংসারে এসে প্রভু তোমার কথা ভুলে যায়।
অধম কাঙাল শরৎ বলে,
একদিন না গেলাম সেই ভজনের মূলে
ভজন সাধন করলে পরে পরপারে যাওয়া যায়।"[৭৪]

এদের সমাজে যারা সঙ্গীত চর্চা করেন, দেহতত্ত্ব আলোচনা করেন, ইহজগৎ ও পারলৌকিক জগৎ সম্পর্কে যারা সতত সজাগ; ভক্ত সাধারণকে যারা পারলৌকিক জগৎ সম্পর্কে সর্বদা সজাগ করে তোলেন, তারাই আবার কখনো কখনো হিন্দুর অবতারবাদ, বৌদ্ধ অনিত্যবাদ, বৈষ্ণব ও নাথধর্মের প্রভাবে প্রভাবিত গানগুলো গেয়ে থাকেন, আলোচনা করে থাকেন। এসব গান যাদের হাতে লালিত ও পুষ্ট তারা সবাই সামাজের নিম্নকোটির সাধারণ মানুষ। যেমন অনিত্যবাদের একটি গান—

"মাটির দেহ মাটি হবে
ভাই বন্ধু না সঙ্গে যাবে
প্রান প্রেয়সী পৈড়া রবে
যাইতে হবে একা ভাই।
এই দুনিয়া ভূতের খেলা
অবশেষে ঘটবে জ্বালা
যাওয়ার সময় কেহ নাই, কেহ নাই।"[৭৫]

বাউল সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ কবি, সঙ্গীত সাধক লালনের গান রাজবংশী সমাজজীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নিয়েছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে লালন শাহের গান এদের সমাজে আস্তে আস্তে প্রবেশ করতে থাকে। দ্বিতীয়ার্ধে এ গান বাণের জলের মতো দ্রুত সমাজজীবনে প্রবেশ লাভ করেছে। লালনের লোকোত্তর চেতনাসমৃদ্ধ গানে গভীর ধ্যান ও জ্ঞানের কথা, ইহকাল, পরকাল, জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়, মানুষ এবং স্রষ্টা সম্পর্কিত বিবিধ জটিল তত্ত্ব ও রহস্যকথা সাবলীল রচনা ভঙ্গীতে ধরা পড়েছে।

অলঙ্কার যেমন নারীর সৌন্দর্য বাড়ায়, আবার অলঙ্কারের আতিশয্যও তেমনি সৌন্দর্যের হানি ঘটায়। সেজন্য পরিমিতি বোধ প্রয়োজন। লালনগীতিতে সেই পরিমিতি বোধ অত্যন্ত প্রখর। সেজন্য লালনগীতির অলঙ্কার বিভিন্ন সমাজ-জীবনে মানুষের দুঃসহ যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করে। লালনের সেই বিখ্যাত পদ—

"আমি একদিনও না দেখিলাম তারে
আমার বাড়ির কাছে আরশিনগর
সেথা এক ঘর পরশী বসত করে।
গ্রাম বেড়ে অগাধ পানি
নেই কিনারা নেই তরণী পারে
তারে দেখব মনে বাঞ্ছা করি
আমি কেমনে সে গাঁয় যাইরে।।"[৭৬]

অথবা

"খাঁচার ভেতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়।
ধরতে পারলে মন বেড়ি দিতাম তারে পায়॥"[৭৭]

উত্তরবঙ্গ থেকে সংগৃহীত দুটি রাজবংশী দেহতত্ত্ব গানে পরলোক চিন্তার সন্ধান মেলে। এই পৃথিবীতে কেহই আপন নয়। একলা এসে একলা চলে যেতে হয়, কেউই সঙ্গী হয় না। তাই পারলৌকিক চিন্তায়, সংসার যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্য মোক্ষ লাভ করার জন্য, হরিনাম সংকীর্তনের কথা বলা হয়েছে।

"ওরে হরিবোল মন বারে বারে
বেলা ডুবিলে হবি অন্ধকার
সঙ্গে নাই সঙ্গী সাতি
সঙ্গীর সাতি কেউ হবে না
ওরে হরিবোল মনের রসনা
হরিবোল মন বারে বারে।"

আবার

"কার জন্যে তুই কান্দিস মন রে—
ভাই দেখো, ভাতিজা দেখো সম্পত্তির ভাগি
আগে করিবে পনের বাটারা, পরে দেহের গতি।
শ্মশান ঘাটে নিগিয়া মন তোক্ পুড়িয়া করিবে ছাই।
একে একে ছাড়িয়া আসিবে দয়াল বাপ-ভাই।"

কীর্তন : বাংলা গানের আদি ধারা হিসেবে কীর্তন গান অন্যতম। ঈশ্বর সাধনার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসাবে গানের সাধারণ জনগণের নিকট কীর্তনের বিশেষ কদর আছে। বাংলার বৈষ্ণব ধর্মজাত সঙ্গীতধারার বিকশিত রূপই কীর্তন। কীর্তনের দুটি ধারা। নামসংকীর্তন ও লীলাকীর্তন বা রসকীর্তন। প্রথম ধারাটিতে হরি বা বিষ্ণুকে সম্মোধন করে 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥' এই ষোড়শ পদ বত্রিশ অক্ষর বিশিষ্ট কীর্তনই নামসংকীর্তন। পঞ্চদশ শতকে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে কীর্তনগানে অসামান্য গতি সঞ্চারিত হয়। বস্তুত শ্রীচৈতন্যদেবই ছিল নাম সংকীর্তনের প্রচারক, পুরোধা। তিনিই সকলকে জানান, "আর কোনো শাস্ত্র নয়, কেবল 'হরে কৃষ্ণ' এই ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর বিশিষ্ট নামসংকীর্তন করলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে।" আর রাধাকৃষ্ণও গোপীকৃষ্ণের কাহিনী অবলম্বনে যে-পালাগান বা পালাকীর্তন তাই-ই লীলাকীর্তন নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভূ বা শ্রীচৈতন্যকে নিয়েও লীলাকীর্তন সৃষ্টি হয়েছে। কয়েকটি প্রধান লীলাকীর্তন হলো গোষ্ঠ, মান, মাথুর, নৌকাবিলাস, নিমাই সন্ন্যাস ইত্যাদি। জয়দেবের গীত *গোবিন্দম,* বড়ু চণ্ডিদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* ও মিথিলার কবি বিদ্যাপতির *ব্রজবুলি* কীর্তন ধারার বৈষ্ণব পদাবলী। ঈশ্বর প্রাপ্তির ও সাধনার সহজে উপায় হিসেবে কীতন, একটি সামাজিক আন্দোলন হিসেবে, মানুষের হৃদয়ে ঠাঁই করে নেয়। রাজবংশীরা চৈতন্যদেবের কীর্তনের আদর্শে, তাঁর আধ্যাত্মচিন্তা ও সাম্যধর্মে আকৃষ্ট হয়ে নামসংকীর্তন ও লীলাসংকীর্তন উভয় ধারায় আপ্লুত হয়েছে। তাই রাজবংশী সমাজে এই উভয় ধারায় কীর্তন তাদের জীবনে আধ্যাত্ম চেতনার অনুরনন সৃষ্টি করেছে।

রাজবংশী জীবনে ও সমাজে যেসব কীর্তন গান প্রচলিত সেগুলো কে বা কারা সৃষ্টি করেছে তার সবটা আজ আর জানা যায় না। তবে এসব গান বলা যেতে পারে রাজবংশী জীবনকে নবপল্লবিত–প্রস্ফুটিত করেছে। নিম্নে দুই ধারার দুটো কীর্তন নমুনাস্বরূপ দেওয়া হলো :

সুবোল মিলন কীর্তন[৭৮]: সুবোল মিলন কীর্তন কবে রচিত হয়েছে, আর কবে থেকে রাজবংশীগণ এই পালা কীর্তন বিভিন্ন ধর্মীয় গানের আসরে গেয়ে আসছেন তা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। তবে বর্তমান গবেষক যাঁর কাছ থেকে এই পালাগান সংগ্রহ করেছেন তিনি জানান যে, এ পালাগান অন্তত পঞ্চাশ বছর ধরে তাঁরা গেয়ে আসছেন। অর্থাৎ সময় হিসাব করলে দাঁড়াচ্ছে, ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার আগেই হয়ত এই পালাগান রাজবংশীদের ধর্মীয় জীবনে প্রভাব ফেলেছিল। আজ এসব কীর্তন গান তাদের জীবনের সাথে মিশে গেছে। নিম্নে সুবোল মিলন কীর্তন পালাটি উল্লিখিত হলো :

শ্রীমতি রাধারাণী কৃষ্ণসেবা করবেন বলে সখিগণসহ নানা বন ভ্রমণ করে নানা রকমের ফুল তুলে নিরালে বসে বসে মালা গাঁথছেন, আর মনে মনে বাসর সাজাচ্ছেন—

গীত (চৌ-তাল ১০ কসি)
নিরালে বসে মালা মালা গাঁথেন শ্রীমতি
হ্যান কালে, হ্যান কালে।
বন্ধুর কথা রায়ের পড়িল মনে সখি,
মালা গাঁথেন শ্রীমতি।
ও বন্ধুর কথা কথা গো রায়ের পড়িল, পড়িল মনে সখি। (২)

রাধা : প্রাণগোবিন্দ আসার সময় অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছ বলে শ্রীমতি রাধারাণী আজ বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করছেন।

গীত (তাল-বিরাম)
আমার বিরহ অনল জ্বলে রে।
ওরে সখি, আমার বিরহ অনল জ্বলে গেল রে
আমার মালার জ্বালায় দ্বিগুণ জ্বলে
আমার বিরহ অনল জ্বলে গেলো রে, ওরে সখি।

পদকর্তা : আমার পদকর্তা বলছেন, শ্রীমতি রাধারাণী বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করছেন। তাই সখিগণ প্রবোধ দিচ্ছেন। বলছেন, দ্যাখ শ্রীমতি, তুই যখন মালার জন্য বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করছিস, তবে ঐ মালা যমুনার জলে বিসর্জন দে। তাহলে তুই আর বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করবি নে।

গীত (তাল-গড় খেমটা)
যমুনার জলে মালা ভাসায়ে দাও গো
বিচ্ছেদ অনল নিভে যাবে জলে মালা দিলে.
নিভে, রায় ধনি তোর অনল নিভে যাবে
যমুনাতে মালা ভাসালে রায় ধনি তোর অনল নিভে যাবে।

রাধারাণী : শ্রীমতি রাধারাণী সখিগণ সহ বলছে, দ্যাখ সখিগণ, এখন যদি মালা যমুনার জলে বিসর্জন দিই, তারপর প্রাণ গোবিন্দ যদি আসেন, আমি তাকে তখন কী দিয়ে সেবা করব। তাই সখিগণ আবার বলেছেন

গীত (তাল-গড় খেমটা)
মালা ভাসায়ে দাও গো, যমুনারী জলে মালা ভাসায়ে দাও গো।
আসে কৃষ্ণ যাবে ফিরে ভাসায়ে দাওগো।
ভাসায়ে দাও গো
আসে কৃষ্ণ যাবে ফিরে, ভাসায়ে দাও গো।

পদকর্তা : শ্রীমতি রাধারাণী আজ সখিগণসহ মালা ভাসায়ে দিবে বলে যমুনর জলে উপস্থিত হয়েছেন। তাই শ্রীমতি রাধারাণী আমার প্রাণ গোবিন্দের উদ্দেশ্যে রোদন করছেন।

গীত (তাল-ঝাপ বাতি)
দয়াল হরি হে আমার সেই নিদানে
মালা ভাসাই কিনা ভাবি তাই মনে
প্রাণ সখি রে, ভাবি তাই মনে।
(দুন) মালা ভাসাই কিনা ভাবি তাই মনে
দয়াল হরি হে, আমার সেই নিদানে।

সখিগণ : সখিগণ বলছে, দ্যাখ শ্রীমতি, তুই আর বিলম্ব করিস নে, মালা যমুনার জলে ভাসায়ে দে।

গীত (তাল-১০ কসি)
মালা ভাসায়ে যমুনার জলে
মালা লাগলো কদম তলে।
হ্যান কালে সুবোলের গমনে, মালা ধরিতে যায় গো
সুবোল তখন ধরিতে যায় গো।
জয় রাধা, শ্রীরাধা বলে, মালা ধরিতে যায় গো,
(দুন) ধরিতে যাইগো, জয় রাধা শ্রীরাধা বলে মারা ধরিতে যাই গো।।
সুবোল তখন মালা নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের গলায় দিলেন

গীত (তাল-গড় খেমটা)
মালা লয়ে দুটি করে এনে দিল বংশির তরে
ধর ভাইরে, পরো মালা গলে।
তখন চম্পক ফুলের মালা দিলেন কৃষ্ণের গলে
মালা পরি সযত্নে সুবোলেরি বলে
মালা কেন বা দিলে গো।
আমার মনে পড়ালি
রায় বরণের কথা সুবোল মনে পড়ালি, মনে পড়ালি
গোষ্ঠ খেলা খেলতে খেলতে, মনে পড়ালি মনে পড়ালি।

(দুন) আজ বিনোদ খেলা খেলতে মনে, কেন ভাই মনে পড়ালি।

কৃষ্ণ : ভাই সুবোল, এই চম্পক ফুলের মালা গলায় পরা অবধি আমার রায়ের কথা মনে পড়ে গেছে। তাই যেকোনো প্রকারে হোক আমাকে আমার রায়কে এনে দেখাতেই হবে। আমি আর ধৈর্য্য ধরতে পারছি না।

গীত (তাল-গড় খেমটা)

যদি মিলাইতে পারে করে কোনো ছলারে
হইবো তোমার দাসো জনমে জনমে রে,
তোমার দাস যে হবো, ও ভাই সুবোল, তোমার দাস যে হবো
এ জনমের মতো তোমার দাস যে হবো।

সুবোল : ভাই কানাই আমার দাস হয়ে তোমার কোনো লাভ হবে না। কেননা, ধনী, জ্ঞানী, মহত্ব এই তিনটি সম্পদ যার নেই তার দাস হয়ে কোনো লাভ হয় না। ভাই কানাই, গুণ বা সম্পদ আমার নেই তাই আমি বলছি, ঐ কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রত্যেক মানবের দাস হওয়া একান্ত আবশ্যক।

কৃষ্ণ : ভাই সুবোল, তুমি যা বললে, আমি সামান্য গো—রাখাল, আমি রাজা বা ধনী তো না, আমার দাস হয়ে কি লাভ হবে?

সুবোল : ভাই কানাই, এই প্রাকৃতিক জগতের যে-ধন ঐশ্বর্য আছে ঐ ধনের ধন ঐশ্বর্যের আশায় যে তোমার দাস হতে চাচ্ছি তা নয়। আমি দাস হতে চাচ্ছি প্রেমধন পাওয়ার আশায়। যে-ধন লাভ করলে জীবন জন্ম-জন্মান্তর ভোগ করতে পারে, এবং তোমার কৃপা লাভ করতে পারে, আমি সেই ধনের আশায় তোমার দাস হতে চাচ্ছি। কারণ এই প্রেমধন অর্জন না হলে তোমার কৃপালাভ করা যায় না। তাই প্রত্যেক মানবের প্রেমধন লাভের আশায় দাস হওয়া কর্তব্য।

কৃষ্ণ : তা তো বললে সুবোল। আমি সামান্য বালক গো-রাখাল, আমার কি জ্ঞান থাকতে পারে? আমি বিদ্বান নই, পণ্ডিত নই।

সুবোল : ভাই কানাই, এই প্রাকৃতিক জগত যে-বুদ্ধি বা জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে ঐ জ্ঞানের আশায়, তোমার দাস হতে চাচ্ছি তা নয়। আমি দাস হতে চাচ্ছি সেই দিব্য জ্ঞানের আশায় যে দিব্যজ্ঞান লাভ হলে তোমার কৃপা লাভ করা যায়। তাই ঐ জ্ঞানের আশায় প্রতিদিন তোমার নিকট শরণগাত হয়ে প্রার্থনা করি, 'তিমিরান্ধস্য জ্ঞান অঞ্জন শলাকরা চক্ষুর উন্মিলিতং যেন তস্মে শ্রীগুরুবে নমঃ' আমার দিব্যজ্ঞান যাতে লাভ হয় বা লাভ করতে পারি, আমি কেন, প্রত্যেক মানবের কর্তব্য।

কৃষ্ণ : ভাই সুবোল, তাতো বললে। কিন্তু আমি ছেলে মানুষ গো—রাখাল, এই জগতের কল্যাণের উদ্দেশ্যে কিছুই করার সাধ্য বা ক্ষমতা আমার নেই। আমি তো মহৎ ব্যক্তি হতে পারি নি।

সুবোল : ভাই কানাই, তুমি মহৎ কি না আমি তা জানি। কেননা, মহৎ কাকে বলা যায়, আমি জানি, সেই মহৎ তুমি ছাড়া অন্য কোনো মানুষের নিকট প্রকাশ হয় না। কেননা, যে মানব নিজের চিন্তা করে এবং সাধন ভোজন করে

তোমার কৃপা লাভ করলেও তাকে মহৎ বলা যায় না। যে মানব নিজের বা আত্মচিন্তা-ভাবনা ত্যাগ করে দেশের বা দশের জন্য কর্ম করে সেই মানবই মহৎ। তাই ভাই কানাই, এই জগতে তোমার মতো মহৎ দ্বিতীয় আর কেউ নেই। কারণ, তুমি সেই জগতের নাথ জগদিশ্বর হয়ে এই জগতের কল্যাণার্থে গুরুরূপে তারন করবেন বলে বিরাজমান হয়ে আছ, থাকবেন, কাউকে ফেলে যাবেন না। ভাই তোমার মতো মহাত্মার দাস প্রত্যেকের হওয়া কর্তব্য। তাই ভাই কানায়, যেদিন বিষজল খেয়ে মরেছিলাম বা দানবেরা আগুনে পুড়িয়ে মেরেছিল, সেদিন তো তুমি ছাড়া আমাদের বিপদ হতে রক্ষা করা বা জীবন দান করতে আর কেউ ছিল না।

গীত (তা-গড় খেমটা)
একদিন বন দাবানলে আরো বিষ জলে
ও ভাই প্রাণ দান দিলে তুমি
আমি সে ধারও সুধিব রাধা এনে দিব
এই চলিলাম আমি।

সুবোল : যাবার সময় একটা কথা মনে পড়ে গেছে। তোর ঐ চরণ ধুলি দে, আমি রাধা আনতে যাত্রা করি।
আমি রাধা আনতে যাত্রা করি।
গীত (তাল-বিরাম)
আমার দে দে চরণ ধূলি
রাধা আনতে যাব, আমি দে দে চরণ ধূলি
(দুন) ও ভাই কানাই দে দে চরণ ধূলি, আমার দে দে চরণ ধূলি॥
সুবোল রাধাকে আনতে অয়ন গৃহে উপস্থিত হয়েছেন—
অয়ন গৃহে

সুবোল : সুবোল জটিলের নিকট বলছে, মাসিমা, আমাদের একটা বাছুর হারিয়েছে, দেখেছে নাকি ?

গীত (তাল-গড় খেমটা)
গোপালেরী লয়ে যেতে বাছুর গিয়েছি ফেলে
কালকের সকাল হতে তোমাদের পাড়াতে
মোদের হারায়ে গিয়েছে,
শ্যামলীর কোমলী বাছুর মোদের হারায়ে গিয়েছে
দেখেছ না-কি ও মাসিমা দেখেছ নাকি
মোদের শ্যামলী কোমলী বাছুর দেখেছ নাকি ?

জটিলে : জটিলে বলছে, বাপ সুবোল আমাদের পাড়ার তো বাছুরটাছুর তো দেখছিনে।

সুবোল : সুবোল বলছে, মাসিমা, খুঁজতে খুঁজতে আমার বড় পিপাসা লেগেছে।

গীত (তাল-গড় খেমটা)
বড় পিপাসা লেগেছে,

ঐ নানা বন ভ্রমণ করে বড় পিপাসা লেগেছে
আমার জল দাও গো, ও মাসিমা জল দাও গো
(দুন) জল দাও গো, আমার রসনা শুকায়ে যাচ্ছে,
ও মাসিমা জল দাও গো।
প্রত্যেক দুনের শেষে ৩ বার হরিবোল

জটিলে : জটিলে বলছে, বাপ সুবোল সত্য করে বল, তোর মনে অন্য কোনো অভিসন্ধি আছে কিনা?

সবোল : সুবোল বলছে, না মাসিমা, সত্যি আমি পিপাসায় কাতর। আমাকে একটু জল দাও, আমাকে শিঘ্র জল দাও।

জটিলে : জটিলে বলছে, তবে বাপ ঐ রান্না ঘরে জল আছে। তুমি জল খেয়ে পিপাসা নিবৃত কর গে। তবে আমার একটি কথা শোনো—

গীত (তাল গড় খেমটা)
জল খেতে যাওরে সুবোল তাতে নয়তো বাঁধা
ঘরে আছে কুলবধূ তারই নামটি রাধা
তারে ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না,
ঘরে আছে কুলবধূ রাধা তারে ছুয়ো না, ছুয়ো না
(দুন) যেন তার নাম করিস না
যার নামে বউ উন্মাদিনী, যেন তার নাম করিস না।

সুবোল : সুবোল বলছে, না মাসিমা আমি অন্য কিছু বলবো না, আমি শুধুমাত্র জল খাব।

পদকর্তা : পদকর্তা বলছে, সুবোল রান্না ঘরে গিয়ে রাধারাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেই রাধা রাণী বলছে

গীত (তাল-গড় খেমটা)
এসো এসো এসো প্রাণেরি সুবোল
ওগো বহুদিন পরে দেখা কেমনে আছে হে
বনে, আমারি মরমী সখা কেমনে আছে হে
মরমী সখা বনে, কেমনে আছে হে।

সুবোল : শ্রীমতি, তা আর কি বলব, তোমার অদর্শনে কেঁদে কেঁদে ধূলোয় লুণ্ঠিত হচ্ছে।

গীত (তাল-ঝাপ বাতি)
বসে কেন গুণমণি বনে কান্দে গুননিধি
কেঁদে কেঁদে শ্যাম আকুল গো,
তোমার অদর্শনে ধনি, কেঁদে পোহায় দিন রজনী,
কেঁদে কেঁদে শ্যাম আকুল গো।
বসে কেন গুণমণি, বনে কাঁদে গুননিধি।

রাধা : রাধা বলছে, সুবোল বললি কি? আমি এই ঘরের কুলবধূ হয়ে দ্বিপ্রহর বেলার কি করে দেখা করি। আমি তো আর ধৈর্য্য ধরতে পারছি নে।

সুবোল : সুবোল বলছে, শ্রীমতি এক উপায় আছে, তোমার ঐ পাটের শাড়ি পড়ে আমি এই রান্না ঘরে বসে থাকি, তুমি আমার এই পিতধড়া পরে প্রাণের বন্ধুর দর্শনে যাত্রা কর।

গীত (তাল-গড় খেমটা)
তখন সুবোলেরি পিতধড়া রাধিকা পরিল·
রাধিকার ও পাটের শাড়ি সুবোল পরিল,
সেজেছে ভাল, বন্ধু দরশনের তরে সেজেছে ভাল
চলে যাও, চলে যাও;
(দুন) প্রাণবন্ধুর দরশনে চলে যাও চলে যাও।

পদকর্তা : পদকর্তা বলছে, শ্রীকৃষ্ণদর্শনে রাধারাণী যাত্রা করিলেন।

গীত (তাল-গড় খেমটা)
তখন একপদ দুইপদ তিনপদ পরে
চলতে না পেরে ধনী আইল ফিরে।
আমার যাওয়া তো হলো না,
ওরে সুবোল আমার যাওয়া তো হলো না
আমার বাধি তো লেগেছে, ও বন্ধু দরশনের তরে, বাধিতো লেগেছে;
এই যুগোল পয়োধরা, বাধিতো লেগেছে।

রাধা : রাধারাণী বলছে, ওরে সুবোল আমি যে আর ধৈর্য্য ধরতে পারছিনে, আমি কোন উপায়ে প্রাণ বন্ধুর সঙ্গে দেখা করব ?

পদকর্তা : পদকর্তা বলছে, শ্রীমতির মনে কষ্ট জানতে পেরে আদ্যশক্তি যোগমায়া হরের বাছুর হরণ করে শ্রীমতি রাধারাণীর নিকটে দিলেন।

গীত (তাল-গড় খেমটা)
যোগী জানে যোগমায়া কৈলাসে বসিয়ে
এনে দিন হরের বাছুর হরণ করিয়ে,
বলে সেজেছে ভাল, বন্ধু দরশনের তরে সেজেছে ভাল,
চলে যাও, চলে যাও, বৎস ধনি কোলে চলে যাও, চলে যাও।
(দুন) চলে যাও, চলে যাও; চলে যাও, চলে যাও
প্রাণবন্ধুর দরশনে চলে যাও, চলে যাও।

পদকর্তা : পদকর্তা বলছে, শ্রীমতি রাধারাণী সুবোলের বেশে আমার প্রাণ গোবিন্দের নিকট গেলেন।

কৃষ্ণ : তাই আমার প্রাণগোবিন্দ বলছেন, ওরে সুবোল তুই একা আসলি, আমার শ্রীমতি কই ?

রাধা : সুবোল বেশে রাধারাণী বলছে সে আর কৃষ্ণদর্শন করবে না,
কৃষ্ণ নামও করবে না। কৃষ্ণ যে বাঁশী বাজায় রাধা রাধা বলে সে বাঁশী পেলে যমুনার জলে বিসর্জন দেবে।

কৃষ্ণ : তাই আমার প্রাণ গোবিন্দ বলছে, সুবোল বললি কি? যে শক্তির আশ্রয় পেয়ে আমি সর্বশক্তিমান, সেই শ্রীমতি আমাকে ত্যাগ করেছে?
এই বলতে বলতে আমার প্রাণ গোবিন্দ অচৈতন্য হলেন।

গীত (তাল-দোলন)

চৈতন্য চাঁদ অচৈতন্য হলো রে, বৃন্দাবনের মাঝে। (৩ বার)

রাধা : তাই শ্রীমতি রাধারাণী বলছেন, হায়! হায়! আমি করলাম কি! প্রাণবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাত করব বলে এসে এখন আমি একি বিপদগ্রস্ত হলাম, তাই শ্রীমতি রাধারাণী আজ আমার প্রাণগোবিন্দের পদ ধরে কাঁদছে।

গীত (তাল-তিওট)

ওঠ ওঠ ওহে নাথ
ওহে তোমার চরণ সেবার দাসী, দাসী ঐ আসছে॥
(তাল-দোলন)
ওঠ ওঠ ও প্রাণ নাথ
তোমাব চরণ সেবার দাসী এসেছে।

পদকর্তা : তাই আমার প্রাণগোবিন্দ আজ জাগ্রত হয়ে, রাধাকৃষ্ণ যুগল মিলন হলো।

মিলন গীতি (তাল)

আজ আমাদের সুখের বৃন্দাবন-নিত্য নতুন নতুন
নতুনো শ্যামেরী বামে নতুনো কিশোরী রায়
দাঁড়ালো শ্যামের বামে বল হরি। (২)
ঐ ফুলেরি মালা নতুন গাঁথনী
শ্যামের গলে দিচ্ছে মালা রাধা বিনোদিনী।
ঐ ময়ুরী বলে ও ময়ুর পেখম ধরে থাক,
রাধা কৃষ্ণের যুগল হলো নয়ন ভরে দ্যাখ।

রূপ বর্ণনার আকর

আমার গৌর সুন্দরের রূপ দর্শন করে আরেকজন ভক্ত বলছেন। তাই পদকর্তা ভাব দিয়ে বলছেন—

দ্যাখো গীত রে ভাই নয়ন ভরে
আমাদের সেই রাধারাণী দ্যাখেরে ভাই নয়ন ভরে
ঐ দ্যাখ, ভুলিতে নারে নয়ন বাঁকা, শ্যাম অঙ্গ রায় রূপে ঝাপা,
ভুলিতে নারে নয়ন বাঁকা।
এ যে ব্রজ হতে এসেছে গো
আমাদের সেই বনমালী ব্রজ হতে এসেছে গো
মা যশোদায় নয়ন তারা,
(দুন) এবার নদীয়ায় পড়েছে ধরা, মা যশোদার নয়ন তারা।

শ্রীবাস গৃহিনী মালিনীমা আমার গৌর সুন্দরকে পেয়ে নদীয়া নাগরীগণকে ডেকে ডেকে বলছেন।

গীত

আয় আয় তোরা দেখে যা গো—
অনার্পিত গৌর মুরতি আয় আয় তোরা দেখে যা গো
দেখে যারে নদেবাসী আয় আয় তোরা দেখে যা গো
উজ্জল রসের নির্যাস মুরতি, আয় আয়, তোরা দেখে যা গো
(দুন) চৌষট্টি রসের নির্যাস মুরতি, আয় তোরা দেখে যা গো।

তাই আমার গৌর সুন্দরের রূপ দেখে একজন ভক্ত বলছেন এহেন অপরূপ মুরতি কোন বিধি গঠন করেছে?

গীত

কোন বিধি গঠেছে গো
অপরূপের মুরতি, কোন বিধি গঠেছে গো।

পদকর্তা : তাই আমার পদকর্তা ভাব দিয়ে বলছেন, আমাদের যে বিধি গঠন করেছেন, সে বিধির গঠন হতে পারে না। কারণ আমাদের ভিতরে এরকম অপরূপ মুরতি একটাও দ্যাখ্যা যায় না। তাই পদকর্তা ভাব দিয়ে বলছেন, আমাদের বিধিকে যে বিধি গঠন করেছে সেই বিধির গঠন হতে পারে।

গীত

এ বিধির গঠন নাই ভাই
ভুবনোমোহনো মুরতি বিধির গঠন নাই-ভাই
বিধির বিধি গঠেছে ভাই।
অপরূপের মুরতি বিধির বিধি গঠেছে ভাই
বলি গঠে নয়নে দেখে নাই ভাই
অনার্পিত গৌর মুরতি, গঠে নয়নে দেখে নাই ভাই
দেখলে ছেড়ে দিত না ভাই, গঠে নয়নে দেখে নাই ভাই।

পদকর্তা : তাই আমার পদকর্তা ভাব দিয়ে বলছেন—

গীত

ভুবনোমোহনো মুরতি, গঠে বিধি ছেড়ে দিয়েছে
(দুন) এই জগৎকে দেখাবে বলে, গঠে বিধি ছেড়ে দিয়েছে।

শ্লোকসহ রূপ-বর্ণনার আকর

অনার্পিত গৌর মুরতি কোনো যুগে কোনো সময় কাউকে এই অনার্পিত প্রেমনাম অর্পণ করেন নাই। তাই এই অনার্পিত প্রেম নাম যেচে সেধে কলিজীবকে প্রদান করলেন।

পদকর্তা : তাই পদকর্তা ভাব দিয়ে বলছেন—

গীত

কলিজীবের ভাগ্যে অপর্ণ হলো এই অনার্পিত গৌর মুরতি
কলিজীবের ভাগ্যে অপর্ণ হলো।

তাই পদকর্তা ভাব দিয়ে বলছেন, কলিজীবের এই নাম প্রেম অর্পণ হয়ে কি হলো?

গীত

কলির জীব আজ ধন্য হলো
অনার্পিত গৌর অর্পণ হয়ে,
কলির জীব আজ ধন্য হলো
আজ আনন্দ ধরে না
মালিনী মায়ের মনে আজ আনন্দ ধরে না,
ঐ আনন্দ ধরে না
শ্রীবাসেদের চারভাই, আনন্দ ধরে না,
(দুন) নিজ ঘরে গৌর পেয়ে আজ আনন্দ ধরে নারে।

কীর্তন-২ কলিতে গৌর সুন্দরের আবির্ভাব[৭৯] **:** আজ যে উপাখ্যান বর্ণিত হবে, সেটি হচ্ছে কলিতে গৌর সুন্দরের আবির্ভাব। একদিন দেবর্ষি নারদ, কৃষ্ণনাম গুণকীর্তন শ্রবণ করার লাগি মর্ত্যধামে ভ্রমণ করছেন। সারা মর্ত্যধাম ভ্রমণ করে কোথাও তিনি কৃষ্ণনাম শ্রবণ করতে পারলেন না। এই সময়টা হলো দ্বাপর যুগের লীলা অবসান ও কলিযুগ আগত। তাই দেবর্ষি নারদ মনে মনে চিন্তা করছেন, কলি যুগ কৃষ্ণনাম বর্জিত, কলিজীব বড়ই বিপদাপন্ন। আমি কখনো স্বর্গে, কখনো মর্ত্যে, কখনো পাতালে প্রতিদিন এইভাবে ত্রিভূবন ভ্রমন করি। বিশেষত যখন যার অমঙ্গল দেখতে পায় আমি তখন তার মঙ্গল কামনা না করে থাকতে পারি না। তাই কলির জীব যে বিপদাপন্ন তা আমার দ্বারা মঙ্গল হওয়া অসাধ্য। কলি জীবের মুক্তি আমার দ্বারা সম্ভব না। তাই দেবর্ষি নারদ চিন্তা করে স্থির করলেন আমার প্রাণগোবিন্দ দ্বারকায় আছেন। তাই দেবর্ষি নারদ দ্বারকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন কলি জীবের মুক্তির জন্য। দেবর্ষি নারদ দ্বারকায় গিয়ে দেখছেন, আমার প্রাণগোবিন্দ সিংহাসন পরে বসে আছেন। রুক্সিনী সত্যভামা পদসেবা করছেন। দেবর্ষি নারদকে দেখামাত্রই সিংহাসন থেকে উঠে এসে আলিঙ্গন করলেন। আর বললেন, দেবর্ষি নারদ, কি মনে করে? সর্বমঙ্গল তো? তখন নারদ বলছেন, "প্রভু আমি কৃষ্ণনাম শ্রবণ করার লাগি মর্ত্যধামে গিয়েছিলাম, কিন্তু সারা মর্ত্য, ভ্রমণ করে কোথাও কৃষ্ণনাম শ্রবণ করতে পারি নি। কলির জীব সব কৃষ্ণনাম বর্জিত।

গীত

কেহ জাগা নাই, জাগা নাই
আমি সারা ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে এলাম, কেউ জাগা নাই জাগা নাই,
সব মায়া ঘুমে ঘুমায়ে আছে, কেউ জাগা নাই জাগা নাই।

প্রভু হে কলির জীব সব কৃষ্ণনাম বর্জিত। তারা বিষয় সম্পদ ও আত্মঅহংকারে মর্ত্য হয়ে মোহ ঘুমে ঘুমিয়ে আছে। তাই তোমার নিকটস্থ হয়েছি। তখন আমার প্রাণগোবিন্দ বললেন, "দেবর্ষি তোমার মুখে এই কলি বার্তা শ্রবণ করে আমার মন খুব ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। কারণ আমি এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছি, সবই আমার ভক্ত, কিন্তু মানব আমার প্রধান প্রিয় ভক্ত। এদের দুঃখ কষ্ট আমি সহ্য করতে পারি না। তাই কলি জীবের মুক্তির পথ আমাকে করতেই হবে। তুমি শিঘ্র করে দেবলোক, ব্রহ্মলোক, শিবলোক, ইন্দ্রলোক গমন কর। তারা যেন স্ব স্ব ভাবে মর্ত্যে গিয়ে জন্মগ্রহণ করে। আমিও পিছে পিছে আসছি।" তাই আমার প্রাণগোবিন্দ নন্দসূত কৃষ্ণনদীয়ায় শচীগর্ভে গৌর রূপে অবতীর্ণ হলেন। তিন বাঞ্ছা-অভিলাষি নদীয়ায় উদয় হলেন গৌর হরি। তার একটি বাঞ্ছা এই, কলির জীবকে তিনি উদ্ধার

করবেন। তাই তিনি বাল্যলীলা শেষ করে গার্হস্থ্য আশ্রম ত্যাগ করে চব্বিশ বছর শেষে সন্ন্যাস অবলম্বন করলেন। সন্ন্যাস অবলম্বন করে অনার্পিত মধুর হরির নাম প্রেম অযাচিতভাবে প্রদান করলেন। তাই আমার গৌর সুন্দর বললেন, "হরের্ণাম হরের্ণামৈব কেবলম। কালৌ নাস্তেব্য নাস্তেব্য গতিরন্যথা।"

আমার গৌরসুন্দর বললেন, হে কলির জীব, এ নাম ছাড়া গতি নাই, গতি নাই। তাই গৌরের নিত্যসিদ্ধ পরিষদ, প্রভু নিত্যানন্দকে নিয়ে এই মধুর হরির নাম প্রেম প্রদান করতে করতে আজ এই শ্রীবাস আঙিনায় উপনীত হলেন। শ্রীবাস মালিনীমা আমার গৌর সুন্দরকে পেয়ে, নদীয়া নারীগণকে ডেকে বলছেন—

গীত

আমার গৌর সুন্দর এসেছে রে
আরে কিবা শ্রীবাসের (২) অঙিনায় ঐ এসেছে রে।
আয় আয় তোরা দেখে যারে
আমার গৌর সুন্দর এসেছে রে
দেখে যারে নদে বাসী, আমার গৌর সুন্দর এসেছে রে।
আয় আয়, তোরা দেখে যা গো
অনার্পিত গৌর মুরতি, আয় আয় তোরা দেখে যা গো
দেখে যারে নদে বাসী, আয় আয় তোরা দেখে যা গো
উজ্জ্বল রসের নির্যাস মুরতি, আয় আয় তোরা দেখে যা গো
(দুন) চোষট্টি রসের নির্যাস মুরতি আয় আয় তোরা দেখে যা গো।

আমার গৌরসুন্দরকে দর্শন করতে নদীয়া নাগরীগণ চলেছেন। তাই পদকর্তা ভাব দিয়ে বলছেন,

গীত

সব সারি সারি চলিল
যত নদীয়া নাগরী সব সারি সারি চলিল
সব সারি সারি চলে যায়
এ ভবের লিলা খেলা, সব সারি সারি চলে যায়।
তারা আর ফিরে আসবে না, সারি সারি চলে যায়॥

তাই নদীয়া নাগরীগণ অন্যান্য সবাইকে ডাকছেন—

গীত

আয় না ধনি, আয় না চলে
গৌর রসের বদন দেখবি যদি, আয় না ধনি আয় না চলে॥

অন্যান্য নারীগণ বলছেন, আমরা কুল ছেড়ে কি করে যাব? তখন পদকর্তা বলেছেন—

গীত

কুলে কি মোদের গৌর দিবে
অকুলের কাণ্ডারী গৌর, কুলে কি মোদের গৌর দিবে।
যাই যাবে ছার কুলে যাবে, কুলে কি মোদের গৌর দিবে
মোদের ছাড়ে ছাড়বে পতি

(দুন) পাই যদি গৌর প্রাণ পতি, ছাড়ে ছাড়বে গৃহপতি
পাই যদি মোর জগৎপতি ছাড়ে ছাড়বে গৃহপতি।

তাই নদীয়া নাগরীগণ আমার গৌর সুন্দরকে দর্শন করছেন। তখন পদকর্তা বলছেন,

গীত

দ্যাখো রে ভাই নয়ন ভরে
আমাদের সেই রাধারমন, দ্যাখ্যো রে ভাই নয়ন ভরে
ঐ দ্যাখো ভুলিতে নারে নয়ন বাঁকা
শ্যাম অঙ্গ রায় রূপে ঝাপা, ভুলিতে নারে নয়ন বাঁকা
এ যে ব্রজ হতে এসেছে গো
মা যশোদার নয়ন তারা
(দুন) এবার নদীয়ায় পড়েছে ধরা, মা যশোদার নয়ন তারা।

তখন আমার গৌর সুন্দরের রূপ দেখে একজন ভক্ত বলছেন, এহেন অপরূপের মুরতি কোনো বিধি গঠন করেছে।

গীত

কোন বিধি গঠেছে গো
অপরূপের মুরতি কোন বিধি গঠেছে গো

তখন আমার পদকর্তা ভাব দিয়ে বলছেন, আমাদের যে বিধি গঠন করেছেন, এ বিধির গঠন হতে পারে না। কারণ আমাদের ভিতর এরকম মূর্তি আর একটিও দেখা যায় না। তাই পদকর্তা আবার বলছেন, আমাদের বিধিকে যে বিধি গঠন করেছে সেই বিধির গঠন হতে পারে।

গীত

এ বিধির গঠন নাই ভাই
ভবনোমোহনো মুরতি, বিধির গঠন নাই ভাই
বিধির বিধি গঠেছে ভাই
অপরূপের মুরতি বিধির বিধি গঠেছে ভাই
বলি গঠে নয়নে দেখে নাই ভাই
অনার্পিত গৌর মুরতি গঠে নয়নে নাই ভাই।
তাই পদকর্তা বলছেন, না, দেখেছে, দেখে ছেড়ে দিয়েছে।

গীত

গঠে বিধি ছেড়ে দিয়েছে,
ভুবোমোহনো মুরতি গঠে বিধি ছেড়ে দিয়েছে
(দুন) এই জগৎকে দেখাবে বলে গঠে বিধি ছেড়ে দিয়েছে।

অনার্পিত গৌর মুরতি কোনো যুগে কোনো সময় কাউকে এই অনার্পিত নামপ্রেম অর্পণ করেন নিতাই এই অনার্পিত নামপ্রেম যেঁচে সেধে কলি জীবের প্রদান করলেন।

তাই পদকর্তা ভাব দিয়ে বলেছেন—

গীত

কলি জীবের ভাগ্যে অর্পণ হলো
এই অনার্পিত গৌর মুরতি কলি জীবের ভাগ্যে অর্পণ হলো

তাই পদকর্তা বলছেন, কলি জীবের প্রতি এই নাম প্রেম অর্পণ হয়ে কি হলো?

গীত

কলির জীব আজ ধন্য হলো
অনার্পিত গৌর অর্পণ হয়ে কলির জীব আজ ধন্য হলো।
আজ আনন্দ ধরে না
মালিনি মায়ের মনে আজ আনন্দ ধরে না। (২)
শ্রীবাসেদের চারি ভায়ের আনন্দ ধরে না রে।
নিজ ঘরে গৌর পেয়ে আজ আনন্দ ধরে নারে।
তাই ভাগ্যবতী মালিনীমা আজ গৌর চরণ ও ধুয়ায়ে দেয়—

গীত

গৌর চরণ ধুয়ায়ে দেয়
নয়ন জলে চরণ ধুয়ায়ে দেয়
ধুয়ায়ে দেয় আর মুছাইয়ে দেয়। গৌর চরণ ধুয়ায়ে দেয়।
গৌর বদন পানে চেয়ে চেয়ে, চরণ ধুয়ায়ে দেয় আর মুছায়ে দেয়॥

আমার পদকর্তা বলছেন, গৌরসুন্দরকে নিজের বাড়িতে পেয়ে কত আনন্দিত, কিন্তু দুই নয়নের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে, কারণ কি? তাই পদকর্তা আবার বলছেন, মানুষ শোকে দুঃখে কাঁদে, আনন্দেও কাঁদে। তাই আজ মালিনীমা গৌর সুন্দরকে পেয়ে আনন্দের অশ্রু ধারায় বুক ভেসে যাচ্ছে। আজ মালিনীমা নিজ হাতে গৌর চরণ ধুয়ায়ে দিচ্ছেন। দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ। তাই আমার ভাগ্যবতী মালিনীমা বৃক্ষসম হইনু। তাই গৌর চরণ ধুয়ায়ে দিয়ে আমার মালিনীমার জনম স্বার্থক হয়েছে (আর কাঁদছে)।

গীত

প্রেম জলে ডুবু ডুবু লোচন তরা
প্রলাপো সন্তাপো কিবা আদি রসে ভরা
নয়ন কোমল বহে রে
ভাগ্যবতী মালিনীমার আজ নয়ন কোমল বহে রে
হৃদয় কোমল হতে ধারা, নয়ন কোমল বহে রে।
আজ বদন কোমল বহে রে।
হৃদয় কোমল হতে ধারা, বদন কোমল বহে রে
ধারায় ধরা ভেসে গেল। (২)
(দুন) এই জগৎ কে ভাসাবে বলে ধারায় ধরা ভেসে গেল।

মালিনীমা ও নদীয়া নারীগণ আমার গৌরসুন্দরের গলে পুষ্পমাল্য প্রদান করেছেন। তাই আমার পদকর্তা ভাব দিয়ে বলছেন—

গীত

কোন ধনি গেঁথেছে মালা
মন মতো মন মতো করে কোন ধনি গেঁথেছে মালা
ঐ অনুরাগের সুতো দিয়ে কোন ধনি গেঁথেছে মালা
কোন ধনি গেঁথেছে মালা।
আমার গৌরের গলে কতই শোভা, কোন ধনি গেঁথেছে মালা
মালা দুলিতে লাগিল।
গৌর গলা পেয়ে মালা মালা দুলিতে লাগিল
পরিসর পরে, মালা দুলিতে লাগিল
মালা বাড়িতে লাগিল।
দুলিতে দুলিতে মালা বাড়িতে লাগিল
মালা বাড়িতে লাগিল।
দুলিতে দুলিতে মালা বাড়িতে লাগিল
মালা বাড়িতে লাগিল।
চরণে জড়াবে বলে, মালা বাড়িতে লাগিল
অমনি গর্জিয়া উঠিল
চরণ হতে নুপুর গর্জিয়া উঠিল।
বলে তোর হতে আজ আমি ধন্য
গলায় থেকে কি করিলি মালা তোর হতে আজ আমি ধন্য।
আমি সেই পদে জড়ায়েছি রে।
(দুন) দেবগণ যে পদ পায় না ধ্যানে সেই পদে জড়ায়েছি রে।

গীত

আয় আয় তোরা দেখে যা গো। (২)
শ্রীবাস আঙিনায় চাঁদের বাজার, আয় আয় তোরা দেখে যা গো
নয়ন মেলে দেখে নেও গো, দেখে যা রে নদে বাসী,
(দুন) এমন দিন কি আর হয় কি না হয়, দেখে যারে নদে বাসী।

কীর্তন দুটির মূল চরয়িতার নাম বাসুদেব ঘোষ বলে উল্লিখিত আছে। কিন্তু কবে বা কোন সময়কালে রচিত তার কোনো সন্ধান মেলে না।

কৃষিব্রতমূলক সঙ্গীত : রাজবংশী সমাজে কৃষিকেন্দ্রিক যেসব আচার, পূজা অনুষ্ঠান এবং তার সাথে গানের প্রচলন রয়েছে সেগুলো হলো কাতি পূজার গান, ষাটপূজার ব্রত উপলক্ষে গান এবং হাটঘুরনির আচার। এসব গানের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য কৃষিক্ষেতের ফসল রক্ষা ও বৃদ্ধি ছাড়া সন্তান কামনার সাথে অর্থাৎ উর্বরতাবাদের সাথে সম্পৃক্ত।

কাতি পূজার গান : উত্তর ও পূর্ব বাংলায় রাজবংশী সমাজে কাতি পূজা বা কার্তিক ব্রতের গান বহুল প্রচলিত। কার্তিক মাসের সংক্রান্তিতে এই ব্রত অনুষ্ঠিত হয় বলে এর নাম কার্তিক ব্রত হয়েছে।[৮০] কাতিপূজার গানে কৃষিজ ফসল রক্ষা উপলক্ষে শস্যক্ষেত নষ্টকারী ইঁদুর, পাখি, বাঘকে নিয়ে রচিত হয়েছে গানগুলো। এসব শস্য নষ্টকারী কীটপতঙ্গ ও

পশুপাখিকে নিরস্ত করতে গানের মাধ্যমে তাদের কাছে প্রার্থনা জানানো হয়।[৮১] গানগুলো বৃহত্তর রংপুর, দিনাজপুর ও খুলনা এলাকায় প্রচলন আছে। বর্তমান গবেষক বৃহত্তর যশোর এলাকায় কার্তিক পূজা উপলক্ষে ফসল ও সন্তান কামনার সন্ধান পেলেও গানের অস্তিত্ব খুঁজে পান নি। এসব গান হয়তো ক্রমশ বিলুপ্ত হতে চলেছে।

গান–১

ওরে ইন্দুররে ইন্দুর, তুই খন্দক করিস না
খন্দক করা ধানগুলো ছিপি করিস না
চোত্ মাসত্ বুনুন ধান পাকলে পরে খাম
হামার কাটার আগে ইন্দুর তুই কিসোক কাটিল্।[৮২]

গান–২

পংখিরে, আর রে বাবুই রে
ক্ষেতের পাকনা ধান কেনে খাইলিরে
ওড়ে ওড়ে ধান খায়, পড়ে পড়ে রঙ চায়
সারাই নাইলের আগ বাসরে।।[৮৩]

গান–৩

তোলা মাটি ধওলারে বাইগোন
সাধু বাইগোন ঝোঁপা ঝোঁপ।।
সেই বাইগোন ছিড়িতেরি সাধু
সাধুর হস্তে নাগিল কাঁটা।।
চওড়ার হাটে যায়ারে সাধু
সাধু আনিলেক বিন্দি সূতা।
কোলাতে বসায়েরে সাধু
সাধু খসায় হস্তের কাটা।
তোলা মাটির ধওলারে বাইগো,
সাধু বাইগোন ঝোঁপা ঝোঁপা।
সেই বাইগোন ছিঁড়িতেরি সাধু
সাধুর পায়ে নাগিল কাঁটা
পালঙ্কে বসায়েরে সাধু
সাধুপায়ের খসায় কাটা।[৮৪]

ষাট পূজা[৮৫] : উত্তরবঙ্গের রাজবংশী মেয়েরা ষাট পূজা করেন। ষাট পূজা কৃষিজ ফসল বৃদ্ধি ও সন্তান লাভের সাথে যুক্ত। মিহির চৌধুরী কামিল্যা এই পূজাকে রাজা নয়নারায়ণের সময়কালের পূজা বলে উল্লেখ করেছেন। তার রাজ্যে এই পূজার প্রচলন হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের চারদিন বাকি থাকতে এই পূজা শুরু হয়। সাতদিন চলে। প্রয়োজন হয় একটি ছোট্ট পিঁড়ি। সেটাকে উকনাই গৌরীর পিঁড়ি বলে। পূজার ব্রতিদের হাতে গড়া ক'টি কাদার পুতুল থাকে। নাম উকনাই গৌরী, ছত্রকাকই, ওদের ছেলে ও বামন–বামনী। একটি রঙিন কাপড় দিয়ে সাজানো হয়। পিঁড়ির চারিদিকে সাজানো মাটির ডেলা, আর লাগে কাটা হরিতকি, ডালিম,

পেয়ারা, লেবু ও নাসপাতি, একটি সিঁদুর কৌটা ও একজোড়া শাঁখা। পূজা শেষে দেওয়া হয় নৈবদ্য, ফল, মিষ্টি, দই, চিড়ে ইত্যাদি।

রাজবংশীদের ষাট পূজার ব্রতকথার গানগুলোতে সন্তান রক্ষাকারী ষষ্ঠীর আরাধনার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ব্রতগানগুলো তার প্রমাণ বহন করে। একটি গান নিম্নরূপ :

ছুরি কাটারি জাগো ঝাঁকে ঝাঁকে লাগো
হারাইলে পাই মরিলে জিয়াই
দুপুরি আগুনে খ্যালায় স্যালয় নিবাই।[৮৬]

হাট ঘুরানী : উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজে কোথাও কোথাও এই ব্রত পালিত হয়। দশ পনের জন মেয়ে ও কিছু কিশোর ও পুরুষ একত্রিত হয়ে উলু দেয়, ও দুধমাখা চাল নিয়ে হাট ঘুরে বেড়ায় সাতবার। বৃষ্টি না হলে, ফসলের জন্য বৃষ্টি কামনায় এ উৎসব করে। এই উৎসবে একসময় বিবস্ত্র হতো বলে মিহির উল্লেখ করেছেন।[৮৭] এখন অবশ্য বিবস্ত্র করা হয় শিশু মেয়েকে। অবশ্য বিভিন্ন এলাকায় হাট ঘুরানীর নাম ভিন্ন ভিন্ন। কোথাও কোথাও 'গ্রাম সেবা' আবার কোথাও কোথাও 'ভেদই খেলা' পরব বলে। সবগুলোরই উদ্দেশ্য এক নাচগান ও নাচগানের সাহায্যে বৃষ্টি নামানো। এই সংস্কারটির সাথে তাদের হুঁদুম দ্যেও পূজা এর প্রভূত মিল রয়েছে। এগুলোর প্রত্যেকটি ঐন্দ্রজালিক বা যাদু প্রভাবজাত সংস্কার।

ধর্মনিরপেক্ষ সঙ্গীত : যেসব গান সাধারণত চিত্ত বিনোদনের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হয়েছে, ধর্মীয় উদ্দেশ্যে নয়, সেই গানগুলো ধর্মনিরপেক্ষ সঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত। ধর্মনিরপেক্ষ সঙ্গীতে কর্মে উদ্দীপনা যোগায়, মানব জীবনের সুখ-দুঃখ, প্রেম-বিরহ, আশা-আকাঙ্খা, রাগ-অভিমান ইত্যাদি প্রতিফলিত হয়। সেকারণে ধর্ম নিরপেক্ষ সঙ্গীত মানুষের মুখে মুখে সবসময় গীত হয় ; কখনো ঘাটে, কখনো মাঠে, কখনো একাকি, কখনো আসরে।

কর্ম উদ্দীপনামূলক সঙ্গীত : যেসব গান কর্মে উদ্দীপনা যোগায় সেই গানকে এর অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা হয়।

ধুয়া গান : বৃহত্তর কুষ্টিয়া, যশোর ও খুলনা জেলায় ধুয়া গানের বেশ প্রচলন রয়েছে। অত্র এলাকার রাজবংশীরা ধুয়া গান গায় মাঠে-ঘাটে, আসরে সব জায়গায়। ধুয়াগানে মানুষের বাস্তব জীবনের ছবি প্রতিফলিত হয়। গানগুলো খুব সাদামাটা ; কোনো চিত্রকল্প, প্রতীকী শব্দ কিংবা কোনো অনুসঙ্গের আশ্রয় ধুয়া গানে দেখা যায় না। ধুয়া গান কখনো কখনো ভাবগান ও বাউল সাধনা ও সুফীতত্ত্বের গানের পর্যায়ভুক্ত মনে করা হয়। নিম্নে রাজবংশীদের কাছ থেকে সংগৃহীত দুটি ধুয়ো গান উপস্থাপিত হলো :

গান-১

দয়াল আমার আর জন খাটা হয় না
রাজবংশী জোলা মালো এরা সবাই জাতির ভাল গো
কেউ ধরে মাছ, কেউ বোনে তাঁত
কেউ কারো বাড়ি যায় না, দয়াল কেউ কারো বাড়ি যায় না
দয়াল আমার আর জন খাটা হয় না।
কামার কুমোর তেলি সুঁড়ি আমরা তাদের বাড়ি গেলি গো
ঐ ছুঁয়ো না ঐ কুমোরের বাড়ি গো

দয়াল এ কথা গায়ে সয় না
আমার আর জন খাটা হয় না
দয়াল আমার আর জন খাটা হয় না।[৮৮]

১৩৪৩ বঙ্গাব্দে ঝিনেদা মহাকুমায় গুনাই বিবি যাত্রা পালা গীত হওয়ায় ঐ এলাকায় নারী পুরুষ মাতোয়ারা হয়েছিল। সেই প্রভাব অদ্যাবধি চলছে। তৎকালীন সময়ের একটি ধুয়াগান সংগৃহীত হয়েছে, যে গানে ঐসব এলাকার সমাজ জীবনের চিত্র প্রস্ফুটিত হয়েছে।

গান–২

বিটারা গায় মাঠে–ঘাটে, ছামড়ারা গায় সব সময়
বিটিরা গায় রানতি বসে, ছেমড়িয়া আম কুড়োয় আর গায়।
জন না বেচলি পেট চলে না, সকালে যায় বেচিতে
মাগী তখন পাড়ার পর যায় কর্জ মাঙিতে।
তোরা ঝাল তেল লবণ দেনা সকালে যায় রাধিতে
মোল্লা পাড়ায় হচ্ছে গুনা আমরা তাই যাব শুনিতে।
উঠেছে রবারের জুতো ছয় আনায় বাবুগিরি
মুচি মেথর ভদ্র ইতর চিনিতে না পারি।
আরো তাদের বাবুগিরি খিলির দোকানের খিলি পান
মাচায় ছুঁচো তেরাত করে কাপড়ের নিচে আণ্ডার প্যান।
কারুর মাথায় তেল জোটে না ছ্যাপ দিয়ে করে চুল সমান
রসিক বলে কলি কালে গেল মানির মান
কারো হাফশার্ট গায়, চকরা জুতো পায় সবাই বলে দল করি
গ্রামে গ্রামে হচ্ছে গুনাই আমরা ঘুমাতে না পারি।।

প্রেমমূলক সঙ্গীত

ভাওয়াইয়া : মূলত বিরহ–বিচ্ছেদের গান। পল্লীর যুবতী নারীর প্রেমার্তি, মিলন–ব্যাকুলতা ও বিচ্ছেদ বেদনা ভাওয়াইয়া গানের উপজীব্য। ভাওয়াইয়া গানের কেন্দ্রীয় ভাব নারীর প্রেম, সে কুমারী কন্যা হোক, কিংবা যুবতী বধূর পরকীয়া প্রেমই হোক। এসব গান কোনো না কোনো পুরুষকে সম্বোধন করে নারীর আর্তি, হৃদয়ের আকুলতা, বেদনা, নৈরাশ্য প্রকাশিত হয়। মাহুত, মৈষাল, চ্যাংড়া, নাইয়া, বৈদ, সাধু, বাউদিয়া ইত্যাদি শ্রেণীর পুরুষকে সম্বোধন করে গানগুলো সৃষ্টি হয়েছে।[৮৯] রাজবংশীদের এই ভাওয়াইয়া গান শুধু উত্তরবঙ্গের নয় সারা বাংলাকে প্লাবিত করেছে। গানগুলোতে কোনো পৌরাণিক চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় না। কালা–কানাই নামের যে চরিত্র পাওয়া যায়, সে কানাই ব্রজের কৃষ্ণ নন, পল্লীর নামহীন কোনো যুবক।[৯০]

ভাওয়াইয়া গানের বহু স্থানীয় নাম আছে। যেমন মাহুতের গান, মৈষাল বন্ধুর গান, গাড়ীয়াল বন্ধুর গান, কানাইর গান, পাথারিয়া গান, দোতরার গান ইত্যাদি। তাছাড়া ভাওয়াইয়া বিশেষজ্ঞগণ এ গানকে চিতন ভাওয়াইয়া, ক্ষীরোল ভাওয়াইয়া, দরিয়া, ও দীঘলনাসা ভাওয়াইয়া, মৈষালী ভাওয়াইয়া প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন।

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলা এবং পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলীয় কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর এবং আসামের গোয়ালপাড়া জেলাসমূহের মধ্যে এ গানের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে। শিল্পী গবেষক সুখবিলাস বর্মা বলেছেন, ভাওয়াইয়া যে অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী সঙ্গীত সেই প্রাচীন কামরূপের মূল জনগোষ্ঠী রাজবংশী, এবং এই অঞ্চলের রাজবংশী ধারায় পুষ্ট। একথা বলা প্রয়োজন যে, শুধু রাজবংশী নন, এ অঞ্চলের ব্রাহ্মণ, খেন, যোগী, ধোপা, কোচ, মেচ, রাভা, মুসলমান সকলেই মূল রাজবংশী সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, উল্লিখিত অঞ্চলের মানুষজন (মূলত রাজবংশী) তাদের ধ্যান-ধারণা, আচার-আচরণ, জীবনযাত্রার সুখ-দুঃখ, তাদের শিল্পবোধ, অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি নদী প্রভৃতি, আঞ্চলিক ভাষা সবকিছুর মধ্যে উৎপত্তি হয়েছে এই ভাওয়াইয়ার।[৯১] ভাওয়াইয়া যাদের হাতে প্রাণ পেয়েছে, পেয়েছে বিপুল জনপ্রিয়তা তাঁরা কেশব বর্মণ, রংপুরের হরলাল রায়, তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথ রায়, ইন্দ্রমোহন রাজবংশী প্রমুখ। তাছাড়া নায়েব আলী, আব্বাস উদ্দীন, সুরেন্দ্রনাথ বসুনিয়া, ফেরদৌসি রহমান, কছিমুদ্দিন, মোস্তফাজামান আব্বাসী, রোকসানা করিমও ভাওয়াইয়া গান জনপ্রিয় করে তুলেছেন। নিচে নমুনা হিসেবে কয়েকটি ভাওয়াইয়া গান তুলে ধরা হলো :

ভাওয়াইয়া[৯২] গান-১ কিসের মোর আন্দন কিসের মোর বারন
কিসের মোর হলদি-বাটা,
মোর প্রাণনাথ অন্যের বাড়ি যায়,
মোর আঙ্গিনা দিয়া ঘাটা॥
মোর বন্ধু গান গায় মাথা তুলি না-চায়
চমকি চমকি হাসং চোখের ইশারা করং
তবু বন্ধু না-দেখে মোরে।
আর যদি শোনং আর যদি দেখং
অন্যজনের সাথে কাতা,
এহেনত যৌবন সাগরে ভাসাব
পাষাণে ভাঙ্গিব মাথা॥
নিন্দের আলিশে হাত পড়ে বালিশে
মনে করং বন্ধু বুঝি আছে
চেতনা হয়া দেখং বন্ধু নাই বগলে
বকখান মোর ছ্যাং ছ্যাংগা হইছে॥

গান-২ ও কি মোরি বন্ধুরে বন্ধু, আজি ছাড়িনু মুই জনমের মত।
বাপো-মায়ের মোর কঠোর হিয়া দূরদেশে দিছে বিয়া,
দেশ ছাড়িয়া যাং দেশান্তরে।
বন্ধুরে বন্ধু, ছাড়িনু মুই জনমের মত।
মোর কাতা যদি থাকে মনে
যাইবেন একবার ঐনা দেশে, রইব না পন্থের দিকে চাইয়া।
বন্ধুরে বন্ধু, ছাড়িনু মুই জনমের মত।

গান–৩ আই মোর পায়ে বা ঘুংরো বাজেরে
আই মুই কেমনে বাইরা যাং
ঘরে মোর শ্বশুর আগদুয়ারে ভাসুর
ও মোর শিয়রে ননদী জাগে
আও মুই পিরীতির আগে পিরীতিরও বাদে
ও ঘুংগুরায় বায়না দিনু
আরে না জানিয়া রসিয়া বানিয়া
কালাই বা ভরেয়া দিছেরে॥
ও মুই ঠাসিয়া ধরং চিপিয়া ধরং
ও আস্তে ফেলাওং পাওরে॥

গান–৪ আরে ও বাঙর মইষের ওরে দফাদার
আজি না করং তোর বাঙর মোষর চাকিরি।
আজি বাঙর মোষের ওরে এমনি রে দুধ
চোখের না ধরে নিন্।
আজি মোষ চড়াং মোর মৈষাল বন্ধু রে
ও মৈষাল কোন্ বা চরার মাঝে
আজি এলাও কেনে ঘান্টির ডাং
না শোনো আর কানে।
আজি ব্যথান দিছি ও মোর কন্যারে
ও কন্যা ঘাটের উজানে
জল আনিবার ছলে কন্যা
দেখা করেন মোরে।

আচার-সংস্কারমূলক পারিবারিক সঙ্গীত

রজঃসক্রান্তির গান : রমণীদের নিকট রজঃসংক্রান্তি উৎসবটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। রাজবংশী সমাজ বিশ্বাস করেন যে, আষাঢ় মাসের সাত তারিখ থেকে পরবর্তী তিন দিন আকাশ ও পৃথিবীর মিলন হওয়ার ফলে ধরিত্রী রজঃস্বলা হয়। ব্যক্তিগত জীবনে রজঃকালে মেয়েদের যেসব নিয়ম পালন করতে হয় রাজবংশীরা ভূমির ক্ষেত্রেও সেই একই ধরনের নিয়ম মেনে চলেন। ঐ সময় মাটিকাটা, লাঙল চালনা, জমি-নিড়ানী ইত্যাদি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। পুরুষেরা জমিতে কোনো কাজ করেন না। আসামের কামাক্ষ্যা মন্দিরে এই সময় রজঃউৎসব হয়। উত্তরবঙ্গসহ সার বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার রাজবংশী সমাজে বিশ্বাস আছে যে, কামাক্ষা মন্দিরের যোনিপীঠে মাটির ভেতর থেকে এসময় রজঃরক্ত উৎসারিত হয়। এই সময় লুচি, রুটি, চিড়ে, মুড়ি কিংবা পান্তাভাত খাওয়ার রেওয়াজ আছে। এছাড়া কেউ কেউ উপবাস থেকে ফলমূল ও কাঁচা দুধ খান।

রাজবংশী সমাজে কোনো মেয়ে প্রথমত রজঃস্বলা হলে এখনো রমণীগণের মধ্যে উৎসবের তোড়জোড় লক্ষ করা যায়। এখনো সধবা মেয়েরা দলবেঁধে নতুন ঋতুমতী মেয়েকে স্নান করায় ও সমস্বরে গান গায়। তবে এসব গান এখন বিরল হয়ে পড়েছে। উত্তরবঙ্গের

রাজবংশী সমাজে এইসব গান এখনো প্রচলিত থাকলেও দক্ষিণবঙ্গে রাজবংশী সমাজে রজঃউৎসবে কোনো গান গাওয়া হয় না। তবে অন্যান্য আচার-প্রথা মানা হয়। রজঃউৎসবের গান হলো—

"হাতৎ নিলো কার গো খৈলা কচুনার পাতৎ নিলো ছেকা।
নদীৎ যাবা কাজ নাইগে বেটি চয়াৎ ঘষেক মাথা॥
চুয়ার পানিৎ আই মোর না ভিজে দেহা।
যাত্রাকালে আই মোক নাই করিস বাধা॥"[৯৩]

মেয়ে ঋতুমতী হলে মা তার সানন্দ স্বীকৃতি দেন, এবং বয়স্ক বলে ধরে নিয়ে তাকে নতুন কাপড় ও ফোতা ব্যবহারের ব্যবস্থা করে দেন। এ গানে তারই সন্ধান মেলে—

"বেটি, তুই দুইহে চাইরহে ঘষেক দেহা।
হাটের হাট আনি দিম তোক বাহারের ফোতা।
পিন্দিয়া বেড়া তুই চাইরোতি। পেখা করিয়া ময়র নাখাতি।
মাইয়া মানষি হামেরা বেড়ালি।
নসর অসর দেহার হিলানী হ্যাদে ল-দ্যাল খঁপা।
হ্যাসেক স্যাক করিয়া বেটি তুই পিন্দিস গে ফোতা॥"[৯৪]

পূর্বে রাজবংশী মেয়ের ৬-৭ বছর বয়সে বিয়ে হতো। ফলে শ্বশুর বাড়ি বধূ ঋতুমতী হলে তাকে ঘটা করে, লোক জানিয়ে গর্ব করে দ্বিতীয় বিয়ে দেওয়া হতো। যে মেয়ে বিয়ের আগে বাপের বাড়ি ঋতুমতী হতো শ্বশুর বাড়ির মহিলা সমাজে তাকে তিরস্কৃত হতে হতো।

বিয়ের গান : রাজবংশী সমাজে বিয়ে উপলক্ষে প্রচুর আচার-বিশ্বাস-সংস্কার বিদ্যমান রয়েছে। বিয়ের উদ্দেশ্যে কনে দেখা থেকে শুরু করে বিয়ের পর বেশ কিছুদিন পর্যন্ত বিভিন্ন আচার-সংস্কার পালিত হয়। এই আচার-সংস্কার-বিশ্বাস হিসাবে তাদের সমাজে বিয়ের গান প্রচলিত আছে। এই গানগুলো বাংলাদেশের সব এলাকার রাজবংশী সমাজে এখন আর দেখা যায় না। তবে বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুরে প্রচলন আছে। সমস্ত উত্তরবঙ্গে এসব গান গেয়ে যেমন পুরানো রীতি ঐতিহ্য পালিত হয়, তেমনি আনন্দ উপভোগ করা হয়।

কোনো বিবাহযোগ্য কন্যাকে দর্শনের সময় কন্যার বুদ্ধি বিবেক, রান্নাবান্নায় দক্ষতা ইত্যাদি পরীক্ষা করার জন্য বিভিন্ন প্রশ্ন করা, ধাঁধা জিজ্ঞাসা করার প্রচলন এখনো বিদ্যমান। সমগ্র উত্তরবঙ্গে হেঁয়ালী করে প্রশ্ন করার রীতিও পরিলক্ষিত হয়। রংপুর অঞ্চলের এরকম একটি হেঁয়ালী ধরনের গীত—

বরপক্ষ : বলতো দ্যাখি মা, কোন ভত্তাতে হলদি দেওয়া নাগে?

কনে : মাছের ভত্তা আর ডালের বত্তাতে হলদি দেওয়া নাগে।

বরপক্ষ : আচ্ছা মা কনতো দ্যাকি কোন জিনিস দিলে তরকারি হয় ভাল?

কনে : আকলান-পাকলান জ্বাল, ঝাল তরকারী হয় ভাল।

বরপক্ষ : আচ্ছা কনতো দ্যাকি মা বেটি ছাওয়ালের সবচেয়ে দামী অলঙ্কার কোনটি?

কনে : সোয়ামী। —রংপুর[৯৫]

এরপর কনে পছন্দ হলে বরকনে আশীর্বাদের দিন ধার্য্য হয়। তারপর নানান ধরনের আচার অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে বিয়ের দিন সমাগম হলে বিয়ের কেনাকাটা, গৃহ আঙিনা সাজানো, ছাদনা তলা তৈরি ও আল্পনা অঙ্কন, গঙ্গাবরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠান হয়। রাত্রে বয়যাত্রীসহ বর-কনের পিতার গৃহে উপস্থিত হলে বরণ ডালায় বরপক্ষ কনের জন্য যেসব অলঙ্কার নববস্ত্র ও বিলাস সামগ্রী নিয়ে আসেন তাই দিয়ে কনে সিংরানো বা সাজানো হয়। এই সময় পরিবেশিত হয় মেয়েলী গীত—

“বরের বাবা আইনচেরে সোনা
ভরা সবার মাঝে
বরু তাঁইও বোলে আকুলান পড়ে
বাপধন দ্যাকিয়া নাও নাইটেরো শলকে
বরের বাবা আইনচেয়ে সেন্দুর
ভরা সভার মাজে
বরু তাঁইও বোলে আকলান পড়ে
ভাইধন দ্যাকিয়া ল্যানও হ্যাচাগের শলকে।” —রংপুর[৯৬]

তারপর বর-কনের বিয়ের সময় রমণীরা সমস্বরে গান গায়। এই গানগুলোতে রাজবংশী সমাজের নানান চিত্র ফুটে ওঠে। মাথায় মুকুট, কপালে চন্দনের উল্কি, হাতে কাঁকন ও গলায় চন্দ্রহার পরে কন্যা বিয়ের পিঁড়িতে বসলে ব্রাহ্মণ ঠাকুর মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে জলঘটের আম্রপল্লবের উপর বর-কনের হাত রেখে বাপকে দিয়ে কন্যা সম্পাদন করেন। তাদের সমাজের বিয়ের এটি গান—

“বর কন্যার বিয়াও হয়
আস্তে আস্তে কইন্যা পাও ফেলায়
বাপের বাড়ির কইন্যা
শ্বশুর বাড়ি যায় রে
হলুদ মাখা কইন্যার গোরা গাও
আস্তে আস্তে কইন্যা ফেলায় পাও
কোলার ছোটো ভাই কান্দে
কান্দে বাপে মাও।
সোনার বরণ কইন্যার চন্দ্রমুখ
ধিকধিক কইন্যার করে বুক
আজি হত ভাঙিল কইন্যার
বাপের বাড়ির সুখ।
চন্দ্রমালা কইন্যার হস্তে কাঙ্কন
মাথাত মটুক কপালে চন্দন
দুই চোখ ভিজা কইন্যার
না বিরায় কান্দন।
ঘাটের উপুরা আমের পাত

বরে কইন্যায় রাখে পাত
মন্ত্র কয় বামুন ঠাকুর
সম্প্রদান করে বাপ।
বৈরাতী জোগার দেয় তালে-তালে
ঢোল করকা সানাই বাজে
বাপের দুলালী কইন্যা
শ্বশুর বাড়ি যায় রে।"[৯৭]

বিয়ে সম্পন্ন হলে বাসি বিয়েতে কৃত্রিম পুকুর পার, কড়ি খেলা ইত্যাদি নানান আচার সম্পন্ন হলে একসময় কনে বিদায় পর্ব আসে। তখন কন্যার পিতা-মাতা আত্মীয়-স্বজন কেঁদে আকুল হয়। তখন কন্যার মাতার কণ্ঠে কান্নার ধ্বনীর সাথে গীত হয়—

"বচোন মোর কান্দেরে
বচোনের মাও কান্দে পাষাণে ভাঙ্গিমো মাতারে।"[৯৮]

শ্বশুর বাড়ি যাওয়ায় পূর্বে পিতা শেষ বারের মতো উপদেশ দেয়।

"ভাত দেখে দিনু বিয়ে তোক
ভালো করে থাকিবো তুই সুখত রাখিবো মোক"।[৯৯]

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজে বধূবরণের সময় গান ও নৃত্য হয়। সেই গান ও নৃত্য বেশ উপভোগ্য। প্রতিবেশী এয়োস্ত্রীগণ এই বধূবরণের গান গান, বিধবা মহিলারা এই গান গেয়ে থাকেন, ও অনেক রঙ্গ রসিকতা করেন। বরণের একটি গান—

"ওরে বরণ করতে চাইলেন চায়
কানের সোনা কইন্যার ঢুল খেলায়,
ও কি ওরে বরণ করিত আই মোর
আরো বা কি কি নাগো রে
ওকি ওরে ধূপ নাগে ধুনা নাগে
আরো বা কি কি নাগেরে।
বরণ করিতে চাইলোন চায়
আই বইরাতি করিয়া নেয়
ওকি ওরে বাদ্যকার বাইজ বাজায়
যখরিয়ায় বন্দুক ফুটায় রে
বরণ করিতে চাইলোন চায়
কনের সোনা কইন্যার ঢুল খেলায়
ওকি ওরে যখরিয়ায় বন্দুক ফুটায়
বিয়ার সাজোন সাজেয়া নেয় রে।"[১০০]

বিয়ের পর কনে যখন শ্বশুর বাড়িতে থাকে, বাপ-মা তাকে দেখতে আসেন না, কিংবা বাপের বাড়ির কোনো খোঁজ খবর পান না, তখন বাপ মায়ের জন্য প্রাণ কেঁদে ওঠে কনের। কন্যাকে বেঁচে খেয়ে অর্থাৎ বিয়ে দিয়ে আর কোনো সংবাদ নিচ্ছেন না বলে পাষাণ পিতা-মাতার খবরের জন্য আগ্রহে অপেক্ষা করার চিত্র ফুটে ওঠে নিম্নোক্ত গানে—

"ও গাড়িয়াল ভাই পাও ধরং
একখানা কাথা জিগাসা করং
কেমন আছে মোর দয়াল বাপ-মাও
বাপো মা মোর কঠোর হিয়া
মন বান্দিছে পাষাণ দিয়া
বেচায়া খায়া মোর খবর না করে।"[১০১]

সাধভক্ষণের গান : রাজবংশী সমাজে গর্ভধারণ থেকে শুরু করে শিশুর অন্নপ্রাশন বা মুখে ভাত দেওয়া অনুষ্ঠান পর্যন্ত নানান ধরনের আচার-অনুষ্ঠান-বিশ্বাস, সঙ্গীতের প্রচলন রয়েছে। শিশুকেন্দ্রিক এসব আচার অনুষ্ঠানের পেছনে যাদুবিশ্বাস সক্রিয়। শিশু ও প্রসূতি সংক্রান্ত আচার-সংস্কার উৎসবের মূল কারণ-যাদু ও ট্যাবু, সন্তানের নিরাপত্তা ও মঙ্গল কামনা। গর্ভবতী নারী বিভিন্ন ধরনের খাবারের প্রতি একটি আকর্ষণ বোধ করে থাকেন। সেকারণে একদিন নানান ধরনের খাদ্যসম্ভারে তাকে আপ্যায়িত করা ও অনাগত সন্তানকে আশীর্বাদ করার রীতি হলো সাধভক্ষণ উৎসব। সাধভক্ষণ উৎসবের গানগুলোতে শারীরিক পরিবর্তন ও নানা ধরনের উপসর্গের কথা, বিভিন্ন ধরনের খাবারের প্রতি দূর্নিবার আকর্ষণের কথা প্রকাশ পায়। যেমন—

"গাবরুর মাও মোর হাউসের পোয়াতী কি সোনালী
খাবার চাইছে ইলশা মাছের পেটি কি সোনালী
কইন্যার বাপ বলে মোর বৈ ভাতার ধরেক কি সোনালী।"[১০২]

যে-কোনো ধরনের টক দ্রব্যাদি যেমন, বরই, তেঁতুল, লেবু, লেবুপাতা, কড়কড়া ভাত, পান্ত ভাতা প্রভৃতির প্রতি গর্ভবতী গ্রাম্য রমণীদের আকর্ষণ থাকে, যেটি এই গানের মধ্যে পাওয়া যায়—

"লাউলোর বউলো সাধগুি।
কি কি খাইতে সাধ?
ঘরের ছাঁইচে নলভোগ ছিম, তাই খাইতে সাধ।
বরইর অম্বল, কড়াকড়া ভাত
লেবু পাতা আর পান্তাভাত।"[১০৩]

গানগুলোর মধ্যে গর্ভবতী নারীর শারীরিক পরিবর্তনের কথা পাওয়া যায়। যেমন—

"দুই মাসের ব্যালায় লো সুজুনী ভুজনী
আমার গা বমি বমি করে লো সুজনী ভুজনী
তিন মাসের ব্যালায় লো সুজনী ভুজনী
আমার মাথা ঘুর ঘুর করে লো সুজনী ভুজনী।।"[১০৪]

শিশুকেন্দ্রিক আচার-গান : উত্তরবঙ্গসহ অন্যান্য এলাকার রাজবংশী সমাজে সাত দিনের দিন 'সাতের কামান' অনুষ্ঠানে নাপিত ডেকে ক্ষৌরকর্ম করে শিশুর মস্তক মুণ্ডন ও নখ কাটা হয়। এসময় উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের রমনীগণ গান গায়—

"ভাল করে করেন গো খেউরি
বিন্না বাড়ির নাপিত হে
বালার মাথায় চুল যেন না থাকে হে।"[১০৫]

মুখে ভাত বা অন্নপ্রাশনের গান : সাধারণত পাঁচ বা সাত মাসে আত্মীয় কুটুম্ব ও পাড়া প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করে স্থানীয় গ্রাম মাঙ্গলিক থানে আনুষ্ঠানিকভাবে শিশুর মুখে ভাত স্পর্শ করান। সেই সময় তাদের পরিবারের মহিলারা ও অভ্যাগত আত্মীয় স্বজন ও অন্যান্য রমণীরা সমস্বরে গীত পরিবেশন করেন।

"ক্ষীর খা রে ছ্যাইল্যা ক্ষীর খা
তোর মার হাতের ক্ষীর খা
মার ডিমত ব্যাচা টাকা দ্যাহাজে পাব
তবে না খাবার হামি মার হাতের ক্ষীরও।"[১০৬]

রাজবংশী সমাজে সন্তানের মুখে ভাত অনুষ্ঠানে পূর্বে ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হতো না, বর্তমানে ব্রাহ্মণ ঠাকুর দ্বারা মুখে ভাত স্পর্শ করানো হয়, এবং কেউ কেউ এ অনুষ্ঠান বিশাল কলেবরেও করে থাকেন।

তথ্যসূত্র

১. সুনীল চক্রবর্তী, *লোকায়ত বাংলা,* পৃ. ৬ ; উদ্ধৃত : বেণু দত্তবায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬
২. হুঁদুম দ্যেও-এব গান রাজবংশী গান অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।
৩. আশরাফ সিদ্দিকী, *লোকসাহিত্য* (ঢাকা : স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৬৩), পৃ.১৭০
৪. George Thomson, *Studies in Ancient Greek Society,* quoted from বেণু দত্তবায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২
৫. বেণু দত্তবায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১
৬. ঐ, পৃ ৮৪
৭. ঐ
৮. *লোকসাহিত্য,* ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৭ (বাংলা একাডেমী, ঢাকা থেকে প্রকাশিত)
৯. ওয়াকিল আহমদ, *লোককলা প্রবন্ধাবলী,*
১০. লেখকেব ব্যক্তিগত সংগ্রহ।
১১. ওয়াকিল আহমদ, *লোককলা প্রবন্ধাবলী,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২১
১২. সংগ্রহ : সাধনচন্দ্র বিশ্বাস, গ্রাম—বাদুরগাছা, কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ থেকে।
১৩. সংগ্রহ : ঐ থেকে।
১৪. Prof. Nirmal Kumar Bose, *Tribal Life in India*. p. 71.
১৫. শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু (সম্পা.) *বাংলা বিশ্বকোষ,* খণ্ড ১৮, (কলকাতা : প্রথম প্রকাশ ১৮৮৬-১৯১১), দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৮৮, পৃ. ৪২-৮১
১৬. Ralph L.Beals and Harry Hoijer, *An Introduction to Anthropology* 3rd ed; (Newyork : The McMillan Company, 1965), pp. 644-645.
১৭. সৌরিন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, 'ভাষার জন্মকথা', *মাসিক বসুমতি,* (বৈশাখ ১৩৪২), পৃ. ১০৮
১৮. রাজেশ্বর মিত্র, *বাংলার সংগীত* (কলিকাতা : মিত্রালয়, মধ্যযুগ, ১৯৫৫), পৃ. ২৩
১৯. সুকুমার রায়, *ভারতীয় সংগীত : ইতিহাস ও পদ্ধতি* (কলিকাতা : ফার্মা কে.এল, মুখোপাধ্যায়, ১৯৭৫) পৃ. ১৬৫, পরিবর্ধিত সংস্করণ।
২০. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোকসাহিত্য,* (কলিকাতা : ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৫৭)। *বাংলা লোকসাহিত্য :* নৃত্য ও গীত, (কলিকাতা : ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৬৫), ১ম সংস্করণ।
২১. আশরাফ সিদ্দিকী, *লোকসাহিত্য* (ঢাকা : স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৬৩)

২২. M. Shahidullah & M.Abdul Hai, *Traditiond Culture in East Pakistan* (Dacca: University of Dacca, 1963).

২৩. রওশন ইয়াজদানী, *মোমেনশাহীর লোকসাহিত্য* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭০)।

২৪. সামীয়ূল ইসলাম, *উত্তর বাংলার লোকসাহিত্য* (রংপুর : বেগম আয়েশা ইসলাম, ১৯৭৩)।

২৫. আব্দুল হাফিজ, *লৌকিক সংস্কার ও মানব সমাজ* (ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৭৪)।

২৬. প্রভাত কুমার গোস্বামী (সম্পা), *হাজার বছরের গান* (কলিকাতা : সরস্বতী লাইব্রেরী, ১৩৭৬)।

২৭. সুধীরকুমার করণ, *সীমান্ত বাংলার লোকযান* (কলিকাতা : এ মুখার্জী এণ্ড কোম্পানী প্রা. লি:, ১৩৭১)।

২৮. দিলীপ মুখোপাধ্যায়, *উত্তর রাঢ়ের লোকসংগীত* (কলিকাতা : কলোনী প্রকাশনী, ১৯৭০)।

২৯. আব্দুল হাফিজ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫

৩০. Hans Kelsen, *Society and Nature* (London : Kegan Paul Co. 1967), p. 24

৩১. হাবিবুর রহমান, *ভৌগোলিক পরিবেশ ও লোকসংগীত* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮২), পৃ. ৭৪–৭৫, সংগ্রহ : রংপুর কাউনিয়া থানা, ১৯৭৭

৩২. ড. মুহম্মদ আবদুল জলিল, *উত্তরবঙ্গের লোকসংগীত*
৬০ ও গবেষকের ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

৩৩. *লোকসাহিত্য*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৭ (বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত)।

৩৪. মোহাম্মদ আব্দুল হাফিজ, 'যাদুবিদ্যার দিগদিগন্ত', *সাহিত্যিকী*, ১৩৭৪ (বসন্ত সংখ্যা), পৃ. ১৫৩

৩৫. বেণু দত্তবায়, *উত্তর বাংলার লোকসাহিত্য*

৩৬. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা লোকসাহিত্য*, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৯

৩৭. ঐ, পৃ. ৪৫৩

৩৮. শ্রীপূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ, 'গ্রাম্যগীতি সংগ্রহ', *রঙ্গপুর-সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা*, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩১৬, পৃ. ১৭৫

৩৯. Saratchanra Mitra, 'On the Cults of Sonaroya in Northern Bengal', *JDL*, Vol. VIII, 1922, pp. 165-166.

৪০. Saratchandra Mitra, *op. cit, JDL*, Vol. VIII, p. 160

৪১. দীনেশচন্দ্র সেন, *পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ৪র্থ খণ্ড, ২য় সংখ্যা* (কলিকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩২), পৃ. ৪৬৭

৪২. বেণু দত্তরায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

৪৩. হ্যাঁচড়া পূজার গানগুলো সংগৃহীত হয়েছে শ্রীমতি পারুল বিশ্বাস, বয়স-৪৫, পেশা-গৃহিনী, শিক্ষা-নিরক্ষর, স্বামী-জীবনচন্দ্র বিশ্বাস, গ্রাম-বাদুরগাছা, ডাকঘর-হাট বার বাজার, থানা-কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ ও শ্রীমতি সীতারানী বিশ্বাস, বয়স-৩৬, পেশা-গৃহিনী, শিক্ষা-নিরক্ষর, স্বামী-কার্তিকচন্দ্র বিশ্বাস, গ্রাম-চান্দুটিয়া, ডাকঘর-চান্দুটিয়া, যশোর।

৪৪. চিত্তরঞ্জন দেব, *পল্লীগীতি ও পূর্ববঙ্গ* (কলিকাতা : কথকতা, ১৩৬৫), পৃ. ৪৫

৪৫. সংগ্রহ : সোহাগী, বয়স : ৭০, পেশা-গৃহিনী, শিক্ষা-নিরক্ষর, স্বামী-বিরেশ্বর বিশ্বাস, গ্রাম-বাদুর গাছা, থানা-কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ থেকে গবেষক নিজে সংগ্রহ করেছেন।

৪৬. শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু (সম্পা), *বাংলা বিশ্বকোষ, অষ্টাদশ ভাগ,* (দিল্লী : বি, আর, পাবলিশিং কর্পোরেশন, ১৯৮৮), ১ম প্রকাশ ১৮৮৬–১৯১১, পৃ. ৭৪

৪৭. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, *কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী* (ক.বি. ১৯৫৪), পৃ. ১৬২

৪৮. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *বাংলা সাহিত্যের কথা, ২য় খণ্ড* (ঢাকা : ১৩৭১ বঙ্গাব্দ) পৃ. ২৩৬

৪৯. সিবাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাপিডিয়া : বাংলাদেশের জাতীয় জ্ঞানকোষ,* খণ্ড ১০

৫০. ঐ, পৃ. ২১-২২
৫১. সুকুমার সেন, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস,* ১ম খণ্ড (কলিকাতা : ১৯৬৩), পৃ. ৪৫০
৫২. মুহম্মদ আবদুল জলিল, *লোকসাহিত্যের নানাদিক* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩), পৃ. ৫২
৫৩. মিহির চৌধুরী কামিল্যা, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১২৪
৫৪. বামেশ্বর ভট্টাচার্য, *সত্যপীবের কথা,* নগেন্দ্রনাথ বসু (সম্পা.), (কলিকাতা : বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ), পৃ.৫
৫৫. রামাই পণ্ডিত, *শূণ্যপুবাণ,* নগেন্দ্রনাথ বসু (সম্পা.), (কলিকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষৎ, ১৩১৪)
৫৬. রামেশ্বব ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১
৫৭. মিহির চৌধুরী কামিল্যা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯
৫৮. ঐ, পৃ, ১১৯
৫৯. ঐ. পৃ. ১১৯
৬০. ঐ, পৃ. ১২০
৬১. ঐ, পৃ. ১২০
৬২. জাগগানগুলো গ্রাম-বাদুবগাছা, থানা-কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ থেকে গবেষকের ব্যক্তিগত সংগ্রহ।
৬৩. হাবিবুর বহমান, *ভৌগোলিক পরিবেশ ও লোকসংগীত,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪
৬৪. চিত্তরঞ্জন দেব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯-৫০
৬৫. শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, *ভারতীয় সাহিত্যে বারমাস্যা* (কলিকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রা: লি. ১৯৫৯) পৃ. ২২
৬৬. সিবাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাপিডিয়া,* খণ্ড ৯, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫১-৩৫২
৬৭. ঐ, খণ্ড ৩, পৃ. ২৯০-২৯১
৬৮. আবদুল কাদির, *বাঙলাব লোকায়ত সাহিত্য* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫) পৃ. ৫১
৬৯. ঐ, পৃ. ৫২
৭০. ঐ, পৃ. ৫২
৭১. গবেষকের ব্যক্তিগত সংগ্রহ। যাঁর থেকে সংগৃহীত : সাধনচন্দ্র-বিশ্বাস, বয়স-৩৬, পেশা-কৃষিকাজ, শিক্ষা-এস.এস.সি. পিতা-যুগোলচন্দ্র বিশ্বাস, গ্রাম-বাদুরগাছা, কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ।
৭২. আশুতোষ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ.১২৯
৭৩. ভাবগান : লেখকের ব্যক্তিগত সংগ্রহ।
৭৪. ঐ
৭৫. মোমেন চৌধুরী ও সামীয়ুল ইসলাম, *লোকসাহিত্য,* খণ্ড ১৯ (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৫১
৭৬. খোন্দকার রফিউদ্দিন, *ভাব-সংগীত,* হরিশপুর, যশোর, গান নং-৫৩, (যশোর : ১৩৭৮) পৃ. ১৯
৭৭. অধ্যাপক আনোয়ারুল করিম, *বাউল সাহিত্য ও বাংলা গান* (কুষ্টিয়া : ১৯৭১), পৃ. ২২৫
৭৮. সুবোল মিলন কীর্তনটি গবেষক সংগ্রহ করেছেন—কীর্তনীয়া যুগোলচন্দ্র বিশ্বাস, বয়স- ৭৫, পেশা-সাধু, শিক্ষা পঞ্চম শ্রেণী পাশ, গ্রাম-বাদুরগাছা, থানা-কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ থেকে। মূল রচয়িতা বাসুদেব ঘোষ। সময়কাল-উল্লেখ নেই।
৭৯. ঐ
৮০. আশুতোষ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৬
৮১. বেণু দত্তরায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫
৮২. *সঞ্চিতা,* রেডিও বাংলাদেশের সংগীত সংগ্রহশালা, ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস, ঢাকা, গান নং-রংপুর-৩৬, ১৯৭৭
৮৩. ঐ, গান নং খুলনা-১০, ১৯৭৭
৮৪. বেণু দত্তরায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭-৯৮

৮৫. মিহির চৌধুরী কামিল্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২-১২৩
৮৬. ঐ. পৃ. ১২২
৮৭. ঐ, পৃ. ১১৭-১১৮
৮৮. ধুয়া গান দুটি সংগৃহীত হয়েছে সাধনচন্দ্র বিশ্বাস, প্রাগুক্ত থেকে।
৮৯. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলা লোকসংগীত : ভাওয়াইয়া* (ঢাকা : শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৯৫), পৃ. ৩০-৩২
৯০. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলা লোকসংগীত : ভাওয়াইয়া* (ঢাকা : শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৯৫), পৃ. ৩২
৯১. সুখবিলাস বর্মা, 'ভাওয়াইয়ার সংজ্ঞা উৎপত্তি ক্রমবিকাশ', *লোকসংস্কৃতি গবেষণা,* সনৎকুমাব মিত্র (সম্পা), ৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা (কলিকাতা : ১৬৯৯), পৃ. ১১৭
৯২. ভাওয়াইয়া গানগুলো বেণু দত্তরায় (সম্পা), *উত্তর বাংলার লোকসংগীত,* প্রাগুক্ত থেকে সংগৃহীত।
৯৩. মিহির চৌধুরী কামিল্যা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১
৯৪. ঐ, পৃ. ১৪১
৯৫. মুহম্মদ আবদুল জলিল, *বাংলাদেশের উত্তব অঞ্চলের মেয়েলী গীত* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪), পৃ. ২০
৯৬. ঐ, পৃ. ৩৩
৯৭. বেণু দত্তবায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯
৯৮. মুহম্মদ আবদুল জলিল, *উত্তববঙ্গের লোকসঙ্গীত*
৯৯. ঐ, পৃ. ৩৪
১০০. বেণু দত্তবায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮
১০১. ঐ, পৃ. ১০৮
১০২. ড. মুহম্মদ আবদুল জলিল, *উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫, মুহম্মদ আব্দুল জলিল। *বাংলাদেশের উত্তর অঞ্চলেব মেয়েলী গীত,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫
১০৩. হাবিবুব রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮
১০৪. মনোয়ারা খাতুন, *রাজশাহীর মেয়েলীগীত : সামাজিক পটভূমিকা ও সমীক্ষা,* অপ্রকাশিত গবেষণা নিবন্ধ ও মুহম্মদ আবদুল জলিল, *লোকসাহিত্যেব নানাদিক,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩
১০৫. মনোয়ারা খাতুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১
১০৬. ঐ, পৃ. ৭২

অধ্যায় ১২

রাজবংশী ও অন্যান্য উপজাতির সমাজ-সংস্কৃতির সাদৃশ্য

ধর্মের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাপক। কিন্তু ধর্মের সঠিক সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ একে কোনো জাতির ও উপজাতির শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। ধর্ম একটা অনুভূতির ব্যাপার। আর এ অনুভূতিটা অনির্বচনীয়। ধর্মের প্রায় সমার্থক শব্দ হিসাবে 'religion' কথাটা প্রচলিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে religion ও ধর্ম এক নয়। religion শব্দটির অর্থ হতে পারে 'প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম'।[১] আর বিভিন্ন ভাষায় ধর্মের সমার্থক শব্দের মূল অর্থ হচ্ছে জীবন চলার পথ (way of lufe)। কিন্তু বাংলায় 'ধর্ম' শব্দের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। আলোচ্য প্রবন্ধে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম-দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করা উদ্দেশ্য নয়, ব্যাপক অর্থে বাংলাদেশের উপজাতীয় সমাজে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বাইরে যেসব ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার সংস্কার পালিত হয় সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে।

ধর্মের উৎপত্তি কীভাবে ঘটেছে তা নিয়ে সমাজবিজ্ঞানী (Sociologist), নৃবিজ্ঞানী (Anthropologist) ও ধর্মতত্ত্ববিদের (Theologist)মধ্যে মতপার্থক্য আছে, এবং থাকাটা স্বাভাবিক! কিন্তু বর্তমান বিশ্বে যে-কয়টি বৃহৎ ধর্ম আছে সেগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করার পর অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হলেও এদের মূল শিক্ষায় বড় একটা পার্থক্য নেই। মূল কথা হলো মানবতার কল্যাণ সাধন। দেশ ও কালভেদে সব মানুষের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান থাকে। কিন্তু তাই বলে এক সংস্কৃতি অন্য সংস্কৃতি থেকে উৎকৃষ্টতর বা নিকৃষ্টতর, এসব বলার সঙ্গত কোনো কারণ নেই। লেভি স্ট্রস (Levi Straus)-এর মতে, তথাকথিত আদিম মন ও আধুনিক মনের মধ্যে পার্থক্য করা সঠিক নয়।[২] নৃবিজ্ঞানে সাধারণভাবে ধর্মকে অতিপ্রাকৃত সত্তা, ক্ষমতা বা শক্তি সংক্রান্ত বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের সামষ্টিক রূপ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। ধর্ম সম্পর্কে যেসব নৃবিজ্ঞানী অধিকতর চর্চা করেছেন, তাঁরা হলেন ই.বি টায়লর (E.B. Tylor), জেমস্ ফ্রেজার (James Frazger), এমিল ডুর্খেইম (Emile Durkheim) প্রমুখ। ধর্মের নৃবৈজ্ঞানিক অধ্যয়নে শেষোক্ত জনের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ধর্মের একটি সার্বজনীন সংজ্ঞা প্রণয়ন করতে গিয়ে 'অতিপ্রাকৃত' এর বদলে 'পবিত্র' এর ধারণার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর দৃষ্টিতে ধর্ম হচ্ছে পবিত্র কিছুকে ঘিরে যেসব বিশ্বাস ও চর্চা দেখা যায় সেগুলোর সামষ্টিক রূপ! নৃবিজ্ঞানীদের মতে ধর্ম মানুষের জীবন ও জগৎকে বোধগম্য, অর্থময় করে তুলে ধরে মানসিক চাপ, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা নিরসনে ভূমিকা রাখে, এবং সমাজ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে। আর মিথ (myth), লোকচার, লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার হচ্ছে ধর্মের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা ধর্মের সাথে মিশে গেছে। এগুলো হতাশাগ্রস্ত মানুষের মনোজগতে সাময়িকভাবে কিঞ্চিত আশার আলোর প্রতিফলন ঘটায়।

ব্রিটিশ নৃবিজ্ঞানী ই.বি টায়লর সর্বপ্রাণবাদ (animism) এর ধারণা নিয়ে আসেন। তিনি বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতিতে আত্মা বা আত্মাসদৃশ অন্যান্য সত্তার ধারণা কোনো-না-কোনো আকারে লক্ষ করেছেন। তাই তিনি 'আত্মার ধারণায় বিশ্বাস' এই বিশ্বজনীন সাংস্কৃতিক প্রপঞ্চ (phenomenon) কে সর্বপ্রাণবাদ (animism) আখ্যা দিয়েছেন। টায়লরের মতে, ধর্ম হলো 'বিভিন্ন আত্মারূপীয় সত্তায় বিশ্বাস' (belief in spirit beings)। আর এই আত্মারূপীয় সত্তা বলতে বিভিন্ন অতিপ্রাকৃত অশরীরী সত্তা যেমন-ভূত-প্রেত, দেব-দেবী, ঈশ্বর প্রভৃতিকে বুঝিয়েছেন। ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে এই যে বিভিন্ন আত্মারূপীয় সত্তায় বিশ্বাস, ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ায় বিশ্বাস, ওঝা-গুনিনে বিশ্বাস প্রভৃতির মূলে রয়েছে মানুষের মঙ্গল ও প্রশান্তি লাভের আশা। আর এইসব বিশ্বাস একদিনে আসে নি, এসেছে হাজার হাজার বছর ধরে একটু একটু করে মানুষেরই প্রয়োজনে।

ই.বি. টায়লরের সর্বপ্রাণবাদ ধর্মের পর আরেকটি ধর্মীয় উপাদান পাওয়া যায়, সেটি হলো টোটেমবাদ (totemism)। এমিল ডুর্খেইম দেখিয়েছেন যে, টোটেমবাদের পরে ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে। টোটেমচিন্তা হচ্ছে এমন এক ধরনের কল্পনা যেটি ঐ বিশেষ একটি টোটেমবাদের সঙ্গে কোনো মানুষ বা মানুষ্যগোষ্ঠীর রহস্যময় সম্পর্ক বা আত্মীয়তার কথা বলে।[৩] তবে মানুষের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় চেতনার ক্ষেত্রে টোটেম চিন্তা সব মানবগোষ্ঠীতে একই মাত্রায় বিকশিত হয় নি। কোনো মানবগোষ্ঠীতে কম, আবার কোনোটিতে বেশী মাত্রায় এসেছে। টোটেম মানবগোষ্ঠীর রক্ষাকর্তা। টোটেমের আশীর্বাদে তাদের জীবনযাত্রা চালিত হয় আর অভিশাপে তাদের ধ্বংস অনিবার্য করে তোলে।[৪] এজন্য বিভিন্ন আদিগোষ্ঠী টোটেমকে পূজা-অর্চনা করেন। বছরের বিশেষ দিনে তারা নাচ-গান-উৎসব করে টোটেমকে সন্তুষ্ট রাখেন। টোটেম প্রাণীকে তারা মেরে ফেলেন না, টোটেম গাছের ফল-মূল-পাতা তারা খান না। এই টোটেম চিন্তা থেকেই পৃথিবীতে পরবর্তীকালে নাগবংশ, সূর্যবংশ ইত্যাদি বংশের সৃষ্টি হয়েছে বলে ধরা হয়।[৫]

টোটেমের কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। সেগুলো হলো i) টোটেমকে আত্মীয়, রক্ষাকর্তা, বংশের আদিপুরুষ হিসাবে কল্পনা করা হতো। তার অতি মানবিক ক্ষমতা ও শক্তি আছে বলে ধরা হতো। তাঁকে শুধু শ্রদ্ধাভরে পূজায় করা হতো না, ভয়ও করা হতো। পরবর্তীকালের নানা কল্পিত দেব-দেবীর পূর্বসূরী বা সমগোত্রীয় ছিল টোটেম। যেমন রাঢ় দেশে তন্তুবায়দের টোটেম হংস, শুড়িদের ময়ুর, কামার ও কাঁসারীদের ময়ুর ও মুণ্ডাদের রাজহাঁস। প্রাচীন আদিবাসীদের এই যে টোটেম তা এই পূজিত লক্ষ্মী ও কার্তিকের বাহনের সাথে মিলে যায়। এখনো আদিম অনার্য জাতির টোটেম হিসাবে সাপের পূজা (মনসা দেবীর পূজা) প্রাচীনতম নিদর্শন।[৬] ii) টোটেমকে বিশেষ নাম ও প্রতীক দিয়ে চিহ্নিত করা হতো। iii) টোটেমকে হত্যা করা, খাওয়া এমনকি স্পর্শ করাও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়। iv) টোটে..ক কেন্দ্র করে নানা অনুষ্ঠান ও আচার-বিধির সৃষ্টি হয়।[৭]

এখনো অনেক জাতিগোষ্ঠী টোটেম ব্যবস্থার অনুশাসনে চালিত হয়ে থাকে। যেমন-অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসী (aborigin),অষ্ট্রেলিয়ার বাইরে উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে, পলিনেশীয় দ্বীপের বিভিন্ন জাতির মধ্যে, পূর্ব ভারতে এবং আফ্রিকার নানা জায়গায় টোটেম

অনুশাসন ছিল, এবং এখনো তা বর্তমান। আদিম আর্যদের মধ্যে ও ইউরোপের সেমিটিক জাতির মধ্যেও টোটেম ব্যবস্থা ছিল। এসব কারণে অনেক নৃবিজ্ঞানীই মনে করেন টোটেম ব্যবস্থা মানবীয় বিকাশের একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় স্তর, যা প্রতিটি জাতিই তার ক্রমবিকাশের পথে অতিক্রম করেছে।[৮] বাংলার রাঢ় অঞ্চলে যে অদ্যাবধি টোটেম ব্যবস্থার প্রচলন আছে তা গবেষক মানিকলাল সিংহ একটি সমীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন উপজাতি ও জাতিগোষ্ঠীর টোটেমের তালিকা প্রদান করেছেন। যেমন–সাঁওতাল জাতির প্রথমত হাঁসদা, সরেন, মুর্মু, মাণ্ডি, টুডু, কিসকু ও হেমব্রেম এই সাতটি উপবিভাগে বিভক্ত ছিল। পরবর্তীকালে এদের মধ্যে আরও পাঁচটি উপভাগের সৃষ্টি হয়। এইসব উপভাগগুলো এক একটি টোটেমের সাথে যুক্ত। যেমন–হাঁসদার হাঁস, কিসকুর সোনালী চিল, মুর্মুর নীলগাই, মাণ্ডির মেরদাঘাস, সরেনদের জামবাটি, মহিষ ইত্যাদি অসংখ্য টোটেম দেখতে পাওয়া যায়। বর্ণহিন্দু ও নিম্নবর্গের জাতিগুলোর মধ্যে আজো এইসব টোটেমের প্রচলন রয়েছে। এগুলো বিয়ে, পূজা-অর্চনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বিয়ের ক্ষেত্রে একই টোটেমবিশিষ্ট গোত্রের মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ।[৯]

বর্ণহিন্দু ও নিম্নবর্গের হিন্দু জাতির গোত্রের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই মিল দেখতে পাওয়া যায়। যেমন–শাণ্ডিল্য গোত্রের কথা ধরা যাক। মুণ্ডাদের ভাষায় কিল্লি অর্থ গোত্র। সাণ্ডিকিল্লি শাণ্ডিল্য গোত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। মুণ্ডারা এখন বিশ্বাস করে শাণ্ডিল্য ঋষি তাদের গোত্রের আদিপুরুষ।[১০] ব্রাহ্মণের গোত্র বিন্যাসের ক্ষেত্রে গোত্র শাস্ত্রী পরিচিতির মূল শিকড় সন্ধান করে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন যে, মোট আটজন ঋষি মূল গোত্রস্রষ্টা। এই সমস্ত ঋষিদের প্রবর বলা হয়। তাঁরা হলেন জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, বিশ্বমিত্র, অত্রী, গৌতম, কাশ্যপ, বশিষ্ট ও অগস্ত্য।[১১] বর্ণহিন্দুদের মধ্যে একটি নিয়ম এখনো প্রচলন আছে একই গোত্রের বর-কনে কখনো বিয়ে হয় না। এই নিয়মের মূল উৎস এই টোটেম ব্যবস্থা যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিবর্তন ঘটলেও এই পূর্বের প্রথা এখনো লুপ্ত হয় নি। এই বিষয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন, "If there is common pravara among the intended brides and bride-grooms, among the discendants of the Rg-vedic Rsis, there is no marriage."[১২]

ধর্মের বিভিন্ন স্তর আলোচনা করতে গেলে আরেকটি বিষয় এসে পড়ে, সেটা হলো জাদু (magic)। নৃবিজ্ঞানী James G. Frager তাঁর *'Golden Bough'* গ্রন্থে ধর্মের উৎপত্তি ব্যাখ্যায় জাদুর অস্তিত্বের কথা বলেছেন। তাঁর মতে, মানব সমাজে ধর্মের উৎপত্তির আগে জাদুর অস্তিত্ব ছিল। জাদুর সাহায্যে অতিপ্রাকৃতকে আয়ত্বে আনা সম্ভব নয়। এই উপলব্ধি থেকে প্রকৃত ধর্মীয় চেতনার উন্মেষ ঘটেছে বলে ফ্রেজার মনে করেন। কিন্তু মানুষ যখন বিশ্বাস করে যে, বিশেষ কলাকৌশল প্রয়োগ করে অতিপ্রাকৃত শক্তি বা সত্তাসমূহকে বশে আনা যায়, সেগুলোর সাহায্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইপ্সিত ফলাফল অর্জন করা যায়, তখন এ ধরনের বিশ্বাস ও কলাকৌশলকে নৃবিজ্ঞানে জাদু বলে চিহ্নিত করেন। যেমন–যখন আমরা দেখি যে, বৃষ্টির আশায়-গ্রামবাসীরা 'ব্যাঙের বিয়ে'র আয়োজন করেছে, যখন শুনি কারো মন

জয়ের আশায় তেলপড়া, পানিপড়া লক্ষ্যিত ব্যক্তির শরীরে ছিটানো হয় বা উদ্দীষ্ট ব্যক্তিকে বিশেষভাবে প্রস্তুতকৃত পানের খিলি খাওয়ানোর চেষ্টা করা হয়, বা যখন কারো ক্ষতি করার জন্য 'বাণমারা' হয়–এসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিশ্বাস, আচরণ ও কর্মকাণ্ডসমূহকে জাদুর আওতাভুক্ত ধরা হয়। মানুষ এসব জাদু বিশ্বাসকে ধর্মজ্ঞান করে থাকেন। ফ্রেজার এইসব জাদুধর্মী আচার ও অনুষ্ঠানের মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক উপযোগিতা দেখতে পেয়েছেন।

বাংলাদেশের উপজাতিরা বাঙালির মতোই হিন্দু, বৌদ্ধ, ইসলাম, খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে ও পালন করে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা উপজাতীয় নামধাম, চাষবাস, আচার–রীতি, ভাষা, তাদের আদি ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ করে নি। তার কারণ হলো জাতিসত্তার সাথে প্রাতিষ্ঠানিক বা শাস্ত্রীয় ধর্মের সম্পর্ক ক্ষীণ কিন্তু সংস্কৃতির সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সংস্কৃতির শোণিতধারা জাতিসত্তার সূক্ষ্মতর তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে প্রবাহিত কিন্তু ধর্মীয় চেতনা হৃদয়ের বহিরঙ্গে প্রোথিত। সেকারণে ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক জাতিসত্তার ভিত ধর্মভিত্তিক জাতিসত্তার চেয়ে অধিকত সদৃঢ়।[১৩] যদি তা না হতো তাহলে সমগ্র বিশ্বের মানুষ বৌদ্ধ খ্রিষ্টান, হিন্দু, ইসলাম, জৈন ইত্যাদি ধর্মভিত্তিক জাতিতে বিভক্ত হয়ে ধর্মভিত্তিক পৃথক পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করত। কিন্তু ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তি দৃঢ় বলেই তা সম্ভব হয় নি। এজন্য এদেশের উপজাতিরা হিন্দু–বৌদ্ধ–ইসলাম-খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করা সত্ত্বেও তাদের পূর্ব–পুরুষের আচার–সংস্কার নিষ্ঠার সাথে পালন করে থাকে, সেগুলো তারা ছাড়তে পারেন নি। তারা এখনো বাস্তুদেবতা, গ্রামদেবতা, গোত্রদেবতা, সর্পদেবী মনসা পূজা প্রভৃতি করেন। উপজাতিদের কাছ থেকে গাছ, পাথর, পাহাড়–নদী, সূর্য–চন্দ্র, পৃথিবী, বৃষ্টি–ঝড়–ঝঞ্ঝা প্রভৃতি দেবতারূপে পূজা পায়। ভূত–প্রেত, মৃত আত্মা ও অন্যান্য অলৌকিক অশরীরী আত্মার পূজা করে থাকেন। সাঁওতালদের বড় দেবতা 'চাদুবোঙা' বা 'সূর্যদেবতা'। 'মারাঙবুরো' বা পাহাড়দেবতা তাদের গোত্র বা কুলদেবতা। গারোদের সবচেয়ে বড় মান্যদেবতা 'তাতারা রাগুবা', তারপর 'সালজং' (সূর্য দেবতা), 'ছোছুম' (চন্দ্র), 'গোয়েরা' (বজ্র) দেবতা প্রভৃতি। আত্মাবস্তুজ্ঞানে জড়বস্তুর পূজা এসব উপজাতিরা করে বলেই তাদের ধর্মের নাম সর্বপ্রাণবাদ। অবশ্য হিন্দু ধর্মেও এধরনের সর্বপ্রাণবাদের অস্তিত্ব লক্ষণীয়। যেমন বর্ণ–হিন্দু ধর্মে জড়বস্তুপূজা, শালগ্রাম শিলাপূজা, আত্মাপূজা, প্রতীকপূজা, প্রতিমাপূজা এগুলো তো অনার্য উপজাতীয় সভ্যতারই ক্রমবিবর্তনের বর্তমান রূপমাত্র। একটি কথা অবশ্য বলা প্রয়োজন যে, এদেশে যখন প্রাতিষ্ঠানিক বা শাস্ত্রীয় ধর্ম, যেমন হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, ইসলামধর্ম, খ্রিষ্টধর্ম প্রচার ও বিস্তার লাভ করে নি, সেইসময় উপজাতীয় মানুষজন এসব ধর্মাচার পালন করত, এবং সেই ধারাবাহিকতা শাস্ত্রীয় ধর্ম গ্রহণ সত্ত্বেও উপজাতিগুলো পূর্ণমাত্রায় বজায় রেখেছেন।

অবিভক্ত ভারতের প্রথম আদমশুমারি প্রতিবেদন '*স্ট্যাটিস্টিক্যাল একাউন্ট অব বেঙ্গল*'-এ দেখা যায় যে, তখন অবিভক্ত ভারতবর্ষে বসবাসকারী লোকদের জাতি ও ধর্মভিত্তিক আলাদা আলাদাভাবে গণনা করা হয়েছে। যেটির ধারাবাহিকতায় স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশেও ধর্মভিত্তিক লোকগণনার রীতি দেখা যায়। জাতি ও ধর্ম পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত হিসাবে ধরে নেওয়া হয়। অর্থাৎ যে পরিবারে শিশুটি জন্মগ্রহণ করে সেই পরিবারের ধর্ম ও

জাতি পরিচয়ই তাকে বহন করতে হয়। পাকিস্তান আমলে ১৯৫১ ও ১৯৬১ সালের আদমশুমারি প্রতিবেদনে হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান এর পাশাপাশি তফসিলী সম্প্রদায় (scheduled caste) বলে আরেকটি কলামের সন্ধান পাওয়া যায়। তফসিলী সম্প্রদায়ভুক্তরা কোন ধর্মাবলম্বী তার কোনো উল্লেখ ঐ রিপোর্টগুলোতে পাওয়া যায় না। সরকারিভাবে উপজাতিগুলোর ইসলাম-হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী বলা হলেও সাধারণ বাঙালিদের এব্যাপারে আলাদা মতামত পোষণ করতে দেখা যায়। তাদের ধারণা উপজাতিদের এসব ধর্মের আওতাভুক্ত করা হবে কেন? তাদের ধর্ম এসব ধর্ম থেকে আলাদা বলেই তারা মনে করেন। অবিভক্ত ভারত গভর্ণমেন্ট ও নৃবিজ্ঞানীদের কেউ কেউ এসব জাতির ধর্মকে 'সর্বপ্রাণবাদ' (animism) বলে অভিহিত করেছেন। সর্বপ্রাণবাদের অর্থ 'জড়োপাসনা' বা 'ভূত-প্রেতপূজা' বা অলৌকিক শক্তিকে পূজা করা বুঝায়। হিন্দু সমাজের বহু শ্রেণীর মধ্যে সর্বপ্রাণবাদ ধর্মের অস্তিত্ব বহুলভাবে মিশে রয়েছে বলে ঐসব উপজাতীয়দের ধর্মের পার্থক্যটা ঠিক বোঝা যায় না।

ইংরেজ আমলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে কতিপয় জাতিগোষ্ঠীকে অনুন্নত (backward) সম্প্রদায় হিসাবে চিহ্নিত করে তাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-আর্থিক উন্নয়নের জন্য একটি তফসিলে উন্নয়ন নীতিমালা (development policy) তৈরি করা হয়। সেই সময়ে যেসব জাতিগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য উক্ত তফসিলে তালিকাভুক্ত করা হয়, পরবর্তীকালে তারা তফসিলী সম্প্রদায়ভুক্ত জাতি হিসাবে সমাজে পরিচিতি লাভ করে। বলা বাহুল্য যে, ঐসব অনুন্নত জাতিগোষ্ঠীগুলোর প্রায় সব ক'টিই উপজাতীয় বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জাতি ছিল। তফসিলী জাতিগুলোর একটা অংশকে আবার 'অবনত শ্রেণীর হিন্দু' হিসাবে পৃথক নামকরণের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু এদেশের ইসলাম ও খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও 'অবনত শ্রেণী' থাকলেও তাদের পৃথক করে দেখা হয় নি।[১৩] এই 'অবনত শ্রেণীর হিন্দু'দের কতিপয় জাতিগোষ্ঠীকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্র, গবেষক, নৃতাত্ত্বিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্বের অধ্যাপকগণ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য লক্ষ করে তাদের উপজাতি পর্যায়ভুক্ত করেছেন। কোচ, পলিয়া, রাজবংশী তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

১৯৯১ সালের আদমশুমারি প্রতিবেদনে সরকারিভাবে ২৭টি 'উপজাতীয়' সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া 'অন্যান্য' (others) নামে আর একটি সারণীর উল্লেখ দেখা যায়। ২৭টি উপজাতি সম্প্রদায়ের সর্বমোট জনসংখ্যা ৯,৪৪,২৩৫ জন এবং 'অন্যান্য' কলামে উল্লিখিত জনসংখ্যা হলো ২,৬১,৭৩৪ জন। সর্বমোট উপজাতীয় জনসংখ্যা সরকারি হিসাব মতে ১২,০৫,৯৭৮ জন। বেসরকারি হিসাব মতে, এ সংখ্যার চেয়ে আরো অনেক বেশি সংখ্যক উপজাতীয় সম্প্রদায়ের লোকজন আছে বলে জানা যায়। সরকারিভাবে স্বীকৃত ২৭টি উপজাতি হলো বোম, বুনো, চাকমা, গারো, হাজং, হরিজন, খুমি, খাসিয়া, খিয়াং, কোচ, লুসাই, মাহাতো, মণিপুরী, মারমা, ম্রো, মুরং, মুণ্ডা, ওঁরাও, পাহাড়িয়া, পাঙ্খো, রাজবংশী, রাখাইন, চাক, সাঁওতাল, তঞ্চঙ্গ্যা ত্রিপুরা ও উরুয়া।[২৯] এইসব উপজাতীয় লোকজনকে আবার আদমশুমারিতে ধর্মভিত্তিক গণনা করে আলাদা তালিকা প্রদান করা হয়েছে। নিম্নে ধর্মভিত্তিক উপজাতীয় জনসংখ্যার তালিকা দেওয়া হলো :

সারণী
বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক উপজাতীয় জনসংখ্যা ও শতকরা হার, ১৯৯১ ও ১৯৮১

	১৯৯১		১৯৮১	
	সংখ্যা	শতকরা/হার	সংখ্যা	শতকরা হার
সর্বমোট	১২,০৫,৯৭৮	১০০	৮৯৭,৮২৮	১০০
মুসলিম	২,১৭,২৮৪	১৮.০	--	--
হিন্দু	২,৫৫,২০৯	২১.২	২১৬,৫৫৫	২৪.১
বৌদ্ধ	৪৮২,৮৬২	৩৬.৭	৩৯২,৪৫৬	৪৩.৭
খ্রিষ্টান	১৩২,৪২৩	১১.০	১১৮,৫৪০	১৩.২
অন্যান্য	১৫৮,২০০	১৩.১	১৭০,২৭৬	১৯.০

[illegible]
১৯৯৮), পৃ. ১৮৭

উপরিউক্ত সারণী থেকে দেখা যায় যে, ১৯৯১ সালের সর্বমোট উপজাতীয় জনসংখ্যা ১২,০৫,৯৭৮। তন্মধ্যে মুসলমান ১৮.০%, হিন্দু ২১.২%, বৌদ্ধ ৩৬.৭%, খ্রিষ্টান ১১.০% এবং অন্যান্য ১৩.১%। ১৯৮১ সালে উপজাতীয় জনসংখ্যা ছিল ৮৯৭,৮২৮। তন্মধ্যে কোনো ইসলাম ধর্মাবলম্বী নাই, হিন্দু ২৪.১%, বৌদ্ধ ৪৩.৭% খ্রিষ্টান ১৩.২% ও অন্যান্য ১৯.০% দেখা যায়। সারণী পর্যালোচনা করলে সকলের একটি বিষয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে যে, ১৯৮১ সালে উপজাতীয় জনসংখ্যা তালিকায় কোনো ইসলাম ধর্মাবলম্বী মুসলমান নাই, অথচ ১৯৯১ সালের শুমারি তালিকায় মুসলমান জনসংখ্যা শতকরা ১৮.০%। বিষয়টিতে সন্দেহ ঘনীভূত হয়। যদি ১০ বছরে উপজাতীয় জনসংখ্যার ১৮.০% তাদের পূর্ব ধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলামধর্ম গ্রহণ করে থাকে তাহলে কোন কোন উপজাতি, কোন প্রেক্ষাপটে ধর্মান্তরিত হয়েছে তার ব্যাখ্যা জানা আবশ্যক। সরকারিভাবে ঘোষিত ১৯৯১ সালের আদমশুমারি তালিকায় যে ২৭টি (তালিকায় ২৯টির মধ্যে বংশী ও রাজবংশী একই, টিপ্‌রা ও ত্রিপুরা একই) উপজাতি জনগোষ্ঠী তালিকাভুক্ত হয়েছে তারা পূর্বে ইসলাম ধর্মাবলম্বী ছিল না। শুধুমাত্র বৃহত্তর বগুড়া, দিনাজপুর ও রংপুর এলাকাতে রাজবংশী উপজাতীয়রা পূর্ব ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায়, কিন্তু জেলাভিত্তিক উপজাতি তালিকায় ঐ জেলাগুলোতে রাজবংশীদের উপজাতি হিসাবে গণনা করা হয় নি। উল্লেখ্য যে, ঐসব জেলাগুলোতে প্রচুর সংখ্যক হিন্দু ধর্মাবলম্বী রাজবংশীক্ষত্রিয় উপজাতি রয়েছে। এছাড়া মনিপুরী পাঙন ও বেদেরা ইসলাম ধর্মাবলম্বী। তাদেরকেও তালিকাভুক্ত করা হয় নি। আর গারোদের একটি ক্ষুদ্র অংশও মুসলমান হয়ে গেছে। সুতরাং ১৮.০% জনসংখ্যা ইসলাম ধর্মাবলম্বী হলে তারা কোন কোন উপজাতি তা স্পষ্ট হয় না। তাছাড়া হিন্দু ধর্মাবলম্বী উপজাতি জনসংখ্যা সংখ্যায় আরো বেশি রয়েছে, যাদের প্রাথমিক গণনায় উপজাতীয় হিন্দু হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। জেলাভিত্তিক উপজাতীয় জনসংখ্যার কলামে 'অন্যান্য' উপজাতির জনসংখ্যা ২,৬১,৭৪৩, এবং ধর্মভিত্তিক উপজাতির জনসংখ্যা 'অন্যান্য' কলামে রয়েছে ১৫৮,২০০ জন। এরা কোন উপজাতির লোক তার ব্যাখ্যাও জাতীয় সিরিজে পাওয়া যায় না।

১৯৯১ সালের আদমশুমারির প্রতিবেদনে 'অন্যান্য' উপজাতিগোষ্ঠী বলতে কাদের বুঝানো হয় তার কোনো ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হয় নি। বিশেজ্ঞদের মতে 'অন্যান্য' উপজাতীয় গোষ্ঠগুলো হলো—বনজোগী (পাঙ্খো বা কুকিদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ), দালুই, দালু বা দুলাই (গারোদের একটা শাখা), হদি বা হাড়ি (একটি হিন্দুধর্মী গোষ্ঠী), হো (মুণ্ডাদের একটি শাখা), কাছারী (একটা হিন্দুধর্মী গোষ্ঠী), পলিয়া (রাজবংশীদের একটা শাখা), পাতোর বা পাত্র (হিন্দুদের একটা শাখা), নর (Pnar) (খাসিয়াদের একটা শাখা), রিয়াং (টিপ্‌রা বা ত্রিপুরাদের শাখা) এবং সেন্দু (খুমিদের শাখা)।[১৬] শুধু 'অন্যান্য' কলামের উপজাতি বললেই বিষয়টি পরিষ্কার বোঝা যায় না। কারণ বনজোগী, রিয়াং ও সেন্দু উপজাতির লোকেরা পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় ; দালুই, হদি, কাছারী উপজাতির লোকজন ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ ও সিলেট ; পাতোর ও নর (pnar) উপজাতিদ্বয় সিলেটে ; আর পলিয়া উপজাতির সদস্যরা বৃহত্তর দিনাজপুরে ও রংপুরে বসবাস করে। কিন্তু আদমশুমারির জাতীয় সিরিজের জেলাভিত্তিক সারণীতে সারাদেশের প্রতিটি জেলাতেই 'অন্যান্য' উপজাতীয় লোকের বাস দেখা যায়। দেশের অন্যান্য এলাকাগুলোতে এইসব উপজাতিগুলো বসবাস করে না। সুতরাং আরো কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর লোকজনকে উপজাতি হিসাবে চিহ্নিত করে অন্যান্য কলামে স্থান দেওয়া হয়েছে, এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। কোন কোন উপজাতীয় জনগোষ্ঠীকে 'অন্যান্য' কলামে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তাদের সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে অনেকেই মনে করেন।

Clarence T. Maloney (১৯৮৪) আরও ১০টি ইন্দো-আর্য ভাষাগোষ্ঠীর লোকজনকে প্রাক্তন উপজাতি (ex-tribal) জনগোষ্ঠীর লোক বলে বর্ণনা করেছেন। তারা হলেন বেদে, ভূঁইমালী, ভূঁইয়া, জালিয়া (কৈবর্ত), কুকামার, কুর্মি মাহাতো, মাল্লা বা মালো, গঞ্জু, মাহাতো ও নমঃশূদ্র।[১৭] বুনো এবং উরুয়া বলে দুটি উপজাতি ১৯৯১ সালের আদমশুমারিতেই উল্লেখ পাওয়া যায়। এরা ছাড়াও বাংলাদেশে তুরী, পাহান, বানাই, সিং, বাগদি, মুরিয়ার, মুসহর, রাই, রাজোয়ার প্রভৃতি জাতিগোষ্ঠীকে বিভিন্ন বই পুস্তকে পাওয়া যায়। তবে এদের সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ও নির্ভরযোগ্য তথ্য দুষ্প্রাপ্য।

বাংলাদেশের উপজাতি ও নিম্নবর্গীয়দের হিন্দু[১৮] ধর্মগ্রহণ

সুদূর অতীতকাল থেকে যেসব উপজাতীয় জনগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির পাশাপাশি, নিজেদের দেব-দেবীর পূজা-অর্চনার পাশাপাশি হিন্দু ধর্মীয় দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা, আচার-অনুষ্ঠান একটু একটু করে গ্রহণ করেছে, এবং আজকে যারা হিন্দু ধর্মাবলম্বী বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে তারা হলো-বুনো, হাজং, হরিজন, কোচ, মাহাতো, মণিপুরী, পাহাড়িয়া, রাজবংশী, ত্রিপুরা, পলিয়া, দালুই, হদি, কাছারি, মিকির, পাত্র, রিয়াং, কুকামার, ভুইমালী, ভূঁইয়া, জালিয়া, মালো, নমঃশূদ্র প্রভৃতি। এসব জাতিগোষ্ঠীর হিন্দুধর্ম গ্রহণ হঠাৎ করে নয়, শত শত বছরে ধরে আস্তে আস্তে হিন্দু ধর্মকে তারা গ্রহণ করেছেন। তাইতো ১৮৭২ সালের আদমশুমারি প্রতিবেদনেও এদের অনেক জাতিগোষ্ঠীকেই অর্ধহিন্দু আদিবাসী-উপজাতি (semi-Hinduized aborigines & aboriginal tribes) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

এসব হিন্দু ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীগুলোকে হিন্দু বলে অভিহিত করা যায় কিনা তা নিয়েও নানান মতভেদ দেখা যায়। বিভিন্ন সেন্সাস কমিশনার ও নৃতাত্ত্বিকগণ এইসব জনগোষ্ঠীর হিন্দুত্ব নিয়ে নানান ধরনের মতামতও ব্যক্ত করেছেন। যেমন, ১৮৯১ সালের ভারতের সেন্সার কমিশনার জে.এ. বেইনস (J.A. Baines) বলেন, "বহু উপজাতীয় গোষ্ঠী (tribal people) বর্তমানে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছেন। এদের ধর্মমত এবং যারা এখনো অহিন্দু উপজাতিরূপে আছে, তাদের ধর্মমতের মধ্যে কোনো ভেদরেখা টানা যায় না।"[১৯] স্যার হার্বার্ট রিজলী তাঁর ১৯১১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে বলেছেন, "হিন্দুধর্ম এবং জড়োপসনার (animism) কোনো স্পষ্ট পার্থক্য করা সম্ভব নয়...উপজাতীয় (tribal) লোকেরা ধীরে ধীরে একটু একটু করে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে চলেছে। সুতরাং কতখানি এবং কী পরিমাণে হিন্দুধর্ম গ্রহণের পর উপজাতীদের হিন্দু বলা উচিত সে সম্বন্ধে কোনো মাপকাঠি স্থির করা সম্ভব নয়।[২০] ১৯২১ সালের বোম্বাইয়ের (বর্তমান মুম্বাই) সেন্সাস সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মন্তব্য করেছেন, "জড়োপসনার (animism) ধারণাকে একেবারে বাতিল করে দেওয়া উচিত। যাদের এযাবৎকাল জড়োপসক বলে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, তাদের 'হিন্দু' নামে তালিকাভুক্ত করা উচিত।[২১] ডা: হাটনের ধারণা ছিল, হিন্দুধর্ম প্রধানত ঋগ্বেদের ধর্ম ও আর্যপূর্ব প্রচলিত ভারতীয় ধর্মবিশ্বাসগুলোর সম্মিলিত রূপ। ডা: হাটন অবশ্য এক জায়গায় মন্তব্য করেছেন, "যতক্ষণ না উপজাতীয়রা ব্রাহ্মণ পুরোহিত গ্রহণ করে, গরুকে পবিত্র মনে করে এবং হিন্দু মন্দিরের বিগ্রহ পূজা করে, ততক্ষণ এদের হিন্দু বলা ঠিক হবে না।" তিনি অবশ্য শেষ পর্যন্ত এও বলেছেন যে, "হিন্দুধর্ম ও উপজাতীয় ধর্ম উভয়ের মধ্যে ভেদরেখা টানা দুষ্কর।"[২২] মোট কথা, যেসব জায়গায় উপজাতীয়রা তাদের জীবন ও জীবিকার সন্ধানে হিন্দুরের সংস্পর্শে এসেছে, সেখানেই প্রতিবেশী হিন্দুধর্ম থেকে তারা অজস্র উপাদান সংগ্রহ করে নিজেদের জীবন চর্যার সাথে মিশিয়ে নিয়েছে, যদিও তাদের চিন্তা-চেতনা অপরিবর্তিত থেকে গেছে। আজকের সমাজ ব্যবস্থায় হিন্দু ধর্মাবলম্বী এসব উপজাতীয় জনগোষ্ঠী হিন্দু হিসেবে পরিচিতি পেলেও উপজাতীয় হিন্দু বা অবনত শ্রেণীর হিন্দু বলেই মনে করা হয়। নৃতাত্ত্বিক ফরসাইথ (Forsyth) বলেছেন, "উপজাতীয়দের আচার-ধর্ম ও ভাষার সঙ্গে হিন্দুদের আচার-ধর্ম ও ভাষা এমনভাবে মিশে গেছে যে তাদের আদিম বৈশিষ্ট্য এখন খুঁজে বের করা অসম্ভব। তবে যাই বলা হোক না কেন, আধুনিক বর্ণ হিন্দুদের সাথে যদিও এরা ক্রমশ মিশে যেতে চলেছে তবুও এদের বর্তমান অবস্থা বর্ণ-হিন্দু সমাজ থেকে অনেক ব্যাপারে বিশিষ্ট ও পৃথক।[২৩]

বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম বিস্তারের সময়কাল ও উপজাতিদের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ

খ্রিস্ট্রীয় প্রথম শতক থেকে প্রাচীন বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রসারের প্রমাণ বৌদ্ধ সাহিত্যে ও স্থাপত্যের নিদর্শনে পাওয়া গেছে।[২৪] কলিঙ্গের সম্রাট অশোক (খ্রি পূ. ৩২০) বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে বৌদ্ধধর্ম প্রচার শুরু করেন।[২৫] খ্রিস্ট্রীয় চতুর্থ শতক থেকে গুপ্ত রাজাদের উদার আনুকূল্যে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। গুপ্ত রাজারা পরম ভাগবতবৈষ্ণব কিন্তু তাদের ধর্মীয় গোড়ামী ছিল না। এই সময়ে নানা দেবতায়নে বুদ্ধের মূর্তি প্রতিষ্ঠার কথা ইতিহাসে উল্লিখিত হয়েছে। ধর্ম বিশ্বাসের স্বাধীনতার এই পরিবেশে বৌদ্ধধর্ম বিস্তারের সাক্ষ্য চীনা পরিব্রাজক ইৎ-সিং-এর ভ্রমণ বিবরণীতে পাওয়া যায়।[২৬] গুপ্তযুগে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম সম্প্রসারণের প্রমাণ সেই সময়কালের কিছু মূর্তি ও তাম্রশাসনে বিধৃত রয়েছে। গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের

সময় চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন (৩৩৯-৪১৫ খ্রি.) ভারত ভ্রমণের সময় বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রতিলিপি ও মূর্তি চিত্র সংকলনে ব্যাপৃত ছিলেন।[২৭] খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শুরুতে প্রাচীন বাংলায় বৌদ্ধধর্ম ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তারের মধ্য দিয়ে সমাজ জীবনে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের আদর্শ প্রতিফলিত হয়। এই শতকের শুরুতে বৌদ্ধরাজ হর্ষ বর্ধনের সাথে শশাংকের বিরোধ চরম আকার ধারণ করেছিল।[২৮] চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে পুণ্ড্রবর্ধন ও সমতট ভ্রমণ করেন। তিনিও ঐসব স্থানে বৌদ্ধ ধর্মের উপস্থিতির কথা বলেন।[২৯] খ্রিষ্টপূর্ব ৩২০ শতকে সম্রাট অশোকের, নবম শতাব্দীতে পালারাজাদের এবং দশম শতাব্দী হতে একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত চন্দ্র বংশের হাতে বৌদ্ধধর্ম রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। বিক্রমপুর, চট্টগ্রাম, রাজশাহীর বৌদ্ধ মঠসমূহ, রাজশাহী, পাহাড়পুর ও কুমিল্লার ময়নামতিতে আবিষ্কৃত পোড়ামাটির ফলক,[৩০] শিলালিপি নিঃসন্দেহে এদেশে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারতা প্রমাণ করে। বৌদ্ধ ধর্মের এই প্রসার শুধু বাংলাদেশে নয় থাইল্যাণ্ড, কম্বোডিয়া, মায়ানমার, মঙ্গোলিয়া, চীনসহ ৯২টি দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল।[৩১] বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার উপজাতিরা এদেশে অভিবাসনের পূর্বে মায়ানমার (বার্মার আরাকান) ও তিব্বত-চীন এলাকায় বসবাস করত। সেসব দেশে থাকাকালীন সময়েই তাদের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব প্রতিভাত হয়েছিল। তবে বৌদ্ধ ধর্ম তাদের মধ্যে প্রসারিত হলেও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের পূর্বের আদি ধর্মচিন্তা তাদের মধ্য থেকে এখনো লোপ পায় নি, যা আজও স্বমহিমায় বিরাজমান।

বাংলাদেশে উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ

১৭৫৭ সালে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ-দ্দৌলার পতন ঘটেছিল এদেশীয় কতিপয় বিশ্বাসঘাতক আমত্যবর্গ ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ইংরেজগণের ষড়যন্ত্রে। ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৫ খ্রি. পর্যন্ত এদেশীয় শাসক পুতুল-শাসকের ন্যায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার পর ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতা ইংরেজদের কুক্ষিগত হয়। বলা যায়, এই সময় ও তারও কিছুকাল পূর্ব থেকেই খ্রিস্টান মিশনারী বা ধর্মপ্রচারক দল ভারতে আগমন করেন ও তাঁদের ধর্ম প্রচার শুরু করেন। কিন্তু তখন বর্ণহিন্দু ও মুসলমান সমাজে ধর্ম সম্প্রসারণে সাফল্য না পেয়ে এদেশের নিম্নবর্গের উপজাতীয় হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে ধর্ম সম্প্রসারণের কাজ পূর্ণোদ্দমে শুরু হয়। এই সময়ে খ্রিস্টান পাদ্রীগণ উপজাতিদের কিছু কিছু উপকার করেছেন, যেমন অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, শিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগ গ্রহণ ইত্যাদি।[৩২] মিশনারীগণ বুঝেছিলেন যে, বৈষয়িক উন্নতির ভরসা দিতে পারলে ওরাওঁ, মুণ্ডা, সাঁওতাল, গারো সমাজ খ্রিস্ট ধর্মে আকৃষ্ট হতে পারে। মিশনারীদের এই পরিকল্পনা এদের ক্ষেত্রে অনেকাংশেই সফল হয়েছিল। দেশীয় উপজাতিদের মনে খ্রিস্ট ধর্ম আবেদন সৃষ্টি করতে পারার বড় কারণ হলো উৎসবপ্রবণ ক্যাথলিক মতবাদের মধ্যে উপজাতিরা তাদের গোষ্ঠীগত নাচ-গানের প্রথাটুকু বজায় রাখার সুযোগ পেয়েছিলেন। উপজাতিদের গোষ্ঠীগত সমাজব্যবস্থা, আচার-ব্যবহারের প্রতি তাঁরা বিরুদ্ধাচরণ করেন নি। তাছাড়া খ্রিস্টধর্মের মিশনারীগণের মধ্যে জাতিগর্বের মতো সংকীর্ণ মানসিকতা ছিল না।[৩৩] সেকারণে এদেশের ওরাওঁ, মুণ্ডা, সাঁওতাল, গারোরা অনেকেই হিন্দু

ধর্মাচরণ ত্যাগ করে, এবং ম্রো, বম, খিয়াং, লুসাই, পাঙ্খো প্রভৃতিরা অনেকেই বৌদ্ধ ধর্মাচরণ ত্যাগ করে খ্রিষ্ট ধর্মগ্রহণ করেছেন।

উপজাতীয় ধর্মানুষ্ঠানের বিবরণ

১৯৩১ সালের সেন্সাসে ওরাওঁদের ৪১% হিন্দু, ২০% খ্রিস্টান বলে পরিচয় দিয়েছেন। বর্তমানে ওঁরাওরা খ্রিস্টধর্মের দিকে ক্রমশ ঝুঁকে পড়ছেন। ওঁরাওরা জড়োপাসক। তাদের মধ্যে হিন্দুধর্মের সংস্কৃতির প্রাধান্য লক্ষ্যণীয়। তাদের মতে 'ধরমী' বা 'ধরমেশ' ধরণীর সৃষ্টিকর্তা। ওরাওঁদের প্রধান প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠান–ফাগুয়া, সারহুল, সোহ্রাই, কারাম পর্ব। ওরাওঁ সমাজেও গ্রামদেবতা, গার্হস্থ্যদেবতা, ফসলাদি সংরক্ষণের দেবতার পূজা করা হয়। তারা প্রত্যেক পূজা পার্বণেই দেবতাদের নামে বিভিন্ন উপাচার উৎসর্গ করে নাচগান মদ্যপানের অনুষ্ঠান করে থাকেন।[৩০] ফাগুয়া অনুষ্ঠিত হয় ফাল্গুনে, সারহুল চৈত্র মাসে, কারাম ভাদ্রে আর সোহ্রাই কার্তিক মাসে। প্রতিটি অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবন ও জীবিকার উন্নতি সাধন, ব্যক্তি–পরিবার–সমাজের কল্যাণ কামনা ; শিকারের সাফল্য ও ফসলের ফলন বৃদ্ধির চিন্তায় এসব ধর্মীয় উৎসবের উদ্দেশ্য। ফাগুয়া নববর্ষের উৎসব। ওঁরাও সমাজে এই উৎসবটি উদ্‌যাপিত হয় ফাল্গুনী পূর্ণিমায়। তাতে ব্যবহৃত হয় প্রচুর ফাগ্ বা আবির। ফাল্গুনী পূর্ণিমার রাতে পাহান বা পুরোহিত অফুলন্ত শিমুল গাছের একটি, ভেরেণ্ডা গাছের একটি ও জিগা গাছের একটি করে শাখা কেটে পূজার থানে পুতে রাখেন। অতঃপর পুরোহিত তিনবার থান প্রদক্ষিণ করেন, ও শুরু হয় পূজার আনুষ্ঠানিক কর্মাদি।[৩৫] এসময় উপস্থিত ওঁরাও জনতা সমস্বরে তাদের ভাষায় বলে ওঠেন, বিগত বছরের সকল অকল্যাণের ন্যায় এবছরের সকল অকল্যাণ, রোগ, শোক, দুঃখ–যন্ত্রণা দুর হয়ে যাক'।[৩৬] ফাগুয়া অনুষ্ঠানের আরেকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান হলো শিকারযাত্রা, যাকে তাদের ভাষায় 'ডাণ্ডা কাট্টা' বলে। ডাণ্ডা কাট্টা অনুষ্ঠানটি শুধুমাত্র ফাগুয়া উৎসবের সময়ই করা হয় না, পারিবারিক যে–কোনো কল্যাণ কামনায় প্রায়শই 'ডাণ্ডা কাট্টা' অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।[৩৭] এই অনুষ্ঠানে প্রাপ্ত শিকারের মাংস গ্রামবাসীরা সমবেত হয়ে রান্না করে পানীয় দ্রব্যসহ খায়। সামাজিক উৎসব 'সারহুল' সম্পন্ন করে পুরোহিত। পুরোহিত পূজার থানে সিঁদুর লাগায়, ধূপদানীতে বার বার ধূপ নিক্ষেপ করেন, ও থানে আতপ চাল উৎসর্গ করেন। এসময় করজোড়ে গৃহদেবতার কাছে প্রার্থনা জানান, সমাজের সকল মানুষের কল্যাণ কামনা করে। অতঃপর পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করে যার মূল অর্থ হলো বৃষ্টির আবাহন, ফসলের বৃদ্ধি কামনা, সমাজের সাধিত কল্যাণসাধন। অনুষ্ঠানের তৃতীয় পর্যায়ে মোরগ বলিদানের আনুষ্ঠাকিতা। বলিদানের আগে যদি প্রদত্ত চাল মোরগটি খায়, তাহলে সেবছর বৃষ্টি হবে, ফসল ফলবে, সমাজের কল্যাণ হবে বলে তারা বিশ্বাস করেন।[৩৮] কারাম পর্বটি সম্পন্ন হয় বর্ষাকালে, ভাদ্রমাসে। সেজন্য উত্তরবঙ্গে কারাম পর্বকে 'ভাদই পরব' বলা হয়। কারাম পরব হচ্ছে বৃক্ষের পূজা উপলক্ষে উৎসব; এই উৎসবকে কেন্দ্র করে ওরাওঁ সমাজের কিশোর–কিশোরী, যুবক–যুবতী হয়ে ওঠেন নৃত্য চঞ্চল, সঙ্গীত মুখর, পানাহার মত্ত। কারাম পর্বে তাদের নিজস্ব ভাষার গান ও কারাম বৃক্ষ পূজার কাহিনী নর–নারীরা মনোযোগের সাথে শ্রবণ করেন। সোহরাই পূজার মানে হলো গোয়াল পূজা, গবাদি পশুর কল্যাণ কামনা করা। কার্তিক মাসে চাষাবাদ শুরু হওয়ার আগে চাষের উপকরণাদির প্রতি যত্ন নেওয়া এ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে। এই অনুষ্ঠানে গোবরকে তারা

অতি পবিত্র বস্তু মনে করেন। শুধু ওরাওঁরা নয়, গোবরকে উত্তরবঙ্গের সকল উপজাতিই যেমন–সাঁওতাল, রাজবংশী, মুণ্ডারা পবিত্র মনে করেন। এদের ধর্মানুষ্ঠান যেসব উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে, রাজবংশী, সাঁওতাল, মুণ্ডা, মালো প্রভৃতি উপজাতির লোকেরাও প্রায় একই উদ্দেশ্যে স্ব স্ব নিয়মে তাদের পূজাচার করে থাকেন।

সাঁওতালদের প্রধান দেবতা হলো মারাংবুরো। গ্রামের সকলের মঙ্গল–অমঙ্গলে মারাং বুরোর ইচ্ছায় ঘটে থাকে বলে সাঁওতালরা বিশ্বাস করেন। একারণে মারাং বুরোর উদ্দেশ্যে সাদামোরগ ও সাদা ছাগল উৎসর্গ করা হয়। তাদের গার্হস্থ্য দেবতার নাম বোঙা/বোঙা থাকে পাহাড়ে। বোঙাদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সাঁওতালরা রোগমুক্তি বা সার্বিক কল্যাণ কামনায় মানতকালে সিংবোঙার উদ্দেশ্যে ভোগ দেয়। এই ভোগে মুরগীর বাচ্চা উৎসর্গ করেন। প্রত্যেক সাঁওতাল পরিবারে আবার দুটি করে বোঙা আছে : 'ওরাক বোঙা' (বাস্তু দেবতা) ও 'আবগে বোঙা' (গোত্রদেবতা)।[৩৯] তাছাড়া ওঁরাও, রাজবংশীদের মতো সাঁওতালরাও ফসলের উন্নয়ন কামনা, গ্রামের মঙ্গল কামনা, গো–মহিষাদির পূজা–পাহাড়–পর্বত–নদীর পূজা করে থাকেন। সাঁওতালরা খ্রিস্টধর্মী হয়ে গেলেও এসব ধর্মীয় আচার তারা নিষ্ঠার সাথে আনন্দোৎসবের মাধ্যমে পালন করেন।

১৯৩১ সালের সেন্সাসে সাঁওতালদের ৪০% হিন্দু ও ০১% খ্রিস্টান হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। বর্তমান সাঁওতালদের অনেকেই খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছেন। সাঁওতালদের মধ্যে বেশ ক'টি সম্প্রদায় আছে। যেমন–দেশওয়ালী, থৌরা ও খ্রিস্টান। দেশওয়ালীগণ হিন্দু ধর্মীয় আচার–আচরণে অনুরক্ত, থৌরাগণ সর্বপ্রাণবাদ বা জড়বাদী (animism or animatism) আর খ্রিস্টান ধর্মালম্বীরা যিশুর উপাসক। ভূঁইয়া, ভূঁমিজ, ভুঁইমালী, প্রভৃতি জাতি নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দিয়ে বাঙালিদের সাথে মিশে যাচ্ছে। খাসিয়াদের পূর্বধর্ম হিন্দু হলেও, খাসিয়ারা খ্রিস্টান মিশনারীদের প্রচেষ্টায় ধর্মান্তরিত খ্রিষ্টান হয়ে গেছে।[৪০] খাসিয়াদের পূর্বধর্ম হিন্দু বলেই তারা হিন্দুদের মতোই কিছু দেবতার পূজা করে থাকেন। তাদের প্রধান দেবতা হলো উ ব্লাউ নাংথাউ। যাকে তারা সৃষ্টিকর্তা জ্ঞান করেন। এছাড়া উ ব্লাউ মতুং (জলদেবতা), উ ব্লাউ সংসপাহ (ধনসম্পদের দেবতা), উরিং কেউ (গ্রাম দেবতা), কায়িহ (রোগ–জরা রক্ষাকারী), ও কাখ্‌লাম (কলেরা, মহামারীর দেবতা) ইত্যাদি পূজা করে থাকেন। তাদের এসব দেবতার পূজা ঠাকুর দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রায় সময়ই খাসিয়ারা এসব অনুষ্ঠানে ছাগল, মোরগ উৎসর্গ করে থাকেন। ত্রিপুরা, রাজবংশী, চাকমা, ওরাওঁ, সাঁওতালরা গ্রামদেবতা, জলদেবতা, ধনসম্পদের দেবতা, রোগ হরণকারী পূজা করে থাকে। এসব পূজা–অর্চনার উদ্দেশ্য এক ধরনেরই বিশ্বাসে তারা করে থাকেন। কুর্মি মাহাতোরা হিন্দু ধর্মাবলম্বী। ভূমিলক্ষ্মীর পূজা তারা করেন। ভূমিলক্ষ্মীকে কেন্দ্র করেই তাদের সমস্ত আশা–আকাঙ্ক্ষা আবর্তিত হয়। মাহাতোরাও সাড়ম্বরে সাঁওতাল, ওঁরাওদের মতো করম দেবতার পূজা করেন।

গারোদেরও পূর্বে হিন্দু ধর্ম ছিল। এদের খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের বয়স ১০০–১৫০ বছরের বেশি নয়। টাঙ্গাইলের মধুপুর এলাকার স্বল্পসংখ্যক গারোরা বর্তমানেও সনাতনপন্থী হিন্দু–ধর্মাবলম্বী।[৪১] এখনো গারোদের বৃদ্ধ বয়সীরা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ বা গীর্জায় যাওয়াটাকে গ্রহণ করেন না। গারোদের মধ্যে তাদের পিতৃপুরুষের ধর্মীয় অনুষ্ঠান *'ওয়াংগালা'* এখনো পালন করতে দেখা যায়। গারোদের আদি ধর্মের নাম 'সাংসারেক'। ওয়াংগালা (wangala) সূর্যের

প্রতীক, এবং উর্বরতার দেবতা সালজং-এর সম্মানে উদ্‌যাপিত হয়। এতে পূজারীরা শস্য ক্ষেত্রে অর্ঘ্য নিবেদনের পর সমস্ত গ্রাম উৎসবানন্দে মেতে ওঠে।[৪২] গারোদের পূজা-পার্বণের রীতি পদ্ধতি অনেকটা হিন্দু ভাবাপন্ন। এদের পূজা অনুষ্ঠানেও হিন্দুদের ন্যায় পুরোহিত ব্যবহৃত হয়। এরা পুরোহিতকে 'কমল' বলে। গারোরা ফসল উৎপাদন ও বৃদ্ধির জন্য ওয়াংগালা ছাড়াও আরো কিছু ধর্মীয় উৎসব পালন করেন। সেগুলো হলো *'আগাল মাকা', গিচিপং', 'মিচিল তাতা', 'রংচুগালা'* ও *'ফাওকারা'*। এ পর্বগুলো সাধারণত বীজবোনা, ফসল তোলা, নবান্ন প্রভৃতি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পালন করা হয়ে থাকে। ওয়াংগালা পূজা দুটি উদ্দেশ্যে গারোরা করেন। প্রথমত ফসলাদিকে কীটপতঙ্গ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা করা; দ্বিতীয়ত রোগ ব্যাধি, জ্বরা-মৃত্যু থেকেও নিজেদের রক্ষা করা। গারো সমাজে প্রস্তর পূজা, পূর্ব-পুরুষ পূজা ইত্যাদিও করা হয়। এসব পূজায় তারা পাঠা বলি, খরগোস বলি করে দেবতার নামে উৎসর্গ করেন।[৪৩]

মুরংদের নিকট বিশ্বস্রষ্টা হলো তুরাই এই দেবতাকে তারা শ্রদ্ধার্ঘ জানাই। তবে ওরেং নামক দেবতার নামে তারা পূজা দেন। ওরেং হলো গার্হস্থ্য দেবতা এবং সংসারের যাবতীয় কার্যাদির শুভ ফলদায়ক। শ্রাবণ মাসে মুরং মেয়ে-পুরুষ ভরা নদীর কিনারে ওরেং দেবতার নামে গরু বধ করেন। সেই সঙ্গে বেজোড় সংখ্যক মোরগ-মুরগীও বলি দেন। নৃত্যগীত, মদ্যপান এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ। বর্ষশেষে মুরংরা সেখানে সমবেতভাবে ভাত, মাংস, মদ ও পিঠা স্থাপন করে প্রার্থনা করে : 'হে ওরেং, তুমি আমাদের জুম চাষে সাহায্য কর, আমাদের রোগমুক্ত রাখ।'[৪৪]

মনিপুরীরা হিন্দুধর্মাবলম্বী বৈষ্ণবপন্থী। স্থানীয়ভাবে তারা মৈথেই নামে পরিচিত। গারো, হাজং, মণিপুরী, কোচ, পলিয়া, রাজবংশী, তঞ্চঙ্গ্যা, ওরাওঁ, হদি, দালুই, সূর্যবংশীরা নিজেদের ক্ষত্রিয় হিন্দু বলে দাবি করেন।[৪৫] তাছাড়া চাকমা, মারমা, ত্রিপুররাও নিজেদের ক্ষত্রিয় হিসাবে দাবি করতে শোনা যায়। মনিপুরীদের বৈষ্ণবধর্ম। মণিপুরীদের রাসনৃত্যের সংকীর্তন রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। রাধাকৃষ্ণের রাসযাত্রায় মনিপুরীরা ঢোল, মৃদঙ্গ বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে ধ্রুপদী রাসনৃত্যে সবাইকে বিমোহিত করেন। চৈত্র পূর্ণিমায় বসন্তকালীন রাসনৃত্য উৎসব মণিপুরীদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উৎসব। ওরাওঁদের ফাল্গুনী পূর্ণিমায় ফাগুয়া উৎসবে, সাঁওতালরা বসন্তে আর মণিপুরীরা রাস উৎসবে আবির ছোঁড়ার হোলিখেলায় মেতে ওঠেন। বনজোগীরা ক্রমশ খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলেও তাদের নিজস্ব আদি ধর্মীয় বিশ্বাস-প্রথাদি মেনে চলেন।

ত্রিপুরারা হিন্দু ধর্মাবলম্বী হলেও বর্ণ-হিন্দুদের পূজাপার্বণ ও দেবদেবীর পূজা-অর্চনার সাথে তাদের দেব-দেবীর পার্থক্য আছে। ত্রিপুরাদের দেবতাদের নাম হলো *মাতাই কতর, লাম প্রা, সংগ্রংমা, তুইমা, মাইলুংমা, খঁইজংমা, বুড়ামা, বানিরাও, সাতবোন, বুড়িরক, কারায়া, গরায়া* ইত্যাদি। তাছাড়া রোগব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভের উদ্দেশ্যে ত্রিপুরারা সুকুন্দ্রায় বুকুন্দ্রায়, বরমালী বিখিত্রায়, যমদুগা, দুদুগা ইত্যাদির পূজা করে থাকেন। যেসব ওঝা পূজায় মন্ত্রপাঠ ও অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন তাদেরকে আচাই বলে। এসব পূজায় পশু-পাখি বলির প্রথা চালু আছে। যেমন-বরমালীর জন্য ছাগল, বিখিত্রায়ের জন্য মুরগী, মোআনীর জন্য শূকর বলি ও রোখাজয়ের জন্য কুকুরের মাংস উৎসর্গ করে থাকেন।[৪৬] এই কুকুরভোজী

অপদেবতার উদ্দেশ্যে কুকুরের মাংস উৎসর্গ করলেও ত্রিপুরারা কিন্তু কুকুরের মাংস খায় না। কুকুরটিকে তারা দা-ছুরি দিয়ে বলি করেন না, জবাইও করেন না, কুকুরটিকে মুগুর দিয়ে মাথায় আঘাত করে হত্যা করা হয়। ত্রিপুরাদের দুটি গোত্র রিয়াং ও উসুই। এরাও ত্রিপুরাদের মতো সমস্ত পূজা অর্চনা করে থাকেন।

রাজবংশীরা বর্ণ-হিন্দুদের প্রায় সকল দেবদেবীর পূজা-অর্চনার পাশাপাশি নিজেদের কতিপয় দেবদেবীর পূজা করেন। তাদের নিজস্ব দেব-দেবীর পূজার মধ্যে হ্যাঁচড়া, ত্রিনাথ ঠাকুর, সুবচনি পূজ, হরিঠাকুরের পূজা,, সার্বজনীন গ্রাম মাঙ্গলিক 'গাইটে' পূজা ইত্যাদি করে থাকেন। গাইটে পূজায় রাজবংশীদের রোগমুক্তি, আর্থিক উন্নতি বা ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য গ্রাম-মাঙ্গলিক পূজার 'থানে' তারা বিভিন্ন মানত করেন। এসব মানতের মধ্যে পশুবলি, মাথা মুণ্ডন করে চুল দান, মানুষের বুক চিরে রক্তদান উল্লেখযোগ্য। রাজবংশীদের মতোই ত্রিপুরারা গ্রামবাসীদের মঙ্গলের জন্য সার্বজনীন মাঙ্গলিক পূজা করেন। এ পূজার নাম কের পূজা। এ পূজায় ওঝা পূজা বেদীর সম্মুখে নাচেন ও বলিকৃত সমস্ত পশুপাখির মাংস পূজাস্থানে রান্না করে সকলে খেয়ে থাকেন। তুইবুকমা বা তুইমা গঙ্গাদেবীর পূজা, মাইলুংমা শস্য দেবীর পূজা, হাকামা বনদেবীর পূজা, বুড়ামা পূজা 'জুম' দেবতার পূজা, মাতাইকতর বা মাতাই চাংগরামু শিব-পার্বতী বা কালী পূজা। রাজবংশী, ত্রিপুরাদের মতোই অনুরূপ গ্রামমাঙ্গলিক পূজা চাকমারা এখনো করেন। চাকমাদের ভাষায় ঐ পূজার নাম 'থানমানা পূজা'। চাকমারা থানমানা পূজা শেষে সবাই মিলে একত্রে ত্রিপুরাদের মতো খাওয়া দাওয়া করেন। আর রাজবংশীদের পূজা শেষে প্রত্যেক পরিবারের ঘরে ঘরে পূজার উদ্দেশ্যে নিবেদিত পবিত্র খাদ্য আতপ চাল, চিনি প্রভৃতি বিতরণ করা হয়। রাজবংশী সদস্যদের প্রতেকেই শ্রদ্ধাভরে ঐ পবিত্র খাদ্য খেয়ে থাকেন। কোনো রাজবংশী সদস্য যদি পূজার সময় দীর্ঘদিন গৃহের বাইরেও অবস্থান করেন তাহলে সে ফিরে আসার পর তাকে যত্ন করে রেখে দেওয়া ঐ পবিত্র খাবার খেতে দেওয়া হয়।

ম্রোরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও তাদের কিছু সংখ্যক খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছেন। তবে তাদের মধ্য মারমাদের ধর্মীয় সংস্কৃতির প্রভাব বেশী লক্ষ করা যায়। ম্রো-দের কিছু নিজস্ব পূজা ও বিশ্বাস আছে। যেমন-রোগীর আরোগ্যলাভের পর তারা গোহত্যা অনুষ্ঠান করেন ও গরুর জিহ্বাটি কেটে নেন। এসময় ম্রো যুবকেরা বিশেষ ধরনের বাঁশী বাজান ও তরুণীরা নৃত্য করে থাকেন।

হাজংরা হিন্দুধর্মাবলম্বী। রাজবংশী, কুর্মি মাহাতো, কর্মকার, মালো, মাহালীদের মতো বর্ণহিন্দুদের প্রায় সব দেব-দেবীর পূজা করলেও, তারা ত্রিপুরা, গারো, রাজবংশী, চাকমা, মারমা, তঞ্চঙ্গ্যা, মুরং, রিয়াংদের মতো শিব-দুর্গাকে অধিক সম্মান করেন। পূর্বে তারা বিয়ে ও পূজা-অর্চনায় ঠাকুর বা ব্রাহ্মণ ব্যবহার করতেন না কিন্তু এখন করেন। তবে ব্রাহ্মণ সমাজের অপেক্ষাকৃত সামাজিক সম্মানে নীচু শ্রেণীর ব্রাহ্মণরা তাদের পূজা-অর্চণা করে থাকেন। হাজংরা পূজা-অর্চনায় তুলসী পাতা ব্যবহার করত না, কিন্তু এখন করেন। তাছাড়া সব পূজাপার্বণে তারা সেজু গাছের পাতা ব্যবহার করেন।

চাকমারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও তাদের আদি ধর্মীয় বিশ্বাসে ভাত-দ্যা, থানমানা, ধর্মকাম, হালপালনী পূজায় দেবী মা-লক্ষ্মীর উদ্দেশ্যে খানা দেন। এটি আষাঢ় মাসের সাত

তারিখে ফসলের দেবীর উদ্দেশ্যে করা হয়। ঐদিন হালের বলদগুলোকে চাষাবাদ থেকে মুক্ত রাখেন। হালপালনী উৎসবটি রাজবংশী ও পালন করেন। রাজবংশীরা ভাদ্রমাসের ভাদু উৎসবে গরুকে কলাপাতায় মুড়ে চালের গুড়ার তৈরি পিঠা খাওয়ান। চাকমারা গৃহস্থের মঙ্গলের জন্য ধর্মকাম পূজা করেন। তবে আদি ধর্মীয় উৎসবের মধ্যে চাকমাদের বিঝু উৎসব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এটি তারা বাংলা নববর্ষে করে থাকেন। ওঁরাও, সাঁওতাল, রাজবংশী, মুণ্ডারাও অনুরূপ নববর্ষে উৎসব করে থাকেন। রাজবংশীরা চৈত্র মাসের শেষ দিকে চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে চড়কপূজা করেন, চড়ক নাচান, রাজবংশী সদস্যরা উপোষ থেকে কাদামাটি উৎসব করেন, শিবলিঙ্গ তৈরি করে পূজা করেন। আর বৈশাখের প্রথম দিনে স্থানীয় গ্রাম মাঙ্গলিক পূজার থান তলায় মেলার আয়োজন করে থাকেন।

সাদামাটা সহজ-সরল জীবনে অভ্যস্ত রাখাইন সম্প্রদায়ে বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালিত হয়। এর মধ্যে গৌতম বুদ্ধের জন্মবার্ষীকী,বৈশাখী পূর্ণিমা, মাঘীপূর্ণিমা প্রবরণাপূর্ণিমা ও বসন্ত উৎসব ছাড়াও রাখাইনরা চৈত্র সংক্রান্তিতে (এপ্রিল মাসে) 'সাংগ্রেং উৎসব'[৪৭] পালন করেন। এটা রাখাইনদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব। এ সময় রাখাইন তরুণ-তরুণী'[৪৭] যুবক-যুবতীরা সার্বজনীন এই আনন্দ উৎসবে 'পানি খেলা'য় (water festival) মেতে ওঠেন। তিনদিনব্যাপী এ আনন্দ উৎসবের অপরিহার্য অঙ্গ হলো নারী পুরুষের সমন্বিত দলের নাচ-গান ও পানি ছিটানো। বাঙালি হিন্দুদের মতো তাদেরও বার মাসে তের পার্বণের সার্বজনীন বিভিন্ন পূজা উৎসব-অনুষ্ঠান আছে। সেগুলোতেও রাখাইনরা খুব আমোদ-ফূর্তি, নাচ-গান করেন।[৪৮] মারমা ও রাখাইনদের উৎসব একই ধরনের, এবং বস্তুত একই ঢঙে সেগুলো তারা পালন করেন।

উপজাতীয় চাকমা, মারমা, তঞ্চঙ্গ্যা, চাক, ম্রো, মুরং খুমি, রাখাইনরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। লুসাই, পাঙ্খো, বমদের প্রায় সবাই খ্রিস্টধর্মাবলম্বী। ১৯৬৬ সালে বমদের ৮৬% খ্রিস্টান[৪৯] ধর্ম গ্রহণ করেছেন বলে দেখা যায়। লুসাইদের প্রভাবে পাঙ্খোরাও খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছেন। তবে তাদের মধ্যে এখনো অনেক প্রাচীন রীতিনীতি রয়ে গেছে। খিয়াংদের অধিকাংশ লোকই পূর্বে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিল। সাম্প্রতিককালে তারা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছেন।[৫০] বাংলাদেশে মণিপুরীদের একটি শাখা যারা পাঙন নামে পরিচিত এরা ইসলাম ধর্মাবলম্বী মণিপুরী মুসলমান নামে পরিচিত। পাঙন নামক মণিপুরী শাখাটি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গেলেও কিছু কিছু উপজাতীয় সংস্কৃতি তাদের মধ্যে এখনো বর্তমান। মামাত, ফুফাত ভাইবোনদের মধ্যেই কেবলমাত্র তাদের বিয়ে সীমাবদ্ধ। অনুরূপ সম্পর্কীয় আত্মীয়দের মধ্যেও তারা ছেলেমেয়ের বিয়ে দেন না।

ব্রিটিশ শাসনামলে খ্রিস্টান মিশনারীগণ খ্রিস্টধর্মের ব্যাপক প্রসারের জন্য সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। আর্থিক ও সামাজিকভাবে অনুন্নত সম্প্রদায়গুলো তাদের পূর্বের কোনো কোনো জাতির হিন্দুধর্ম ও উপজাতীয় অন্যান্য ধর্ম ছেড়ে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছেন। অবশ্য যেসব উপজাতীয় লোকজন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে নি তাদের প্রতি মিশনারীদের অনুদারতার কথাও শোনা যায়। একটি কথা বলা দরকার যে, এসব উপজাতীয় সম্প্রদায়গুলো ইসলাম-হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে ঐসব ধর্মীয় প্রায় সব নিয়ম-কানুন, রীতিনীতি পালন করলেও উপজাতীয়রা সবাই তাদের প্রাচীন ধর্মীয় লোকসংস্কার, লোকবিশ্বাস, প্রাচীন

ধর্মীয় আচার-নিয়মকানুন এখনো ছাড়তে পারেন নি। তারা এখনো সেগুলোকে ভক্তিশ্রদ্ধা সহকারে পালন করেন।

বাংলাদেশের উপজাতিদের স্ব স্ব ধর্মের পূজা-পার্বণ, ধর্মীয় উৎসবাদি নিরীক্ষণ করলে একটা বিষয় সবার দৃষ্টিগোচর হবে যে, তাদের সব জনগোষ্ঠীর পূজা-অর্চনা-উৎসবাদির উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। এদেশের সকল উপজাতীয় লোকজন যে-বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে ও বিশেষ তাৎপর্যে এগুলো পালন করে, তা হলো ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি, ব্যক্তি তথা গ্রামের সার্বিক মঙ্গল, গো-মহিষাদির রোগমুক্তি, আর্থিক উন্নয়ন, ভয়-ভীতি, ঝড়-ঝঞ্ঝা থেকে নিজেদের রক্ষা, সন্তান কামনা ইত্যাদি।

বাংলাদেশের প্রতিটি উপজাতীয় সমাজ বিভিন্ন গোত্রে বা গোষ্ঠীতে ও উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত। গোষ্ঠী ও উপগোষ্ঠীগুলো স্ব স্ব গোষ্ঠীর মধ্যে রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়। এই গোষ্ঠী ও উপগোষ্ঠীর জ্ঞাতিসম্পর্ক বাঙালি সমাজের জ্ঞাতি সম্পর্কের ভিত্তির চেয়ে দৃঢ়। বাংলাদেশের বিভিন্ন উপজাতীয় সমাজে বিভিন্ন সংখ্যক উপগোষ্ঠী বিদ্যমান। যেমন-চাকমাদের গোষ্ঠী একুশটি, উপগোষ্ঠী একশ পঞ্চাশটি; ত্রিপুরাদের গোষ্ঠী ছত্রিশটি এবং উপগোষ্ঠীও অনুরূপ; সাঁওতালদের গোষ্ঠী বারটি ও উপগোষ্ঠী প্রায় দু'শটির কাছাকাছি।[৫৩] অনুরূপভাবে রাজবংশীরাও বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত, তবে তাদের গোষ্ঠীর কোনো নির্দিষ্ট নাম নেই বলে তাদের মধ্যে কতসংখ্যক গোষ্ঠী বা উপগোষ্ঠী রয়েছে তা জানা যায় না। বাংলাদেশের উপজাতীয় সমাজের এইসব গোষ্ঠী ও উপগোষ্ঠীসমূহ পূর্ব-পুরুষ, বাসস্থান, ফল-মূল, নদী-নালা, গাছ-বৃক্ষ, জন্তু-জানোয়ার ইত্যাদির নামে পরিচিত। এসব তাদের টোটেম ও জন্মান্তর চিহ্ন বহন করে। এদেশের কোনো উপজাতীয় সমাজেই একই গোত্রে বা গোষ্ঠীতে বিয়ে চলে না। বিয়ে করতে হলে ছেলে ও মেয়ে অবশ্যই ভিন্ন গোষ্ঠীর বা গোত্রের হতে হবে। একই গোত্রে বিয়ে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে মোনোমালিন্য বিয়ে ও বলপূর্বক বিয়ের ক্ষেত্রে উক্ত রীতির ব্যতিক্রম বিরল হলেও লক্ষ করা যায়।

গারো ও খাসিয়া সমাজ মাতৃতান্ত্রিক। তাছাড়া বাংলাদেশের অন্যান্য সকল উপজাতীয় জনগোষ্ঠী পিতৃতান্ত্রিক্ সমাজের অন্তর্ভুক্ত। পিতৃতান্ত্রিক হলেও তাদের অধিকাংশের মধ্যে এমন কতকগুলো নিয়ম-কানুন রয়েছে যা বৃহত্তর সমাজের সাথে নানান ভাবে পার্থক্যপূর্ণ। সাঁওতাল, ওরাওঁ প্রভৃতি সমাজের মতো রাজবংশী সমাজে পিতার স্থাবর ও অবস্থাবর সম্পত্তিতে মেয়েদের কোনো মালিকানা স্বত্ব নেই। পিতার মৃত্যুর পর পুত্ররা সম্পত্তি সমান ভাগে ভাগ পায়। সম্পত্তি ভাগাভাগির সময় সাঁওতাল ও ওরাওঁদের মেয়েরা একটা করে গাভী পেয়ে থাকে।[৫৪] কিন্তু রাজবংশী সমাজে কন্যারা কোনো সম্পত্তির ভাগ না পেলেও বর্তমানে সাধ্যমত পিতা-মাতারা তাদের কন্যার বিয়ের সময় যৌতুক হিসাবে নানান দ্রব্যাদি, গহনা ও টাকা-পয়সা দিয়ে থাকেন।

বাংলাদেশে এমন কোনো উপজাতি নেই যারা সন্তান কামনায় পূজাপার্বণ কিংবা ব্রত-অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন না। যেমন—চাকমাদের গাংশালা পূজা, ত্রিপুরাদের কালাইয়া, ওরাওঁদের হরি আরি, খাসিয়াদের অম্বুবাচি ইত্যাদি অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য সন্তান কামনা। এরকম সন্তান কামনায় রাজবংশীরা চৈত্র মাসের শেষদিন ও বৈশাখ মাসের শুরুর দিন

শিবলিঙ্গ পূজা করেন। তাছাড়া তারা কার্তিক পূজা ও অম্বুবাচি উৎসবেও সন্তান কামনা করেন।

সন্তান উৎপাদনে অক্ষম বন্ধ্যা নারীর স্থান উপজাতীয় সমাজে অবজ্ঞেয়। বন্ধ্যা নারীরা ফসলের ক্ষেত মাড়াতে পারে না, নৃত্যে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয় না, সামাজিক উৎসব–অনুষ্ঠানে যেমন বিয়ে, পূজা–অর্চনা ইত্যাদিতে আনুষ্ঠানিক দ্রব্যাদি স্পর্শ করতে ও অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয় না। রাজবংশী সমাজেও এরকম বিষয় মহিলাদের মধ্যে খুব দেখা যায়। ঐসব পূজা–অর্চনা ও সামাজিক অনুষ্ঠানে এয়োতিদের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি ও গুরুত্বপূর্ণ।

গর্ভবতী নারীর খাদ্যখাদ্য, চলাফেরা, ইচ্ছা–আনিচ্ছা অনেক বিধিনিষেধ সকল উপজাতি সমাজ মেনে চলে। যেমন–চাকমা রমণীরা গর্ভাবস্থায় মিষ্টি লাউ ও তরমুজ খান না; মারমা রমণীরা কাঁকড়া খান না; গারোরা বাইম মাছ, বোয়াল মাছ ও গজার মাছ খান না ; সাঁওতাল, ওঁরাও রমণীরা ইঁদুর ও বাইম মাছ খান না। চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের সময় রাজবংশী গর্ভবতী মহিলারা কোথাও হেলান দিয়ে দাঁড়ান না, কোনো মাছ বা ফল বা গাছ তারা কাটেন না। এতে গর্ভজাত সন্তান পঙ্গু হয়ে যেতে পারে বলে তারা মনে করেন। এসব বিশ্বাস সাঁওতাল, ওঁরাও গারো, চাকমা প্রভৃতি সমাজে বিদ্যমান রয়েছে।[৫৫] গারো সমাজের মতো রাজবংশী সমাজে গর্ভবতী নারীকে খাঁটি দুপুর বা সন্ধ্যা বেলায় বাড়ির বাইরে যেতে দেওয়া হয় না অপদেবতার প্রভাব এড়ানোর জন্য। এছাড়াও প্রায় সব উপজাতীয় সমাজে গর্ভবতী নারীর ইচ্ছামতো তেঁতুল, আচার, কুল ইত্যাদি খাওয়ার ব্যাপারে কোনো বিধি নিষেধ নেই। ঠিক এরকমভাবে গর্ভবতী মহিলার ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেওয়ার ফলে রাজবংশী, ওঁরাও, সাঁওতাল মহিলারা পোড়ামাটি, সাজিমাটি এবং হাড়িপাতিলের চাড়া খান।[৫৬] সাধারণত চুলার পোড়ামাটি রমণীরা খান।

সন্তান প্রসবকালে নানারকম সতর্কতা ও সংস্কার হিসাবে আলাদা ঘর বা বিচ্ছিন্ন কুটিরের ব্যবস্থা শুধু রাজবংশী সমাজে নয়, হাজং, হদি, দালুই, চাকমা, ত্রিপুরা প্রভৃতি সমাজে লক্ষ করা যায়।[৫৭] আলাদা ঘর নির্মাণ থেকে শুরু করে প্রসূতির পূর্ণ শৌচ হওয়ার আগ পর্যন্ত নানাবিধ আচার, নিয়ম পালন করা হয়। এসবের উদ্দেশ্য হলো অপদেবতার কোপ থেকে সন্তান ও প্রসুতিকে মুক্ত রাখা ও সন্তানের মঙ্গলকামনা। রাজবংশীদের মতো গারো, হাজং, খাসিয়া, লুসাই প্রভৃতি সমাজ সন্তান-ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর কুটিরের মধ্যে অগ্নিকুণ্ড করে রাখে, এবং প্রসূতি যদি কোনো প্রয়োজনে বাইরে যায় তাহলে অগ্নিকুণ্ড বা অগ্নি প্রজ্বলিত কোনো কাঠ হাতে করে সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়[৫৮], এবং নিজ আঁচি গৃহে ফিরে অগ্নিকুণ্ডে হাতে–পায়ে সেঁক দিতে হয়। শুধু প্রসূতি নয়, অন্য যে কেউ আঁচি ঘরে গেলে সেই অগ্নিকুণ্ডে তাকে সেঁকে নিতে হয়। তাছাড়া ঐ ঘরে অন্য কেউ প্রবেশ করলে তাকে স্নান করে পুনরায় শৌচ হতে হয়। অগ্নিকুণ্ড ও লৌহদণ্ড তাদের সমাজে অপদেবতা তাড়ানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। ম্রো, মুরং, সেন্দুজ, বনজোগী ও পাঙ্খো সমাজের মতো রাজবংশীদের সমাজে সন্তান প্রসবকালে ঝাড়ফুঁক, তেলপড়া, জলপড়া, সুতাপড়া ইত্যাদি চিকিৎসা পরিলক্ষিত হয়। রাজবংশী সমাজে সাত দিন পর 'সাতের কামান' শেষে প্রসূতিকে সাত তরকারী খাওয়ানোর নিয়ম রয়েছে। সাত তরকারী খাওয়ার উদ্দেশ্য হলো অশৌচ থেকে শুদ্ধিকরণ ও প্রসুতি সন্তানের মঙ্গল কামনা।

হাজং, হদি, দালুই, সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাও প্রভৃতি সমাজের মতো রাজবংশী রমণীরা নিজ নিজ স্বামী বা ভাসুরের নাম মুখে উচ্চারণ করেন না।[৫৯] স্বামী বা ভাসুরের নাম উচ্চারণ করাটা তারা পাপ হিসাবে গণ্য করেন। যেমন–কোনো রমণীর স্বামীর বা ভাসুরের নাম যদি 'অমূল্য' হয় তাহলে সে তরকারীর নাম 'মূলা' উচ্চারণ করেন না; যাদের স্বামী বা ভাসুরের নাম পশুপতি, তারা পশু শব্দটি উচ্চারণ করেন না। যেমন–পরশুদিনকে তারা 'উ' দিন কিংবা পশুপাখিকে তারা জীবজন্তু, পাখ–পাখালি ইত্যাদি বলেন এবং মূলা তরকারীকে তারা লম্বা তরকারী বলেন।

সাঁওতাল, ওরাওঁ, রাজবংশী, হো, মুণ্ডা প্রভৃতি সমাজে তাদের মেয়েদের যৌবন প্রাপ্তির চিহ্ন হিসাবে উল্কি অঙ্কন করা হয়[৬০] বা চন্দনের কাঁই দিয়ে তিলক বা ফোটা কপালে এঁকে দেওয়া হয়। বিয়ের সময় এদের সমাজের ছেলেমেয়ের কপালে চন্দন দ্বারা উল্কি. ফোঁটা বা নক্‌শা অঙ্কন করা হয়।

হাজংরা শিশু সন্তানকে দেবতুল্য জ্ঞান করেন, ফলে গর্ভবতী নারীকে তারা খুব শ্রদ্ধভক্তি করেন, মর্যাদা দেন। অনুরূপভাবে গারো, হদি, রাজবংশী, সাঁওতাল, ওঁরাও, চাকমা, ত্রিপুরা, মারমা প্রভৃতি সমাজে গর্ভবতী নারীর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন ও খাওয়া–দাওয়া ও যত্ন নেওয়ার ব্যাপারে সকল সমাজ বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে থাকেন।[৬১] গ্রামের মঙ্গল ও শাসন ব্যবস্থার জন্য গ্রাম প্রশাসকদের বিভিন্ন নীতি ও শর্ত পালন ছাড়াও গ্রামের মঙ্গল কামনায় প্রায় সকল উপজাতীয় সমাজে গ্রাম মাঙ্গলিক থানে বিভিন্ন পূজাপার্বণ করেন। তাছাড়া ওঁরাও, রাজবংশী ও সাঁওতাল সমাজে বিভিন্ন পদ্ধতিতে গ্রাম দেবতার পূজা ছাড়াও মাটির নতুন 'সরায়' ওঝা বা গ্রাম্য পাহান কর্তৃক মন্ত্রপাঠ করে তা গ্রামের রাস্তাঘাট, বাড়ির সম্মুখে কিংবা গোয়ালঘরে ঝুলিয়ে রাখা হয়।[৬২] বাংলাদেশের যেসব উপজাতি পাহাড় ও অরণ্যভূমিতে বসবাস করে তারা জুম পদ্ধতিতে চাষাবাদ করতো। কিন্তু বর্তমান জমু চাষ পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়া অন্যান্য এলাকায় হ্রাস পেয়েছে। সমতল ভূমির হাজং, হদি, গারো, সাঁওতাল, ওঁরাও, রাজবংশী প্রভৃতি সমাজ বাঙালি সমাজের মতো হালচাষ পদ্ধতিতে ফসল ফলান। তবে সব উপজাতি সমাজ কৃষিনির্ভর হলেও তাদের মধ্যে নানাবিধ ব্যবসায়, কাঠকাটা, পশুপালন ও শিকার, মাছ ধারা ইত্যাদির মাধ্যমেও জীবিকা নির্বাহ করতে দেখা যায়।

সাঁওতাল ও ওরাওঁদের সোহ্‌রাই উৎসবে নক্সাকৃত নানাধরনের পিঠা খাওয়ার প্রচলন লক্ষণীয়। অনুরূপভাবে হাজং, হদি, দালুই এবং রাজবংশী সমাজে পৌষ–পার্বণ উপলক্ষে পিঠার সমারোহ সাঁওতাল ও ওঁরাওদের সোহ্‌রাই উৎসবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এছাড়া গারো, চাকমা, ত্রিপুরা ও মারমা সমাজেও নানাবিধ নক্সা–শিল্পকর্মসম্বলিত পিঠা–পুলি মুগ্ধ করে।[৬৩] উল্কী অঙ্কনের ক্ষেত্রে E Crawley একটি মন্তব্য করেছেন যেটির সাথে বাংলাদেশের উপজাতীয় সমাজের উল্কী অঙ্কনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের সাথে মিল পাওয়া যায়। সেটি হলো, "আদিম সমাজের উল্কী অঙ্কনের অন্তরালে যে বিশ্বাস বদ্ধমূল রয়েছে তা হলো, তাতে তাদের জীবন সুখের হবে; স্বাস্থ্য ভাল থাকবে এবং শক্তির অধিকারী হবে।"[৬৪] রাজবংশী সমাজের পূজা–অর্চনা ও সামাজিক উৎসব–অনুষ্ঠানে যে চন্দন তিলক ও ফোঁটা বা গৈরিক মাটির বিভিন্ন উল্কী অঙ্কিত হয় তা পবিত্রতার প্রতীক হিসাবে পরিগণিত। হিন্দু সমাজেও চন্দন চর্চা বা গৈরিক মাটির ব্যবহার লক্ষ্যণীয়, যা অনার্য সংস্কৃতির ফসল। হিন্দু প্রভাবান্বিত

উপজাতীয় সমাজের সকলেই তিলক ব্যবহারের পক্ষপাতি।[৬৫] তবে মণিপুরী ও কোচ মান্দাই ও বর্মন সমাজে সবচেয়ে এর ব্যবহার বেশি লক্ষ করা যায়।

হিন্দুধর্ম প্রভাবান্বিত উপজাতি যেমন রাজবংশী, দালুই, হদি, ভারতের আগারিয়া, গোন্দ, কোল প্রভৃতি সমাজের ধারণা যে, রাবন যখন সীতাকে হরণ করে নেয়, তখন সম্ভাব্য অশুভ আচরণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সীতাদেবী বারো বছর এই রজঃস্বলা রীতি পালন করে। সেই থেকে ঋতুস্রাবের শুরু হয়েছে।[৬৬] বাংলাদেশের হিন্দুভাবাপন্ন সকল উপজাতীয় সমাজে সিঁদুরের ব্যবহার আছে। তবে সাঁওতাল, ওরাওঁ, মুণ্ডা, রাজবংশী, মণিপুরী, হাজং প্রভৃতি সমাজে সিঁদুর সুপ্রাচীন কাল থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আজকের বাঙালি বর্ণ হিন্দু সমাজে যে সিঁদুরের ব্যবহার লক্ষ করা যায় তা অনার্য–আদিবাসী উপজাতিদের সংস্কৃতি থেকে গৃহীত। বর্ণ হিন্দুদের শাস্ত্রীয় গ্রন্থ বেদ, পুরাণ, প্রভৃতিতে ঘট স্থাপনের ব্যবস্থা থাকলেও কোথাও সিঁদুরের ব্যবহারের কথা উল্লেখ পাওয়া যায় না। পালযুগে ভবদেব ভট্ট ও পণ্ডিত পশুপতি ভদ্রের স্বীকৃতির মাধ্যমে বাঙালি হিন্দু রমণীরা সিঁদুর ব্যবহারের ব্রাহ্মণ্য স্বীকৃতি লাভ করে।[৬৭] বর্তমানে বাঙালি রমণীরা সিঁদুরকে অক্ষয় করে রাখার জন্য সারা বছর কোনো–না–কোনো উৎসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সিঁদুর খেলায় মেতে ওঠেন, নানান ব্রত অনুষ্ঠানে সিঁদুর ব্যবহার করেন।[৬৮]

সাঁওতাল বিয়েতে কনের আঁচলে ধান ও আতপ চাল রাখা হয় অপদেবতার কোপ এড়ানোর জন্য। রাজবংশী সমাজের বিয়েতে কনের মাথার উপর দিয়ে ইঁদুরের মাটি নিক্ষেপ করার উদ্দেশ্য হলো পিতৃঋণ পরিশোধ। তাছাড়া উপজাতীয় সমাজে লিঙ্গ ও লাঙ্গল উর্বরতার প্রতীক হিসাবে গণ্য করা হয়।

হাজং, ত্রিপুরা ও রাজবংশী বিয়েতে কলাগাছকে কেন্দ্র করে সাতবার ঘুরতে হয়। এর উদ্দেশ্য হলো কলার কাঁদির মতো দম্পতির অনেকগুলো সন্তান কামনা। কলাগাছ যৌনতার প্রতীক হিসাবে বিবেচিত। রাজবংশী সমাজে বিয়ের পর নব দম্পতি যখন ঘরে যায় তখন ছাদনাতলা থেকে ঘর পর্যন্ত কাপড় বিছিয়ে দেওয়া হয় ও তার তলে সারি সারি সরা রাখা হয়। সেগুলো বর ও কনেকে পা দ্বারা মাড়ানোর সময় ভাঙ্গতে হয়।[৬৯] এর অর্থ হলো সন্তান কামনা ও অপদেবতার চোখ কানা করে দেওয়া। কুকি ও লুসাই সমাজে এভাবে অপদেবতার কোপ এড়ানোর জন্যে সারারাত বাসর ঘরে ঢিল ছোঁড়েন। রাজবংশী, হাজং, হদি, দালুই, ওরাওঁ প্রভৃতি সমাজে নব দম্পতিকে সাদা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। এটিও অপদেবতার কুনজর এড়ানোর সাথে সম্পর্কিত।[৭০] অবশ্য কেউ কেউ বলেন যে, সাদা কাপড়ে ঢেকে দেওয়ার পর নবদম্পতি যদি হাসিমুখে পরস্পরের দিকে তাকায় তাহলে সংসার জীবন সুখের হয়।

বাংলাদেশের বিভিন্ন উপজাতীয় সমাজের ঠাকুর ঘরে বিভিন্ন দেব–দেবীর মূর্তি বা ফটো রাখা হয়। যেমন–রাজবংশী, হাজং, দালুই, ত্রিপুরা, মনীপুরী প্রভৃতি হিন্দু ধর্মাবলম্বী সমাজের ধর্ম–মন্দিরে বা ঠাকুরঘরে কার্তিক, গনেশ, বিষ্ণু, মহাদেব, শিব, পার্বতী, শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গ, শ্রী শ্রী জগন্নাথ, রাধা, কালী প্রভৃতির মূর্তি; চাকমা, মারমা, রাখাইন সমাজে মহামুনি বুদ্ধের মূর্তি, ও খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী গারো, সাঁওতাল, ওরাওঁ ও খাসিয়াদের গীর্জায় যিশু ও মেরীর মূর্তি দৃষ্টিগোচর হয়।[৭১]

বিবাহের ক্ষেত্রে অপদেবতার কোপ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য সাঁওতাল, মুণ্ডা, কোচ প্রভৃতি সমাজের মতো রাজবংশী সমাজেও বনদেবতা ও বনবিবির কর্তৃত্বাধীন বৃক্ষরাজির সাথে প্রতীকী বিয়ের রেওয়াজ আছে।[৭২] বাংলাদেশের প্রায় সব উপজাতীয় সমাজের বিয়েতে ধান, দূর্বা, আতপচাল, সিঁদুর, মিষ্টি, কলার ছড়ি, কাজল প্রভৃতির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। সাঁওতাল, ওঁরাও, রাজবংশী, হদি, দালুই, হাজং প্রভৃতি সমাজে এগুলো আবশ্যক। ধান, দূর্বা, আতপচাল ইত্যাদিতে রয়েছে জীবনসার (Life essence) এবং সিঁদুর যৌনতার চিহ্ন (Sex symbol) বা বিজয়ের প্রতীক।[৭৩] চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, হদি, দালুই, ওরাওঁ, রাজবংশী প্রভৃতি সমাজে মঙ্গলঘট থেকে আমপাতার শীর্ষমূল দ্বারা জল ছিটিয়ে আশীর্বাদ করার রীতির প্রচলন রয়েছে।[৭৪]

'অহিংসা পরম ধর্ম, যাগযজ্ঞে পশুবলী অধর্ম কথাটির প্রচলন থাকলেও বাংলাদেশের প্রায় সকল উপজাতি গ্রামের মঙ্গল, সংসারের মঙ্গল ও নিজের সার্বিক মঙ্গল কামনা করে বিভিন্ন পূজা ও আচার–অনুষ্ঠানে পশুবলী দেন, এবং সেই পশুর মাংস তারা এক জায়গায় বসে খান। সাঁওতাল, ওরাওঁ, মুণ্ডা, রাজবংশী, গারো, ত্রিপুরা, ম্রো, চাকমা, মারমা, রাখাইন প্রভৃতি উপজাতীয় সমাজে পশুবলী দেওয়া হয়। সকল সমাজে পশুবলীর উদ্দেশ্য একই। তা হলো– পশুবলী করে রক্ত ও পশুর মাংস দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে দেবতার তুষ্টি সাধন ও কৃপালাভ।

মৃত আত্মার সদ্গতি, কষ্ট–যন্ত্রণা থেকে মুক্তি ও স্বর্গলাভের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উপজাতীয় সমাজে বিশেষ করে হিন্দু ধর্মাবলম্বী উপজাতি সমাজে মৃত আত্মা বস্তুর উদ্দেশ্যে পূজা দেওয়া, শ্রাদ্ধ করা ও মৃত আত্মার উদ্দেশ্যে তার পছন্দ মতো খাবার পরিবেশন করা হয়। এগুলো যাদের মধ্যে যথেষ্ট প্রচলন রয়েছে তারা হচ্ছেন গারো, খাসিয়া, সাঁওতাল, ওঁরাও, রাজবংশী, মুণ্ডা, মনিপুরী প্রভৃতি। হাজংরা মৃত আত্মাবস্তুর পূজা করেন না, ও পাথরে পূজা করেন না। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী উপজাতীয়গণ পূণর্জন্মে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু হিন্দু ও খ্রিস্টান ভাবাপন্ন যেসব উপজাতীয় সমাজ তারা পূণর্জন্মে বিশ্বাস করেন। যেমন–গারো, হাজং, খাসিয়া, মুণ্ডা, সাঁওতাল, ওরাওঁ, রাজবংশী, মনিপুরী প্রভৃতি পুনর্জন্মে বিশ্বাস করেন। মূর্তিপূজা ও পাথর পূজা প্রায় সকল উপজাতীয় সমাজে লক্ষ করা যায়। গারো, রাজবংশী, মগ, চাকমা, খাসিয়া, লুসাই, সাঁওতাল, ওরাওঁ প্রভৃতি সমাজে বীজ বোনা, ফসল বৃদ্ধি, জমির উর্বরতা বৃদ্ধি ও নবান্ন উপলক্ষে বিভিন্ন আচার–অনুষ্ঠান পালন ও নৃত্যগীতের আয়োজন করা হয়। গারো, রাজবংশী, ত্রিপুরা, চাকমা, মণিপুরী প্রভৃতি সমাজে শবদেহ দাহ করা হয়।

রাজবংশীদের বিচার–শালিসী ব্যবস্থা, সামাজিক আইনকানুনের সাথে ওরাওঁ, সাঁওতাল, মাহালী, পাহাড়িয়া, মুণ্ডা, মাহাতো প্রভৃতি সমাজের মিল আছে। বাংলাদেশের উপজাতিদের স্ব স্ব ভাষা ছিল। বর্তমানে কয়েকটি উপজাতির স্ব স্ব ভাষা আছে, এবং তারা তাদের সমাজে ব্যবহার করে। তবে উপজাতিদের প্রায় সবাই ভালভাবে বাংলাভাষায় কথাবার্তা বলতে পারে। বাংলাদেশের উপজাতিদের ভাষার ক্ষেত্রে একটি কথা বলা দরকার যে, বাংলাদেশের সিলেট, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা ও স্টাণ্ডার্ড বাংলা ভাষার সাথে বেশ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। চাটগাঁয়ে বাংলার সাথে চাকমাদের ভাষার খুবই সাদৃশ্য বর্তমান রয়েছে। চাটগাঁয়ে বাংলাকে যদি বাংলা ভাষার আওতাভুক্ত ধারা হয়, তাহলে চাকমাদের

ভাষাকেও আলাদা ভাষা না বলে বাংলা ভাষা বলাই যুক্তিসঙ্গত। তাছাড়া উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ভাষার আঞ্চলিক বাংলা ভাষার যাবতীয় লক্ষণ সুস্পষ্ট[৭৫] যদিও বলা হয়ে থাকে অতীতে তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব ভাষা ছিল।

তথ্যসূত্র

১. ভবানী প্রাসাদ সাহু, *ধর্মের উৎস সন্ধানে* (কলকাতা :

২. Jerome S. Brunner. *Towards a Theory of Instruction.* (London : Haward University Press, 1966). p.82.

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

৪. অলোক মৈত্র, *বাংলার লৌকিক ধর্মাচারেব ঐতিহ্য সন্ধানে* পৃ. ২২

৫. ভবানী প্রসাদ সাহু, *ধর্মেব উৎস সন্ধানে,* প্রাগুক্ত, পৃ ২৭

৬. অলোক মৈত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

৭. ভবানী প্রসাদ সাহু, *ধর্মের উৎস সন্ধানে,* প্রাগুক্ত, পৃ ২৮

৮. সিগমুণ্ড ফ্রয়েড, *টোটেম ও টাবু* (কলকাতা : সুবর্ণবেখা, ১৯৯৩) ভাষান্তর : ধনপতি বাগ, পৃ. ৩

৯. মানিকলাল সিংহ, *রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি,* ১ম, ২য, ৩য় খণ্ড (বিষ্ণুপুব, বাঁকুড়া, ১৯৮২) থেকে সংকলিত।

১০. নির্মল কুমার বসু, *হিন্দু সমাজের গড়ন* (কলকাতা : বিশ্বভাবতী, ১৩৯১), পৃ. ৩৮

১১. Haraprasad Shastri, *Lokayata and Vratya* (Naihati : Haraprasad Shastri Gavesana Kendra, 1982), P. 46

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

১৩. মুহম্মদ আব্দুল জলিল, *লোকসংস্কৃতির নানা প্রসঙ্গ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫), পৃ. ১

১৪. সুবোধ ঘোষ, *ভারতের আদিবাসী* (কলকাতা :

১৫. বিবিএস, *বাংলাদেশ পপুলেশন সেন্সাস রিপোর্ট ন্যাশনাল সিরিজ* ১৯৯১ (ঢাকা : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বুরো, ১৯৯৮), পৃ. ১৪–১৯৮

১৬. ক্লারেন্স টি ম্যালোনি, 'ট্রাইবস অব বাংলাদেশ এণ্ড সেনথিসিস অব বেঙ্গলি কালচার', মাহ্মুদ শাহ কোরেশী (সম্পা.), *ট্রাইবাল কালচার ইন বাংলাদেশ,* (বাজশাহী : আইবিএস, ১৯৮৪),পৃ. ৫–৫২ কিবরিয়া–উল খালেক, 'এথনিক কমিউনিটিজ অব বাংলাদেশ', ফিলিপ গাইন (সম্পা,) *বাংলাদেশ ল্যাণ্ড, ফরেস্ট এণ্ড ফরেস্ট পিপলস,* (ঢাকা : সেড, ১৯৯৫), পৃ. ১২৫। প্রশান্ত ত্রিপুরা, 'বাংলাদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের পরিচিতি, *সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান পরিচিত* (ঢাকা : বাউবি,) পৃ. ২১৮–২২৪

১৭. ক্লারেন্স টি. ম্যালোনি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫.–৫২ ও কিবরিয়া–উল–খালেক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১–২৫

১৮. *হিন্দু শব্দটি যেহেতু বেদ,* উপনিষদ, *গীতা ও নির্ভরযোগ্য কোনো হিন্দু শাস্ত্রে* পাওয়া যায় না এবং যেহেতু এই শব্দটি বিদেশীদের প্রদত্ত, এবং এর অর্থ সুখকর নয়, সেহেতু অনেক হিন্দু পণ্ডিত ব্যক্তিই এই ধর্মকে হিন্দু ধর্ম বলতে নারাজ। তাঁদের মতে এ ধর্মের নাম হাওয়া উচিৎ 'সনাতন ধর্ম'। হিন্দু ধর্মকে 'বর্ণাশ্রম ধর্ম'ও বলা হয়ে থাকে। দ্রষ্টব্য : Prittibhusan Chatterjee, *Studies in Comparative Religion* (Calcutta : Dasgupta Co. Private Ltd., 1971), p. 348. হিন্দু ধর্মকে মাঝে মাঝে 'ব্রাহ্মণ্য ধর্ম'ও বলা হয়। (দ্র: John H. Feton and others (eds), *Religion of Asia* (Newyork : St. Martins Press, 1983), P.55. তবে এ নামটি হিন্দু ধর্মের ক্ষেত্রে যথার্থ নয়

১৯. সুবোধ ঘোষ, *ভারতের আদিবাসী,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২২–২৬

২০. প্রাগুক্ত. ২২–২৬

২১. প্রাগুক্ত, ২২–২৬

২২. প্রাগুক্ত, ২২–২৬
২৩. ফরসাইথ, *দ্য হাইল্যান্ডস অব সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া,* উদ্ধৃত–সুবোধ ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭
২৪. দেবপ্রিয় বড়ুয়া, 'বাঙালিয়া দর্শন চিন্তায় বৌদ্ধ প্রভাব', ওয়াকিল আহমদ (সম্পা.) *বাঙালির দর্শন চিন্তা* (ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ), পৃ. ৩৭–৬৩
২৫. মুহম্মদ আব্দুল হাই ঢালী, *বাংলাদেশ দর্শন* (চট্টগ্রাম ; মিতা ট্রেডার্স, ১৩৯৪ বাং), পৃ. ৬
২৬. দেবপ্রিয় বড়ুয়া, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩৭–৬৩
২৭ *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩৭–৬৩
২৮. *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩৭–৬৩
২৯. Thomas Watts, *On Yung Chwang's Travels in India* (London : 1904), p. 184.
৩০. K.N. Dikshit, *Memories of Archaeological Survey of India, No-55,* Excavation of Paharpur, Rajshahi Delhi, 1983), p. 58.
৩১. *Encyclopaedia Britannica 1993 Book of the Year ;* উদ্ধৃত : ভবানী প্রসাদ সাহু *ধর্মের উৎস সন্ধানে,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১
৩২ সুবোধ ঘোষ, *ভাবতেব আদিবাসী।*
৩৩. *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১২২
৩৪. আব্দুস সাত্তার, *আরণ্য জনপদে* ৲
৩৫. মুহম্মদ আব্দুল জলিল, *উত্তববঙ্গের আদিবাসী লোকজীবন ও লোকসাহিত্য : ওরাওঁ* (ঢাকা : বিশ্ব সাহিত্যভুবন, ১৯৯৯), পৃ. ৬৪
৩৬. যোযাকিম খালকো, *ওরাওঁ আদিবাসী রীতিনীতির ক্যাথলিক রূপায়ন ,অরুণ*-খালকো (অনুঃ) (বংপুব : রূপায়ন, ১৯৮১), পৃ. ৩
৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩
৩৮. মুহম্মদ আব্দুল জলিল, *উত্তরবঙ্গের আদিবাসী লোকজীবন ও লোকসাহিত্য : ওরাওঁ,* প্রাগুক্ত, প. ৬৮–৬৯
৩৯. আব্দুল কাদির, সাঁওতাল ', হাসমত রশিদ (সম্পা.), *পাকিস্তানের* উপজাতি, ২য় সংস্করণ, (ঢাকা ; পাকিস্থান পাবলিকেশনস, ১৯৬৬), পৃ. ৯–১০
৪০. *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৬১–২৬২
৪১. সুগত চাকমা, *বাংলাদেশেব উপজাতি ও আদিবাসীদের সমাজ, সংস্কৃতি ও আচার ব্যবহার,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২
৪২ A. Playfair, *The Garos* (London : Willium Clowes & Sons Ltd., 1909), p. 80
৪৩. আব্দুস সাত্তার, *আরণ্য জনপদে*
৪৪. আব্দুস সাত্তার, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৬০
৪৫. পাকিস্তান সরকার, *পাকিস্তানের* উপজাতি (ঢকা : পাকিস্তান পাবলিকেশনস্ ১৯৬৬) সংকলিত। সুগত চাকমা, প্রাগুক্ত, সংকলিত।
৪৬. সুগত চাকমা, *বাংলাদেশের উপজাতি ও আদিবাসীদের সমাজ, সংস্কৃতি ও আচার ব্যবহার,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯
৪৭. সুগত চাকমা, *বাংলাদেশের উপজাতি ও আদিবাসীদের সমাজ, সংস্কৃতি ও আচার ব্যবহার,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩
৪৮. মুস্তাফা মজিদ, *পটুয়াখালীর রাক্ষাইন উপজাতি* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯২), পৃ. ৬৯
৪৯. সুগত চাকমা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২
৫০. সুগত চাকমা, *বাংলাদেশের উপজাতি*
৫১. আব্দুস সাত্তার, *আরণ্য জনপদে* ।

উল্লেখ করেছিলেন–তা ভ্রান্ত বলে দেখা যায়। এইচ. এইচ. রিজলী রাজবংশীদের সঙ্গে তিয়র ও বাগদী জাতিকে সমর্থক বা একই উৎসজাত জাতি হিসাবে উল্লেখ করেছেন,[৬] যা সঠিক নয়। কারণ তিয়র ও বাগদীরা মৎস্যজীবী সম্প্রদায় হলেও তাদের সাথে রাজবংশীদের দৈহিক গঠনগত পার্থক্য থেকে শুরু করে সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বিশ্বাসের যথেষ্ঠ পার্থক্য বর্তমানেও বিদ্যমান। ডাঃ বুখানন তাঁর গবেষণায় রাজবংশী কোচ, গারো, মেচ, কাচারিদের একই উৎসজাত জাতি হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন।[৭] রাজবংশীদের উৎপত্তি সম্বন্ধে অধিকাংশ নৃতাত্ত্বিক কোচ রক্তকে স্বীকার করে নিয়েছেন। তবে ইতিহাস বিচারে একথাও স্বীকার্য যে, আজকের রাজবংশী জাতিতে শুধু কোচ নয়, মেচ–রাভাদের রক্তও কিছুটা রয়েছে যারা সবাই মঙ্গোলীয় পর্যায়ভুক্ত। আর রাজবংশীদের সাথে তিয়র ও খেনদের রক্ত যৎসামান্য মিশতে পারে। তবে ডাঃ বুখাননের মন্তব্যের ব্যাপারে একটা কথা বলা প্রয়োজন যে, রাজবংশীদের ক্ষত্রিয়ত্ব দাবির আন্দোলনের আগ থেকেই কোচ, গারো, মেচ, কাচারি ইত্যাদি বিভিন্ন উপজাতির সমাজ ও সংস্কৃতিতে সুস্পষ্টভাবে পার্থক্য ছিল। সুতরাং সুদূর অতীতে রাজবংশীদের সাথে উল্লিখিত জনজাতির রক্তমিশ্রণ কিছুটা ঘটেছে স্বীকার করেও একথা বলা যায় যে, বর্তমানে কোচ, কাচারি, রাভা প্রভৃতি আলাদা আলাদা সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জাতি, কখনোই রাজবংশীদের সাথে এক করে দেখা যায় না।

বাংলাদেশের সকল উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর সমাজ ও সংস্কৃতি এখনো অনেকটাই রক্ষণশীল ও সনাতনপন্থী। হাজার হাজার বছর পার হয়ে আসলেও এসব আদিবাসী–উপজাতি (aboriginal tribes)গুলোর পেশা, সামাজিক কাঠামো, আচার–ব্যবহার, ধর্মীয় বিশ্বাস, ভাষা, সংস্কৃতির বিভিন্ন প্রপঞ্চ (phenomenon) শত শত বছর পূর্বের জীবন প্রণালীর সঙ্গে প্রায় ক্ষেত্রে মিল পাওয়া যায়, যদিও এসব প্রপঞ্চের বেশ কিছুতে ঈষৎ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। শত শত বছর ধরে রাজবংশীরা আর্য–অনার্য বিভিন্ন জাতির সাথে পাশাপাশি বসবাস, মেলামেশা, আদান–প্রদান সত্ত্বেও তাদের স্বীয় ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার–সংস্কার, সমাজ–সংস্কৃতি, জীবনরীতিতে শ্রদ্ধাশীল ও নিষ্ঠাবান। তাদের নিজস্ব জীবিকা মৎস্যচাষ ও কৃষিকাজ করে এখনো তারা পূর্ব–পুরুষের অবদান, বিশ্বাস–সংস্কার শ্রদ্ধার সাথে লালন–পালন করেন। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের রাজবংশীদের সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কিছুটা গ্রহণ বর্জন লক্ষ করা গেছে। তাদের সমাজ ও সংস্কৃতি বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে সংশ্লেষণ (assimilation) ঘটেছে। মেলামেশা, শিক্ষাদীক্ষা, আদান–প্রদান, একই ভাষায় কথা বলার ফলে চিন্তা–বিবেক–মনন সংস্কৃতির আদান–প্রদান অহরহ ঘটেছে। ফলে স্বাভাবিকভাবে সাধারণ মানুষের কাছে গভীরভাবে সমাজ ও সংস্কৃতি নিরীক্ষণ না–করলে বাঙালি ও অন্যান্যের সমাজ সংস্কৃতির সাথে রাজবংশীদের সমাজ ও সংস্কৃতির কতটুকু পার্থক্য তা স্পষ্ট বোঝা যায় না। তবে চাকমা, মারমা, মণিপুরীদের মতো রাজবংশীরাও খেটে খাওয়া জনগণের স্বভাব, সংস্কৃতি, পূর্ব–পুরুষপ্রাপ্ত আচার–রীতিনীতি আঁকড়ে আছেন। বৃহত্তর জাতির তুলনায় রাজবংশীদের বহিরাগমন ও মেলামেশা কম, শিক্ষা–দীক্ষাতেও পিছিয়ে, এখনো প্রাচীন পন্থায় উৎপাদন ব্যবস্থা বহাল রয়েছে ; শ্রমনিয়োগ, সম্পদ বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় তেমন পরিবর্তন ঘটে নি। গ্রহণ–বর্জন দ্বারা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন, আদান–প্রদান দ্বারা চলমানতা, উদ্ভাবন ক্ষমতার দ্বারা নতুন সৃষ্টি ইত্যাদি না–থাকলে সমাজ সংস্কৃতির বিবর্তন ও কাঙ্খিত পরিবর্তন সাধিত হয় না। এসব দিক বিবেচনায় রেখে

সূক্ষ্মভাবে তাদের সমাজ নিরীক্ষণ করে একথা বলা যায় যে, বৃহত্তর সমাজের পরিবর্তন-পরিবর্ধন, আদান-প্রদান, মেলামেশায় যে গতিশীলতা চলমান, সেই ধারা বা গতির চেয়ে রাজবংশীদের সামাজিক গতিশীলতা (social mobility) শ্লথ। সেকারণে বাঙালির সমাজ ও সংস্কৃতির থেকে রাজবংশী সম্প্রদায়ের সমাজ ও সংস্কৃতি স্বাতন্ত্র্য ও আলাদা।

উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের সাথে দেশের অন্যান্য এলাকায় রাজবংশীদের দুই শতাধিক কাল বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস, এবং অন্যান্য এলাকার মানুষের সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রপঞ্চগুলোর সংস্পর্শের কারণে সমাজ ও সংস্কৃতিতে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কিছু কিছু সামাজিক উৎসব ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ উত্তরবঙ্গ ছাড়া অন্যান্য এলাকায় বিলীন হয়ে গেছে, কিছু ক্ষয়িষ্ণু আকারে বহাল রয়েছে। যেসব ক্ষেত্রে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, সেগুলো হলো :

উত্তরবঙ্গের রাজবংশীরা অধিকাংশই চেহারাগত দিক দিয়ে আদি মঙ্গোলয়েড (Proto-Mongoloid)। তাদের রক্তে অস্ট্রিক (Austric) রক্ত মিশ্রণ ঘটেছে বেশ কম। সেকারণে উত্তরবঙ্গের নওগাঁ, ঠাকুরগাঁ, দিনাজপুর, নীলফামারী, লালমনিরহাট, রংপুর, পঞ্চগড়, গাইবান্ধা, জয়পুরহাট প্রভৃতি জেলাতে আদি অস্ট্রালয়েড রক্তধারার রাজবংশী দেশের অন্যান্য এলাকার চেয়ে বেশ কম চোখে পড়ে। পক্ষান্তরে, দেশের অন্যান্য এলাকার রাজবংশী বিশেষ করে যশোর, নড়াইল, মাগুরা ঝিনাইদহ, মানিকগঞ্জ ইত্যাদি এলাকার রাজবংশীদের মধ্যে আদি অস্ট্রালয়েড রক্তধারা বেশী পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। এর কারণ হিসেবে বলা যায় যে, উত্তরবঙ্গ ব্যতীত দেশের উপর্যুক্ত অঞ্চলগুলোর রাজবংশীদের রক্তে ঐসব এলাকার নিম্নকোটি মৎসজীবী মানুষের রক্ত সংমিশ্রণ ঘটেছে। তবে এসব এলাকায় মঙ্গোলয়েড রক্তধারার মানুষের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হলেও তাদের দৈহিক অবয়ব অবিকৃত আকারে পাওয়া যায় না।

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী পুরুষেরা বিশেষ করে বিবাহিত পুরুষেরা অনেকেই উপবীত (পৈতা/নগুন) ধারণ করে থাকেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশক ক্ষত্রিয়ত্ব আন্দোলনের ব্যাপকতার কারণে ইত্যাকার বেশ কিছু পরিবর্তন ও সামাজিক সংস্কার ঘটে যায়। কিন্তু বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে রাজবংশীদের ক্ষত্রিয়ত্ব আন্দোলনের তীব্র আঁচ কখনো লাগে নি, ফলে তারা উপবীত ধারণে তেমন একটা প্রভাবিত হয় নি।

দক্ষিণবঙ্গের রাজবংশী সমাজে ঘা-পাঁচড়া, ওলাওঠা ইত্যাদির প্রকোপ থেকে রেহাই পেতে সারা মাঘ মাস ব্যাপী শিশু-কিশোর-কিশোরীরা, সকাল-সন্ধ্যায় *হ্যাঁচড়া* দেবীকে পূজা করে, এবং ফুলপাতা নিবেদন করে ; হ্যাঁচড়া পূজার দেবীকে ঘিরে তারা সমস্বরে গান করে; কিন্তু উত্তরবঙ্গের কোনো কোনো এলাকায় এই একই উদ্দেশ্য চৈত্র মাসে সারামাস ব্যাপী পূজা করা হয়। এই পূজার স্থানীয় নাম *ছ্যাপড়া পূজা*।

সারা দেশের রাজবংশীদের সমাজে হুদুমা দেবীকে উদ্দেশ্য করে এখনো ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে হুদুমা পূজা করা হয়। রাজবংশী মহিলারা রাত্রি জাগরণের মাধ্যমে বৃষ্টির দেবীর উদ্দেশ্যে গান গায়, কোথাও কোথাও নৃত্য করে থাকেন। তবে উত্তরবঙ্গে ঐতিহ্যগতভাবে এখনো কলাগাছ পুতে তাকে ঘিরে বিধবা ও বয়স্ক মহিলারা পূজা করেন, নৃত্য করেন, গান করেন, এবং বাড়ি বাড়ি ঘুরে চাল-ডাল মাগন করেন। এবং সেই তোলাকৃত মাগন দ্বারা পরবর্তী নির্দিষ্ট

দিনে সবাই মিলে একত্রে আনন্দ সহকারে খাওয়া-দাওয়া করেন। উত্তরবঙ্গ ব্যতীত দেশের অন্যান্য এলাকায় রাজবংশীরা রাত্রি জাগরণের মাধ্যমে পালন করলেও অতীত ঐতিহ্যবাহী এ উৎসবের জমকালো আনন্দে ভাটা পড়েছে।

রাজবংশীদের সমাজে ঘর জিয়া বিহা (companionate marriage) একটি প্রাচীন সংস্কার। দেশে বসবাসকারী রাজবংশীরা অন্যান্য বর্ণ-হিন্দু মুসলমানের বৈবাহিক সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে তাদের প্রাচীন সংস্কার companionate marriage-কে সমাজ এখন সবিশেষ গুরুত্ব দেয় না। তবুও দেশের অন্যান্য অঞ্চলে এরকম বিয়ে আর না দেখা গেলেও উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজে বিরল হলেও বহাল রয়েছে বলে খবর মেলে।

উত্তরবঙ্গে রাজবংশী মহিলারা নিজেদের শস্য ক্ষেতে কৃষিকাজ করেন, এবং অন্যের ক্ষেতে শ্রমবিক্রি (wage labourer) করে অর্থ উপার্জন করে থাকেন। সমগ্র উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজে এটি একটি স্বাভাবিক চিত্র। উত্তরবঙ্গ ব্যতীত দেশের অন্যান্য এলাকায় বিশেষ করে দক্ষিণ বঙ্গের মহিলাদের কৃষিক্ষেতে কাজ করতে দেখা যায় না। সমাজব্যবস্থা তাদের ক্ষেতে-খামারে কাজ করতে দেয় না। তবে বয়স্ক মহিলাদের জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ ও গোবর ঘুটে কুড়াতে দেখা যায়।

রাজবংশীরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নিজেদের সমাজ-সংস্কৃতির আচার-রীতিনীতি, বিশ্বাস-সংস্কার ইত্যাদি বিসর্জন দিতে পারেন নি, কিন্তু হিন্দু হতে চেয়েছেন এবং অনেকাংশে হিন্দু হয়ে উঠেছেন। এই হিন্দু হয়ে উঠার ফলে তাদের মধ্যে বিতর্ক ও সংশয়ের জন্ম হয়েছে, যেমন রাজবংশীরা নিজেদের ক্ষত্রিয় হিন্দু বলে দাবি করেন, কিন্তু বর্ণ-হিন্দু সমাজ তাদের কখনো হিন্দু বলে গ্রহণ করেন নি। বর্ণ-হিন্দুরা রাজবংশীদের আদিবাসী-তফসিলি জাতি (aboriginal or scheduled caste) হিসাবে দেখেছেন। যে-কারণে বর্ণ হিন্দুরা তাদের সাথে কখনো সামাজিকভাবে যেমন-বিয়ের ক্ষেত্রে, পূজানুষ্ঠানে, জন্ম-মৃত্যুর আচার পালনে এবং নানাবিধ আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মে রাজবংশীদের সাথে একেবারে মিশে যায় নি, বরং তাদের আলাদা চোখে দেখেছেন। এমনকি রাজবংশী বাড়িতে বর্ণ-হিন্দুরা অন্ন গ্রহণ দূরে থাক, পানি গ্রহণ পর্যন্ত করেন নি। আর বর্ণ-হিন্দু সমাজের সাথে তাদের সমাজের ছেলেমেয়ের বিয়ে তো এখনো পর্যন্ত সম্ভব নয়।

রাজবংশীরা তিনশ বছরের বেশী সময় ধরে হিন্দু হয়ে ওঠার চেষ্টা করেছে এবং সেই চেষ্টা উনিশ শতকের শেষ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশক পর্যন্ত একটা বৃহত্তর আন্দোলনে রূপ নিয়েছিল। এই আন্দোলন ১৯২১ সালের আদমশুমারি প্রতিবেদন তৈরিতে একটি সমস্যা হয়েও দাঁড়ায়। এই চেষ্টা যে সর্বাংশে সফল হয় নি তার প্রমাণ পাওয়া যায় দেবেশ রায়ের গ্রন্থ *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত*-এ। তিনি লিখেছেন—

> রাজবংশী পরিচয়ের সুবাধে যে রাজ্য ও প্রায়-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, রাজবংশী পরিচয় অবলুপ্তির মধ্যে দিয়ে সেগুলি নিজেদের হিন্দু সমাজের ভেতর ঢুকিয়ে নিয়েছে। কিন্তু ঠিক বিপরীত পদ্ধতিতে বর্ণ হিন্দু সমাজ এই রাজবংশীদের দূরে ঠেলে রেখেছে। ফলে তারা গত প্রায় পাঁচশ বছর এক অদ্ভুত বিপরীত জীবন-যাপন করে আসছে তাদের সমস্ত অবয়বে কোচ জন্মচিহ্ন, তাদের পোশাকে-আসাকে কোচ-উপজাতির অভ্যাস, তাদের অলঙ্করণে কোচ-সংস্কার, তাদের তৈজসপত্রে কোচ ঐতিহ্য, তাদের পরিবারের লোকজনের ভেতরকার সম্পর্ক কোচ-ঐতিহ্য সম্মত ; তাদের ঘরবাড়ি কোচ-রীতি

অনুযায়ী তৈরি হয়, অথচ তারা কিছুতেই নিজেদের কোচ বলে স্বীকার করে না, কোচ পরিচয় তাদের পক্ষে প্রায় নিকৃষ্ট অপমান। নিজেদের উপজাতিত্বের অতীতকে বর্তমানের মধ্যে আবিষ্কার করার মধ্যে অন্তত রাজবংশীদের ক্ষেত্রে, একটা এমন গোঁজামিল আছে, যা মিমাংসা করা অসম্ভব। রাজবংশীরা রাজবংশীও থাকবে, আবার কোচ-বোরো উপজাতিও হবে-এ অবস্থা কোনোভাবে সম্ভব নয়।

কেউ যদি বলেন, এখন আর রাজবংশীদের উপজাতিত্ব নির্ণয় করা যাবে না, তাই তাদের পক্ষে উপজাতিত্বে প্রত্যাবর্তন সম্ভব হবে না-তাহলে সে কথা ধোপে টিকবে না। কারণ ধোপটা দিচ্ছেন রাজবংশীরাই। তারা নিজেদের যে-উপজাতিত্ব স্বীকর করবে, সেই উপজাতিত্বই তাদের পরিচয। তাতে হজসন, ডালটন, বেভারলি, হান্টার, রাউনি, বোয়লো, ম্যাগোয়ার, ও ডোনেল, রিজলী, গ্রীয়ারসন, গেইট, ওমেলি, টমসন—এসব সাহেবদের লিস্ট করা জাতি-উপজাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে মিল হল কি হল না সেটা অবান্তর। কারণ, এইসব সাহেব যে লিস্ট বানিয়ে দিয়েছেন সেটা কোনো নতুন স্মৃতিশাস্ত্র নয় যে তাতে গাঁই গোত্র মিলিয়ে তবে একটি উপজাতিকে উপজাতি হতে হবে।

তবে আশার কথা এই যে, রাজবংশী সমাজ আধুনিক শিক্ষা দ্রুত গ্রহণ করছে। তাদের সমাজে শিক্ষার হার তুলনামূলকভাবে পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি। ফলে শিক্ষিত সমাজে উঠা-বসা, মেলামেশা, আদান-প্রদান, পুরাতন প্রথা-বিশ্বাস না মেনে সাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা আধুনিক প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে লক্ষ করা যাচ্ছে। ফলে পুরাতন প্রথা, সংস্কার ভেঙ্গে এবং কখনো কখনো তা পরিবর্তিত হয়ে গড়ে উঠেছে নতুন নিয়ম।

রাজবংশীরা সমতল ভূমিতে বসবাস করে। তাই সমতল ভূমির বাঙালি হিন্দু-মুসলমানদের সঙ্গে কথোপকথন, আদান-প্রদান, মেলা-মেশা, কাজ-কর্ম, ক্রয়-বিক্রয় ঘটে থাকে। ফলে চিন্তা-ভাবনা, সমাজ-রাষ্ট্র সম্পর্কিত ভাবনা ইত্যাদি বিষয়ে পরস্পরের চিন্তা ভাগাভাগি হয়। রাজবংশীরা অধিকাংশই ভূমিহীন কৃষক ও অল্প জমির মালিক। তাই তারা বিভিন্ন সময়ে স্থানীয় অন্যান্যের ক্ষেতে খামারে কাজ করেন, ও অর্থ উপার্জন করেন। তারা অপেক্ষাকৃত গরিব ও সহজ-সরল প্রকৃতির। ফলে সহজেই তারা অন্যের কথা বিশ্বাস করেন, এবং কিছু ক্ষেত্রে প্রতারিতও হন।

রাজবংশী সমাজ বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন। তারা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল জাতিগোষ্ঠী হওয়ায় দারিদ্র তাদের নিত্য দিনের সঙ্গী। তিনবেলা আহার জুটানো অনেকের ক্ষেত্রে কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তারপর এদেশে তারা সংখ্যালঘু হওয়ায় কখনো কখনো প্রভূত্বকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর নানামূখী চাপের মুখে দিনযাপন করতে হয়। এ চাপ কখনো ধর্মীয় কারণে, কখনো-বা রাজনৈতিক কারণে। রাজবংশী সমাজে কেউ সমস্যায় পড়লে তাকে পার্শ্ববর্তী প্রভাবশালী বিরুদ্ধমহল নানাভাবে হয়রানি করে, কখনো কখনো টাকা-পয়সা দিয়ে সমস্যার সমাধান করতে হয় বলে জানিয়েছেন তারা। এসব কারণে স্বাধীনতাত্তোর কাল থেকে অদ্যাবধি কেউ কেউ পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে পাড়ি দিচ্ছেন।

রাজবংশীরা উন্নত সভ্যতার, যেমন হিন্দু-মুসলমানদের সংস্পর্শে এসে সাংস্কৃতিক আত্মীকরণের (acculturation) পথে যাত্রা শুরু করেন। বোড়ো ভাষী জাতিগোষ্ঠীর অনেকগুলোই (গারো, হাজং, ত্রিপুরা, ডিমাসা ব্যতীত) উন্নত কৃষি কৌশল, যথা-লাঙলের ব্যবহার, জমিতে নিড়ানীর ব্যবহার আয়ত্ব করেন। ধীরে ধীরে নিজেদের উপজাতীয় ধর্ম

বিসর্জন না–দিয়ে এদের দেব–দেবীর মধ্যে হিন্দুদের দেব–দেবীকে স্থান দেন। কোনো কোনো উপজাতীয় রাজা বিভিন্ন ধর্মস্থান যেমন মিথিলা ও শ্রীহট্ট থেকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ করে আনেন, এবং ফলস্বরূপ যত্রতত্র কিছু ব্রাহ্মণ উপনিবেশ গড়ে ওঠে। উপজাতীয় নৃপতিবর্গ হিন্দু সমাজ থেকে প্রশাসক ও রাজ্য পরিচালনার কৌশল আমদানী করেন। রাজ্য পরিচালনার হিন্দুত্বকরণের মধ্যেই উপজাতীয় সংস্কৃতি কিছুটা বিলীন হয়ে গেছে।

একটি বিষয় আজ ঐতিহাসিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত যে, কোচ রাজ্যের রাজসভার বহু হিন্দু সাধক ও পণ্ডিত বিশেষ আসন অলঙ্কৃত করতেন। এর মধ্যে ছিলেন শঙ্করদেব যিনি কামরূপী ভাষায় রামায়ণ ও যাবতীয় চিরায়ত সাহিত্য অনুবাদ করেছিলেন। বুখানন ও অন্যান্য নৃতাত্ত্বিকরা লক্ষ করেছিলেন যে, উত্তরবঙ্গ ও আসামের রাজবংশীরা শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম প্রভাবে প্রভাবিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে ঠাকুর বাড়ি নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিষ্কর ভূমিদান নতুন করে শুরু হয়, এবং এই জাতীয় অধিকাংশ ভূমিদানের তারিখ ছিল ১৭৭০ থেকে ১৮১৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে। এসব ঐতিহাসিক প্রমাণ থেকে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে, কতিপয় বিশিষ্ট জনগোষ্ঠী ছাড়া সর্বসাধারণের মধ্যে 'রাজবংশী' পরিচয় গ্রহণ হয়ত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে চালু হয়েছিল।[৮]

চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, মণিপুরীদের পাশাপাশি রাজবংশীরাও শিক্ষিত হয়ে উঠেছেন, গ্রহণ করেছেন বর্তমান সভ্যতার যান্ত্রিক কলাকৌশল। সমাজ প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। রাজবংশী সম্প্রদায়ের সমাজ ধীর গতিতে হলেও পরিবর্তন হচ্ছে। স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশে পরিবর্তনের এই ধারা স্থবির থাকলেও স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে পরিবর্তনের গতি ধীরে ধীরে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। উপজাতীয় সমাজের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য থাকে, যেসব বৈশিষ্ট্যকে বিবেচনা করে নৃতাত্ত্বিকগণ ট্রাইব বা উপজাতি বলে আখ্যায়িত করেন। একটি কথা বলা আবশ্যক যে, পৃথিবীর সমস্ত উন্নত জাতিগুলোই উপজাতীয় বৈশিষ্ট্য–সংস্কৃতি থেকে নিজেদের উত্তরণ ঘটিয়ে আধুনিক সভ্যতার স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করেছে। সেই ধারাবাহিকতা বাঙালি জাতির মধ্যেও বিরাজিত। আদিবাসী–উপজাতিদের উপজাতীয় বৈশিষ্ট্যের কিছু আচার–আচরণ, রীতি, ধর্মীয় সংস্কার বাঙালি সমাজে আজও বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং কতটুকু উপজাতীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকলে, এবং কী কী উপজাতীয় বৈশিষ্ট্যের বিলুপ্তি ঘটলে একটি জনগোষ্ঠীকে উপজাতীয়ত্বের ধাপ থেকে মুক্তি দিয়ে জাতি হিসাবে চিহ্নিত করা যায় সেটাই অগ্রসর চিন্তাবিদ্‌দের নিকট প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আশা করা যায়, এই প্রশ্নকে সামনে রেখে আধুনিক নৃতাত্ত্বিকগণ জাতি–উপজাতির নতুন সংজ্ঞা উদ্ভাবন করে একটা সুন্দর সমাধানের পথ দেখাবেন। এবং আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে এব্যাপারে রাষ্ট্র তার যথা–দায়িত্ব পালনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন।

তথ্যসূত্র

১ মুহম্মদ আব্দুল জলিল, *লোকসংস্কৃতির নানাপ্রসঙ্গ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫), পৃ. ১

২ 'হিন্দু' শব্দটি যেহেতু বেদ, উপনিষদ, গীতা ও নির্ভরযোগ্য কোনো হিন্দু শাস্ত্রে পাওয়া যায় না, এবং যেহেতু এই শব্দটি বিদেশীদের প্রদত্ত, এবং এর অর্থ সুখকর নয়, সেহেতু অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিই এই ধর্মকে হিন্দুধর্ম বলতে নারাজ। তাঁদের মতে, এই ধর্মের নাম হওয়া উচিত 'সনাতন ধর্ম'। হিন্দু ধর্মকে 'বর্ণাশ্রম ধর্ম'ও বলা হয়ে থাকে।

দ্র: (Prithibhusan Chatterjee, *Studies in Comperative Religion* (Calcutta : Dasgupta Co. Private Ltd., 1971), p. 348.) হিন্দু ধর্মকে কখনো কখনো 'ব্রাহ্মণ্য ধর্ম'ও বলা হয়। দ্র: (John H. Feton and et. al. (eds.) *Religion of Asia* (Newyork : st Martins Press, 1983), p. 55. তবে এ নামটি হিন্দু ধর্মের ক্ষেত্রে যথার্থ নয়।

৩. ড. অতুল সুর, *হিন্দু সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য* (কলকাতা : সাহিত্যলোক, ১৯৯৮). পৃ. ১২–১৩

৪. ড. অতুল সুব, *ভারতের নৃতাত্ত্বিক পবিচয়,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭

৫. সাঈদ–উর রহমান, 'আদিবাসীরা ও আমরা বাঙালিরা', হাফিজ বশিদ খান (সম্পা.) *বাংলাদেশের উপজাতি ও আদিবাসী : অংশীদারিত্বের নতুন দিগন্ত* (চট্টগ্রাম : বাংলাদশের উপজাতি ও আদিবাসী ঐতিহ্য পর্ষদ, ১৯৯৩), পৃ. ১৪

৬. H H. Risley, *Tribes and Castes of Bengal,* Vol-II, 1891, p.183.

৭. Dr. Buchanan Hamilton, op. cit.

৮. শিনকিচি তানিগুচি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫

পরিশিষ্ট-১

শুমারির সাধারণ নিয়মাবলী

ইহা কি উপজাতীয় খানা? রাংগামাটি, বান্দরবন, খাগড়াছড়ি ও পার্বত্য জেলাসমূহে স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ অনুযায়ী স্থায়ীভাবে বসবাসরত চাকমা, মারমা, বোম, খুমী, উচাই, চাক, তনচৈংগা, ত্রিপুরা, লুসাই, পাংখু ও খিয়াং গোত্রভুক্ত লোকজন উপজাতীয় হিসেবে পরিচিত। তাছাড়া ময়মনসিংহ, জামালপুর, দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, সিলেট ইত্যাদি অঞ্চলের উপরোক্ত গোত্রগুলো ছাড়া গারো, হাজং, ডালু, রাজবংশী, হাদি, সাঁওতাল, কোচ ইত্যাদি গোত্রভুক্ত লোকজনকেও উপজাতীয় হিসেবে গণ্য করতে হবে। শহর এলাকাতেও উপজাতীয় লোকদেরকে দেখা যায়। অধিকাংশ সময় চেহারার আকৃতি এবং ভাষার উচ্চারণ শুনে খানাটি উপজাতীয় কিনা বুঝা যায়। এ ক্ষেত্রে এ প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন নেই। অন্যথায় প্রশ্ন করুন, ইহা কি উপজাতীয় খানা। উত্তর "হ্যাঁ" হলে ১ ডিম্বাকৃতি ঘরে মার্কা দিন এবং ফরম আশু-১ক' তে উপজাতীয় খানাটির গোত্র লিপিবদ্ধ করুন। উত্তর 'না' হল ২ ডিম্বাকৃতি ঘরে মার্কা দিন।

সূত্র : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, আদমশুমারি ১৯৯১, (প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল), (ঢাকা : বিবিএস, ১৯৯৮), পৃ. ৭৬

পরিশিষ্ট ২ (ক)

রাজবংশী ভাষার নমুনা

[No.37.]
INDO-ARYAN FAMILY (EASTERN GROUP)
BENGALI OR BANGA-BHASHA
RAJBANGSI DIALECT (RANGPUR DISTRIOT)

একজন মান্‌ষের দুইক্‌না ব্যাটা আছিন্‌। তার ছোট কোনা উয়ার বাপক্‌ কইনে বা মোর পাইসা কড়ির ভাগ মোক্‌ দেও। ঐ কতাতে তাঁয় উমার ঘরক সউগ্‌ বাঁটিয়া দিনে। অনপ্‌ দিন যায়া ছোট চেঙ্গড়া কোনা সউগ্‌ ব্যাচে কিনি একেটে করি ভিন্ন দেশত্‌ গেন্‌। সেটে নানান্‌ কুকাজত্‌ সউগ পাইসা গুনা উড়ি ফেনাইনে। অঁয় যখন ঐদানে সউগ উড়ি দিনে তখন ঐ দ্যাশত খিব্‌ দুর্ভিক্‌ নাগিন্‌। অঁয় তখন বড়ো দুখৎ পইন্‌। দুখৎ পড়িয়া ঐঠাকার একজন সহরী মান্‌ষের গোড়ৎ গেন। ঐ মানুষ কোনা তখন উড়াক্‌ খাওনা বাড়ীতে শুয়র চরবার পটে দিনে। ধানের আগরা যাক্‌ শুয়রে খায় উয়াঁয় তাক খায়া প্যাট্‌ ভরবার চাইনে কিন্তুক তাকো কাঁয় উয়াক্‌ দিনেনা। পাছত চ্যাতন পায়া অঁয় কইনে মোর বাপের মাইনা খাওয়া কত চাকরে খুম মতে

খায়া মানুষেক্ তামাক্ কইম্ বা মুঁই পরমেশ্বরের আগত ফির তোমার গোড়োৎ কতই পাপ করচোঁ, মুঁই আর তোমার ব্যাটা হবার মত নোঁয়াও। মোক তোমার মাইনা খোর চাকরের নাকান আকেন। পাছত অঁয় উঠিয়া উয়ার বাপের গোরত গ্যান্। অনেক দূরত্ থাকতেই আর উয়ার বাপ উয়াক দেখিয়া মোহতে দৌড়ি যায়া গানা ধরিয়া চুমা খাইনে তখন উয়ার ব্যাটা উয়াক কইনে বা মুঁই পরমেশ্বরের গোরত তোমার আগত কতই পাপ করচেঁ মুঁই কাপড়া আনিয়া উয়াক পরান। উয়ার হাতত একনা আঙ্গুট আর পাঁওত জোতা দেও। হামরা খায়্যা দায়্যা খুম হতে অঙ্ তামসা করি। মোর এই ছাওয়া কোনা মরছিন ফির বাঁচি উঠ্চে, হারে গেছিন তাক পাওয়া গেইছে। এই কথা কয়া উমরা খুম মতে অঙ্গ তামসা কইরবার ধর্নে॥

বড় ছাওয়া কোনা খেতত আছিন। তায় ফিরিয়া বাড়ীর গোরত আস্নে ঘাটাৎ থাকতে আর বাড়ীৎ নাচন আর গান্ শুনিবার পাইনে। তখন অঁয় উয়ার একজন চাকরক্ ডাকে পুচ্বার ধর্নে ইগ্না কি? তাঁয় উরাক্ কইনে তোমার ভাই আইন্চে তোমার বাপ্ খুমমতে খাবার বানাইচে। তোমার ভাইওক ভান মতে পাইচে ক্যান্নে। এই কতাতে অঁয় বড় গোসা হইন। তাঞি ভিতরত আর না যায়। পাছত উয়ার বাপ বাইরত আসিয়া উয়াক বজবার ধইরনে। অঁয় উয়ার বাপক জব দিনে মুঁই এতদিন হইন তোমার কত সেবা কন্নু তোমার কতা কোন দিন ফেনাই নাই কিন্তুক কৈ তোমরা একটা ছাগনের পাঁটাও দেন নাই যে তাকে্ নিয়া হামার সাতির গরক ধরিয়া অং তামসা করমো। যে ব্যাটা তোমার সউগ্ পাইসা কড়ি নটির বাড়ীত দিনে তাঁয় আস্নে তারে ক্যান্নে কতয় খাবার বানাইনেন। তার বাপে তাক কইনে তুঁই সদায় মোর সাতে আচিস্ মোর যাক হইবে সউগে তোর। অঙ্ তামসা কইরবারেই নাগে। তোর ভাই কোনা মরচিন, বাঁইচচে ; হারাইচিন তাক পাওয়া গেইচে॥

[No. 40]
INDO-ARYAN FAMILY (EASTERN GROUP)
BENGALI OR BANGA-BHASHA
RAJBANGSI DIALECT (JALPAIGURI DISTRICT)
(Babu Muralidhar Rai Chaudhuri, 1898

মোর ঐলা কাথা ফম্ পরেছে গে, ওগে আবো। ছয় মাস ভরিয়া নদারি মরিয়া।

মাইয়াটা মরিয়া মই হনু পাগেলা, দিনে দিনে কান্দেছোঁ মুই দহলাত্ বসিয়া, গে আবো, ঘরবাড়ির ছাড়িয়া॥ কাঁয় আর খিলাবে মোক্ আন্ধিয়া বাড়িয়া কাঁয় আর ডাকাবে মোর বগলত্ আসিয়া, কি কৈরকৈর করিয়া॥ কাঁয় দিবে মোক্ ওগে আবো বিছিনা পারিয়া, কাঁয় আর হাকাবে পাখা বগলত্ বসিয়া কি কেরেত্কুরুত্ করিয়া। জারের দিনে আছ মই একলায় থাকিয়া, কাঁয় আর থাকিবে মোক্ বগলত্ ধরিয়া, শেজা গরম করিয়া॥ গিরস্তি ছাড়িয়া আবো মুই হইছু বাউধিয়া, যেত্তি সেত্তি বেরাছো মুই ঢুলিয়া পড়িয়া, গে আবো নদারি মরিয়া। মাইয়ার বাদে মোর দেহাটা যাছে তো জ্বলিয়া, পারিস্ যদি একটা মোক্ তুই আঁড়ি দে আনিয়া।

গে আবো দয়া করিয়া॥

[No 43]
INDO-ARYAN FAMILY (EASTERN GROUP)
BENGALI OR BANGA-BHASHA
RAJBANGSI DIASLECT (COOCH BEHAR STATE)

এক জনা মান্‌সির্‌ দুই কোনা বেটা আছিল্‌। তার মদ্দে ছোট জন উয়ার বাপোক্‌ কইল্‌, বা, সম্পত্তির যে হিস্যা মুঁই পাইম্‌ তাক্‌ মোক্‌ দেন। তাতে তাঁয় তার মালমাত্তা দোনো ব্যাটাক্‌ বাটিয়া চিরিয়া দিল্‌। টেইল্‌ দিন নাই যাইতে ছোট ব্যাটা কুল্লো মালমাত্তা গোটেয়া নিয়া দুরান্তর এক দেশোত্‌ গেইল। সেটে নুচ্চামি গুণ্ডামি করিয়া কুল্লে টাকা কড়ী উরিয়া দিল্‌। পাচোৎ যেলা কুল্লে খরচ করিয়া ফেলা হল। সেলায় অতি ভারি মঙ্গা নাগিল্‌। ঐ আকালোত্‌ উয়ার বড় নান্‌ছানা হবার ধরিল্‌। সেলা ওঁয়ায়, এক সহোরোত্‌ যায়া এক জন সউরিয়া মান্‌সির্‌ সন্নাগৎ নিল্‌। তাঁয় উয়াক্‌ শূয়োর চারেবার্‌ বাদে নিজা ময়দানোত্‌ দিয়া পেঠাইল। পাচোৎ শূয়রে যেগ্‌লা জিনিষ খায়্‌ তাকে খাবার্‌ চাইল, তা তাকো কাঁও দিল্‌ না। পাচোৎ উয়ার হুঁস্‌ হইল্‌, বোলে মোর্‌ না বাপ আছে, সেটে কত চাকর দরমাও পায়, পেট্‌ ভরেয়া ফ্যালে ছ্যাড়ে খাবারও পায়, আর মুঁই এঠে ভোকে মরোঁ। মুঁই বাপের ওটে যাইম, তাক্‌ কইম্‌ বা ! মুঁই তোমার কাছোত্‌ ভারি দোষ গুনা কইর চোঁ ; মুঁই তোমার বেটার দাখিল নোয়াও। মোক্‌ তোমার একজন দর্‌মা খোর চাকরের নাকাল রাখো। পাচোৎ ওঁয়ায়্‌ উঠিয়া উয়ার্‌ বাপের কচোৎ গেইল্‌। সেলা উয়ার্‌ বাপ্‌ উয়াক্‌ ঢেইল্‌ দূর হতে দেখিয়া আকা বাকা করিয়া দৌড়িয়া যায়া গালা সাপ্‌টেয়া ধরিয়া চুমা খাইল্‌। ছাওয়া বাপোক্‌ কইল্‌ মুঁই ভারি দোষ ঘাইট কইর্‌চোঁ, মুঁই আর তোমার ছাওয়ার জুগি্‌ নোয়াও। সেলা উয়ার বাপ নিজা চাকরগুলাক্‌ কইল্‌ সিগ্‌গির করিয়া খুব্‌ ভাল্‌ কাপড়্‌ আনি ইয়াক্‌ পেঁদাও, হাতোত আঁউটী আর পাঁওত জোতা পেঁদায়া দেও। আর্‌ আম্‌রা খাওয়া দাওয়া করিয়া হাঁসি খুসি করি। কেনেনা আমার এই ছাওয়া মরিয়া বাঁইচ্চে ; নিউদ্দীশ্‌ হচিল্‌, পাওয়া গেইল্‌। পাচোৎ ওম্‌রা হাঁসি খেলি করিবার ধরিল্‌॥

আর তার বড় বেটা ক্ষেতোত্‌ আচিল্‌, তাঁয়্‌ বাড়ীর কাচোৎ আসিয়া শুনিল্‌ নাচোন্‌ বাইজ বাজনা হবার ধৈরচে। সেলা তাঁয় একজন চাকরোক্‌ কাছোত্‌ ডাকেয়া পুচিল্‌, এগুলা কি ? তাঁয় তাক্‌ কইল্‌, তোমার বাপ্‌ খুব খাওয়া দাওয়ার্‌ উম্‌ ধুম্‌ কইর্‌চে। ওঁয়ার্‌ ঐ কাতা শুনিয়া আক্‌ খাইল্‌, আর বাড়ী সোঁদেবার চাইল্‌ না। পাচোৎ উয়ার্‌ বাপ্‌ বাড়ীর বাহির হয়া উয়াক্‌ বুজামাতা করিবার ধরিল্‌। তাতো ওঁয়ায়্‌ সম্‌জা সম্‌জা না মানিয়া উয়ার বাপোক কইল্‌ দেকো দেকি মুঁই এতো বচর হাতে তোমার খায়্‌ খেজ্‌মৎ কন্নু, তোমার কোন কাতা কোন বেলাও ফেলাওঁ নাই, তাতো তোমরা কোন বেলা মোক্‌ একনা ছাগলের বাচ্চাও দেন্‌ নাই, যে মুঁই মোর সখির ঘর সুদ্দা রঙ্গ্‌ তাম্‌সা করি। আর্‌ তোমার এই বেটা যাঁয় নটীবাজী করিয়া গোটায়্‌ গিরস্তি কানা করি দিল্‌ তাঁয় যেলা আসিল সেলা তোমরা তার বাদে মেলা খাওয়ার উম্‌ ধুম্‌ লাগাইছেন্‌। গেল তাঁয় তাক্‌ কইল বাবা তুই সদাই আমার কাচ্যেৎ আচিস্‌, আর আমার যে গুলা যা আছে তা কুল্লে তোর্‌ ; তোর্‌ এই ভাই মরিয়া গেছিল্‌, বাঁচিছে ; হারায়া গেচিল্‌, পাওয়া গেইচে। সেই বারে হাঁসি খুসী করা খায়॥

Source : C.A. Grierson, *Linguistic Survey of India, Vol. V, Part I,* (Delhi : Motilal Banargidas, 1903), pp 174,183 & 188.

পরিশিষ্ট-২ (খ)

ভাষার নমুনা

এই আলোচনার সঙ্গে যে সব নমুনা দেওয়া হলো তা রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষের কাছ থেকে সংগৃহীত।

কাঁকড়ী সংগী

একটি পরিবার। মা ও ছেলে থাকে। একদিন ছেলেটি মাকে বলল–আমি একটু বিদেশে যাব। মা বলল–খুব ভাল কথা। ছেলে বিদেশে যাচ্ছে। মার খুব আনন্দ। মা ছেলেকে ডেকে বলল— আমি আশীর্বাদ করি। তোমার মঙ্গল হোক। কল্যাণ হোক। কিন্তু একটা কথা বলি বাছা। বিদেশে একা একা যেতে নেই। তাই এই কাঁকড়াটি ধরে এনেছি। একে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও।

মায়ের কথা শুনে ছেলেটির খুব আশ্চর্য লাগল। সে মাকে জিজ্ঞাসা করল—এই কাঁকড়াটিকে সঙ্গে নিয়ে কি হবে? তাছাড়া এঁকে আমি রাখিই–বা কোথায়?

মা বলল—এক কাজ কর বাছা। তোমার বোচকার মধ্যে একটা কর্পূরের কৌটা আছে। তাতে করেই তুমি এই কাঁকড়া সংগীকে নিয়ে যাও।

ছেলেটি মায়ের কথামত কাজ করল। পরদিন সূর্য ওঠার সাথে সাথে মাকে প্রণাম করে বিদেশে রওনা হল। হাঁটতে হাঁটতে সে বহুদূর গেল। দুপুরে সূর্যের তাপ বাড়তে লাগল। রোদে পথ হাঁটতে হাঁটতে ছেলেটি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ল।

পথের ধারে ছিল সারি সারি গাছ। তারই মধ্যে সে একটা বড় গাছের ছায়ায় বসে পড়ল। বিশ্রাম নিতে লাগল। গাছের ছায়ায় ঠাণ্ডা বাতাস আসতে লাগল। তার শরীর শীতল হতে লাগল। আস্তে আস্তে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

এ দিকে এক বিপদ ঘটল। ছেলেটি যখন গভীর ঘুমে অচেতন, তখন কোথা থেকে একটা প্রকাণ্ড সাপ বেরিয়ে এল। ফণা বিস্তার করে সাপটি ছেলেটির দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। বোঁচকার কাছে আসতে সাপটি কর্পূরের গন্ধ পেল। সাপ কর্পূরের গন্ধ খুবই পছন্দ করে। সে ঐ গন্ধে আকৃষ্ট হল। তারপর বোঁচকার ভিতর থেকে কর্পূরের কৌটো সাঁপটি বের করে ফেলল। তারপর কৌটোটা মাটিতে ঠুকতে থাকল। তার ইচ্ছা কৌটো খুলে কর্পূর খাবে। মাটিতে ঠুকতে ঠুকতে এক সময় কৌটোটা খুলে গেছে। আর তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটা কাঁকড়া। ছেলেটির মায়ের দেওয়া সেই কাঁকড়া। কাঁকড়াটি বেরিয়েই তার দুটো বড় মোটা দাঁড়া দিয়ে সাপের গলা চেপে ধরল। আর যায় কোথায়? সাপ আর নড়াচড়া করতে পারল না। আস্তে আস্তে বেহুঁশ হয়ে বেচারা সাপ মরেই গেল।

এতসব কাণ্ড ঘটে গেল, ছেলেটি কিছুই জানতে পারল না। সে তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল। কিছুক্ষণ পর তার ঘুম ভেঙে গেল। তখন বিকেল গড়িয়ে গেছে। তাই আবার রওনা হবার জন্যে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। বোঁচকাটা তুলতে গিয়ে দেখতে পেল, কর্পূরের কৌটোটা খোলা। তার পাশে মরা সাপ আর কাঁকড়া।

তখন ব্যাপারটা সে বুঝতে পারল। মনে মনে কাঁকড়াকে সে ধন্যবাদ জানাল। আর মনে মনে ভাবল—মা যদি এই কাঁকড়াটি না দিত, তাহলে আজ আমি এখানেই শেষ হয়ে যেতাম।

ভাষার নমুনা-১
কাঁকড়া বন্ধু

একখান্ বাড়ি। সেই বাড়িৎ মা ও ব্যাটা থাকে। একদিন ব্যাটা উয়ার মাকে কইল্—মুই খানেক বিদেশৎ যাইম্।

মা কইল্—খুব ভাল্ কতা।

ছাওয়াটা বিদেশৎ যাইবে। মা-টার খুব আনন্দ।

মা ব্যাটাকে ডাকিয়া কইল্—মুই আশীর্বাদ করং—তোমার ভালো হউক। মঙ্গল হউক। মুই একটা কতা কং ব্যাটা। বিদেশৎ একলা যাইতে নাই। তাই এই কাঁকড়াটা ধরি আইনলং। ইয়াক তুই সাথৎ ধরি যা।

মার কতা শুনিয়া ছাওয়াটা খুব অবাক হইল্। উয়ায় মাকে পুছ করিল্—এই কাঁকড়াটাক্ সাথৎ ধরি নিয়া য্যায়া কী হবে? তাছাড়া ইয়াক্ মুই কোন্ঠে রাখিম্?

মা কইল্—একটা কাজ কর ব্যাটা। তোর টোপলার ভিতরৎ একখান্ কপ্পুরের ট্যামা রাখি দিছং। ট্যামার ভিতরৎ এই কাঁকড়া বন্ধুক্ নিয়া যা।

ছাওয়াটা মার কতা রাখিল্। পরের দিন বেলা ওঠার সাথে সাথে মাকে ভক্তি করিয়া বিদেশের বাদে বিরাইলেক। হাঁটিতে হাঁটিতে উয়ায় অনেক দূর গেইল। বেলা বারোটার সময়ে রোদ খুব লাগিল্। রোদৎ হাঁটিতে হাঁটিতে ছাওয়াটা বেজায় শ্যাতে গেইল্।

রাস্তার ধারৎ মেলা গছ্ আছিল্। উয়ারই ভিতরৎ ছাওয়াটা একখান্ বিশাল গছের ছায়াৎ বসিল্। উয়ার শরীল্ ঠাণ্ডা হওয়ার লাগিল্। ধীরে ধীরে ছাওয়াটা থাকিয়া পড়িল্।

এই দিকৎ একটা ঘটনা ঘটিল্। ছাওয়াটা স্যালা খুব নিন্দৎ বোধ পায় না স্যালা কোটে থাকি একটা সাপ ছাড় গেছে কাছৎ আসিয়া সাপটা কপ্পুরের বাস্না পাইল্। সাপ কপ্পুরের বাসনা ভীষণ ভাল্বাসে। সাপটা ঐ বাসনায় মোহিত হইল্। টোপলা থাকি কপ্পুরের ট্যামাটা বির্ করিল্। মাটিৎ ঠোকাইতে লাগিল্। সাপটার ইচ্ছা—ট্যামা খুলিয়া কপ্পুরক খাবে। মাটিৎ ঠোকাইতে ঠোকাইতে একটা সময় ট্যামার মুখটা হকসে গেইল্। ট্যামা থাকি বির হয়্যা আসিল্ কাঁকড়াটা। ছাওয়াটায় মার দেওয়া সেই কাঁকড়াটা। বির হয়্যা উয়ার দুইটা মোট্টা ডাবু দিয়া সাপটার গালা চিপি ধইরলেক্।

এলা কোটে যাবু?

সাপটা নড়িবার পায় না? ধীরে ধীরে অজ্ঞান হয়্যা বেচারা সাপ মারা গেইল। এতসব কাণ্ড ঘটি গেইল ছাওয়াটা কিছুই জানিবার পাইরলেক নোয়ায়। উয়ার স্যালা খুউব নিন্দৎপড়ি গেইছে। অনেকক্ষণ বাদে উয়ার চেতন হইকে। স্যালা বেলা ভাঁটি পইরলেক। ছাওয়াটা উঠিল। টোপলা তুলিবার সময় দেখিল্—কপ্পুরের ট্যামাটা উদাং। ট্যামার পাশৎ মরা সাপ আর কাঁকড়া।

আসল ঘটনাটা বুঝির পাইল্ ছাওয়াটা। মনে মনে কাঁকড়াটাক্ ধন্যবাদ জানাইল্। ভাবিল-মা যেদু কাঁকড়াটাক্ না দিলেক্ হয় তো এল্যায় মুই এইঠেই মারা গেনু হয়।

কোচবিহার অঞ্চলের রাজবংশী কথ্য ভাষা।

ভাষার নমুনা-২

কাঁকড়া দোসর

একটা সংসার। মাও আর ব্যাটা। একদিনা ব্যাটাটা আঈডাক কোহোল (কহিল্)-মুঞি, কনেক্ বিদেশৎ যাম। আঈডা কহিল্—খুবে ভাল্ কাথা। ব্যাটা বিদেশৎ যাছে। আয়ীর খুবে আলন্দ। আয়ীডা ব্যাটাক ডেকেয়া কহিল্-মুঞি অশুরবাদ দেছু। তোর মঙ্গল হোক। কল্যাণ হোক। কিন্তুক একটা কাথা কহচু বাউ। বিদেশৎ একেলায় যাবা যুঞায় না। তাতেনে হিটা কাকড়াক্ ধরিয়া আনিচু। হিটাক তোর সাথৎ নিয়া যা।

আঈডার কাথা শুনিয়া ছাওয়াটার খুবে অচকলাগিল্। উয়ায় আয়ীক পুছিল্—হিটা কাকড়ক সাথৎ নিয়া কী হোবে? তাবাদে হিটাক মুঞি কোঠে বা রাখ?

আয়ীডা কহিল—একটা কাম করেক বাউ। তোর বচকার মৈধ্য একটা কর্পূরের কৌথা ছ্যা (আছে)। তাততে তুঞি হিটা কাকড় দোসরক নিয়া যা।

বাউটা আঐীর কাথামতে কাম করিল্। পরদিনা বেলা উঠার তৎকালে আঈডাক দণ্ডবৎ করিয়া বিদেশৎ যাত্রা করিল্। হাটিতে হাটিতে উয়ায় ভেলদূর গেইল্। দুইপরৎ বেলাড়ার আঁচাই বাড়ি বা ধরিল্। রোদৎ পথ হাটিতে হাটিতে বাউটা এক্কেলে হোদরায়ী গেইল্।

পথের ধারৎ আছিলো সারি সারি গছ। উয়ার মৈধ্য উয়ায় একটা বড় গছের ছিঞাৎ বসিয়া গেইল। জিরিবার ধরিল্-গছের ছিঞাৎ হেম (ঠাণ্ডা) বাতাস আসিবার ধরিল্। উয়ার দেহাটা জুরায় যাবার ধরিল্। আস্তে আস্তে নিন্দায় গেইল্।

হুদিয়া একটা আপদ্ ঘটিল্। চেংড়াটা যেলা ঢালা নিন্দৎ অচেতন, সেলা কোঠে তকা একটা ঢাড়ুয়াপড়া সাপ বাইর্ হঞা আসিল্। ফণা মেলিয়া সাপটা চেংড়াটার মাহ্যা আগায়া আসিবার ধরিল্। বচকার লগৎ আসিতে সাপটা কর্পূরের বাস্না পাইল্।

সাপ কর্পূরের বাস্না খুবেই পসন্দ করে। উয়ায় হুটা বাসনাৎ রন্ধি ধরে।

উয়ারপাছৎ বচকার ভিৎরা হাতে কর্পূরের কৌটাটা সাপটা বাইর করিয়া ফেলাইল্। উয়ার পাছৎ কৌটাটা মাটিৎ ঠুকিয়া যায়ার ধরিল্। উয়ার ইচ্ছা কৌটা খুলিয়া কর্পূর খাবে। মাটিৎ ঠুকিতে ঠুকিতে এক সমাই কৌটাটা খুলিয়া গেইল্। আর উয়ার ভিৎরা হাতে বাইর্ হঞা আসিল্ একটা কাকড়। বাউটার আয়ীর দুয়া সেই কাকড়। কাকড়াটা বাইর্ হঞায় উএার দুইটা বড় মটা গান্হু দিয়া সাপের গালা চিপিয়া ধরিল। আর যাবে কোঠে? সাপ আর লড়াচড়া করিবার পারল্ না। আস্তে আস্তে গেহুঁশ হঞা নাপাড়া সাপ মরিয়ায় গেইল।

এ্যাওলা কাইণ্ড ঘটিয়া গেইল্, চেংড়াটি কুনয় জানিবার পারিল্ না। উয়ার সেলা ঢালা নিন্দের খপড়াৎ আছিলো। ক্ষণেক পাছৎ উয়ার নিন্দ ভাঙ্গিয়া গেইল্। সেলা বেলা ভাটি গেইছে। তাতেনে ঘুরিয়া যাত্রা করিবার বাদে ধামাধোম উঠিয়া দাড়াইল। রচকাটা তুলিবার যায়া দেখিবার পাইল্, কর্পূরের কৌটাটা খুলা। উয়ার বগলতে মরা সাপ আর কাকড়।

সেলা ব্যাপারটা উয়ায় বুঝিবার পারিল্। মনে মনে কাকড়টাক উয়ায় ধৈন্যবাদ জানাল্। আর মনে মনে ভাবিল্-আঈডা যুদি হিটা কাকড়ক্ না দিলেক হয়, তাহোলে আজি মুঞি এইঠেনায় শেষ হয়া গেনু হয়।

কদমতলা, দার্জিলিং অঞ্চলের রাজবংশী ভাষা।

ভাষার নুমনা-৩
কাঁকড়া দোসোর

একটা পরিবার। মা ও বেটা একে সাথে থাকে। একদিন বেটাটা মাটাক কহিল—মাগে মুই কনেক বিদেশত যাম। মাটা কহিল খুব ভাল কাথা। বেটাটা বিদেশত যাছে মাটার কেলে আলন্দে ধরে না। মাটা বেটাটাক ডাকায় কহিল্—বাউ মুই আশুর্বাদ করেছু। তোর ভাল হোক মঙ্গল হক। কিন্তু একটা কাথা কহছু বাছাধন। একেলায় একেলায় বিদেশত যাবা নই। তারে তানে মুই কাকড়াটাক ধরে আইনছু দোসোর করিবার ঢানে। একে তুই নগদ ধরি যা।

মার কাথা শুনিয়া বেটাটা কেলে অবাক হয়া গেল। ওয় সেলা ওর মাক পছিল্ মাগে এই কাকড়টাক দোসোর নিয়া কি হবে। তাছাড়া এক মুই রাখম বা কোনঠে?

মাটা কহিল একটা কাজ কর বেটা তোর টপলাডাত্ একটা কর্পূরের ডিপবা আছে না ঐঠে করিয়া কাকড়াটাক দোসোর নিয়া যা।

বেটাটা মায়ের কাতা মত কাম করিল। তার পরের দিন বেলা ওঠার সাথে সাথে ওর মাক ভক্তি দিয়া বিদেশত যাবা ধইল। বেড়াইতে বেড়াইতে ভেলদুর গেল। দুপহর বেলা তাপ বারিবা ধইল। রোদের তাপতে হাটিতে হাটিতে চেংড়াটা কেলে থাকিয়া গেইছে।

রাস্তায় দুই পাখে সারি সারি গাছ। ওইঠে ওনে একটা বড় গাছের ছায়াত বসে পড়িল। আরাম করিবা ধইল। গাছের ঠাণ্ডা হাওয়া আসিবা ধইল। তারপর সেল। শীতল বাতাসতে দেহাটা ঠণ্ডি হয়া গেল। ধীরে ধীরে নিন্দিয়া পড়িল।

একদিকে একটা বিপদ ঘটিল। চেংড়াটা যেলা নিন্দে একেবারে শরত খায়া পড়িসে ঐ সময় কোনঠে থেকে একটা বড় সাফ চেংড়াটার নগদ আসিছে। একবারে কেলে ফনা নিকিলিয়া নগদ আসিছে। টপলাটার নগদ সাফটা আসিয়া কর্পূরের গন্ধ পাইছে। সাফ্ কর্পূরের গন্ধ খুব ভালবাসে। তারপর সাফটা কপূর ওনছবা ধইল। তারপর সেল। টপমাটাত কর্পূরের ডিপবাটা পাইছে। সেলা কর্পূরের ডিপবাটা আসড়াইতে আসড়াইতে ডিপবাটা খুলিয়া গেইছে। তারপর ডিপবাটার ভিতরত কাকড়াটা নিকিলিল, চেংড়াটার মার দেয়া কাকড়াটা। কাকড়টা নিকিলিয়া সাফের গলাত মোটা দুইটা ডেনঠু দিয়া চিপিয়া ধরিছে। আর কোনঠে যায়? সাফ্ আর নড়িবা চড়িবা পারে না। ধীরে ধীরে বেহুঁস্ হয়া সাফ্ বেচের-মরিয়া গেল।

কত কি ঘটিল চেংড়াটা কিছুই জানিবা পাইল নাই। ঐ সময় ওয় খুবে নিন্দদ পড়িছিল। কিছুক্ষণ পরে ওর নিন ভাঙ্গিল। সেলা বেলা হাটি হয়া গেইছে। আরহ যাবা লাগে, তাড়াতাড়ি উঠিল। টপলাটা উঠাইতে গিয়া দেখিবা পাইল কর্পূরের ডিপবাটা খুলা। তারপর দেখিল্ নগদ একটা মরা সাফ্ আর কাকড়টা।

সেলা ওয় ব্যাপারটা বুঝিবা পাড়িল। মনে মনে কাকড়টাক ধন্যবাদ দিল্ আর মনে মনে ভাবিল্ মা যদি এই কাকড়টাক নি দিল্ হয় তাহলে আজি মুই এইঠে খতম হয়া গেনু হয়।

রায়গাও, জলপাইগুড়ি অঞ্চলের রাজবংশী ভষা।

ভাষার নমুনা-৪
কাঁকড়া দোসর

একেনা সৈংসার। আঈ এ বেটায় রহে। একদিনা বেটাডা আঈ'ক্ কৈল-মুঁঞি (মুঁই) কনেক্ বৈদেশ যাম্। আঈ কৈল-খুপে ভাল্ কাথা। বাউটা বিদেশ যাছে। আঈ'র খুপ হুলাম। আঈ ছাওয়াটাক্ ডেকায় কৈল-মুঁই অশুরবাদ রেচু। তোর মৈঙ্গল হোক্।

ভাল্ হৌক্। কিন্তুক্ একেনা কাথা কহেচু-বাপই, বৈদেশৎ একেলায় একেলায় যওয়া ঠিক না হয়। তার তা নে এই কাঁকড়টাক্ ধরি আনিচু। ইয়াক্ তুঁই সাতৎ ধরি নিগা।

আঈ'র কাথা শুনিয়া চ্যাঙ্গেরাটা অছাক খাইল। অয় আঈ'ক পুছিল-এই কাঁকড়টাক বাটরাইছে। উয়াত্ তুই কাঁকড়াটাক দোসোর নিগা।

বাউটা আঈর কাথামতন কাম করিল। পরদিনা বেলা উঠার নগে নগে আঈক দণ্ডবৎ করে বিদেশৎ যাত্রা করিল। হাটিতে হাটিতে উয়ার ভেল্‌দূর গৈল। দুপুরা রোদের তাপাৎ বাড়িভা লাগিল। রোদৎ হাটিতে হাটিতে চ্যাঙরা বড়য় হোদোরি গেইল।

ডেগরের বগলৎ ছিলো সারি সারি গছ। উড়ার মৈধ্যৎ একটা বড্ড বিরিখের ছেয়াৎ বসি পৈল। জিরিবা ধরিল। গছের ছেয়াৎ হিয়াল বাও-অ বহিবা নাগিল। অর দেহা হিয়াল হবা ধরিল। ধীরে ধীরে অয় নিন্দৎ পৈঁল।

হিপাখে এক আপদ্ ঘটিল। চ্যাঙ্গেরাটা থ্যালা ঘোর নিন্দৎ বেঁহুশ। স্যালা কুণ্ঠেতকা একেনা বড্ড সাপ নিকিলি আসিল। ফান অঠায় হাকন সাপটা চ্যাঙ্গেরাটার ভিতি আগায় আসিবা নাগিল। টপলার বগলৎ আসিয়া হানে সাপটা কফুরের বাসেনা পাইল। সাপ কফুরের বাসেনা খুবে পসন করে। উয়ায় ঐ বাসেনাৎ মাটি কেইল। স্যালা টপলার বিডৎ তকা কর্ফূরের বাটরাইটাক সাপটা নিকিলি ফেলাইল। ইয়ার পাছোৎ বাটরাইটাক্ মাটিৎ আছরায়া লাগিল। অর ইচ্ছা কটরাই খুলিয়া হানে কফুর খাবে। মাটিৎ আছারাইতে আছারাইতে একসমাই কটরাই বিড়ি পৈল। আর উয়ার ভিতর তকা নিকিলি আসিল এককিনা কাঁকড়। চ্যাঙ্গেয়াটায় আঈর দেওয়া সই কাঁকড়াটা কাঁকড়টা। নিকিলি হানে অর ঢ্যান্‌ডেরা দাঁতলা দিয়া সাপটায় টুটি চাপ্পি ধরিল। আর যায় কুণ্ঠে? সাল আর নড়িবা চড়িবা পারে না। ধীরে ধীরে গিয়ান হারেয়া বাছাধন সাপটা মরি গেইল।

এত্‌লা খিটকাল্ ঘটি গেইল চ্যাঙেরা কিছুই জানিবা নাই পালেক। উয়ায় সেই সঈই ঘামাঘাটা নিন্দৎ। কনেক পরে অর নিন্ ছুটিল। স্যালা বেলা গড়ি গেইছে। তারতানে আরহ যাবার তানে ধাও করে উঠে পৈল। টপলা অঠবা যায়আ দেখা পাল কফুরের কটরাইটা হয় খলা। উয়ার লগৎ মরা সাপ আর কাঁকড়টা।

স্যালা খিটকালটা বুঝির পাইল। মনে মনে অয় কাঁকড়টাক ধৈন্যবাদ জানাইল। আর মনে মনে ভাবিল আঈডা যোদি কাকঁড়টাক নাই দিলেক হয় তাহৈলে আজি মুই এধেনায় শ্যাষ হয়আ গৈর্নু হয়।*

দার্জিলিং অঞ্চলের রাজবংশী ভাষা।

* কৃতজ্ঞতা : রতন বিশ্বাস, সম্পাদক, *উত্তরবঙ্গের জাতি ও উপজাতি।*

পরিশিষ্ট-৩

ছড়া : সাহিত্যের আদিম শাখা হিসাবে ছড়া আজ মানবের হৃদয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। সেই অনাদি কাল থেকে ছড়া শিশু ও বড়দের মনে রস সঞ্চার করে এসেছে। যেদিন মানব জীবনে না ছিল বেদ, না ছিল পুরাণ, না ছিল কোনো মঙ্গল কাব্যসাহিত্য তখনো ছড়া মানব জীবনে ছিল। তবে সত্যি সত্যিই ছড়াগুলো কবে, কখন, কিভাবে উৎপত্তি হয়েছিল তার সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে একথা বলা প্রাসঙ্গিক যে, শিশুদের চিত্ত বিনোদন, আনন্দ যোগানো, শিশুদের মনে কৌতুহল সৃষ্টি, অনুসন্ধিৎসা জাগাবার মানসেই ছড়া রচিত হয়েছে। ডাক, খনার বচন ও ধাঁধার মতো ছড়াও খুব সুপ্রাচীন। "শিশুর সঙ্গে ছড়ার সম্পর্কের কথা বিচার করলে ছড়া লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম রূপও শিশুসাহিত্যই সাহিত্যের প্রাচীনতম বিষয় বলে অনুমান করলে ভুল হয় না।"[১] ড. সুকুমার সেন ছড়াকে শিশু-বেদ নামে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, "যে রচনা কোনো ব্যক্তি বিশেষের তৈরি বলে নির্দিষ্ট করা যায় না, যা কোনো এক মানবগোষ্ঠীকে প্রায় অনাদিকাল ধরে জন্মে-কর্মে-চিন্তায় নিয়ন্ত্রিত করে এসেছে তাকে যদি বেদ নাম দিয়ে থাকি তবে অপৌরুষের ছেলেমী ছড়া-গান-গল্পকে শিশুবেদ বললে বোধ করি অসঙ্গত হয় না।"[২]

তিতাস চৌধুরীর ভাষায়, "ছড়ার ভাব অসংলগ্ন, কখনো হিজিবিজি ছবির মতো, বিক্ষিপ্ত, ভাষা অমার্জিত, কখনো চটুল-চঞ্চল, কখনো মনোহারিনী, মনতোষিনী, আবার কখনো আদিরসে টইটম্বুর।"[৩] সবচেয় বড় কথা হলো ছড়ার ভাব-ভাষায় অনৈক্যের মধ্যেও ঐক্য, বিক্ষিপ্ততার মধ্যেও অখণ্ডতা ও অসঙ্গতির মধ্যেও সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায়। এইসব দিক বিচার করলে ছড়ায় ছন্দের গুরুত্বও অস্বীকার করার জো নেই। একজন লোকবিজ্ঞানী ছড়া সম্পর্কে নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন, "The popular rhyme is striking example of the poetic primitive,going back its construction and psychological cessnce almost to the primitive archaic times, and the same time it is frequently an expression of new ideas and attitudes among the masses of the people" মোট কথা, ছড়া বিষয়, ছন্দ, রসবোধ, ধ্বনী সৌন্দর্য, সমাজ চেতনার অনুসঙ্গ, ঐতিহ্যচেতনার প্রকাশ ঘটে থাকে। ড. ওয়াকিল আহমদ ছড়াগুলোকে বিভিন্ন আঙ্গিকে বিশ্লেষণ করে দেখেছেন, "শিব পৌরাণিক দেবতা, বর্গী, ঐতিহাসিক মারাঠা সৈন্য, কৃষক, মালি সমাজের শ্রমজীবী মানুষ বাবা-মা, মামা, ভাই, কন্যা পরমাত্মীয়, বিবাহ অনুষ্ঠান, ডুগডুগি, চাঁই, মাদল, ঝাঁঝর, ঢোল, লোকবাদ্য, বাঘ, বুলবুলি, টিয়া, ভোমরা, বাংলাদেশের পশুপাখি, কীট, ধান, পান, রসুন, বাংলাদেশের ফসল, গয়াকাশী, তীর্থযাত্রা, শিবের গাজন, ধর্মানুষ্ঠান, তিন পাত্রে কন্যাদান, বহুবিবাহ প্রথা ইত্যাদিতে দেশ, সমাজ, জাতির অতীত ও বর্তমানের নানা উপাদান রয়েছে।"[৪] বিশ্লেষণ করে একথা বলা যায় যে, সমাজের সমষ্টিগত মানুষের আবেগ ও কল্পনার বাঙময় রূপ হলো ছড়া। বিভিন্ন ছড়া সংগ্রাহক ছড়াগুলোকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করে আলোচনা করে থাকেন। সেগুলো সাধারণত ছেলে ভুলানো বা শিশুতোষ ছড়া, পারিবারিক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক, ব্যক্তিকেন্দ্রিক ছড়া, আচার-অনুষ্ঠানমূলক ছড়া, ঐন্দ্রজালিক ছড়া, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক ছড়া, শ্রম-পেশা বিষয়ক ছড়া, নীতিশিক্ষামূলক ছড়া প্রভৃতি।

ছেলে ভুলানো ছড়া : ছেলে ভুলানো ছড়ার উদ্দেশ্য হলো জাগ্রত শিশুর মনোরঞ্জন। কখনো খাদ্যবিমুখ শিশুকে অন্যমনস্ক করে খাদ্য গ্রহণ করানো, কখনো ক্রন্দনরত শিশুর ক্রন্দন থামানো, কখনো-বা শিশু নানান রকম বায়না করলে শিশুকে ছড়া বলে অন্যমনস্ক করার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। এই ছড়াগুলোর ধরন ও উদ্দেশ্য সকল

জাতিগোষ্ঠীর সমাজে প্রায় একই রকম। এসব ছড়ার সুর যেমন দ্রুত হয়, তেমনি ছন্দ-তালও। যেমন—

১. 'তায় তায় তায়, মামা বাড়ি যাই
মামা দেলে দুধ ভাত দুয়োরে বসে খাই
ভাতে পড়লো মাছি কোদাল ধরে চাঁছি
মামি এলো ঝাঁটা নিয়ে পালাই পালাই।'

২. খুকা খুকা ডাক পারি খুকা মোদের কার বাড়ি
আয়রে খুকা ঘরে আয় দুধ মাখা ভাত কাকে খায়।

৩. তা থৈ থৈ থুরা ভাঙলো খাটের খুরো
পিড়েত নাচে সুন্দরী বউ বসে বাজায় বুড়ো।

আবার ছেলে-মেয়ে যখন কোনো কিছুতে চোট পায় বা ব্যথা পায় তখন তাদের ভুলাতে নিম্নোক্ত ছড়াটি দাদু-দিদিমারা সুর করে বলে থাকেন—

৪. নোটন নোটন পায়রাগুলো ঝোটন বেঁধেছে
ওপারেতে ছেলে-মেয়ে নাইতে নেমেছে
দুই ধারে দুই রুই কাতলা ভেসে উঠেছে,
কে দেখেছে কে দেখেছে দাদা দেখেছে
দাদার হাতে কলম ছিল ছুঁড়ে মেরেছে
উহ্ ! বড্ড লেগেছে"।

ঘুমপাড়ানি ছড়া : ঘুম পাড়ানি ছড়াগুলো শিশুদের ঘুম পাড়ানোর সময় সুর ও তালে তালে পড়া হয়। স্বভাবতই সুর করে আওড়ানো ছড়াগুলো শিশুমনকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে ফেলে, তখন শিশুরা আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ে। যেমন—

১. খুকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী আইলো দেশে
বুলবুলিতি ধান্ন খায়েছে খাজনা দেব কিসে
ধান ফুরালো পান ফুরালো খাজনার উপায় কি
আর কয়ড়া দিন সবুর কর রসুন বুনিচি।

২. ঘুম পাড়ানি মাসী পিসি আমাগের বাড়ি আইসো
খাট নেই পালং নেই চোখ পাইতে বসো
বাটা ভরা পান দিছি গাল ভরে খাও
খুকির চোখি ঘুম নেই ঘুম দিয়ে যাও।

৩. আয়রে আয় টিয়ে লাফ ঝাঁপ দিয়ে
আমাগের খুকা পান খায়েছে শাউড়ী বাধা দিয়ে।

৪. আয়রে টিয়ে বসরে ডালে দেবো তোর সুনার থালে
খাবি দাবি কলকলাবি
আমাগের খুকার ঘুম পাড়াবি।

খেলাধূলার ছড়া : খেলাধূলার ছড়ার বৈশিষ্ট্য যে, অন্যান্য ছড়াগুলো এদের সমাজের মা-দিদিমা-পিসিমারা আওড়ায়, কিন্তু খেলার ছড়াগুলো শুধুমাত্র ছেলে-মেয়েরা খেলার সময় খেলার অংশ হিসাব আওড়ায়। খেলাধুলার ছড়া নিতান্তই শিশুমন থেকে উৎসারিত বলে এগুলোতে রসবোধ, ছন্দরোধ, সৌন্দর্য চেতনা কম। তবে শিশুদের এসব ছড়াতে সুর ও তাল-মান পরিলক্ষিত হয়। এসব ছড়ায় মুখের আবৃত্তির সাথে অঙ্গভঙ্গি বা অঙ্গ সঞ্চালন করতে হয়। এগুলো অনেকটা সমস্বরে অভিনয়ের মতো, খেলার ছড়াগুলো খেলা থেকে আলাদা করে আবৃত্তি করলে তার স্বাধীন কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। যেমন—

১. আমি এট্টা কতা জানি
কি কতা?
ব্যাঙের মাথা।
কি ব্যাঙ?
কুনো ব্যাঙ
কি কুনো?
গাছ কুনো।
কি গাছ?
তাল গাছ।
কি তাল?
বুড়োর বাল।
কি বুড়ো?
ধান উড়ো-ঝিনাইদহ

২. তুমার ছাগলে খায় কী?
কাঁঠাল পাতা।
মাথায় কী?
ব্যাঙের ছাতা।
করে কী?
মুগুর মাথা?
ন্যাদে কী?
বরই আঁটি।
মোতে কী?
রক্ত খাঁটি।
ধান খায় না পাতা খায়
এ ছাগল কি বান্দা যায়!
কাজতো করে মুগুর মাথা
এ ছাগল কি যা-তা তাতা
ন্যাদে আঁটি রক্ত মোতে
ছাগল ছাড়ো চলুক জোতো-যশোর

৩. টুকরুস নাটুয়া
ব্যাঙের ফাটুয়া
কি ব্যাঙ?
টুরি ব্যাঙ
কি টুরি?
ভোট টুরি।
কি ভোট?
গুয়া কোট।
কি গুয়া?
চা গুয়া।
কি চা?
গু খা।-রংপুর

৪. একুড় দোকুড় তেকুড় নালা
লাড়কা লুড়কু বাঁশের চালা
চাঁই চুঁই চড়ুইর ডিম গরুর শিং
তাতার থুড়ি উনিশ কুড়ি-যশোর

৫. ইকির-মিকির চামচিকিড় চামে কাটা মজুমদার
ধেয়ে এল দামুদার, দামুদারের হাঁড়িকুড়ি
চার দুয়োরে চাল কাঁড়ি,
চাল কাঁড়িতে হলো নাঙলা মাথা
ভাত খেয়ে যা জামাই শালা ভাতে পড়লো মাছি
কোদাল দিয়ে ছাঁছি, কোদাল হলো ভোঁতা খ্যাক
শিয়েলের মাথা।-যশোর

৬. আয়টানা বিবিয়ানা
ডাক্তার বাবুর বৈঠক খানা
ডাক্তার বাড়ি যাইতে
পান সুবোরি খাইতে
পানের আগায় মরিচ বাটা
ইস্কাপনের ছবি আঁটা

যার নাম রেণু বালা গলায় দেব মুক্তোর মালা
হাতে দেব হিরের মালা চলে যা যশোর জিলা ঝিনাইদহ।

৭. এ কোট খালি ও কোট খালি
এই কোটে আমার সুনার থালি।–ঝিনাইদহ

৮. তুই খিডা?
আমি খুকা।
মাথায কি?
আলুর ঝাকা।
পেটে কি
ছেলের পুলা।
কান্দে ক্যান
দুধ পায় না
খায় কি?
লবণ খায়।
তুই বুকা, যা গু খা।–ঝিনাইদহ।

আচার-অনুষ্ঠানমূলক ছড়া : ব্রত, গাজন, বৃষ্টি, বন্যা, খরা, ফসলকে কেন্দ্র করে রাজবংশী সমাজে নানান ছড়ার প্রচলন রয়েছে। এগুলোতে ধর্মীয় বিশ্বাস ও সংস্কারাদি নিহিত। ধর্মীয় বিশ্বাস ও সংস্কার নিহিত ছড়াগুলোর কটি নিম্নরূপ :

১. আশ্বিন যায় কার্তিক আসে
সকল শস্যের গর্ভ বসে
রামের হাতে গুমা
ধান হইস তিন দুনা–ময়মনসিংহ।

২. আশ্বিন গেল কার্তিক গেল
মা ষষ্ঠী গভ্যে গেল ধান তুমি সাধ খাওরে হো।

৩. আমাগের বাড়ির মশা মাছি অমুকের বাড়ি যা
অমুকের মার কাঁথা–কাপড় খুঁচে খুঁচে খা।

ঐন্দ্রজালিক ছড়া : ঐন্দ্রজালিক ছড়ায় যাদুমন্ত্রের প্রভাব থাকে। এতে অনেক সময় নৃতত্ত্বের ও জাতিতত্ত্বের উপাদানের সন্ধান পাওয়া যায়। বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের সাহায্যে যেন প্রাকৃতিক জগৎকে বশীভূত করা যায় বলে বিশ্বাস রয়েছে, তেমনি যাদুমন্ত্রের সাহায্যেও প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার কথায় এদের অটুট বিশ্বাস লক্ষ করা যায়। এগুলোও রচিত হয়েছে খরা, বৃষ্টি, অতিবৃষ্টি রোধে। যেমন—

ঐন্দ্রজালিক ছড়া যেমন রয়েছে—

১. রোদ হচ্ছে বৃষ্টি হচ্ছে
খ্যাক শিয়েলের বিয়ে হচ্ছে

২. কলার পাতায় করম চা/এই বৃষ্টি উড়ে যা।

৩. তালপাতার ছাউনি, ভ্যাম্নার খুঁটি
রক্ষে কর রক্ষে কর মা
দোহাই মা কালী দোহাই মা কালী।

৪. উড়ি বুড়ি থুড়ি মাছ ওঠ দুই কুড়ি
বুড়ির নাম বেনে মাছ তোলবো টেনে।

ব্যঙ্গ বিদ্রুপাত্মক ছড়া : রাজবংশী সমাজে খেলার ছড়া, ঐন্দ্রজালিক ছড়া যেমন রয়েছে। তেমনি ব্যঙ্গ বিদ্রুপাত্মক ছড়াও যথেষ্ট পাওয়া যায়। এগুলো বাচ্চাদের কাঁদানোর জন্যে বা মজা করার উদ্দেশ্যে আওড়ানো হয়। এগুলো সাধারণত ছেলে মেয়েরা, অনেক সময় বড়রাও আবৃত্তি করেন।

১. বুঁজ খাতি ন্যুচ করে
বাগানে যাতি ভয় করে।

২. অমুকের বিয়ে গায় হলদি দিয়ে
এ কয় ও কয় আমি কলি দোষ হয়।

এসব ছাড়াও প্রচুর পরিমাণে ছড়া বর্তমান রয়েছে। যেগুলো খুঁজে বের করা সম্ভব হলে সাহিত্যের ছড়া সম্পদ আরো সমৃদ্ধ হবে নিঃসন্দেহে।

তন্ত্রমন্ত্র : লোকসাহিত্যে তন্ত্র-মন্ত্র অমূল্য সম্পদ। কোনো জাতির উপর ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তন্ত্র-মন্ত্র গবেষণার অমূল্য উপাদান হিসাবে বিবেচিত। মন্ত্রে যাদুশক্তি আছে। একসময় দৈব ও জড়ো উপাসক আদিবাসি-উপজাতিদের মধ্যে যে মন্ত্রবিশ্বাসের উদ্ভব হয়েছিল কালক্রমে তা গ্রহণ করেছে এদেশের বাঙালি হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান সমাজ। গ্রামাঞ্চলের প্রায় সকল সমাজে আপদে-বিপদে-রোগে-শোকে পরিত্রাণের উপায় হিসাবে তন্ত্র-মন্ত্র, ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ-কবজ, জলপাড়া, ফুল-ঝাড়া প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। সভ্যতার ক্রমবিকাশের নানা স্তরে অগ্নি-বায়ু-জল, লতা-পাতা-ফুল-ফল, ধুলি-বালিকণা প্রভৃতি দৈহিক সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে, রোগ নিরাময়ে, প্রলেপে-প্রয়োগে, তন্ত্র-মন্ত্রের সাথে অনুপান হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। যখন ভারতবর্ষে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা (মেডিকেল কলেজ ও এম,বি,বিএস ডাক্তার ও এ্যালোপথিক ওষধ পথ্যাদি) ছিল না তখন তন্ত্রমন্ত্র গাছ-গাছড়ার চিকিৎসায় ছিল মানুষের একমাত্র আশ্রয়স্থল। তখন বিভিন্ন রকম জ্বর যেমন-কফজ্বর, বাত জ্বর, পিত্তজ্বর, বাত-পিত্তজ্বর, শ্লেষ্মা জ্বর, সান্নিপাতিক জ্বর প্রভৃতি নির্ণয় করতেন রোগীর দৈহিক লক্ষণ দেখে। তাদের ভাষায় "হস্তপদে দাহ থেকে পিত্তের প্রকোপ, এতে নাড়ীর গতি হয় কাক ও ভেকের ন্যায়, বাতে হয় বক্র ও পিত্তে চঞ্চলা, শ্লেষ্মায় স্থির মন্দা।"[৫] রোগীর অবস্থা নিরূপণে তখন রোগীর নাড়ীর গতি প্রকৃতি পরীক্ষা করতেন। পুঁথি পরিচিতিতে রোগ ও রোগীর লক্ষণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

"পুরুষের দক্ষিণে নারীর বাম ভাগে
লক্ষণালক্ষণ শুভাশুভ দেখি আগে।"[৬]

আবার নাড়ী পরীক্ষায় দক্ষ চিকিৎসকরা রোগীর মৃত্যুর দিনক্ষণ সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণী করতে পারতেন, যেমন—

"মন্দা মন্দা কুটিল নারীর গতি যার
পঞ্চম দিনে মৃত্যু হয় তার।"[৭]

মন্ত্র যাদুবিদ্যার একটি অঙ্গ যা লোকভাষায় প্রকাশ পায়।[৮] যাদুবিদ্যা কালে কালে প্রায় সকল শ্রেণীর মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলেছে। তার প্রমাণ পাওয়া যায় কোরান, পুরাণ, বেদ ও সংস্কৃত কাব্য-শাস্ত্রাদিতে। এদেশে প্রাচীনকালে একশ্রেণীর মানুষ যাদবিদ্যা দেখিয়ে,

সাপখেলা দেখিয়ে, গাছ-গাছড়া, তাবিজ-কবজ, মন্ত্র-তন্ত্র প্রভৃতির সাহায্যে জীবিকা নির্বাহ করত। এইসব পেশার সাথে যারা জড়িত ছিল তারা হলো ডোম, শবর, পুলিন্দ, নিষাদ, বেদে প্রভৃতি সমাজের লোক।[৯] অতীতের মতো আজো সমাজে যারা পেশাদার, অপেশাদার ব্যক্তি মন্ত্র প্রয়োগ করেন, তারা হলেন গুনিন, ওঝা, বৈদ্য, কবিরাজ, পীর, ফকির, সাধু, সন্ন্যাসী, বেদে, বেদেনী, ধাত্রী প্রভৃতি।[১০] গুণের তারতম্য অনুসারে যেমন—মহামন্ত্র[১১] মুলমন্ত্র[১২] গুণমন্ত্র[১৩] বীজমন্ত্র১৪ আড়াইঅক্ষর মন্ত্র[১৫] প্রভৃতি নাম আছে, তেমনি এসব মন্ত্রের প্রয়োগক্ষেত্রও ভিন্ন ভিন্ন। মন্ত্র শুধু রোগশোক-আপদ-বিপদেই ব্যবহৃত হয় না, আত্মশুদ্ধিতে, দেহশুদ্ধিতে, বীর্যধারণে, শান্ত-যৌন, ধীর স্থির থাকতেও মন্ত্রের ব্যবহার লক্ষণীয়। প্রাচীনকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত রমণী বশীকরণে যেসব উপাদানের ব্যবহার বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে পাওয়া যায়, সেগুলো হলো-মেষের নাকের দড়ি, মৃত গরুর মাথা, রুই মাছের পিত্ত, সাপের আঠালী, কবরের মাটি, এক বর্ণ ধলা গাইয়ের দুধে প্রস্তুত দই[১৬], শ্মশানের ফুল, সাপের মাথার আঠুলি কীট,[১৭] পাখির পালক, বানরের কানের ময়লা, পূর্ণ হাটের ধুলো, স্রোতোস্বলা নদীর ঘাটের পানি, খাটাশের মাথা, একুশ গণ্ডা কড়ি, কাক চিলের ছানা, কসক ও ধুতরা,[১৮] চালচাটি, সতীনের গায়ের ময়লা, ধোরা কাকের জিহ্বা প্রভৃতি উপকরণ।[১৯] এসব দ্রব্যাদির সন্ধান যেসব মঙ্গলকাব্যে পাওয়া যায় সেগুলো হলো দ্বিজমাধবের *মঙ্গলচণ্ডীর গীত* মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর *চণ্ডীমঙ্গল,* দ্বিজরাম দেবের *অভয়ামঙ্গল*।

এছাড়াও ঘনরাম চক্রবর্তীর *ধর্ম্মমঙ্গলে,* কবি আলাওলার *সিকান্দারনামা,* সৈয়দ সুলতানের *রসুল চরিতে,* কৃষ্ণরাম দাসের *কালিকামঙ্গলে, ময়মনসিংহ গীতিকায় কাজলরেখা* পালা প্রভৃতিতে তন্ত্র-মন্ত্রের বিভিন্ন উপাদানের সাক্ষাত মেলে।

মন্ত্রের প্রকৃতি ও অন্তর্নিহিত বিচারে কেউ কেউ এগুলোকে বন্ধন মন্ত্র, বন্দী মন্ত্র, ঝাড়ফুঁক মন্ত্র, চালান মন্ত্র, বারণমন্ত্র, নজর দেওয়া মন্ত্র, বশীকরণ মন্ত্র প্রভৃতি নামে শ্রেণীকরণ করেছেন।[২০]

ড. মুহম্মদ আবদুল জলিল তন্ত্র-মন্ত্রকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে আলোচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। যেমন-সর্পদংশনে আক্রান্ত রোগীকে নিরাময় বিষয়ক মন্ত্র, ভূত-প্রেতে আক্রান্ত রোগীকে নিরাময় করার মন্ত্র, জ্বর নিরাময় মন্ত্র, শিশুরোগ নিরাময়, স্তনের ব্যথা বেদনা নিরাময় মন্ত্র, মাথাব্যথা নিরাময় মন্ত্র, বুকের ব্যথা, পেটের ব্যথা, বাণ মন্ত্রে আক্রান্ত রোগীকে নিরাময় মন্ত্র প্রভৃতি।[২১]

রাজবংশী সমাজে সাপে কামড়ানো রোগীর চিকিৎসায় ওঝা কবিরাজে যতটা বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত তেমনিভাবে এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা বা হাসপাতালে যাওয়ার প্রতি বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হয় নি। ওঝা-কবিরাজগণ সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসা ক্ষেত্রে ডুরবন্ধন, চপেট সাধন, হাত চালান, তালা লাগানো, গামছা ঝাড়া, রুমাল ঝাড়া, বিষবন্ধন, বিষবন্ধন কাটানো, চুনপড়া, গাট দেওয়া মন্ত্র প্রভৃতির ব্যবহার করে থাকেন। যেমন—

১. ডুর ডোর গাঁটের ডোর
থাক বিষ পইড়া ওর

২. গাঁইট বান্দি গাঁইটালী বান্দি
বান্দি লোহার শিকল

আমি যাই ঈশ্বর	যে মুখে খাইছেন বিষ
মহাদেবের সেবা কর	সেই মুখে থাক
দোহাই মা পদ্মার	দোহাই ধর্মের।[২৩]

দোহাই মা জরাৎকার।[২২]

যারা মানসিক রোগী তাদেরই মূলত ভূত-প্রেতে আক্রান্ত রোগী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এসব রোগের উৎপত্তি হয় শারীরিক দৌর্বল্য, অনিদ্রা, অনাহার, অমূলক ভীতি, মানসিক অবদমন ও বিরহজনিত কারণে। এসব ক্ষেত্রে ওঝা-বৈদ্য, কবিরাজ ফকির প্রভৃতি চিকিৎসকরা তেলপড়া, জলপড়া, সরিষা পড়া, চুনপড়া, ধূপবাণ, ঝাঁটা বাণ প্রভৃতির আশ্রয় নেয়। এ সম্পর্কিত একটি জলপড়া মন্ত্র—

শিব-শঙ্কর ফিরিয়া পথ ধর
যে পথে আসিলি তুই
সে পথেই ফিরাবু মুই
সুঁই ফিরাচু কালী চণ্ডীর পুত
তুই হে কালী তুই হে ভূত।
কালী চণ্ডীর উপর যদি চরাব ঘাও
শিব শঙ্করের মাথায় মুছিব দুইপাও।[২৪]

জ্বর নিরাময়ের জন্য নানান চিকিৎসা মন্ত্র আছে, আছে কিছু অনুপান। এ রোগে ঝাড়ফুঁক ছাড়া তেলপড়া ও বিচি কাল ব্যবহৃত হয়। জ্বর নিরাময়ের একটি মন্ত্র নিম্নরূপ—

ইরকুটি মাশান বীরকুটি দ্যেও
আয় মাশান ঘুম পারিয়া
এই পূজা পানি খা তুই চুপ করিয়া
ইসুনের গাজী খায়া তাক খান,
শ্মশান দ্যাও ভুত দ্যাও মাশান।[২৫]

এই মন্ত্রটি তিনবার পড়ে বিচিকলায় ফুঁদিয়ে রোগীকে খেতে দিতে হয়। তার সাথে একটু নিমপাতার গুড়া ও চিনি দিতে হয়।

অম্লপিত্ত দোষ, আমাশয়, পাকস্থলীতে ফোড়া, অখাদ্য-কুখাদ্য ভোজনের ফলে বদহজম হয়, এবং পেট ব্যথা করে তখন নিম্নোক্ত মন্ত্র তিনবার পাঠ করে ফুঁ দিতে হয়।

'সিতা রান্ধে লক্ষণ বাড়ে হুনুমান বসে খায়
ফলনার পেটের বদ হজম করে নেয়।[২৬]

আমাশয় রোগে ব্যবহৃত পানি পড়া মন্ত্র হলো—

গঙ্গা সাগর তিরপানি
একাধারে পরে জানি
যেই আনে সেই খায়
ফন্নার হাগা-মুতা
প্যাট ফুলা পালায়।[২৭]

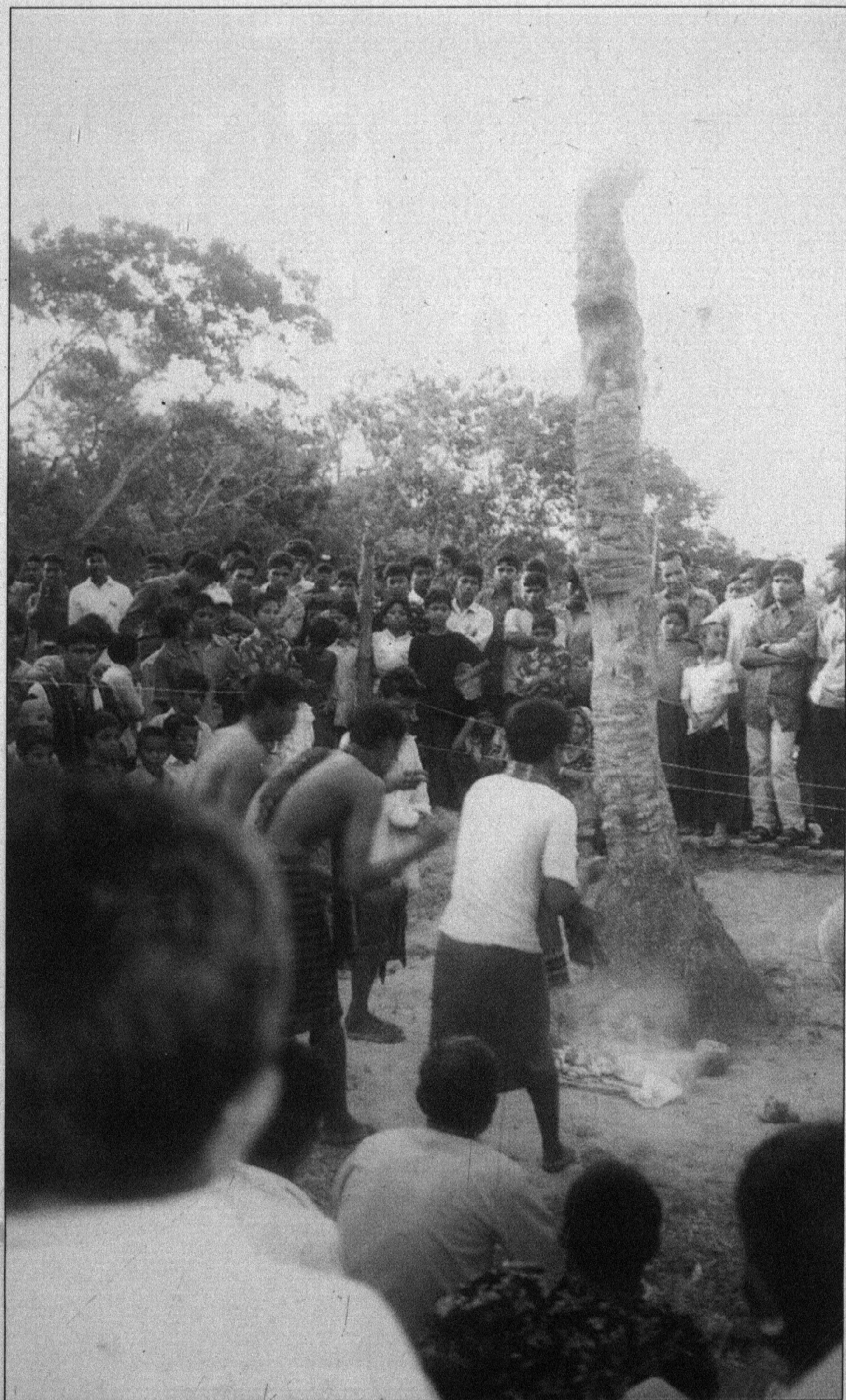




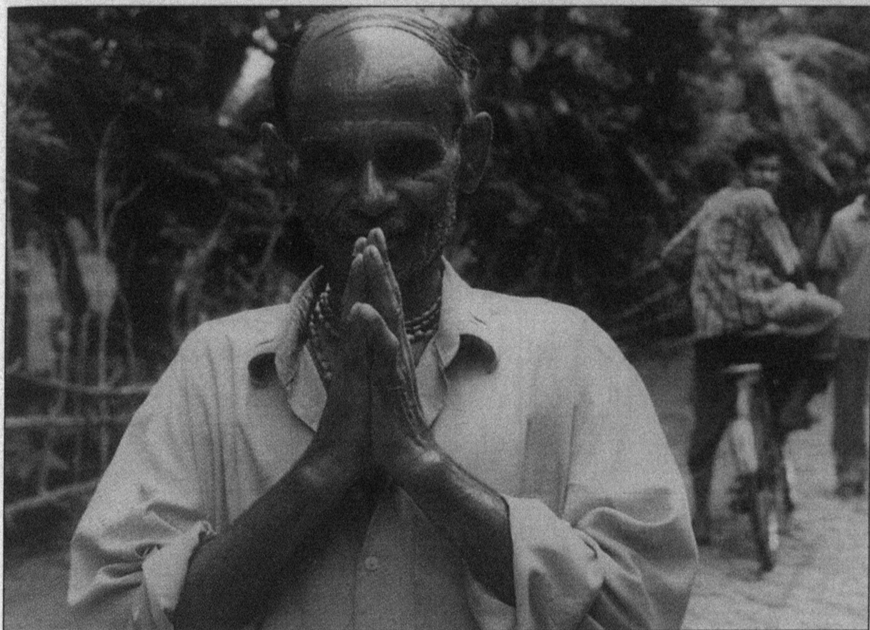
স্কুলগামী শিশু (বুড়িরহাট, আউলিয়াপুর, ঠাকুরগাঁও)



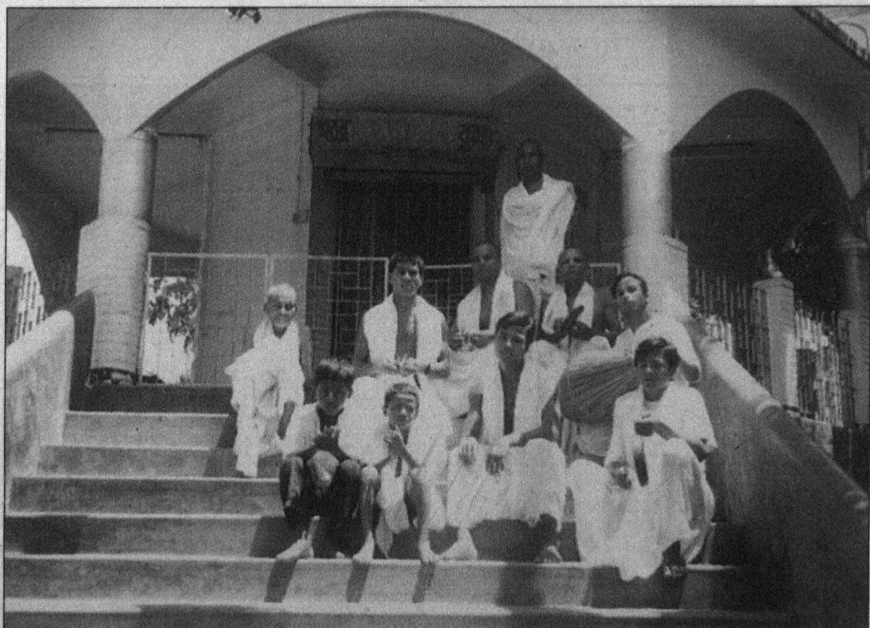
চৈইতপূজা অনুষ্ঠান (বাদুরগাছা, কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ)



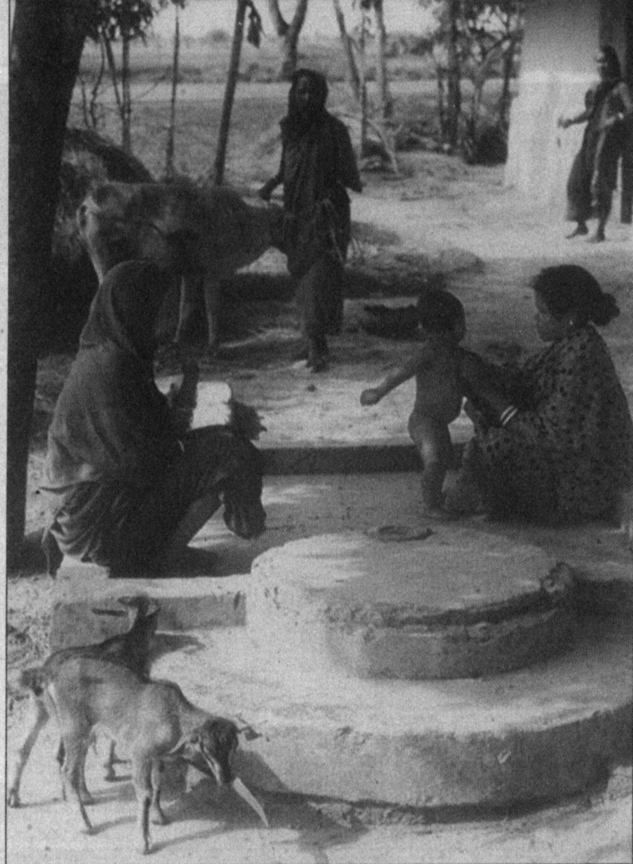
চৈইতপূজার খেঁজরভাঙ্গা পর্বে শোকপাঠ (নড়াইল)



প্রণামরত (চাঁচড়া, যশোর)



অনাথ আশ্রমে রাজবংশী পুরোহিত ও শিষ্যবৃন্দ (লস্করা, গড়েয়া)



অবসর মুহূর্ত (কুচবিহারপাড়া, নওগাঁ)





চৌদ্দ হাত লম্বা কালীমূর্তি (কালীতলা, গড়েয়া রোড, ঠাকুরগাঁও)



কাঁচা কালী (ঢ্যাপাব্রিজ, গড়েয়া রোড, ঠাকুরগাঁও)



শিং মাছের কাটা ফুটলে সাতবার নিম্নোক্ত মন্ত্রটি পড়ে থু থু দিয়ে ক্ষতস্থানের উপর মালিশ করলে বিষ নেমে যায় বলে এদের সমাজে বিশ্বাস আছে।

'বিষ বান্দালাম ছ্যাপ দিয়া
মনসার লেড় দিয়া
নাম বিষ নাম, পাতালে নাম
বান্দ ছাড়িয়া উপরে ষাচ,
মনসা দেবীর মাথা খাচ
ঈশ্বর মহাদেবের মাথা খাচ।[২৮]

বাড়িতে রোগ-বালাই বৃদ্ধি পেলে কিংবা আপদ-বিপদ দেখা দিলে বাড়ির চতুর্দিকে ঘিরে বাড়িবন্ধনমন্ত্র দ্বারা বাড়ি বন্ধন করা হয়। এতে ঐ বাড়িতে আর রোগ-শোক, আপদ-বিপদ প্রবেশ করতে পারবে না বলে এ মন্ত্রের ব্যবহার আছে। বাড়ি বন্ধন একটি মন্ত্র হলো—

আলী আমার বাবা কালী আমার মা
এই বন্ধের মধ্যে যে করবি ঘা
তার সেবকের মাথা খা
দোহাই খোদা দোহাই খোদা দোহাই খোদা-দোহাই।[২৯]

কোনো সংকটে পড়লে সেই সংকট থেকে উদ্ধার পেতে নিম্নোক্ত মন্ত্র তিনবার পাঠ করতে হয়, তাহলে সেই সংকট-বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়।

অটল ঘরের নাম
পূর্বেতে উদয় ভানু রক্তোরি বরণ
তোমার নাম নিলে আমার কেন হয় মরণ
আদি অনাদি সূর্য অখিলের পতি
সংকটে পড়িয়াছি সায় এড়াও দুর্গতি
দোহাই আল্লাহ নিরঞ্জন, দোহাই আল্লাহ নিরঞ্জন
দোহাই আল্লাহ নিরঞ্জন।[৩০]

দাম্পত্য জীবনে দ্বন্দ্ব-সংকট আসে। কখনো কখনো তা প্রকট আকার ধারণ করে। সেক্ষেত্রে স্বামী বা স্ত্রী যে কোনো একজন গুনিন বা ফকিরের শরণাপন্ন হলে তারা এই মন্ত্র পাঠ করে পান পড়া দেন। সেই পান অপর জনকে খাওয়াতে হয়। দাম্পত্য জীবনের সংকট নিরসনে পান পড়া মন্ত্রটি নিম্নরূপ :

সিন্দুর সিন্দুর চিনা সিন্দুর আমার সিন্দুর পড়া
ফন্নির কপালে দিলে ফোঁটা ফন্নার হবে বোকা পাঠা
কার আজ্ঞায়? কামরূপ কামাক্ষ্যার আজ্ঞায়।
আমার সিন্দুর পড়া যদি লঙ্ঘন হয়,
ঈশ্বর মহাদেবের মাথায় মুছি দিব দুই পা।
চিলিং চিলিং লিং লিং সহায়।
আমার এ পান পড়া অমুকের লাগ
কামরূপ কামাক্ষ্যা মায়ের আজ্ঞা।[৩১]

এদেশের আদিবাসী-উপজাতি মানুষের মধ্যে ও গ্রামীণ সমাজে যে তন্ত্র-মন্ত্রের প্রচলন রয়েছে তার উদ্ভব হয়েছে এদেশের মানুষের বহুজাতিক ধর্ম বিশ্বাসের প্রভাবে। এসব তন্ত্র-মন্ত্র বিচার করলে ও তান্ত্রিকদের মতামত থেকে জানা যায় যে, লোক পরম্পরায় অথবা বংশপরম্পরায় মানুষের মধ্যে সর্বধর্মে শ্রদ্ধা ছিল। বৌদ্ধের নিরঞ্জন, ধরম, গোরক্ষনাথ, হিন্দু ও সনাতন ধর্মাম্বলম্বীদের ঈশ্বর, মহাদেব, বিশ্বকর্মা, পার্বতী, কার্তিক, গনেশ, মনসা, চণ্ডী, কালী, শীতলা, কামিক্ষ্যা, ডাকিনী, যোগিনী, রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, কৃষ্ণ, রাধা, বলাই, চৈতন্য, বিশ্বমিত্র, মুসলমানের আল্লাহ, রসুল, ফেরেস্তা, নবী, আউলিয়া, পীর, দরবেশ প্রভৃতি বৌদ্ধ-হিন্দু-মুসলমান-আদিবাসী-উপজাতি নির্বিশেষে সকলের চিকিৎসার ক্ষেত্রে সমান গুরুত্বপূর্ণ।

ধাঁধা : ধাঁধার ইংরেজী প্রতিশব্দ 'Riddle'। ধাঁধাকে বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন ভাষার ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলেও ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। যেমন : রংপুর ও কুচবিহারে 'ছিলকা' ময়মনসিংহে ঠল্লুক, 'কথা' সিলেট পঁই, 'শিমাসা', উত্তরবঙ্গ ও চটগ্রামে দস্তান প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। ধাঁধায় মূলত ধোকা ও সংশয় থাকে। শৈলেন্দ্র বিশ্বাসের অভিধানে বলা হয়েছে ধন্দ থেকে ধাঁধা শব্দের উৎপত্তি হয়েছে, যার অর্থ ধোঁকা, সংশয়, দুরূহ সমস্যা, কৌতুলজনক ও বুদ্ধিবিকারী প্রশ্ন।[৩২]

ধাঁধার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে পৃথিবীর বহু পণ্ডিত বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা করেছেন। Charles Francis Potter বলেন, "Contrary to the common assumption that they are world puzzles proposed by punsters at evening parties, riddles rank with myths, fables, folktales and proverbs as one of the earliest and most wide spread types of formulated thought".

একটি জাতির জনমানুষের আত্মার গভীর থেকে উচিত স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশকে ধাঁধা বলেছেন—James A. Kelso. তাঁর ভাষায়, "A genuine folk riddle is a spontanious expression coming from the depths of the soul of a people or a race. Riddles are, therefore, in a real sense the vox populi" প্রকৃতপক্ষেই ধাঁধায় একটি জাতিগেষ্ঠীর বুদ্ধিমত্তা, চিন্তা-ভাবনা, জীবনাচারণ, ইতিহাস, ঐতিহ্য সমাজ সংস্কৃতির স্বতঃস্ফূর্ত বর্ণনা থাকে। সেজন্য ধাঁধার নৃতাত্ত্বিক গুরুত্ব রয়েছে। ধাঁধার মধ্যে যে নানা ধরনের পালা-পার্বণ, সংস্কার লৌকিক ভাষায় "ধাঁধায় পল্লী কবিও সাধারণ মানুষের ছন্দোবদ্ধ রচনা, তড়িৎ বুদ্ধির দীপ্তি, প্রতিভার ঔজ্জ্বল্য আমাদের মুগ্ধ করে তোলে। ধাঁধার ভেতর চমৎকার ছন্দ ও বিষয়বস্তুর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।[৩৩] সত্যিই, পরিচ্ছন্ন, সুসংবদ্ধ স্বল্পায়তনের মধ্যে কাব্যগুণ ও চিত্রময়তার নিগুঢ় সাহচর্যে ধাঁধা শ্রোতার সম্মুখে ইঙ্গিতময়তার একটি শরীরী রূপ নিয়ে উপস্থিত হয়। সে কারণেই হয়ত বঙ্কিমচন্দ্র মাহাত বলেছেন, "প্রবাদকে বাদ দিলে লোক সাহিত্যের আর কোনো শাখায় এমন স্বল্পায়তনে পরিচ্ছন্ন সুসংবদ্ধতায় মানুষ তার অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানকে সুচতুর রহস্যময় বাগভঙ্গির মধ্যে প্রকাশ করে নি।"[৩৪]

ধাঁধা অনেক আচার-অনুষ্ঠান, বহু পুরাকাহিনী, রূপকথা ও লোকগাঁথা থেকে উদ্ভব বলে আদিম মানুষের বহু বিশ্বাস, পূর্ব পুরুষপূজা, কোনো দৈব দুর্বিপাক থেকে মুক্তির প্রক্রিয়া ইত্যাদির নিদর্শন পাওয়া যায়। ধাঁধা কবে, কোন সময়কালে সৃষ্টি হয়েছিল তা বলা কঠিন।

ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ-প্রবচন ইত্যাদির মধ্যে কোন শাখাটি সর্বপ্রাচীন এ নিয়েও পণ্ডিতমহলে সংশয়ের অন্ত নেই। এ ব্যাপারে ড. কাজ দীন মুহম্মদ বলেন, "ধাঁধা বা হেঁয়ালী যে কত প্রাচীন তাহা বলা যায় না, তবে অগ্রবর্তী মানব সমাজে বহু প্রাচীনকাল হইতেই এইসব চলিয়া আসিতেছে। শুধু আমাদের দেশে নয় অন্যান্য দেশেও লোকসংস্কৃতিমূলক এসবের প্রচলন দেখা যায়।"[৩৫]

ঋগ্বেদে, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ গ্রন্থে, *মহাভারতে*, কবি ফেরদৌসীর *শাহনামা* গ্রন্থে, *আরব্য উপন্যাসে*, ইহুদিদের গ্রন্থ *বাইবেল*-এ, পারস্য সাহিত্যে, সোমদেবের *কথা সরিৎসাগর* গ্রন্থে, *বেতালপঞ্চবিংশতি*-তে, হোমার-সফোক্লিসের কাব্য-নাটক, নাথ সাহিত্য ও হাতেমতাই-এর পুঁথি সাহিত্যে ধাঁধার ব্যবহার আছে। তাছাড়া সতের শতকের কবি কৃষ্ণরাম দাসের *শিবায়নকাব্যে*, ধনরাম চক্রবর্তীর *ধর্মমঙ্গলে* ও কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যের বেশ কিছু ধাঁধার উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে এদেশের আদিবাসী-উপজাতিদের ভাষায় ধাঁধা, যা তাদের একান্ত নিজস্ব, প্রাচীন যুগে ও মধ্যযুগের কোনো গ্রন্থে পাওয়া যায় না। সেকারণে তাদের মধ্যে কবে থেকে কী ধরনের ধাঁধা সৃষ্টি হয়েছিল তার কোনো ঐতিহাসিক দলিল নেই। তবে একথা এখন বলা যেতে পারে যে, সভ্যতার উষালগ্নে যেহেতু তাদের মধ্যে নৃত্য-গীত, পাহাড় চিত্র, গুহাচিত্র ইত্যাদি উচ্চতর সংস্কৃতির আবির্ভাব ঘটেছিল, সেহেতু সমসাময়িককাল কিংবা তৎপরবর্তী সময়ে তাদের মধ্যে ধাঁধা, প্রবাদ প্রবচনের সৃষ্টি হয়েছিল। এখনো বাংলা ও ভারতের বিভিন্ন আদিবাসী-উপজাতি গোত্রের বিয়ে অনুষ্ঠানে, কৃষিকাজে, মৃতদেহ সৎকারে, মন্ত্রাচারে ও ধর্মে কর্মে ধাঁধার অনুশীলন হয়।[৩৬] ছোট নাগপুরে ওরাওঁ উপজাতির সংস্কৃতিতে ধাঁধা জিজ্ঞাসার মাধ্যমে পাত্রপাত্রী নির্বাচন করা হয়। মধ্যপ্রদেশের গঁড় উপজাতির লোকেরা মৃতের অন্ত্যোষ্টিক্রিয়ায় ধাঁধা চর্চা করেন। বাংলা ও আসামের নাগা, কুকি, গারো, কোচ, মুরং, রাজবংশী প্রভৃতি জাতিগোষ্ঠীর লোকজন ফসল পাকলে ও কাটার সময় ধাঁধা বলে আনন্দ উপভোগ করেন।

ধাঁধা মূল বস্তুকে আড়াল করে তুলনা, সাদৃশ্য, রূপক, উপমা, চিত্রকল্প, অলঙ্কারাদির আশ্রয়ে বলা হয়। সদৃশ-বিসদৃশ ও সমতুল-বিপরীত ভাব, বিষয়বস্তু, ব্যক্তি, গুণ, ক্রিয়া দ্বারা নানা বাতাবরণ রচনা করা হয় মূল বিষয়কে আড়াল করার জন্য। ধাঁধার বাহ্যিক লক্ষণের উপর ভিত্তি করে ধাঁধার অবকাঠামোকে ১৬টি সূত্রে বিভক্ত করেছেন ওয়াকিল আহমদ। সেগুলো হলো—

(১) রং চিহ্ন (colour/sign) (২) সংখ্যা/পরিমাণ (number/quantity) (৩) গণিত/গণনা (Mathmatics/ enumeration (৪) অক্ষর/শব্দ (Orthography) (৫) প্রবর্তন (Challenge) (৬) তলিকা (Series) (৭) সংলাপ (dialogue) (৮) আত্মকথন (soliloquy) (৯) ধ্বন্যাত্মক শব্দগুচ্ছ (Onomotopoeia) (১০) পুনরাবৃত্তি (repetation) (১১) বৈপরীত্য (contrast) (১২) ছদ্ম অশ্লীলতা (pseudo obscenity) (১৩) নামায়ন (Onomastics) (১৪) ভণিতা (colophon) (১৫) বাক্‌চাতুর্য (tongue twister) (১৬) ক্রিয়া (function).

যাহোক, রাজবংশী সমাজে অজস্র ধাঁধা রয়েছে যেগুলো তারা বিয়ের আসরে বরপক্ষকে জিজ্ঞাসা করে নাজেহাল করত। এই রেওয়াজ এখনো সম্পূর্ণ বিলিন হয়ে যায় নি। এখনো তাদের সমাজে অবসরে বসে, ধান পাকা ও কাটার সময় ধাঁধা জিজ্ঞাসা করা হয়। অবশ্য এখন আর এগুলোকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে, কিংবা অপদেবতা তাড়ানোর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় না। নিছক আনন্দ উপভোগের জন্যই এগুলো তারা বাঁচিয়ে রেখেছেন। তাদের সমাজে ব্যবহৃত কতকগুলো ধাঁধার নমুনা দেওয়া হলো :

১. কাঁচায় ন্যালব্যাল পাকায় সিন্দুর উত্তর যে না
কতি পারে তার মা খায় পাকা ইন্দুর। উ: পালেদের হাড়ি

২. একটুখানি গাছে কেষ্ট ঠাকুর দোলে। উ: তেঁতুল

৩. কাঁটলে বাঁচে, না কাটলে মরে। উ: নবজাতকের নাভি

৪. আট পা ষোল হাটু মাছ ধরতে যায় লাটু
গাঙে ফ্যালে জাল, মাছ ধরে খায় চিরকাল। উ: জাল, জল, মাছ

৫. বাপরে বাপ মাথায় পড়লো চাপ পালালো বাইরের
হাটে আমি পালাবো কোন ঘাটে। উ: জাল, জল, মাছ

৬. সভা করে বসে আছে দেব চারিজন
তিন পেটে পাঁচ পদ করি নিরূপণ।
অষ্টাদশ কান ত্যর বাহু চৌদ্দ খান।
উনিশ লোচন বিচার করে কহ তবে কোন কোন
দেবতার স্থান।

উ: নাম	পেট	পা	কান	বাহু	চোখ
কার্তিক	১	২	১২	২	১২
দূর্গা	১	২	২	১০	৩
বাহু	০	০	২	০	২
বার দেবতা	১/৩	১/৫	২/১৮	২/১৪	২/১৯

৭. নাক দিয়ে খায় মুখ দিয়ে হাগে। উ: ঘুণি

৮. চার পা ষোল খুর লেজ লম্বা বহু দূর
মানুষ ছাড়া খায় না মরা মানুষ ছোঁয়না। উ: ডাং

৯. বিধাতা নির্মাণ করে নাহিক দুয়ার তাহাতে পুরুষ
এক বৈসে নিরাহার যখন পুরুষবর হয় বলবান
বিধাতার সৃজন ঘর করে খান খান। উ: ডিম্ব

১০. যোগী নয়, সন্ন্যাসী নয়, মাথায় হুতাশন
ছেলে নয়, পিলে নয় ডাকে ঘন ঘন।
চোর নয়, ডাকাত নয় বর্শা মারে বুকে। কন্যা
নয় পুত্র নয় চুমো খায় মুখে। উ: হুক্কা

১১. কোন জীব সকালে চার পায়ে হাঁটে
দুপুরে দুই পায়ে হাঁটে,
সন্ধ্যায় তিন পায়ে হাটে? উ: মানুষ

১২. হাতীর দাঁত ময়ূরে পাখ এই শোলক না ভাঙ্গতি
পারলি গাধার জাত। — উ: মূলা

১৩. কোন ড্রাইভার গাড়ী চালায় না। — উ: স্ক্রু ড্রাইভার

১৪. কোন ছাতা সবচে ছোট। — উ: ব্যাঙের ছাতা

১৫. হাতুর নিন বাইশ খান
চোরে নিয়ে গেল তিনখান,
আর থাকলো কয় খান। — উ: শূন্য

১৬. টানলে কমে, কাটলে বাড়ে
এমন জিনিস কি আছে সংসারে? — উ: সিগারেট/বিড়ি ও পুকুর

১৭. উঠোন ঠন্ ঠন্ পিড়েত বাড়ি
কোনো দাদার জিহ্বায় দাড়ি? — উ: শামুক

১৮. ইড়িং বিড়িং তিড়িং ভাই
চোখ দুটো তার মাথা নাই? — উ: কাঁকড়া

১৯. ছোট্ট কালে ঘোমটা, বড় হলে ল্যাংটা। — উ: বাঁশ

২০. বাগান থেকে বেরোলো টিয়ে
সোনার মুকুট মাথায় দিয়ে। — উ: আনারস

২১. লাল মিয়া হাটে যায় দুই গালে থাপ্পড় খায়। — উ: মাটির পাতিল

২২. একটুখানি গাছে, রাঙা বউটি নাচে। — উ: মরিচ

২৩. সাগরে জন্ম তার লোকালয়ে বাস
মায়ে ছুলে পুত্র মরে একি সর্বনাশ। — উ: লবণ

২৪. কথায় আছে, কাজে নেই, দেখাও যায় না। — উ: ঘোড়ায় ডিম

২৫. লাল লাল জামা গায়
মেম সাহেবরা হাটে যায়। — উ: [illegible]

২৬. তিন তের মধ্যি বার, চার দিয়ে পূরণ কর এই
আমার স্বামীর নাম, বাড়ি নন্দীগ্রাম। — উ: ৩.১৩+১২+৯=৫৫ জন

২৭. চার পায়ার উপরে নিপায়া নাচে
দুপায়া রইছে ডালে। — উ: মরা গরু, মাছ, চিল ও শুকনো
আইখ্যার উপর পইখ্যার বাসা, জল দিয়াছে
চালে শুন কন্যা বিবরণ বাঘের পাড়া জলে ভাসে
কি কারণ। — উ: গোবরে বাঘের পায়ের ছাপা

২৮. খাওয়ার জিনিস নয় তবু সর্বলোকে খায়
ছেলেপিলে খালি পরে কেন্দে ঘরে যায়।
বৃদ্ধ লোকে খালি পরে, করে হায়
হায় যুবলোকে খালি পরে ফিরে ফিরে চায়। — উ: আছাড় খাওয়া

২৯. কালো পাথর মাজ তুমি, কারো তোমার গা
কি জাতির মেয়ে তুমি বল দেকি গা? — উ: কাল পাথর মাজি আমি কাল আমার গা কলসীর কানায় ডিম রেখে ছাগলে দেয় তা সেই জাতির মেয়ে আমি, মরি আ হা হা : স্যাকরার মেয়ে।

৩০. কালো কালো ভোমরা কালো ঘাস খায়
রাত হলে ভোমরা খোয়াড়ে লুকায়। — উ: ক্ষুর

৩১. থাল ঝন ঝন থাল ঝন ঝন থাল নিল চোরে
বৃন্দাবনে লাগলে আগুন কে নিভাতি পারে? — উ: রৌদ্র

৩২. গলা আছে তলা নেই, পেট আছে উজুরি নেই। — উ: পোলো

৩৩. মাটির বাছুর, কাঠের গাই
ওরে বিটা কালা চাঁন্দ দুধ খাবি তো বাছুর বান্দ। — উ: খেজুর গাছ ও মাটির ভাঁড়

৩৪. চিৎ করে ফেলে, উপুড় করে করে
এমন করা করে গহনা শুদ্ধ নড়ে। — উ: শিলানোড়ায় মশলা বাটা

৩৫. দুই পাশে ঢাল, মধ্যিখানে খাল, তার মধ্যি লাল
বরযাত্রী হেঁয়ালী কয় তোমরা যা ভাবছ তা নয়। — উ: সিঁথিতে সিঁদুর

৩৬. গিয়েছিলাম বার বাজারের হাটে
দেখে এলাম এক ছওয়াল দুই মায়ের পেটে। — উ: কপাটের খিল

৩৭. কোনো চিল ওড়ে না? — উ: আঁচিল

৩৮. মামার মা মারা গেলে থাকলো কি? — উ: মা

৩৯. শুড় দিয়ে কাজ করি নই আমি হাতি পর হিতে
খাটি সদা, তবু নিত্য খায়, লাথি। — উ: ঢেঁকি

৪০. কোলকাতার লাগল আগুন
নারকেল বাড়িতে উঠলো ধুম। — উ: হুঁকা

৪১. বল দেখি ভাই, ঘরখানা আছে তার দুয়ায় খানা নাই। — উ: ডিম

৪২. হাড়ের বলদ, চামের শিং, খাড়াইলে বলদ পাড়ে নিন্দ। — উ: শামুক

৪৩. এক গাছে এক ফল পেকে আছে টলমল। — উ: আনারস

৪৪. এক গাছে তিন তরকারী, বসে আছে রাসবিহারী। — উ: কলাগাছ

৪৫. পাহাড়ের দুই ধারে থাকে দুই ভাই এক সাথে চলে তবু দেখাদেখি নাই। — উ: কান

৪৬. ছোট ছোট ছেলেরা ভাঙা নাও ছ্যাছে উই পোকায় কামড় দিলে তুরতুরহিয়া নাচে। — উ: খই

৪৭. হাসতি হাসতি যায় নারী পর পুরুষের কাছে,
দিবার কালে কান্নাকাটি ভিতরে গেলি হাসে। উ: শাঁখা/চড়ি পরা

৪৮. গাছ কাট, গাছালি কাট গাছের কাট মাজা
শও শও কুড়ালে কাট তবু না যায় কাটা। উ: ছায়া

৪৯. হাত নাই পা নাই গড়গড়ায়ে যায়
কাটলে তার মাংস নাই সর্বলোকে খায়। উ: জল

৫০. বেঁচে থাকতে এক, মরলে দুই
ধুয়ে পাখলে তুলে থুই। উ: ঝিনুক

৫১. এক কুড়ি বার ভাই একই ঘর থাকে
সকল ভাইয়ের এক নাম, একই নামে ডাকে। উ: দাঁত

৫২. আকাশেতে থাকে সে 'নারি' নাম ধরি নহে তো
কামিনী আকাশেতে গঙ্গা বন্দি হইল কেমনি? উ: নারিকেল

৫৩. এমন একটা বস্তু ভাই পিঠ দিয়া চলে
চাঁদ নয় সুরুজ নয় দিনে রাতে জলে। উ: ডোঙা/নৌকা

৫৪. সব কিছু পাড়ি দিয়ে যায়,
নদীর কাছে গেলে থেমে যায়। উ: পথ

৫৫. রাজার বাড়ির ম্যানা গাই, ঘাটে ঘাটে জল খায়। উ: বঁড়াশি

৫৬. দুই হাত কুড়ি আঙুল নাকটা
পা, পৃষ্ঠা মাথাটা
চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, নাই
এমন জন্তু কি রে ভাই? উ: মানুষ

৫৭. লম্বা সাদা দেহ তার মাথায় টিকি রয়
টিকিতে আগুন দিলে দেহ তার ক্ষয়। উ: মোমবাতি

প্রবাদ : প্রবাদ একটি জনগোষ্ঠীর অমূল্য সম্পদ। এটি সমাজ বা জাতির সুদীর্ঘ ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা লব্ধ রস ও লৌকিক অভিব্যক্তির ফসল। সমাজের মানুষের রীতিনীতি, ধর্মবিশ্বাস, আচার-আচরণ, সংস্কার সংস্কৃতিই ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। সেই দিক বিবেচনা করে বলা যায়, কোনো জাতিগেষ্ঠীর সভ্যতা-সংস্কৃতির ধারক বাহক হলো প্রবাদ।

প্রবাদের অবয়ব অর্থ-ব্যঞ্জনা ও ব্যবহার প্রায় সর্বত্র এক। জনপদ ও ভৌগোলিক অবস্থার কারণে বিষয়বস্তুর ভিন্নতা দেখা যায়। ভিন্ন জনপদ ও ভিন্ন পরিবেশের কারণে চিত্রকল্পেও ভিন্নতা থাকে। রাজবংশী সমাজের লোকজন যখন প্রবাদ প্রয়োগ করেন তখন তারা আগে একটা ভূমিকা করেন, যেমন-'কথায় বলে না', কথায় আছে', বা 'কথায় বলে' ইত্যাদি। মোটকথা, তাদের সমাজের এসব প্রারম্ভিক ক্ষুদ্র বাক্যগুলো প্রবাদের সমার্থক।

ধাঁধা ও প্রবাদ উভয়ের অর্থ সরাসরি প্রকাশ পায় না। বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তা করে অর্থোদ্ধার করতে হয়। কেউ কেউ অবশ্য বলেন যে, বুদ্ধিবৃত্তিক চিত্রকল্পের মাধ্যমে প্রবাদ সৃষ্টি বলে সমাজের নিম্নকোটির আদিবাসি-উপজাতি সমাজে এগুলোর উদ্ভব হয় নি। কিন্তু বিষয়টি সত্য নয়। কেননা, তারা এ ধরনের সত্যাশ্রয়ী বাক্য সৃষ্টি করেন। প্রবাদের উদ্ভব কাহিনী

সঠিকভাবে জানা না গেলেও একথা বলা সঙ্গত যে, সামাজিক প্রয়োজনেই এগুলোর উদ্ভব ঘটেছিল।

যেসব প্রাচীন গ্রন্থাবলী গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসাবে বিবেচিত, সেসব গ্রন্থাবলীতেও প্রবাদের সন্ধান মেলে। এগার শতকের কবি ভুসুকুপা চর্যাপদে লিখেছেন, "আপনা মাংসেঁ হরিণা বৈরী", তেমনি বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*, মুকুন্দরামের *চণ্ডীমঙ্গল*, শাহ্ মোহাম্মদ সগীরের *ইউসুফ-জুলেখা,* দৌলত উজির বাহরাম খানের, *লায়লী-মজনু,* কৃত্তিবাসের *রামায়ণ,* কাশীরাম দাশের *মহাভারত,* ভারত চন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে প্রবাদের বহুল ব্যবহার আছে।

প্রবাদ সৃষ্টিতে ব্যক্তিমানসের বুদ্ধি অভিজ্ঞতা, রসবোধ ও সৃজনশীলতা মূখ্যভূমিকা গ্রহণ করে তাতে সন্দেহ নেই। তবে আদিম সমাজের ব্যক্তির কোনো স্থান ছিল না বলেই ব্যক্তিসৃষ্ট সমস্ত রচনা সমষ্টির সৃষ্টি হিসাবে ধরা হয়। তৎপরবর্তীকালে যখন বিভিন্ন জনপদের সাথে মিথষ্ক্রিয়া (communicaton & interaction) ঘটেছে তখন সেগুলো পরিব্যাপ্তি লাভ করেছে। সেকারণে ঠিক কোন কোন সৃষ্টিগুলো কোন কোন জাতিগোষ্ঠীর তা স্পষ্টভাবে ধরা সম্ভব হয় না।

স্পেনের লোকবিদ Cervantes বলেন, "A proverb is a short sentence based on long experience"। ব্যক্তি, পরিবার, দেশ, সমাজ, জগৎসংসার, পরিবেশ, কাল-কৃষ্টি সম্পর্কে মানুষ যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে তা সংহত আকারে একটি বাক্যে বিশেষ রীতিতে প্রকাশ করলে প্রবাদ হয়। ফরাসী পণ্ডিতের ভাষায়, "Proverb are crystalized forms of human experence".

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রবাদের সংজ্ঞায় বলেছেন, "প্রবাদ গোষ্ঠীজীবনের অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ততম সরস অভিব্যক্তি।" দেশ-বিদেশের পণ্ডিতের সংজ্ঞার নির্যাস থেকে সংজ্ঞাটি সংজ্ঞায়িত হয়েছে।[৩৭]

বিভিন্ন পণ্ডিতের সংজ্ঞা থেকে প্রবাদের কতগুলো বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায়। যথা—

১. প্রবাদে জাতির দীর্ঘ অভিজ্ঞতা (long expeience), পরিণত বুদ্ধি (elder wisdom), নিটোল নীতিবাক্য (terse dedactve statements), নৈতিকতার অলিখিত বিধি (unwritten laws of morality) স্ফটিককৃতরূপ (crystalized forms), শব্দগুচ্ছের সমন্বয় (conbinationf of words), বিষয়মন্তব্য সম্বলিত বর্ণনাধর্মী উপাদান (descriptive element consisting of alopic and a comment).

৩. প্রবাদ জাতি তিহ্য প্রবহমান (current in tradition), ঐতিহ্যোশ্রিত বক্তব্যধর্মী উক্তি (Traditonal & propositional statements).

৪. রূপক, বক্রোক্তি, বিরোধাভাস অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের ভাষায় প্রবাদ প্রকাশিত হয় (an expresion by a figure, periphrasis antithesis of hyperbole) প্রবাদের প্রকাশভঙ্গি সরল, নিটোল ও রূপকধর্মী।[৩৮]

সামগ্রিক সমাজকে জানার জন্য, লোকঐতিহ্যের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতাকে চলমান জীবনের সঙ্গে তুলনামূলক বিশ্লেষণের জন্য শ্লীল ও অশ্লীল প্রবাদ-প্রবচন সমধিক গুরুত্বপূর্ণ।

সেকারণে ভাষাতত্ত্ববিদ ও নৃতত্ত্ববিদদের বিচার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে দুই ধরনের প্রবাদই মূল্যবান উপকরণ। এ দিকে দৃষ্টি রেখে যথাসম্ভব উভয় ধরনের প্রবাদ সংগৃহীত হয়েছে। রাজবংশীদের ভাষা বাংলা এবং বাঙালিদের সাথে একই অখণ্ড জনপদে পাশাপাশি বসবাস করার ফলে বাঙালিদের প্রবাদের সাথে হুবহু মিল পাওয়া যাবে। তবে কিছু কিছু প্রবাদ নতুন ও ব্যতিক্রমধর্মীও পরিলক্ষিত হয়েছে।

রাজবংশী সমাজে বরকনে নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিবাহের আচার-অনুষ্ঠানে, আয়োজন সমারোহ সমস্তটাই ব্যঙ্গবিদ্রুপ পরিলক্ষিত হয়। সেগুলো প্রবাদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। নিম্নে তাদের সমাজে প্রচলিত কিছু প্রবাদ তুলে ধরা হলো :

১. নদীর জল ঘোলা ভাল, জাতের মেয়ে কালো ভাল।
২. য্যামন ছাগল, তেমনি তার খুটো।
৩. য্যামন দাদা ভজহরি তেমনি দিদি মুন্দাদরি।
৪. মিয়া বিবি রাজী, তো কি করবে কাজী।
৫. বিয়ের মজা বাজনায়, জমির মজা খাজনায়।
৬. ওঠ ছেমড়ি তোর বিয়ে, টোপর মাথায় দিয়ে।
৭. যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়া পড়শীর ঘুম নেই।
৮. চিড়ে বল মুড়ি বল ভাতের সমান না, মাসি বল পিসি বল মায়ের সমান না।
৯. মার বোন মাসি কাদার তলে ঠাসি, বাবার বোন পিসি ভাত কাপড় দে পুষি।
১০. নিজে বাঁচলে বাপের নাম।
১১. ছেলে না কাঁদলে, মা দুধ খাওয়ায় না।
১২. লক্ষ কথার আগে বিয়ে হয় না।
১৩. মার চেয়ে মাসী ভাল, আমি বলি তারে ডাইনী।
১৪. ভাত দেয় না ভাতারে, ভাত দেয় গতরে।
১৫. গতর না খাটালে সোয়ামীও জ্বলে।
১৬. ভাত দেয়ার মুরোদ নেই, নিয়ে শুয়ার গুঁসাই।
১৭. ভাত দেয়ার ভাতার না, কিল মারার গুঁসাই।
১৮. পিঠে বেঁধেছি কুলা কানে দিয়েছি তুলা, যত কিলাবি কিলা।
১৯. ভাতারে আনলি ধন, গিন্নী লক্ষ্মী হন।
২০. হলুদ জব্দ শিলে, মাগী জব্দ কিলে, ধ্যাতলা মেয়ে জব্দ হয় শ্বশুর বাড়ি গেলে।
২১. যে রান্ধে সে চুলও বান্ধে।
২২. হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে, কান্দলি কি আবার মেলে?
২৩. এক হেঁসেলে তিন রাধুনী পুড়ে মরে ফ্যান গালুনি।
২৪. সাধলি জামাই খায় না পিঠে, শেষে মরে তাওয়া চেটে।
২৫. আসরে পাই না ঠাই, ঘরে এসে মাগীকে কিলায়।
২৬. বৃন্দাবনে সবাই সতী, নাম কিনেছেন রায়।
২৭. মানষির কুটুম আইলে গেলি, গরুর কুটুম চাটলি চুটলি।
২৮. হাতে নেয় পয়সা কড়ি, মিনসে যায় শ্বশুর বাড়ি।
২৯. পুঙায় নেই চামড়া, দুধদে খায় পাকা আমড়া।

৩০. নিধনীর ধন হলে দিনে দেখে তারা।
৩১. অতিথি আনে নাকে দড়ি, কুঁচে খায় লাঠির বাড়ি।
৩২. উপর দিকে ফেলালে থু থু নিজের গায়ে লাগে।
৩৩. ফেল কড়ি মাখ তেল।
৩৪. নিঃশ্বাসের বিশ্বাস নেই।
৩৫. রাখে হরি মারে কে, মারে হরি রাখে কে।
৩৬. যার যখন চলে ভাল, মুতলে বাতি জ্বলে আলো।
৩৭. মানলে শিব না মানলে পাথর।
৩৮. বেচা গরুর দাম নেই।
৩৯. ঢেঁকি সঙ্গে গেলিউ ধান ভানে।
৪০. ফাঁপা ঢেকির আওয়াজ বেশি।
৪১. মারিতো গাণ্ডার, লুটিতো ভাণ্ডার।
৪২. মাঘের শীত বাঘের গায়।
৪৩. বনগায়ে শিয়াল রাজা।
৪৪. দুধের গাই-এর লাথিও সহ্য হয়।
৪৫. মদ্দে মদ্দে লড়াই হয়, উলু খড়ের পরান যায়।
৪৬. এক হনুমানের মুখ পুড়লে হাজার হনুমানের মুখ পোড়ে।
৪৭. গাছে বেল পাকলে তাতে কাকের কি।
৪৮. অতি সিয়ানার গলায় দড়ি, কুঁচে খায় লাঠির বাড়ি।
৪৯. উঁই পোকার ডানা ওঠে মরনের তরে।
৫০. ছুঁচোর চাকর চামচিকে, তার মাইনে চৌদ্দসিকে।
৫১. পেটে ক্ষুধা মুখে লাজ, সেই বউ-এর নেই কাজ।
৫২. নেই কাজ তো খই ভাজ।
৫৩. সোজা আঙুল ঘি না উঠলে বড়শি আঙুলে ওঠে।
৫৪. যার শিল তার নুড়া, তারই ভাঙে দাঁতের গোঁড়া।
৫৫. পুঙায় নেই চাম, সেনাপতি নাম।
৫৬. হাগে ছোঁচে না, পাদে গলা জলে যায়।
৫৭. হাগবেউ না পথও ছাড়বে না।
৫৮. বিয়ের সময় কন্যা বলে মোতপো।
৫৯. মনু রায়, খাওয়ার সময় মুততে যায়।
৬০. ঘরের শোভা এয়োতি বউ ক্ষেতের শোভা ধান,
কোলের শোভা শিশু ছেলে যেমন নতুন চাঁন।
৬১. যা বায়ান্ন তাহাই তিপ্পান্ন।
৬২. মনে নেই শখ, কি দে রান্দি গজার মাছের টক।
৬৩. নিত্য রুগীর ঔষধ নেই,
নিত্ ভিখারীর ভিক্ষা নেই।
৬৪. কান টানলে মাথা আসে।

৬৫. লোহাই লোহা কাটে, জাত কাটে জাতে,
রাগে হয় পয়মাল, খায় কলা পাতে।
৬৬. নেই কাজ তো, খৈ ভাজ।
৬৭. নাচতে না জানলে উঠোনের দোষ।
৬৮. লোম বাছতে কম্বল উজাড়,
ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়।
৬৯. এক হাতে তালি বাজে না।
৭০. চোরের ধন বাটপারে খায়।
৭১. আচারে লক্ষ্মী, বিচারে পণ্ডিত।
৭২. দিন যায় কথা থাকে।
৭৩. এক মাঘে শীত যায় না।
৭৪. পরের ধনে পোদ্দারী, লোকে বলে গাদ্দারী।
৭৫. সুঁই কয় চালনের তোর পাছায় ফুটো।
৭৬. দশচক্রে ভগবান ভূত।
৭৭. গরু কোন্দে খুটোর জোরে।
৭৮. হাতি মলিও লাখ টাকা বাঁচলিও লাখ টাকা।
৭৯. পোঁদে চেনে কঁচু, শুয়োরে চেনে ঘেঁচু।
৮০. সাধে কি বিড়াল গাছে ওঠে।
৮১. ডায়ো জানে গুড়ের খোঁজ।
৮২. পুরোনো চাল ভাতে বাড়ে।
৮৩. নয় বানানি রাধে, সকাল বেলায় হাসে তো বিকেল বেলায় কাঁদে।
৮৪. যার জন্যে করি চুরি সেই বলে চোর।
৮৫. অভাগার গুরু মরে, ভাগ্যবানের বউ মরে।
৮৬. আশায় মরে চাষী, ধিয়ানে মরে যুগী।
৮৭. রাম করাত ! যেতেও কাটে আসতেও কাটে।
৮৮. হয় মুচি কানাই বোষ্টমী ক 'মুচি-বোষ্টনী কইসনে।
৮৯. পাড়া সম্পর্কে মুচি কাকা।
৯০. আঁধার ঘরে দিনের আলো, যতটুকু জ্বলে ততটুকু ভাল।
৯১. কামার বাড়ির বিড়াল, ঠকঠকিতে ভোলে না।
৯২. পারে না ঘট গড়তে, নিয়ে বসে কোলার বায়না।
৯৩. কুথাকার কে, আমড়া ভাতে দে।
৯৪. ভাতারের ভাত খাবি-দাবি গান গাইবি সুখে,
ছেলের ভাত খাতি গেলি কাঁদবি রে তুই দুঃখে।
৯৫. যমের মুখে পান্তা ভাত, খিদে মরে না পাথর চাট।
৯৬. বাপের কালে নেই কো চাষ, ধানকে বলে দুবলো ঘাস।
৯৭. কুঁজোও চিৎ হয়ে শুতে চায়।
৯৮. বামুন গেল ঘর, নাঙল তুলে ধর।

৯৯. মোল্লার দৌড় মসজিদ তামাতি।
১০০. পাঁজির পা ঝাড়া।
১০১. ঘোড়া দেখলেই খোঁড়া হয়।
১০২. পরের কাজে কামার ব্যস্ত।
১০৩. চাষা চিনা যায় হাড়ে, তাঁতি চিনা যায় পাড়ে।
১০৪. শাঁকের মধ্যে পুঁই, মাছের মধ্যে কৈ, পাখির মধ্যে বৈ।
১০৫. ঘরের শোভা এয়োতি বউ ক্ষেতের শোভা ধান।
১০৬. চাল ভাঁজা খাতি মজা, দেখতে ভাল মুড়ি।
এক ছেলের মা করতি মজা দেখতি ভাল ছুড়ি।
১০৭. গাঁয়ের যোগী ভিক পায় না।
১০৮. চেনা বামুনের পৈতার দরকার হয় না।
১০৯. চোরের মার বড় গলা।
১১০. আপ ভাল তো জগৎ ভাল।
১১১. আপন চেয়ে পর ভাল, পরের চেয়ে জঙ্গল ভাল।
১১২. মরার উপর খাড়ার ঘা
১১৩. কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা।
১১৪. চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।
১১৫. শীতে ভাল কম্বল, ঝোলের মধ্যে অম্বল।
১১৬. যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ।
১১৭. সেই রামও নেই, অযোধ্যাও নেই।
১১৮. স্বভাব যায় না মলি, ইল্লেৎ যায় না ধুলি।
১১৯. নদী না দেখেই ন্যাংটা হওয়া ভাল না।
১২০. পেটে খেলে পিটে সয়।
১২১. অদিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।
১২২. ধান ভানতে শিবের গীত।
১২৩. কবে পাকবে তাল, বসে কাটায় কাল।
১২৪. সবাই ভাল সবাই মন্দ, পিঁয়াজ রসুন একই গন্ধ।
১২৫. পথে দেখলে কামার, ফাল গড়ায় দে আমার।
১২৬. ঈশারায় পণ্ডিত বোঝে, মুখ্য বোঝে কিলে,
পাড়া-পড়শী বোঝে তখন চোখে আঙুল দিলে।
১২৭. হাগে ছোঁচে না, আলো চালে ওব্যসি করে।
১২৮. তিন টাকার ছাগল গেল, তো শিয়ালের মন তো চিনা হলো।
১২৯. মাথায় বুদ্ধি থাকলে বাপের বাড়িও বাচ্চা হয়।
১৩০. বসে খেলে রাজার ধনেও কুলোয় না।
১৩১. মেয়ে মানুষ আর কলা গাছ তাড়াতাড়ি বাড়ে।
১৩২. কাজের বেলায় কাজি, কাজ ফুরোলেই পাঁজী।
১৩৩. নামে তালপুকুর ঘটি ডোবে না।

১৩৪. যার কণ্ঠে ঘা সে বলে বাঁচি, যার হাঁটুতে ঘা সে বলে মরি।
১৩৫. নতুন নতুন তেঁতুল বিচি, পুরানো হলে বাতায় গুজি।
১৩৬. মার পোড়ে না মাসির পোড়ে।
১৩৭. চ্যাঙ উজোয় ব্যাঙ উজোয়, দাদা বলে আমিও উজোয়।
১৩৮. য্যামন বুনো ওল তেমন বাঘা তেঁতুল।
১৩৯. ঘরের বউ উপোষ করে, ছুঁচোয় এসে কীর্তন করে।
১৪০. অভাগা যেদিকে যায় সাগর শুকিয়ে যায়।
১৪১. গাধাও পশু, আর চামচিকাও পাখি।
১৪২. অতি বাড় বেড়ো না ঝড়ে পড়ে যাবে,
অতি ছোট হয়ো না ছাগলে মুড়ে খাবে।
১৪৩. ইয়ার্কির নাম লোকসান।
১৪৪. হত থাকলে যশ, কত নাঙ হবে বশ।
১৪৫. চোরের মার বড় গলা, আরো খায় দুধ কলা।
১৪৬. মায় রান্দে য্যামন–ত্যামন বোন রান্দে পানি।
নতুন বউ রান্দে ভাল যেন পরমান্নখানি।
১৪৭. কাজের মধ্যে দুই, খাই আর শুই।
১৪৮. শিকারী বিড়াল গোঁফ দেখলেই চিনা যায়।
১৪৯. পার হয়ে গেলে পাটনী হয় বাড়ারশালা।
১৫০. এক দুয়োব বন্ধ তো হাজারো দুয়োর খোলা।
১৫১. কারুর ঘরে আগুন ধরে কেউ শলোকে চাল ঝাড়ে।
১৫৩. ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।
১৫৪. চোরে চোরে মাসতুতো ভাই।
১৫৫. কাজীর গরু খাতায় আছে, গোয়ালে নেই।
১৫৬. দুই দিন বৈরাগী হয়ে ভাতরে কয় অন্ন।
১৫৭. কড়ি কটকা চিড়ে দই, কড়ি বিনে বন্ধু কই?
১৫৮. এ গাঁয়ে রোদ নেই চান্দাফ্রায় রোদ।
১৫৯. হাতি যখন ফাঁদে পড়ে চামচিকায়ও লাথি মারে।
১৬০. হাতি ঘোড়া গেল তল, ভেড়া বলে কত জল!
১৬১. সব মাছে গু খায়, ঘাওড়া মাছের নাম হয়।
১৬২. শক্তের ভক্ত নরমের যম।
১৬৩. যায় দিন যায়রে কচুর লতি খাইয়ে,
একদিন কব কথা, দিনের নাগাল পাইয়ে।
১৬৪. প্রেমে মজেছে মন, কে বা হাড়ি কে বা ডোম।
১৬৫. যদি হয় সুজন, এক বিছানায় নয় জন।
১৬৬. যদি থাকে বন্ধুর মন, গাঙ পর হতে কতক্ষণ।

প্রবচন : আপাত দৃষ্টিতে প্রবাদ ও প্রবচনের মধ্যে পার্থক্য খুঁজে না পাওয়া গেলেও সুক্ষ্মভাবে বিচার করলে স্পষ্ট পার্থক্য চোখে পড়ে। প্রবাদের ভেতর গূঢ়ার্থ-নিহিত থাকে, কিন্তু প্রবচনে বাচ্যার্থ ছাড়া গূঢ়ার্থ থাকে না। প্রবচন মূলত সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা, জ্ঞান, নীতি, উপদেশমূলক হয়ে থাকে। এতে রূপক, প্রতীক, সংকেত, চিত্রকল্প থাকে না। প্রবচনের আবেদন প্রত্যক্ষ, সরস ও সহজবোধ্য হয়ে থাকে। প্রবাদের মতো মাথা খাটিয়ে, চিন্তা করে অর্থ খুঁজতে হয় না। নিম্নে রাজবংশী সমাজে ব্যবহৃত কতিপয় প্রবচন তুলে ধরা হলো :

১. নিম তিতা নিসুন্দি তিতা আর তিতা জর (বিষ)
এর থেকেও বেশি তিতা দুই সতীনের ঘর।
২. অভাবে স্বভাব নষ্ট মুখ নষ্ট বরণে
ঝরনায় ক্ষেত নষ্ট, স্ত্রী নষ্ট মারণে।
৩. কুটুম্বের মধ্যে শালা গয়নার মধ্যে বালা
সাজের মধ্যে মালা, বাসনের মধ্যে থালা।
৪. কচি পাঁঠা বুড়ো মেষ।
দৈ-এর আগা ঘোলের শেষ।
৫. সঙ্গ দোষে ছেলে নষ্ট, হাত আলস্যে গোঁফ নষ্ট।
৬. সাঁজে সন্ধ্যা, সকালে ছড়া, তবে হবে লক্ষ্মীর গড়া।
৭. পরের দেখে করলে হায়, যা ছিল তাউ যায়।
৮. উনু ভাতে দুনো বল, ভরা পেটে রসাতল।
৯. ধীরে রান্দ ধীরে খাও, তবে তো তার আস্বাদ পাও।
১০. পূর্বে হাঁস পশ্চিমে বাঁশ/উত্তরে বেড়ে দক্ষিণে ছেড়ে, ঘর করগে যা।
১১. দক্ষিণ দুয়ারী ঘরের রাজা, পূর্ব দুয়ায়ী তাহার প্রজা
পশ্চিম দুয়ারী মুখে ছাই, উত্তর দুয়ারীর খাজনা নাই্।
১২. মাংসে মাংস বৃদ্ধি ঘৃতে বৃদ্ধি বল
দুধে বীর্য বৃদ্ধি শাঁকে বৃদ্ধি মল।
১৩. উদর মোটা রোগী ক্ষীণ
সেই হচ্ছে মৃত্যুর চীন।
১৪. খেলার আগে ব্রহ্মচর্য্য
তারপরে মন ধর ধৈর্য্য
তবে হবে অটল বীর্য।
১৫. আগে তিতা পাছে মিঠা।
১৬. মিনিট দশেক স্নানের পরে থাকা উচিৎ অনাহারে।
১৭. ভাত নাই যার মান নাই তার।
১৮. চিড়া বল, পিঠা বল ভাতের সমান নয়
মাসী বল, পিসি বল, মায়ের সমান নয়।
১৯. শ্বশুর বাড়ি মধুর হাড়ি, তিন দিন পর ঝাঁটার বাড়ি।
২০. অভাবে স্বভাব নষ্ট, বুদ্ধি নষ্ট ভাতে।

২১. পটল বুনলে ফাল্গুনে ফল বাড়ে দ্বিগুনে
ফাল্গুনে না বুনলে ওল শেষে হয় গণ্ডগোল
খনা বলে চাষার পো শরতের শেষে সরিষা রো
সরিষা বুনে কলাই মুগ বনে বেড়াও চাপড়ে বুক
কার্তিকের জলে দুনো ধান খনা বলে।
তামাক পোঁত গুড়িয়ে মাটি বীজ পোঁত গুটি গুটি।
হাত বিশেষ করি ফাঁক, আম কাঁঠাল পুঁতে রাখ।
গাছ গাছালি ঘন সবে না, ফল তাতে ফলবে না
খনা বলে শুন শুন, শরতের শেষে মূলা বুন।
২২. যে করে পরের আশ, তার হয় সর্বনাশ।
২৩. কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, পাকলে করে ঠাস্ ঠাস্।

লোককাহিনী (Folk tales) : লোককাহিনীগুলো শুনে আবালবৃদ্ধবনিতা শুধু নির্মল আনন্দ উপভোগই করে না, গল্পগুলো অনেক সময় ধর্ম-নীতি-জ্ঞান শিক্ষাদান করে। রাজবংশী সমাজে নানান ধরনের গল্পের প্রচলন আছে। সেসব গল্প স্বর্গ-মর্ত-পাতাল, দৈত্য-দানব-রাক্ষস-খাক্কস, ভুত-প্রেত-ডাইনী, সাধু-সন্নাসী, পীর-ফকির, তাঁতি-কামার-কুমার-জেলে-ধোপা-নাপিত-ব্রাহ্মণ, নদী-সাগর-পাহাড়-পর্বত-অরণ্য, চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা ইত্যাদি নিয়ে রচিত। তাছাড়া নানাবিধ ধর্মীয় কাহিনী অবলম্বনে ব্রতকথার প্রচলন আছে। আছে পৃথিবী, মাটি-জল-মানুষ, প্রকৃতি সৃষ্টির কাহিনী। এসব কাহিনীর উপর ভিত্তি করে দেশী-বিদেশী সমালোচকগণ বিষয় (theme), অর্থ (meaning) ও রূপবিচার (form) করে লোককাহিনীকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। যেমন-রূপকথা (fairy tales), ব্রতকথা (religionus tales), রোমাঞ্চকর কাহিনী (novella), পুরাকাহিনী (myth), স্থানিক কাহিনী legend), সন্তকাহিনী (sage tales), নীতি কথা (fables), পশুকাহিনী (animaltales) প্রভৃতি।[৩৯] এখানে নমুনা হিসাবে ব্রতকথা, রূপকথা ও পুরোকাহিনীর উদাহরণ দেওয়া হলো :

ব্রতকথা : কেউ কেউ লোককাহিনীর থেকে আলাদা মনে করেন। কিন্তু ব্রতকথা চারিত্রিক দিক দিয়ে রূপকথার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। শুধুমাত্র ব্রতকথায় লৌকিক দেবতার পূজার উদ্দেশ্যে কিছু আচার-অনুষ্ঠান পালিত হয় বলেই ধর্মীয় অনুভূতির সাথে সম্পৃক্ত মনে করা হয়। পণ্ডিতগণ মনে করেন শুধুমাত্র ব্যবহারিক প্রয়োজনেই লোক-কাহিনীগুলো ব্রতকথায় রূপান্তরিত হয়েছে। ব্রতকথার মধ্যে অনার্যের প্রভাব বিদ্যমান। কোল, মুণ্ডা, সাঁওতাল, রাজবংশী, মাহাত প্রভৃতি সমাজ দৈব-অদৃষ্ট-ঐন্দজালিক যাদুতন্ত্রে খুব বিশ্বাস করেন তাদের ব্যবহারিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে এগুলোর প্রভাব পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্র মাহাত করম পূজার ব্রতকাহিনীটিতে বর্ণনা করেছেন যে, করম পূজা সাঁওতাল, ওরাওঁদের মধ্যে পূজিত হয় খুব আনন্দোৎসব করে। এই ব্রতকথাটি ভবিষ্যপুরাণে পাওয়া যায়। ড: সুধীরকুমার করণ করম পূজা কাহিনীতে সদাগর, লক্ষ্মী, গনেশের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন। ফলে সেটি হিন্দুপ্রভাবপুষ্ট মনে হয়। বস্তুত সাঁওতাল, ওরাওঁ, মাহাতদের করম ব্রতকথাই বামুন-বোষ্টমের কথা আছে, এবং সেটা খুব সাম্প্রতিককালে এ কাহিনীতে অনুপ্রবেশ ঘটেছে বলে ড. মাহাত মত প্রকাশ করেছেন। ড. মাহাত বলেছেন, "যে কোনো ব্রত বা পূজা অনুষ্ঠানে যৎসামান্য অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকলে তাকেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা

পুরাণের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।"[৪০] সুতরাং আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি, যে-সমস্ত লৌকিক দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা নিম্নকোটির মানুষের মধ্যে বহুলভাবে পূজিত হয়ে আসছে, সেগুলোর কোনোটি ব্রাহ্মণ দ্বারা, পূজিত, কোনোটি গ্রাম্য পাহান দ্বারা। আবার কোনোটি মহিলাদের দ্বারা সেসব লৌকিক দেবদেবী সবই অনার্যদের। পরবর্তীকালে সেগুলোর অনেকগুলোকেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের অর্থ উপার্জনের মাধ্যম হিসাবে পুরাণভুক্ত করা হয়েছে।

***শীতলা ব্রতকথা*:** শীতলা পৌরাণিক দেবী নয়, লৌকিক দেবী। প্রাচীন কোনো পৌরাণিক গ্রন্থে শীতলা প্রসঙ্গ নেই।[৪১] *পিচ্ছিলাতন্ত্রে* শীতলা প্রথম দেবীরূপে পাওয়া যায়। সুতরাং হিন্দুদের কোনো প্রাচীন গ্রন্থে স্পষ্টভাবে শীতলা পূজার প্রসঙ্গ না থাকায় বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন বৌদ্ধ তান্ত্রিকরাই সর্বপ্রথম সাকারমূর্তিতে শীতলাদেবীর পূজা করেন।[৪২] বৌদ্ধ হারীতীও শীতলার ন্যায় বসন্ত-ব্রণ ব্যাধিনাশিনী। শীতলা বসন্তরোগ বিনাশীনী। তার মুখমণ্ডলে পেরেকের মাথায় টোপ তোলা বসন্ত চিহ্ন দেখা যায়। নেপালের বৌদ্ধ হারীতীর মূর্তি ঐরূপ। শৈব প্রভাবের ফলে শীতলা বসন্তনাশিনী দেবী হিসাবে যখন জনমনে স্থান করে নিচ্ছিল তখন হীনাবস্থায় পতিত ব্রাহ্মণ যাজকেরাও শীতল দেবীর পূজা করা শুরু করেন, এবং সাথে সাথে শীতলার মাহাত্ম্য ও পূজাচার সৃষ্টি করে শীতলামঙ্গল সৃষ্টি করলেন।[৪৩]

শীতলার ব্রতকথাটি হলো-চন্দ্রবংশীয় এক শৈব নৃপতির নিকট দেবী শীতলা বৃদ্ধার রূপ ধরে এস বলেন, 'শীতলা পূজা না করায় আমার সাতপুত্র বসন্তরোগে মারা গেছে। তাই তোমার শতপুত্রের কল্যাণার্থে শীতলা পূজা কর। কিন্তু রাজা বৃদ্ধার কথায় কর্ণপাত না করায় একে একে বসন্ত রোগে তার পুত্রগণ মারা গেল। তখন রাজা শিবারাধনা করলে শিব সয়ং তাঁর পাশাপাশি চন্দ্রকেতু শীতলার পূজা করতে নির্দেশ দিলেন। রাজা পূজা সম্পন্ন করলে চন্দ্রকেতু শীতলাদেবী মৃত সকলকে বাঁচিয়ে দিলেন।

শুভচণ্ডী বা সুবচনী ব্রত বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভগবতে আছে 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণ। দম্ভ করি বিষ হরি পূজে কোন জনে।'[৪৪] বিশ্বকোষে বলা হয়েছে যে, মঙ্গলচণ্ডির গানগুলো কোনো পৌরাণিক বিষয় নিয়ে রচিত হয় নি। চৈত্যদেবের আবির্ভাবের আগে থেকেই মঙ্গলচণ্ডীর গান গীত হতো। রাজবংশী ও অন্যান্য হিন্দু ধর্মাবলম্বী সমাজে যে সুবচনী পূজা ও ব্রতকতার প্রচলন আছে তা শুভচণ্ডীরই প্রাকৃত রূপ। সুবচনী ব্রতকথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে বিধায় এখানে উল্লেখ করা হলো না।

সারদামঙ্গলে সরস্বতীর মাহাত্ম্য, *কমলামঙ্গলে* লক্ষ্মীচরিত্র, *গঙ্গামঙ্গলে,* গঙ্গাদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। পূজার কাহিনীগুলো পড়লে মনে হয় এগুলোও প্রথমে লৌকিক দেবীরূপে আবির্ভূত হয়েছিল যা পরবর্তীকালে পুরাণে স্থান দেওয়া হয়েছে। শিব পৌরাণিক দেবতা। কিন্তু *লক্ষ্মীমঙ্গল* রচয়িতা কবি জগমোহন দুর্ব্বাসার অভিশাপ হতে সমুদ্রমন্থন বিবরণ পুরাণ হতে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সেখানে শিবের কালীদহে প্রবেশ, কোচিনীরূপে শিবের সাথে প্রেমালাপ প্রভৃতি কাহিনী পুরাণে পাওয়া যায় নি।[৪৫]

***পুরাকাহিনী*:** রাজবংশী সমাজ-জীবনে অনেক পুরাকথা লুকিয়ে আছে। এগুলো লোক মুখে মুখে শ্রুত হয়। লিখিত আকারে এগুলো পাওয়া যায় নি। নমুনা হিসাবে ক'টি উল্লিখিত হলো—

সাপের বিষ হারানো : একদিন মা মনসা সর্পকুলকে ডেকে বিষ প্রদান করছিল। সবচেয়ে বেশী বিষ দিয়েছিল ঢোঁড়া সাপকে। বিষ দেওয়ার পর তাকে লক্ষ্মীন্দরকে কামড়ানোর আদেশ দেয়া হয়েছিল। আদেশ পাওয়ার পর পথিমধ্যে গঙ্গা পার হওয়ার সময় গঙ্গাতীরে কচুপাতায় বিষ রেখে মাছ খাওয়ার লোভে গঙ্গা পার হতে থাকে। কচুপাতার বিষ পিঁপড়া, শিংমাছ, টেংরামাছ, কাঁকড়া ইত্যাদিতে খেয়ে ফেলে। ঢোঁড়া সাপ ফিরে এসে আর ঐ বিষ পায় না। সেই থেকে ঢোঁড়া সাপ বিশ হারিয়ে বিষহীন সাপে পরিণত হয়। মনসাদেবী তাকে অভিশাপ দিয়েছিল যে, এখন থেকে সমস্ত লোক তোকে পায়ে মাড়াবে। আর কচুপাতায় রাখা বিষ পিঁপড়া, শিংমাছ, টেংরা মাছ, কাঁকড়া ইত্যাদিতে খেয়েছিল বলে তাদের কাটায় বিষ হয়েছিল।

ধান গাছে চাল হওয়া : সত্যযুগে ধানগাছে ধান হতো, না, চাল হতো। একদিন একজন মানুষ সেই চালের জমিতে বসে মলত্যাগ করছিল ও ছিঁড়ে খাচ্ছিল। তখন ভগবান ক্ষিপ্ত হয়ে মানবকুলকে অভিশাপ দিলেন, "আমাকে তোরা যখন মলত্যাগ করতে করতে স্পর্শ করে আমার পবিত্রতা নষ্ট করেছিস, তখন তোদের অভিশাপ দিচ্ছি, তোরা এখন থেকে সাতগুণ পরিশ্রম করে চাল বানিয়ে তারপর খেতে পারবি, তার আগে নয়।" তাই ধান কাটার পর মাড়াই করা, বাতাসে উড়িয়ে পরিস্কার করা, সেদ্ধ করা, শুকানো, ঢেঁকিতে ছাটানো ও কুলাতে ঝেড়ে পরিস্কার করে রান্নার উপযোগী করতে হয়।

গরুর কোকে (কোমরে) হাড় না থাকা : সত্য যুগে সব মানুষ সত্য কথা বলত। তাদের কথায় আগুন জ্বলত। এই সময় হিন্দুরা (রাজবংশীর–হিন্দু ধর্মাবলম্বী হওয়ায় এ 'হিন্দু' শব্দ তাদের জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে) গো–মাংস খেত। গরুর মাংস বিতরণের পর হাড়গুলো সাজিয়ে মন্ত্র পাঠ করে ফুঁ দিলে পুনরায় গরুটি জীবিত হয়ে যেত। তো, এইভাবে চলতে চলতে একদিন মাংস ভাগ করে মানুষের মধ্যে বিতরণের সময় একজন লোক হাড়মাংস খাওয়ার লোভে গরুর পিছন দিকের পায়ের কাছাকাছির হাড় অর্থাৎ কোমরের হাড় চুরি করে মাটির ঢেলার নিচে লুকিয়ে রেখেছিল। তারপর মাংস বিতরণ শেষে বিতরণকারী পুনরায় যখন হাড়গুলো সাজাতো লাগল তখন পিছনে দু'পাশের কোমরের হাড় পেল না। এবং যে লুকিয়ে রেখেছিল সেও আর স্বীকার করল না। ফলে হলো কি–গরুটি আর বাঁচানো গেল না। তখন কানু গোপাল অভিশাপ দিল যে, "তোরা আর গরু খাবি না, সব সময় গরুকে দেবতাজ্ঞানে পূজো করবি।" সেই থেকে হিন্দুরা গরুর মাংস খায় না, গরুকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করেন। আর হাড় লুকিয়ে রেখে খেয়েছিল বলে তখন থেকে মানবকূলে মিথ্যা কথা বলা ও চুরির স্বভাব সৃষ্টি হলো। আর গরুর কোকের হাড় চুরি হয়ে গিয়েছিল বলে গরুকে হাজার রকমের ঘাস খাওয়ালেও কোক ওঠে না।

হনুমানের মুখ পোড়া : লঙ্কারাজ রাবণ অযোধ্যাপতি রামের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হলে রামচন্দ্র যখন সীতাকে উদ্ধার করে আযোধ্যার দিকে রওনা হয়েছিল, তখন রাবণ রাগান্বিত হয়ে প্রতিশোধ স্পৃহায় লঙ্কায় আগুন ধরিয়ে দিল। তখন সেই আগুন নিভানোর জন্য রামের অনুচর–সহযোগী হিস্যবে উপস্থিত হনুমান নিজের মুখের ভেতরে সমস্ত আগুন পুরে নিভিয়ে ফেলেছিল। সেই থেকে পৃথিবীর সমস্ত হনুমানের মুখ পোড়া।

কাঠবিড়ালীর গায়ে ডোরা দাগ: রামচন্দ্র যখন সীতাকে উদ্ধার করতে লঙ্কার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন, তখন পথিমধ্যে সমুদ্র ছিল। সেই সমুদ্র পার হয়ে তবেই লঙ্কায় পৌঁছানো সম্ভব। তখন রামচন্দ্র চিন্তিত হলেন—কি করা যায়! চিন্তা করতে করতে হঠাৎ দেখলেন যে, সমুদ্রের জলে গা ভিজিয়ে কাঠবিড়ালী বালিতে গড়াগড়ি দিয়ে সেতুর কাছে গিয়ে ধুয়ে সেতু তৈরির জন্য বালু ফেলছে। তখন রামচন্দ্র সাহস পেলেন। কাঠবিড়ালী যদি সমুদ্রে সেতু বাঁধতে সাহস দেখাতে পারে, তাহলে পারা যাবে না কেন? তারপর বানর, হনুমানদল, বানররাজ সুগ্রীবের সহায়তায় সমুদ্রে সেতু বেঁধে ফেললেন। কাঠবিড়ালী সেতুবন্ধনে সহায়তা করা ও সাহস দেওয়ার জন্য রামচন্দ্র খুশি হয়ে কাঠবিড়ালীকে আশীর্বাদ করেছিলেন, "যত উঁচু থেকে তোর পতন" ঘটুক না কেন তোর মৃত্যু হবে না। তাই উঁচু মগডাল থেকে কাঠবিড়ালী পড়ে গেলেও মরে না। আর রামচন্দ্র আশীর্বাদ করার সময় কাঠবিড়ালীর পিঠে আঙুল বুলিয়েছিলেন। সেইজন্য সেই আশীর্বাদের চিহ্নস্বরূপ আঙুলের দাগের স্মৃতি আজও কাঠবিড়ালীর পিঠে রয়ে গেছে।

শামুকের জন্মকথা: রাজা হরিশ্চন্দ্র মুনিঋষির দানের দক্ষিণা দিতে গিয়ে সর্বস্ব খোয়ানোর পর ভাগ্যবিপাকে পড়ে তাঁকে ডোমের শূকর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিতে হয়েছিল। প্রতিদিন শূকরের বিষ্ঠা পরিস্কার করতে তাঁর খুব অসুবিধা হতো। তাই ধর্ম ঠাকুরকে স্মরণ করে হরিশ্চন্দ্র বললেন, "আগামীকাল থেকে আমি আর শূকরের বিষ্ঠা পরিস্কার করতে পারব না। ধর্মঠাকুর তুমি খোঁয়াড় পরিস্কার করার ব্যবস্থা কর।" পরের দিনে রাজা হরিশ্চন্দ্র দেখলেন যে, শূকরের বিষ্ঠা গেঁড়ি শামুকের রূপ ধরে খোঁয়াড়ের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। সেই থেকে গেঁড়ি শামুকের জন্ম হলো।

সাপের একচোখ কানা ও কান না থাকা: মা মনসা যখন সর্পকুলকে বিষ দিয়ে পৃথিবীতে ছেড়ে দিলেন, তখন সর্পকুল মানুষকে দংশন করে প্রচুর মানুষ মেরে ফেলতে লাগল। তখন মানবকুল দেবের দেব মহাদেবের শরণাপন্ন হল এবং সাপের অত্যাচারের কাহিনী জানাল। তারপর মহাদেব সর্পকূলকে অভিশাপ দিয়ে এক চোখ কানা করে দিলেন এবং সাপের কান তুলে নিলেন, যাতে মানুষের কোনো শব্দ শুনতে না পারে, এবং পৃথিবীর যেন একপাশ দেখতে পায়। তখন থেকে সাপের অত্যাচার কম হলো ও সাপের এক চোখ কানা হলো।

সৃষ্টি কাহিনী : ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোম যখন কিছুই সৃষ্টি হয়নি, তখন ব্রহ্মা বিষ্ণুমহেশ্বর মাটি সৃষ্টি করে জলে ফেলে দিলো। সেই সময় কুন্তনীর পৃষ্ঠে স্থির হয়ে বসে জলের পরে ভাসছিল। তারপর শক্তি ও প্রভু রতিক্রিয়ায় মিলিত হলে সেই বীর্য থেকে ব্রহ্মার বাম অঙ্গে কন্যার জন্ম হলো এবং সেই কন্যাকে দক্ষ (শিব বা মহাদেব) বিয়ে করলে তাদের থেকে একশ' কন্যা জন্মগ্রহণ করে। তারপর কন্যাগুলোকে কোশ্বরের সাথে বিয়ে দিলে ইন্দ্র, শশী, চন্দ্র, পবণ, বরুণ প্রভৃতি জন্মিল। তারপর আস্তে আস্তে পৃথিবীতে মানবকুল সৃষ্টি হলো।

এরকম অনেক পুরাকথা এদের সমাজে প্রচলন আছে। তারা প্রতিটি প্রাকৃতিক ও জীবন্ত বস্তুতে ভগবান নিহিত রয়েছে বলে বিশ্বাস করে। তাছাড়া তেত্রিশ কোটি দেবতা আছে, যাঁরা মানব কল্যাণে নিয়োজিত এরকম ধারণা ও বিশ্বাস তাদের ভেতর গভীরভাবে নিহিত আছে।

সেসব কারণে পণ্ডিতগণ এই ধরনের বিশ্বাসকে সর্বপ্রাণবাদ (animism) বলে আখ্যায়িত করেছেন।

রূপকথা

চালাকের গল্প : এক চালাক লোক ছিল। সে শুধু কথার প্যাঁচে ফেলে মানুষকে ঠকাত। সে একদিন নাপিতের নিট চুল কাটাতে গেল। তো, নাপিত তাকে বিভিন্ন ধরনের চুল কাটার বিবরণ ও মূল্য জানাল। নাপিত বলল, যে, শুধু কানের দুপাশের চুল ছাঁটালে চার আনা, সমস্ত মাথার চুল ছাটলে আটআনা, বাটি বসিয়ে ছাঁট দিলে তার মূল্য পড়বে আট আনা, আর মাথামণ্ডুন করলে চার আনা। তখন চালাক লোকটি প্রথমে তার কানের দু'পাশের চুল কাটতে বলল। নাপিত সুন্দর করে চুল কেটে দিল। তারপর চালাক লোকটি আয়নায় নিজের মাথাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখার পর সমস্ত মাথার চুল কাটার কথা বলল। নাপিত ছাঁট দিতে দিতে নাপিতের বিকেল গড়িয়ে গেল। এদিকে নাপিতের অন্যান্য খরিদ্দার ফেরৎ চলে যাচ্ছে। নাপিত তো মহাখুশি। মনে মনে ভাবছে যে, যাক একজন খুব ভাল খরিদ্দার পেয়েছি। অনেক টাকায় হয়ত দেবে সে। অবশেষে বাটি ছাঁট শেষ হলে সে মাথায় চুল কাটানো পছন্দ হয়নি বললো। নাপিতকে ধমক দিয়ে বলল, কি চুল কেটেছ তুমি। একদম পছন্দ হয় নি আমার। তুমি মাথা টাক করে দাও। নাপিত ধমক খেয়ে টাক করে দিল। চালাক লোকটি পকেট থেকে চার আনা বের করে নাপিতকে দিতে গেল। কিন্তু নাপিত নিল না। বলল, আপনাকে চার রকমের চুল খুব আরাম দিয়ে কাটিয়েছি। আমাকে দ্বিগুণ মূল্য দিতে হবে। কিন্তু চালাক লোকটি দিতে না চাইলে আস্তে আস্তে অনেক লোক জড় হলো। নাপিত সব কথা খুলে বলল। কিন্তু চালাক লোকটি বলল আপনারাই দেখুন আমাকে সে মাথামুণ্ডল করে দিয়েছে। এর মূল্য পর আনা। আমি তো সেই চার আনা তাকে দিচ্ছি। আপনারা দেখেন, নাপিতকে কেমন বোকার মতো আমার কাছে অন্যায় দাবি করছে। তখন উপস্থিত সকলে চালাক লোকটিকে সমর্থন করল এবং নাপিত তিরস্কার করে চার আনা নিকে সন্তুষ্ট থাকেত বলল।

চালাক সেখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে চিন্তা করতে লাগল। এখন বেলা তো প্রায় অস্তে যায়। এদিকে পেটে তো খুব ক্ষুধা। চার আনা পয়সা ছিল তা তো নাপিতকে দিতে হলো। এখন খাব কী করে! ফন্দি আঁটতে আঁটতে হাঁটতে লাগল। অবশেষে একটা চালাকি বের করে ফেলল। তারপর ময়দার দোকানে গিয়ে বসে ময়রাকে বলল, "দাদা, আপনার রসগোল্লার গামলায় তো অনেক মাছি বসেছে। ওগুলো না তাড়ালো তো রসগোল্লা নষ্ট হবে। আপনি বিশ্রাম নিতে থাকেন আমি আপনার মিষ্টির মাছি তাড়াচ্ছি। আপনি আরাম করে ঘুমান।" ময়রার দোকানো একটা ছোট ছেলে ছিল। তাকে চালাক লোকটি ডেকে খুব সখ্যতা গড়ে তুললো এবং বলল' 'আমার নাম মাছি, তুমি আমাকে মাছি বলে ডাকবে। ঠিক আছে?" ছেলেটি বলল "আচ্ছা"। তখন ছেলেটিকে বলল, তুমি গ্লাস ধুয়ে একগ্লাস জল নিয়ে এসো। খুব পিপাসা পেয়েছে। ছেলেটি জল আনতে গেল। তখন চালাক লোকটি ময়রাকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখে রসগোল্লা সাবাড় করতে লাগল। ছেলেটি এসে দেখে যে টাক লোকটি সব রসগোল্লা খেয়ে ফেলছে। তখন সে ময়রাকে ডাকতে ডাকতে বলল, "কাকা, ময়রা কাকা, মাছি সব মিষ্টি খেয়ে গেল।" তখন ময়রা চোখ না মেলেই খ্যাক করে উঠল। বলল, "খাকগে। মাছি আর কতটুক খাবে। তুই আমার ঘুমের ব্যাঘাত করিস নে।" ছেলেটি ভয়ে আর কিছু

বলল না। চালাক লোকটি সব রসগোল্লা খেয়ে জল খেয়ে ঢেকুর তুলতে তুলেত বাড়ির দিকে রওনা হলো। ময়রা ঘুম থেকে উঠে গামলায় মিষ্টি না দেখে চিৎকার করতে লাগল। তখন ছেলেটি বলল, আপনাকে তো বললাম যে মাছি সব মিষ্টি খেয়ে গেল। আপনি তো উঠলেন না। বললেন, মাছি আর কতটুক খাবে।" তাই আমি আর কিছু বলিনি। ততক্ষণে টাক লোকটা সব মিষ্টি খেয়ে চলে গেছে। তখন ময়রা চালাক লোকটির চালাকি বুঝতে পেরে কপাল চাপড়াতে লাগল। আমি দেখেশুনে বাড়ি এলাম। আমার কথাটা ফুরালো, নটে গাছটা মুড়ালো।

লোকনাট্য (Folk-drama) : রাজবংশী সমাজ জীবনে যেসব ঐতিহাসিক, ধর্মীয়, পৌরাণিক, লোককাহিনীকে আশ্রয় করে যাত্রা, পালাগান, নাটক, কবিগান প্রচলিত আছে তা সবই লোকনাট্যের অন্তর্ভুক্ত। গ্রামের মাঝে কোনো উন্মুক্ত জায়গায়, কিংবা কোনো বাড়ির উঠোনের বৃহৎ আঙিনায় আচ্ছাদিত আসরে নাচ, গান, বাজনা, সংলাপ অভিনয় সহযোগে এসব লোকনাট্য পরিবেশিত হয়। এসবের মধ্যে রয়েছে যাত্রা, পালাগান, কবিগান, ভাবগান, পৌরাণিক ও ধর্মীয় পালা যেমন–রাজা হরিশ্চন্দ্র পালা, রাধাকৃষ্ণের মানভঞ্জন, নিমাই সন্ন্যাস, গোরাচাঁদের সংসায় ত্যাগ, শ্রীকৃষ্ণের নৌকাবিলাস, বেহুলা লক্ষ্মীন্দরের পালা, বিজয়–বসন্ত পালা প্রভৃতি। এছাড়া বিংশ শতাব্দীর দ্বিতায়ার্ধ থেকে তাদের সমাজজীবনে ঐতিহাসিক ও সামাজিক কাহিনী অবলম্বনে যেসকল যাত্রাপালা রচিত হয়েছে সেগুলো সহজেই স্থান করে নিয়েছে। এসব যাত্রাপালা তারা নিজেরাই অভিনয় করেন, তাদের সমাজের বিভিন্ন গ্রামে মঞ্চস্থ করে থাকেন। এসব যাত্রাপালার মধ্যে রয়েছে–সাবিত্রী–সত্যবান, পঞ্চপাণ্ডবের যুদ্ধ, ক্ষুদিরামের ফাঁসি, সোহরাব–রুস্তমের যুদ্ধ প্রভৃতি। সামগ্রিকভাবে বিচার করলে এসব বিভিন্ন আঙ্গিকে ও রূপে রচিত ও পরিবেশিত পালাগানগুলোকে লোকনাট্যের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে' "লোকাশ্রিত কাহিনী–আশ্রিত চরিত্র, চরিত্র অনুযায়ী উক্তি–প্রত্যুক্তি সহজ সরল বলিষ্ঠতার সঙ্গে গ্রামীণ সমাজে জনসাধারণের জীবন অবলম্বন করে যে নাটকধর্মী রচনা মুখে মুখে রচিত হয়ে মুখে মুখে প্রচারিত হয় তাই লোকনাট্য।"[৪৬] অন্য একজন গবেষক মনে করেন, "লোকাশ্রিত কাহিনী, কাহিনী আশ্রিত চরিত্র, চরিত্র অনুযায়ী উক্তি–প্রত্যুক্তি সহজ–সরল বলিষ্ঠতার সঙ্গে লোকগীতি, নৃত্য এবং লৌকিক বাদ্যযন্ত্রের ঐকতানের মাধ্যমে দৃঢ় ভাবভঙ্গির দ্বারা লোকাকীর্ণ উন্মুক্ত আসরে অভিনয়ের সাহায্যে যা প্রকাশ করা হয় তাই সাধারণ অর্থে লোকনাট্য।"[৪৭] অবশ্য এটি শুধু যাত্রাগানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অন্যান্য নাট্যপালাগানে এসব লক্ষণের সবগুলো একসাথে উপস্থাপিত হয় না। রাজবংশী সমাজে যেসমস্ত লোকনাট্য অনুষ্ঠিত হয় সেগুলোতে সমাজের নর–নারীর দুঃখ–বেদনা, অত্যাচার–নিপীড়ন, হাসি–কান্না, সংগ্রাম–প্রতিরোধ, ভালবাসা, প্রেম–প্রীতি, লোভ–লালসা ভোগ–যৌনতা প্রভৃতি পাওয়া যায়। ধর্মীয় ও পৌরাণিক পালাগুলোতে হাসি–কান্না, সংসার জীবনের দুঃখ–যন্ত্রণা, ঈশ্বর ও স্বর্গ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা, সংসার–মায়া–মমতা–বাসনা–কামনা ইত্যাদির কথা আছে। উত্তরবঙ্গের ভাসান যাত্রায় বেহুলা–লক্ষ্মীন্দরের কাহিনীভিত্তিক যে লোকনাট্য মঞ্চস্থ হয় তা জনমনের গহীনে করুণরসের সঞ্চার করে। অষ্টাদশ থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত রাজবংশী সমাজে জারিযাত্রা, গাজীর পালা, বনবিবির পালা, রসের বাইদ্যানি পালাগানের বহুল প্রচলন ছিল। সেগুলো আজ বিলুপ্তির

পথে। সামগ্রিক দিক বিচার বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, রাজবংশী সমাজে যেসব পালাগান অনুষ্ঠিত হয় তা সাহিত্যগুণ সমৃদ্ধ ও শিক্ষামূলক। নিম্নে মাঠ থেকে সংগৃহীত একটি লোকনাট্য নমুনা হিসাবে উল্লিখিত হলো :

লোকনাট্য

রাজা হরিশচন্দ্র

বা

শ্মশান মিলন

প্রথম পাণ্ডুলিপি লিখন–১৩৫৫, দ্বিতীয় লিখন–১৩৯২ ও তৃতীয় সংস্করণ লিখন–১৩৯৪

প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্য

স্থান : বিশ্বামিত্র ঋষির আশ্রম।
কোমণ্ডল হস্তে বিশ্বামিত্র ঋষির প্রবেশ।

বিশ্বামিত্র : অযোধ্যার রাজা হরিশ্চন্দ্র পৃথিবীর সবার আদর্শ মহাপুরুষ, কিন্তু আমি তাকে পরীক্ষা করব। হরিশ্চন্দ্র, তুমি যে কেমন দানবীর অযোধ্যাপতি– তোমার ভীষণ পরীক্ষা। কোপিঞ্জল—

কোপিঞ্জলের প্রবেশ

কোপিঞ্জল : (নেপথ্যে) আজ্ঞে–প্রভূ?

বিশ্বামিত্র : যাও কোপিঞ্জল, আমার তপোবন হতে পূজার পুষ্প তুলে নিয়ে এস।

কোপিঞ্জল : তথাস্তু গুরুদেব।
কাপিঞ্জল প্রস্থান। পরে বিশ্বামিত্র প্রস্থান রাজ হরিশ্চন্দ্রের প্রবেশ

হরিশ্চন্দ্র : (সিংহাসনে উপবেশনে) যা ধারণার অতীত, কল্পনার অতীত, ঐশ্বর্য্যের অধিশ্বর হয়ে পৃথিবী দাতা বলে পরিচিত হওয়া সহজ ব্যাপার নয়।

শৈব্যারাণীর প্রবেশ

শৈব্যা : (নেপথ্যে)–কি হয়েছে নাথ?

হরিশ্চন্দ্র : শুন রাণী, আজ আমার মনটা অতি চঞ্চল হয়ে হয়ে পড়েছে। আমি এখনি মৃগয়া শিকারে যাত্রা করব।তুমি অন্তঃপুরী প্রবেশ কর।

হরিশ্চন্দ্রের প্রস্থান

শৈব্যা : আজ আবার মহারাজ কোথায় চল্লেন তা–কিছু জানতে পারলুম না। ভগবান–স্বামীর কোনো অমঙ্গল না হয়। (শৈব্যার প্রস্থান)

প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য

কোমণ্ডল হস্তে বিশ্বামিত্র প্রবেশ

বিশ্বামিত্র : (পূজায় বসিয়া) ওঁ নমস্তে–ওঁ নমস্তে–ওঁ নমস্তে, কোপিঞ্জল–কোপিঞ্জল—

কোপিঞ্জল প্রবেশ

কোপিঞ্জল : (নেপথ্যে)–না প্রভূ তপোবনে ফুল নাই। গাছের পাতাগুলি পর্যন্ত ছাগলে মুড়েছে।

বিশ্বামিত্র : (উঠিয়া) কার এত সাহস, প্রতিদিন আসি তপোবন স্বেচ্ছায় পুষ্পতরু করে উৎপাদন, শাখাভাঙ্গি করে যায় পুষ্প আহরণ। কার দ্বারা হেন অনিষ্ট সাধিত হলো বলতে পার কোপিঞ্জল ?

কোপিঞ্জল : না গুরুদেব–তবে শুনেছি কুঠিরের অনতিদূরে রাজা হরিশ্চন্দ্র ছাউনি গুনেছে, তবে প্রকৃত অপরাধি কে তাহা আমি বলতে পারলুম না প্রভূ।

বিশ্বামিত্র : ও–হো–হো–হো এখানেও রাজা হরিশ্চন্দ্র। তবে অদ্য হতে যে আমার উপবনে প্রবেশ করবে বা পুষ্প চয়ন করবে নিশ্চয়ই সে লতার পাশে বন্ধন হইবে, বন্ধন হইবে, বন্ধন হইবে। (বিশ্বামিত্র প্রস্থান)

ফুলমাল্য হস্তে পঞ্চকন্যার প্রবেশ ও গীত

পঞ্চকন্যা : (নেপথ্যে প্রথম কন্যা) তপোবনে প্রবেশ করতে আজ আমার অন্তরে ভয় ভয় হচ্ছে কেন।

দ্বিতীয় কন্যা : আরে আম্‌রাতো চিরদিন স্বাধীনভাবেই এই তপোবনে পুষ্প আহরণ করি, ভয় কি ? চলো, তাড়াতাড়ি ফুল তুলে নিয়ে চলে যাই। বিশ্বামিত্র ঋষি এসে পড়বে।

তৃতীয় কন্যা : আরে ভয় কি, চলো।

পঞ্চম কন্যার গীত

১। ওরে পঞ্চকন্যা রে ইন্দ্রের শাপে
ছিল বিশ্বমিত্র স্তপো বনে
নিশির শেষে সবে গো মিলে
ও যাই তাঁরা পুষ্প রে চয়নে।

২। ওরে ব্যর্থ না হয় মুনির বচন
তাদের নিজ কর্মের দোষেরি কারণ
লতার পাশে হইলে রে বন্ধন
দেখে হরশিত রে তপোবন।

৩। তখন হরিশ্চন্দ্র নরপতি
গিয়ে মৃগ অন্বেষণ রে করি
হরিশ্চন্দ্র বলে গো ডাকে
ও রাজন কর রে অভ্যাতি।

৪। সবে লতার পাশে বন্ধন দেখি
তখন হরিশ্চন্দ্র মর রে অতি
দয়া উপার্জিল গো প্রাণে
মুক্ত করে দিল রে পঞ্চসখী।

প্রথম কন্যা : একি হলো, লতার পাশে বন্ধন হইলাম কেন ? একি বিশ্বামিত্র ঋষির অভিশাপ !

দ্বিতীয় কন্যা : আরে না না, ইন্দ্রের অভিশাপ। একদিন ইন্দ্রের রাজসভায় নৃত্যগীতে আমাদের তালভঙ্গ হয়েছিল বলে সে আমাদের অভিশাপি দিল বিশ্বামিত্র ঋষির তপোবনে বন্দিনি হয়ে থাকতে। আমি প্রশ্ন করেছিলাম, মহারাজ–অভিশাপ দিলেন–আমাদের মুক্তির উপাই কি বলুন। মহারাজ বললেন, রাজা হরিশ্চন্দ্রের আগমনে তাহার পরশনে তোমাদের মুক্তি।
ডাকো, একবার আমরা সবাই মিলে উচ্চঃকণ্ঠে রাজা হরিশ্চন্দ্রকে স্মরণ করি।
(সকলে সমঃস্বরে) রাজা হরিশ্চন্দ্র, তুমি আমাদের উদ্ধার করো। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র, তুমি আমাদের উদ্ধার করো। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র, তুমি আমাদের উদ্ধার করো।

ধনুর্বাণ হস্তে শিকারসাজে হরিশ্চন্দ্রের প্রবেশ

হরিশ্চন্দ্র : (নেপথ্যে দূর থেকে) ওকি? ওযে শুনিতেছি রমণীর কণ্ঠস্বর।

পঞ্চকন্যা : (উচ্চকণ্ঠে) মহারাজ হরিশ্চন্দ্র, তুমি আমাদের উদ্ধার করো। (তিনবার)

হরিশ্চন্দ্র : ঐ ঐ? আর্তকণ্ঠে কে যেন ডাকিতেছে মোর উদ্ধার করিতে। যাই যাই অগ্রসর হয়ে দেখি কে পড়িল বিপদে।
(অগ্রসর হয়ে)—এযে হেরি বিশ্বামিত্র ঋষি তপোবন। একি পঞ্চকন্যা? লতার পাশে কে বন্ধন করিল তোমাদের?

পঞ্চকন্যা : (১ম কন্যা)–মহারাজ ? একদিন স্বর্গের দেব ইন্দ্রের রাজসভায় নৃত্যগীতে আমাদের তালভঙ্গ হয়েছিল বলে সে অভিশাপ দিল আমাদের! বিশ্বামিত্র ঋষির তপোবন বন্দিনী হয়ে থাকতে। হায়! বুঝি না কতদিনে ইন্দ্রের অভিশাপ হতে আমরা মুক্তি পাব।

হরিশ্চন্দ্র : হ্যাঁ, আমি করিব তোমাদের বন্ধনমুক্ত।
(বন্ধনে হস্তদিয়া)–যাও পঞ্চকন্যা, তোমরা বন্ধন হইতে মুক্ত। (পঞ্চকন্যা বন্ধনমুক্ত)

পঞ্চকন্যা : (বন্ধন মুক্ত হইয়া), মহারাজ–আমাদের মুক্তির বিনিময়ে উপহার গ্রহণ করুন।

গীত

রাজন, তুমি লহ মোদের প্রীতি উপহার,
হে তোমারি পরশে মুক্তি হইনু
চলিনু স্বর্গের যাত্রী মোরা এবার=
মোরা গাহিয়া যাব চিরদিন,
তোমারি জয়ের গুণগান।
বিদায় দেবতা প্রণাম চরণে তোমার।।

পুষ্পমাল্য হরিশ্চন্দ্রের গলে পরিয়ে দিয়ে পঞ্চকন্যা প্রস্থান

হরিশ্চন্দ্র : স্বর্গের অপ্সরী পঞ্চকন্যা, ছিল বন্দি দেব ইন্দ্রের অভিশাপে বিশ্বামিত্র ঋষি তপোবনে, মম পরশনে, হইল উদ্ধার। যাই ফিরে মহর্ষী বিশ্বামিত্র সনে করিয়া সাক্ষাৎ। (হরিশ্চন্দ্র প্রস্থানোদ্যত)

বিশ্বামিত্র কোমণ্ডল হস্তে প্রবেশ

বিশ্বামিত্র : (নেপথ্যে). কে, কে তুমি? কে করিলে কন্যার বন্ধন মোচন। সর্বনাশ হবে তার সংসার জীবন।

হরিশ্চন্দ্র : আসুন, মহীর্ষী প্রণাম চরণে। (প্রণাম করিল) আমি করেছি কন্যার বন্ধনমোচন।

বিশ্বামিত্র : কেন? কার অনুমতিতে করিলে কন্যার বন্ধন মোচন?

হরিশ্চন্দ্র : ঋষিবর? শিকার ভ্রমিতে ভ্রমিতে উপনীত হইনু স্তপোবন, কন্যা মোরে করিল আমন্ত্রণ, তাই করেছি কন্যার বন্ধন মোচন, তাতে হয় যদি অপরাধ মোর প্রভু দানে তুষ্ট করিব ব্রাহ্মণ। আমার প্রতি এত ক্রোধ কেন তপোবন। (নতজানু হয়ে)

বিশ্বামিত্র : আরে, আরে দানগর্বী অযোধ্য ভূপতি। তুমি দান পূণ্য কর সে উত্তম, কিবা দান করেছ কাহার কর অহঙ্কার, তবে আমায় কিঞ্চিত ভিক্ষা দাও হরিশ্চন্দ্র।

হরিশ্চন্দ্র : বলুন, ঋষি, আপনি কি দানে পরিতুষ্ট হবেন প্রভু?

বিশ্বামিত্র : হরিশ্চন্দ্র, দান যদি দিতে চাহ মোরে অগ্রে ত্রি–সত্য কর, পরে আমি করিব প্রার্থনা।

হরিশ্চন্দ্র : মোর প্রতি অবিশ্বাস কেন ঋষিবর। দানে রাজা হরিশ্চন্দ্র ভূবন বিখ্যাত, দ্বারে আসিলে প্রার্থী প্রাসাদে মোর ফেরে না কভু বিফল মনেতে। কহ ঋষি দান করিবে গ্রহণ–আমি করিনু ত্রি–সত্য–সত্য–সত্য। আপনি যাহা করিবেন প্রার্থনা, আমি অকপটে তাহা করিব দান।

বিশ্বামিত্র : (হাসি) হা–হা–হা–কিন্তু জানিও হে রাজন, এ সত্য লঙ্ঘিলে নাহি পরিত্রাণ তব বিশ্বামিত্র ঋষি কোপানলে, আমার শাপেতে ভস্ম হইবে তুমি চক্ষুর পলকে।

হরিশ্চন্দ্র : জানি ঋষি সত্য ভঙ্গ মহাপাপ। সত্য রক্ষা হেতু যাই যদি সর্বস্ব আমার তবু সত্য রক্ষা করিব আমি।

বিশ্বামিত্র : উত্তম, তবে আমার আশা কি পূর্ণ করবে হরিশ্চন্দ্র? উচ্চ আশা নিয়ে ভ্রমে বিশ্বামিত্র ঋষি তাই বাসনা মাগোচিতে ক্ষত্রিয় কুলে লভিয়া জনম লভিতে সম রাজ্য কর দান এই ভিক্ষুক তপসে। চুপ করে রইলে কেন হরিশ্চন্দ্র?

হরিশ্চন্দ্র : ঋষিবর? কার্যে হরিশ্চন্দ্র নাহিলো অক্ষম।
(রাজমুকুট হস্তে লইয়া), এই নিন ঋষিবর, আমার অর্থ ব্যাপিত রাজ মুকুট আজ আমি আপনাকে করিলাম দান। (রাজমুকুট প্রদান)

বিশ্বামিত্র : (রাজমুকুট হস্তে ধরিয়া) ধন্য, ধন্য তুমি রাজন। রহিল তোমার এ অসম্পূর্ণ দান। আগামী কল্য প্রাতেঃ তব প্রাসাদ যাইব আমি দানের দক্ষিণা করিতে গ্রহণ। সাক্ষী থেকো দেবগণ? হরিশ্চন্দ্র আজ মোর সমরাজ্য করিল প্রদান। (রাজমুকুট লইয়া বিশ্বামিত্র প্রস্থান)

হরিশ্চন্দ্র : মৃগয়া শিকার ভ্রমিতে দয়াময় তুমি সব করিতে পার। দয়াময়–তুমি মোর থাকিও সহায়। (হরিশ্চন্দ্র প্রস্থান)

প্রথম অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য

রাজপ্রাসাদ চিন্তামগ্নভাবে শৈব্যারাণীর প্রবেশ

শৈব্যা : (নেপথ্যে) আজ একি দুঃস্বপ্ন দেখলাম। ও উঃ। সেকি ভয়ানক স্বপ্ন, কোথায় রাজ্য, কোথায় এশ্বর্য–অযোধ্যার রাজরাণী যেন কাঙ্গালিনি হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মহারাজ গিয়েছেন মৃগায় শিকারে কই তিনি তো এখনও ফিরে আসলেন না। আমি যেন চতুর্দিকে অমঙ্গলের ছায়া দেখছি। ভগবান? আমার দুঃশ্চিন্তাকে তুমি ছিন্ন করে দাও।

দ্রুত রুহিতাশ্ব প্রবেশ

রুহিতাশ্ব : (নেপথ্যে) মা, মা, বাবা মৃগয়া শিকার হতে ফিরে এসেছেন?

শৈব্যা : না বাবা? মহারাজ এখনও ফিরে আসেননি।

রুহিতাশ্ব : মা–তাহলে আমি আবার খেলতে গেলাম। (রুহিতাশ্ব প্রস্থন)

রাজমুকুট শূন্য হরিশ্চন্দ্র প্রবেশ

হরিশ্চন্দ্র : রাণী? এত মলিন বদন দেখছি কেন? (সিংহাসনে উপবেশন)

শৈব্যা : আজ একটা বড় দুঃস্বপ্ন দেখেছি স্বামী। হায়, সেকি ভয়ানক স্বপ্ন, তাই আমার মনটা বড় চঞ্চল হয়ে পড়েছে।

হরিশ্চন্দ্র : স্বপ্ন কভু সত্য হয় না রাণী। মিথ্যা সে স্বপ্ন লয়ে বৃথা চিন্তায় মন কর না চঞ্চল।

শৈব্যা : নাথ? স্বপ্ন তো সত্য হয় না। আজ আপনার মৃগয়া শিকার হতে ফিরে আসতে এত বিলম্ব হলো কেন? আর আপনার রাজ চিহ্নটাই বা কোথায় রেখে আসলেন স্বামী?

হরিশ্চন্দ্র : শুনো রাণী? সে বড় এক অদ্ভুত কাহিনী। গিয়ে মৃগয়া শিকারে শিকার ভ্রমিতে ভ্রমিতে উপস্থিত হইনু বিশ্বামিত্র ঋষি তপোবনে, সেখানে ঘটিল এক অদ্ভুত ঘটনা মোর, তাই সমরাজ্য করে এসেছি দান ভিক্ষুক তাপসে।

শৈব্যা : নাথ? তারপর?

হরিশ্চন্দ্র : তারপর আরও তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছি আমি, আগামী কল্য প্রাতেঃ প্রাসাদে আসিবে ঋষি দানের দক্ষিণা করিতে গ্রহণ।

শৈব্যা : নাথ? তারপর? তারপর?

হরিশ্চন্দ্র : তারপর? তারপর শুনতে পাবে রাণী, সব দেখতে পাবে। তুমি আমাকে একটু শান্ত হতে দাও, আমাকে একটু সুস্থ হতে দাও।

শৈব্যা : চলুন নাথ, অন্তঃপুরী চলুন। (উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ

স্থান অযোধ্যার প্রজা-ভিখারী ব্রহ্ম দত্ত ব্রাহ্মণের বাটী ও ব্রহ্মদত্ত ব্রাহ্মণের প্রবেশ।

ব্রাহ্মণ : (নেপথ্যে) গুরু গোবিন্দ হে-পাপি তরাও-পাপি তরাও। সংসার জ্বালা আর সহ্য হয় না। ও গিন্নী, গিন্নী তুমি গেলে কোথায় গো, বাড়ীর দিকে এস, আমি ভিক্ষায় যাব।

ব্রাহ্মণী শান্ত সুন্দরী প্রবেশ

ব্রাহ্মণী : (নেপথ্যে) বলি কি হয়েছে? অমন করে ডাক পাড়া হচ্ছে কি জন্যে শুনি?

ব্রাহ্মণ : তোমাকে ডাকছি গিন্নী শুনো। আমি আজ সকাল করে ভিক্ষায় যাব। কারণ আজ আমার শরীরটা বড় ভার ভার লাগছে। মনে হয় গায়ে জ্বর আসতে পারে। তুমি আমাকে কিছু খেতে দাও, সকাল করে ভিক্ষা থেকে ঘুরে আসি।

ব্রাহ্মণী : তবে তুমি আর ভিক্ষায় যেওনা, শুয়ে থাকো গিয়ে। তোমার তো গায়ে জ্বর এসেই রয়েছে।

ব্রাহ্মণ : তাতে বটেই। আমি শুয়ে থাকি আর তুমি পান, পানের তামাক মুখে দিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ঘুরে বেড়াও গিয়ে। খাওয়াটা হবে কোত্থেকে, পান পানের তামাক আসবে কুত্থেকে। মুষ্টি ভিক্ষায় দুজনের পেট চালান যে কি হচ্ছে সেটা আমিই জানি। একেতো অভাবের সময় লোকে ভিক্ষা দিতে চায় না, শুধু আমার পায়ে হেঁটে মরণ, যে মা ভিক্ষা দেয় সেও মা ভাল, যে মা ভিক্ষা দেয় না সেও মা আমার ভাল। ভিখারী ব্রাহ্মণের রাগের কি কোনো দাম আছে গিন্নী।

ব্রাহ্মণী : আমার কথা শোন। তুমি আজ একটু বারবাড়ীর দিকে যাও তো। আমি শুনলাম আমাদের মহারাজ পৈতে গলায় মানুষ দেখলেই টাকা, পয়সা, সোনা, দানা, জমাজমি পর্যন্ত দান করছেন। আজ তুমি একটু রাজবাড়ীর দিকে যাও।

ব্রাহ্মণ : তুমি শোন গিন্নী শোন। দানটা অতো সস্তা নয় গিন্নী, কি হয়েছে তুমি জান, আমি সব খবর রাখি। মহারাজ হরিণ শিকারে গিয়ে তপোবন বিশ্বামিত্র ঠাকুরের সাথে কি কথা নিয়ে তর্কবিতর্ক হয়। তাতে মহারাজের রাজমুকুট বিশে ঠাকুর নিয়ে নিয়েছে। রাজমুকুট বিশে ঠাকুর জোর পূর্বক নিল কি মহারাজ স্বেচ্ছায় দান করে এল, রাজবারী আজ তার বিচার, তুমি তা জান গিন্নী? বিশ্বামিত্র ঠাকুরের পৈতেই ধার আছে, আজ বিচার কি হয় দেখ। রাজবাড়ীর সমস্ত খবর বাড়ী বসেই পাওয়া যাবে গিন্নী। আমার পৈতের কোন দাম নেই, আমাদের মুষ্টি ভিক্ষাই ভাল গিন্নী, আমাদের অতো লোভের কাজ নেই, তুমি এস। গুরু গোবিন্দ হে, পাপি তরাও-পাপি তরাও। (ব্রাহ্মণ প্রস্থান)

ব্রাহ্মণী : ও মা, মিন্‌সের শুধু ভয়। বিটা ছেলে, পুরুষ ছেলে মন্দা লোকের কাছে যেতে পারবে না, মুগুর মালা। (ব্রাহ্মণী প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান অযোধ্যার রাজ প্রাসাদ। রাজা হরিশ্চন্দ্র সিংহাসনে উপবেশন করে আছেন। মন্ত্রী ও রাজা কথোপকথন।

হরিশ্চন্দ্র : (সিংহাসন বসিয়া) শোন মন্ত্রী? বিশ্বামিত্র ঋষির পদধুলি আজ পড়িবে প্রাসাদে মোর, ধন্য হবে রাজপুরী, সৌভাগ্য আমার।

মন্ত্রী : মহারাজ? কিবা হেতু বিশ্বামিত্র ঋষি আজ প্রাসাদে হবে আগমন? জানি সেই ঋষিবর মহাক্রোধী কথায় কথায় দেয় অভিশাপ।

হরিশ্চন্দ্র : শঙ্কা কর না মন্ত্রী। ধর্মের উপর কর নির্ভর।

শৈব্যা রাণী প্রবেশ উদ্যত

হরিশ্চন্দ্র : শোন মন্ত্রী? গতকল্য গিয়ে মৃগয়া শিকারে শিকার ভ্রমিতে ভ্রমিতে বিশ্বামিত্র স্তপোবনে। সেথায় স্বর্গের অপ্সরী পঞ্চকন্যা ছিল বন্দিনী হয়ে। আমি তাদের করিনু উদ্ধার। ঋষি তাতে রুষ্ট হয়ে অভিশাপ দিতে হলেন উদ্যত। তাই কথা প্রসঙ্গে দানধর্ম উঠিল তথায় বিশ্বামিত্র ঋষির সনে। মোর প্রতি ঋষিবর ক্ষিতি দান করিলেন প্রার্থনা, তাই সম রাজ্য করে এসেছি দান ভিক্ষুক তাপসে। আজ প্রাতে প্রাসাদে আসিবেন ঋষি দানের দক্ষিণা করিতে গ্রহণ। (শৈব্যা অগ্রসর হয়ে)

শৈব্যা : সর্বনাশ করেছেন স্বামী, সর্বনাশ করেছেন। শুনি সে বড় দুর্দান্ত ঋষি। তাঁর কোপানলে পড়িলে সব ভস্ম হয়ে যায় নাথ? শুনি তুমি দানে অনেক পুণ্য হয়, কিন্তু এ দানের পথে আমাদের অমঙ্গল মনে হচ্ছে স্বামী? হৃদয় আমার আতঙ্কে কাঁপছে যে, কে যেন গ্রাসিতে আসছে মোর।

দ্বার রক্ষক প্রতিহারীর প্রবেশ

প্রতিহারী : (নেপথ্যে) মহারাজ? দ্বারে উপস্থিত বিশ্বামিত্র ঋষি।

হরিশ্চন্দ্র : এসেছেন ঋষিবর? যাও মন্ত্রী, শীঘ্র গিয়া লয়ে এস প্রসাদে স্ব-সম্মানে তাঁরে।

মন্ত্রী : মহারাজ? রাজ আদেশ আমি অবশ্য করিব পালন। কিন্তু সর্বনাশ ঘটিল এবার। (প্রতিহারীসহ মন্ত্রীর প্রস্থান)

গীত কণ্ঠে ভবানন্দ বিবেক প্রবেশ

গীত

ওরে রাজন তুমি আনলে ডেকে আখীজল,
এখন জ্বলবে তোমার দানের পথে
বিশ্বনাশী দাবানল,
তোমার হৃদয় জুড়ে উঠবে কেঁদে

দুঃখ ভাঙ্গা হাহাকার,
তোর রবি যাবে ডুবে আসবে ছুটে অন্ধকার,
শুধু কঁাদবে বসে পথে পথে
দেখ্‌বে তখন দানের ফল॥

বিবেক প্রস্থান

হরিশ্চন্দ্র : একি শুনি সাধকের বাণী । দানের মোর ফলিবে কু-ফল? না-না, দানে যদি ফলিবে কু-ফল তবে কেন ধর্ম শাস্ত্রে কহে দাতা সম পুণ্যবান নাহিক ত্রি-জগতে। দূর হও পাগল সম্মুখে হতে মোর। দান কার্যে হরিশ্চন্দ্র হবে না কাতর-হবে না।

মন্ত্রীসহ বিশ্বামিত্র ঋষি প্রবেশ

হরিশ্চন্দ্র : আসুন, আসুন মহির্ষী প্রণাম চরণে। (প্রণাম করিল)

বিশ্বামিত্র : জয় হোক? জয় হোক তোমার অযোধ্য ঈশ্বর। কর রাজা প্রতিশোধ প্রতিশ্রুতি করিয়াছ যাহা। আসিয়াছি। আমি তবো প্রাসাদে তাহা করিতে গ্রহণ।

হরিশ্চন্দ্র : ভুলি নাই ঋষিবর? প্রতিশ্রুতি আমি অবশ্য করিব পালন। কহ ঋষি কিবা চাহ দানের দক্ষিণা।

বিশ্বামিত্র : দাও দানের দক্ষিণা সপ্তকোটী স্বর্ণমূদ্রা।

হরিশ্চন্দ্র : যাও মন্ত্রী? ভাণ্ডারীকে করহ আদেশ সপ্ত কোটী স্বর্ণমূদ্রা আনিতে হেথায়। (মন্ত্রী প্রস্থান উদ্যত)

বিশ্বামিত্র : দাড়াও মন্ত্রী? কোথা যাও, কার অর্থ আন্‌তে চলছো। রাজকোষ আমার অধিশ্বর। হে রাজন? সমরাজ্য দানিলে মোর কিবা অধিকার আজ রাজকোষে তোমার।

হরিশ্চন্দ্র : ও-হো-হো-হো, সত্যিই তো আমি রাজ্য হারা হয়েছি। আমি কি দিয়ে দানের দক্ষিণা দিব।

ক্রন্দনের সুরে হরিশ্চন্দ্রের গীত

আমি কেমনে শুধিব দক্ষিণা
দানের দক্ষিণা আমি, কেমনে শুধিব গো,
বুঝিতে না পারি আমি, ভিক্ষুকের বাসনা গো,
বলে দাও বলে দাও মোরে, ওহে তপোধন গো,
দানের দক্ষিণা দিয়া, আমি মুক্ত হবো ঋণ গো।

বিশ্বামিত্র : তোমার স্ত্রী-পুত্র বিক্রয় করো-তাতেও যদি না হয়, তুমি আত্ম বিক্রয় করে তোমার দানের দক্ষিণা সঞ্চয় কর। বিশ্বামিত্র আজি হতে পৃথিবীর অধিশ্বর। যাও তুমি পৃথিবী ছাড়িয়া, নাহি তবো অধিকার থাকিবে হেথায়। কিন্তু কহ সত্য কবে মোরে দিবে দানের দক্ষিণা সপ্তকোটি স্বর্ণমূদ্রা।

মন্ত্রী : তপোধন? তাহলে যে মহারাজ আজ নিরাশ্রয়, কোথায় করিবে বসতি- কৃপা করে ভিক্ষা দিন একটু বাসযোগ্য ভূমি।

বিশ্বামিত্র : না–না? নাহি পাবে সূচ্যগ্র মেদিনী, গোটা পৃথিবী এখন আমার অধিশ্বর। আছে পৃথিবীর বহির্ভাগে বারানসী ধাম। পত্নী–পুত্র লয়ে যাও তথা পাবে বা স্থান। আর প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাবে মোর তরে কবে দিবে দানের দক্ষিণা সপ্তকোটি স্বর্ণমুদ্রা।

শৈব্যা : ভগবান! ভগবান! একি বিপদে ফেলিলে ভক্তের তুমি। স্বামী? স্বামী? স্বপ্ন মোর সত্যি হলো আজি। (ক্রন্দন ও চোখে জল)

রুহিতাশ্ব দ্রুত প্রবেশ

রুমিতাশ্ব : মা–মা, কাঁদছো কেন মা? কি হয়েছে বলনা, এ্যা–বাবাও যে কাঁদছে? কি হয়েছে বলনা মা?

শৈব্যা : ওরে পুত্র রুহিতাশ্ব? বাবা, সর্বনাশ ঘটেছে আমাদের। তোর পিতা সমরাজ্য ঐশ্বর্য্য সর্বস্ব দান করেছে ঐ ঋষি ঠাকুরকে। আজ আমরা রাজ্য হারা হয়েছি বাপ।

রুহিতাশ্ব : মা? শুনি রাজ্য দানে অনেক পূণ্যি হয়, তাঁর জন্য আবার তুমি কাঁদছো কেন মা?

শৈব্যা : ওরে রুহিতাশ্ব, শুধু তাই নয় বাবা, আমাদের যেতে হবে সর্বস্ব ত্যাজিয়া পৃথিবী বহির্ভাগ বারানসী ধামে। আজ আমরা পথের ভিখারী বাপ, ওরে রুহিতাশ্ব? বাবা–তায় মোর ঝরে অশ্রুজল।

রুহিতাশ্ব : তাঁর জন্য তুমি দুঃখ করো না মা। পিতা মোর অন্যায় কার্যে হারায়নি ঐশ্বর্য্য সম্পদ। দান কার্যে যায় যদি সর্বস্ব জননী, দান পূণ্য বলে এর চেয়ে ভাল রাজ্য পাব। চল মা, আমরা এ রাজ্য ছেড়ে চলে যাই।

হরিশ্চন্দ্র : আবার–আবার বলো ঐ কথা বাপ। ওরে রুহিতাশ্ব–দান কার্যে যায় যদি সর্বস্ব আমার তাতে দুঃখ নেই, দুঃখ কোরোনা বাবা? শৈব্যা, মোছ অশ্রুজল করো আনন্দ। পিতার সত্য পালিবারে পুত্র উন্মাদ। ঋষিবর, তবে আসি প্রণাম চরণে। (প্রণাম করিয়া প্রস্থানোদ্যত)

বিশ্বামিত্র : হরিশ্চন্দ্র, খুলে রেখে যাও তোমাদের পায়ের রাজ আভরণ।

হরিশ্চন্দ্র : এও কি সইতে হইবে আমার। ঋষিবর? যাহা করিবেন আদেশ আমি তাহাই করিব পালন। শৈব্যা? খোল গায়ের রাজ আভরণ (পোষাক খুলিয়া) এই নিন ঋষিবর? আমারে গায়ের রাজ আভরণ। (পোষাক প্রদান) ঋষিবর–এবার আসি। বিদায় মাগি তব চরণে। (প্রণাম করিয়া প্রস্থানোদ্যত)

বিশ্বামিত্র : হরিশ্চন্দ্র–খুলে রেখে যাও তোমার পুত্রের গায়ের রাজ আভরণ।

বিশ্বামিত্র : ঋষিবর? ঋষিবর? এও কি সইতে হবে মোর। পিতা হয়ে পুত্রের গায়ের আভরণ আমি কেমনে খুলিব। ঋষিবর? পুত্রের গায়ের আভরণটা আমায় ভিক্ষা দিন প্রভু?

বিশ্বামিত্র : না–না, পাবে না ভিক্ষা। ফের যদি ভিক্ষা মাগো মোর ঠাই নরকগামী হবে তুমি। তবে ফিরিয়ে লহ তোমার অর্থব্যাপিত মনিময়ের রাজমুকুট, ভোগ কর রাজ্য তব।

হরিশ্চন্দ্র : না–না, আমি যে ত্রি–সত্যি পাশে বদ্ধ।

রুহিতাশ্ব : কি হবে বাবা রাজ আভরণে। আমি নিজেই খুলে দিচ্ছি। (পোষাক খুলিয়া) এই নিন ঠাকুর আমার গায়ের রাজ আভরণ। (পোষাক প্রদান) এখন আমরা যেতে পারি ঠাকুর।

হরিশ্চন্দ্র : শৈব্যা, মুছ অশ্রু বিদায় পদধূলি নাও ঋষির চরণে। ঋষিবর? দিন পদ ধূলি প্রণাম চরণে। (প্রমাণ করল। পদধূলি লইয়া) মহর্ষী–এবার আমরা বিদায়–বিদায়। (হরিশ্চন্দ্র, রুহিতাশ্ব, শৈব্যা প্রস্থানোদ্যত)

বিশ্বামিত্র : হরিশ্চন্দ্র–প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাও মোর তবে, করে দিবে দানের দক্ষিণা সপ্তকোটি স্বর্ণ মুদ্রা।

হরিশ্চন্দ্র : পিছু ফিরে আর চাহিব না ঋষি, সপ্ত দিন পরে দিব আমি দানের দক্ষিণা সপ্তকোটি স্বর্ণ মূদ্রা।

বিশ্বামিত্র : উত্তম? যাও হরিশ্চন্দ্র, সপ্তদিন পরে বারানসী ধামে তব সাথে আমি করিব সাক্ষাৎ (বিশ্বামিত্র প্রস্থান)

মন্ত্রী : মহারাজ? মহারাজ?

হরিশ্চন্দ্র : মহারাজ নেই মন্ত্রীবর। হরিশ্চন্দ্র আজ পথের ভিখারী। সব গেছে মোর পূণ্য অনুষ্ঠানে। শৈব্যা? মোছ অশ্রু কর আনন্দ, চলো ধরণীর বহির্ভাগে কাশিধামে করতে বসতি। সে বারানসী নয় সে আমার কাশীধাম।

শৈব্যা : ওগো স্বামী? পথের ভিখারী আজি হইলে যে তুমি। অযোধ্যা ঈশ্বর দিন ভিখারীর মত পত্নী–পুত্র লয়ে পথে পথে বেড়াবে ঘুরিয়া, কেমন সহিবে তাহা জীবন সঙ্গিনী তব?

হরিশ্চন্দ্র : দুঃখ কোরোনা শৈব্যা। দয়াল শ্রীহরির চরণ কর স্মরণ, চলো আমরা যায়। হেধর্ম দয়াল শ্রীহরি দয়াময়, আমার যাত্রা পথে তুমি হও প্রধান সহায়। আমি পথভ্রষ্টা হই যদি কভু, তুমি পথ দেখায়ে দিও প্রভু? আমি নিরাশ্রয়, আমি নিরাশ্রয়, আমি নিরাশ্রয়। (প্রস্থানোদ্যত)

ধর্মদূত সাধু গীত কণ্ঠে প্রবেশ

গীত

আয় চলে আয়, চলে আয়, চলে আয়,
ভয় নাই ওরে দানবীর।
আমি রহিব তোমার সাথে সাথে,
মুছাতে তোমার অশ্রুনীর।।
তোমার প্রলয় তুফান ছিন্ন কর, দিব তোমার ওপার আমি,
নাশিব তোমার রুদ্ধদ্বার
রাখিব অটুটু তোমার উচ্চশির।।

গীত কণ্ঠে বিবেক আস্তে আস্তে প্রস্থান ও সঙ্গে সঙ্গে হরিশ্চ চন্দ্র শৈব্যা প্রস্থান

বিশ্বামিত্র ঋষি প্রবেশ

বিশ্বামিত্র : শোন মন্ত্রী, এই গোটা রাজ্য আজ আমার অধিশ্বর। তুমি হাটে-বাজারে, শহরে-নগরে, প্রান্তরে রাজ্য মধ্যে ঢোল সহকারে জানিয়ে দিবে আজ হতে সমরাজ্য বিশ্বামিত্র ঋষি করিবে চালনা।
আমার আদেশ-রাজ্য মধ্যে মাছ, মাংস, মদ্য পান চলিবে না, নিরামিষ খাইতে হইবে। একাদশী উপবাসী হোব্যেসী করিতে হইবে। সাবধান রাজ্য মধ্যে কোন অন্যায় অত্যাচার, অনাচার চলিবে না। খুব কড়াভাবে ঘোষণা করে দাও। আর মনে থাকে যেন, রাজ্য মধ্যে কোন অচেনা বেওরুশ লোক প্রবেশ না করে। সাবধান, খুব কড়াভাবে ঘোষণা করে দিবে। (বিশ্বামিত্র প্রস্থান)

মন্ত্রী : দেবংশে ঠাকুর। ঐ দেবংশে ঠাকুরের পাল্লায় পড়ে মহারাজ ধর্ম ধর্ম করে সব হারাল। এখন আমি যদি ঐ দেবংশে ঠাকুরের কথা না শুনি, না মানি তাহলে যে আমার ভাগ্যে কি আছে।
ওরে বাপরে বাপ, একেবারে সদ্যই ঠাকুরগো মহারাজের একেবোরে সদ্যই রাজ্য ছাড়া করলো গো। যার কথায় কথায় বিষ সে আবার করবে রাজ্য চালনা। রাজ্য মধ্যে কোন খাজা গুণ্ডার হাতে পড়ে গিয়ে মার খেয়ে মরবে বেটা। (মন্ত্রী প্রস্থান)

সনসেট ও পরে কাড়াদার প্রবেশ

কাড়াদার : (নেপথ্যে-ঢোলে বাড়ি দিয়ে) শোন অযোধ্যাবাসী প্রজাগণ-একটা কড়া ঘোষণা। আজ হতে সমরাজ্য বিশ্বামিত্র ঋষি করিবে চালনা। (ঢোলে বাড়ি দিয়) সাবধান, রাজ্য মধ্যে মাছ, মাংস, মদ্যপান করা নিষেধ, নিরামিষ খাইতে হইবে, একাদশী উপবাসী হোব্যেসি করিতে হইবে। (ঢোলে বাড়ি দিয়) প্রজাগণ হুশিয়ার-সব হুশিয়ার-রাজ্য মধ্যে কোন অন্যায় অত্যাচার অনাচার করা চলিবে না। (ঢোলে বাড়ি দিয়া) সাবধান-আদেশ অমান্য করিলে বিশ্বামিত্র ঋষির অভিশাপে সব ভস্ম হইয়া যাইবে। খুব হুশিয়ার-হুশিয়ার-হুশিয়ার।

কাড়াদার প্রস্থান কনসেট

তৃতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্য

স্থান : বারানসী ধাম মধুসুধন ব্রাহ্মণের বাটী, মধুসুধন ঠাকুর প্রবেশ

ঠাকুর : (নেপথ্যে) ব্রাহ্মণী ও ব্রাহ্মণী, তুমি গেলে কোথায় গো। বাড়ীর দিকে এসো। আমার হাটবেলা হয়ে গেল। না-এরকম করে আর পারা যায় না। বাড়ী দুটো পূজা খরচ আবার ব্রাহ্মণী বায়না ধরেছে একটা দাসী চাই-পারিচারিকা চাই। একটা পারিচারিকা না হলেই হবে না। ওরে বাপরে বাপ, একেবারে রাজবাড়ীর বায়না যে। ব্রাহ্মণের পয়সা কড়ি তো খরচের কোন মা-বাপ নেই। ব্রাহ্মণী দাসী দাসী করে একেবারে জ্বালিয়ে খালো। আজ হাটে গিয়ে যে করেই হোক সস্তা দেখে একটা দাসীর

ব্যবস্থা করবই। যদি পাওয়া যায়, আগে একটা দাসীর ব্যবস্থা করে তারপর আমার অন্য খরচ, আমি প্রতিজ্ঞা করলাম।

ব্রাহ্মণী প্রবেশ

ব্রাহ্মণী : (নেপথ্যে) বলি অমন করে ভূতে বকা হচ্ছে কি জন্যে? ভূতে ধরেছে নাকি। আজ আবার কিসের প্রতিজ্ঞা করা হচ্ছে শুনি? হাটের দিন হলেই তো প্রতিজ্ঞা কর। কাজের বেলায় তো কিছুই না। একেবারে জ্বালিয়ে মারিল যে।

ব্রাহ্মণ : ভুতে বকা নায়–ব্রাহ্মণী–ভুতে বকা নয়। তুমার গাউনি গাচ্ছি।

ব্রাহ্মণী : বলি আমার গাউনি কি গাচ্ছো শুনি? তুমার মাথা–না তুমার মুণ্ডু, না তুমার পিণ্ডি?

ব্রাহ্মণ : তুমি শোন ব্রাহ্মণী? বেশী বাড়াবাড়ি কর না বলছি। এত সাধ করে তোমায় আমি বিয়ে করলাম, কিন্তু এ পর্যন্ত তোমার সাধ মিটাতে পারলাম না। তুমি তো জীবনভর ষষ্টি পুজো করে একেবারে নেহাল হলে, সেই সঙ্গে আমিও খরচ করে ফতুর হলাম। এ পর্যন্ত তোমার পেটে একটা ছোয়াল পোয়াল কিছুই হল না। আমি বলছি তোমার ষষ্ঠি পূজো বন্ধ কর, পূজো টুজোই আর কাজ নেই।

ব্রাহ্মণী : তুমি বলো কি গো, তাড়াতাড়ি করলেই হবে, মা ষষ্ঠি মুখ তুলে চাইলে তো হবে।

ব্রাহ্মণ : হবে তোমার মাথা–আর আমার মুণ্ডু।

ব্রাহ্মণী : আঃ মলো যা, মিন্‌সে বলে কি? ঠাকুর দেবতার সঙ্গে আবার চালাকি। তুমি ঠাট্টা করছো গো, ঠাকুর দেবতার কি অমন কথা বলতে আছে পাপ হবে যে গো।

ব্রাহ্মণ : আরে বাদ দাও তোমার ঠাকুর দেবতা, আমি বলছি তোমার ষষ্টী পুজা বন্ধ কর।

ব্রাহ্মণী : তুমি বলো কি গো–কাল আমার ষষ্টী পুজো তুমি পুজোর জন্যে কিছু যোগাড় টোগাড় করবা না গো?

ব্রাহ্মণ : না–তোমার ষষ্টী পুজার জন্যে আমি আর একটি পয়সাও খরচ করব না।

ব্রাহ্মণী : বেশ, তাহলে, বন্ধ কর তোমার গোবিন্দর পূজো, আমার পূজো বন্ধ করব। তিন বেলা যে পুজো আহ্নিক কর, তোমার কোনো মা–খুড়ি যোগাড় করে দেই এখন দেখা যাবে। (মুখ ও হাত নাড়া দিয়ে প্রস্থান)

নাড়ি ও কোমণ্ডল হাতে হঠাৎ চুড়ামনি গোস্বামী প্রবেশ

চুড়ামনি : (নেপথ্যে) হরি বল মন–হরি বল হরি বল।

ব্রাহ্মণী : কে? প্রভু? আসুন আসুন প্রভু চরণ ধুলি দিন। (প্রণাম করন।)

ব্রাহ্মণী–ও ব্রাহ্মণী এই দেখ গুরুদেব এসেছেন তুম শীঘ্র করে চরণ ধৌত জল নিয়ে এসো।

চূড়ামনি : বৎস? অত ব্যস্ত হয়ো না।
ব্রাহ্মণ : বসুন প্রভু, বসুন। (চুড়ামনি গোস্বামী বসিল)
চূড়ামনি : বৎস? তোমার সর্বাঙ্গীন কুশল তো?
ব্রাহ্মণী : আজ্ঞে, হ্যাঁ প্রভু। আপনার চরণের আশীর্বাদ আমার সর্বাঙ্গীন কুশল।
চূড়ামনি : বেশ! বহু দিন হলো তোমাদের বাটীতে আমি আগমন করিনি। তোমাদের দেখবার জন্য মনটা খুব ব্যাকুল হলো, তাই তোমাদের দেখতে এলাম। বৎস তোমার সন্তানাদি কয়টি?
ব্রাহ্মণী : প্রভু? (চোখে হাত দিয়ে ক্রোন্দন) ওটি ভিন্ন আর আমার কোনো কষ্টই নেই প্রভূ। ওই জন্যই মরমে মরে আছি, বহু দিন যাবত ধরে ষষ্টী পূজা করে আসছি, কিন্তু-একটিও সন্তান লাভ করিতে পারিনি প্রভু।
চূড়ামনি : বৎস? দুঃখ কোরোনা, আমার আশীর্বাদে শীঘ্রই তোমার পুত্র সন্তান লাভ হবে।
ব্রাহ্মণী : সেকি প্রভু?
চূড়ামনি : হ্যাঁ বৎস, আমার কাছে চণ্ডিকা দেবীর স্বপ্নদ্য বংশবৃদ্ধি নামক সদ্য ফলপ্রদ মহাকবচ আছে। সেই কবচ ধারন করলে বৎসরের মধ্যে পুত্র সন্তান লাভ কোরবে। আমি তোমার সেই কবচ দান করে যাবো।
ব্রাহ্মণ : ও-হো-হো, তাই প্রভু আমার বাড়ীতে শুভাগমন করেছেন। আজ ষষ্টী মাতা আমাদের প্রতি বুঝি মুখ তুলে চাইলেন।
ও ব্রাহ্মণী-তুমি এদিকে এস এত দিন পরে আজ ষষ্টী মাতা আমাদের প্রতি মুখ তুলে চেয়েছেন।
এসেছো ব্রাহ্মণী? এই দেখ গুরুদেব এসেছেন। ষষ্টী মাতা আমাদের উপর মুখ তুলে চেয়েছেন, তাই প্রভূ চণ্ডিকা দেবীর স্বপ্ন ফলপ্রদ বংশবৃদ্ধি কবচ দিয়ে যাবেন বৎসরের মধ্যে আমাদের পুত্র সন্তান হবে। বুঝেছো ব্রাহ্মণী? তুমি গুরুদেবকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে যাও। শীঘ্র চরণ ধৌত করে দিয়ে বসিবার আসন করে দাও গিয়ে। আমি হাটে যাচ্ছি, হাট সদায় করে এখনি ফিরে আসবো। তুমি গুরুদেবের চরণ ধুলি নাও প্রণাম কর। (ব্রাহ্মণী প্রণাম করিল)
চুড়ামনি : (ব্রাহ্মণীর মাথায় হাত দিয়া) সুখে থাকো মা তোমাদের মঙ্গল হোক।
ব্রাহ্মণ : উঠুন প্রভু বাড়ীর ভিতর চলুন। (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান-বারানীর হাট সংলগ্ন মধুসুদন ব্রাহ্মণের প্রবেশ।

ব্রাহ্মণী : আমি হিসাব করে দিখেছি, আজ হাটে আমার মেলা খরচ। অর্থাৎ বহু খরচ হবে। আমি জানি হাতে কিছুটা পয়সা কড়ি হলেই কত খরচ এসে জোটে। কি করব, যে সমস্ত খরচ এসে পড়ে খরচ না করেই পারা যাবে না। বাড়ীতে দুই দুটো পূজা খরচ তারপর গুরুদেব। আবার ব্রাহ্মণীর হুকুম বাড়ীতে হুকুম পরিচারি করেই চাই।

হরিশ্চন্দ্র, রুহিতাশ্ব, শৈব্যার প্রবেশ

হারিশ্চন্দ্র : (নেপথ্যে) শৈব্যা? আজ আমার দানের দক্ষিণা সপ্তকোটি স্বর্ণমুদ্রা দিবার সেই সপ্ত দিন। চিন্তায় আকুল কোথায় পাইব সপ্তকোটি স্বর্ণমুদ্রা, ভাবিতেছি তাই কি করি উপায়।

শৈব্যা : ও গো নাথ? কি দিয়ে শুধিবে তুমি তাপসের ঋণ। শুন প্রভু নিবেদি চরণে, হাটে গিয়া বিক্রয় করিয়া মোর পরিশোধ হও তুমি দানের দক্ষিণা। তাপসের ঋণ।

হরিশ্চন্দ্র : শৈব্যা? শৈব্যা? এও কি পরীক্ষা আমার। তুমি একি বলছো শৈব্যা? স্বামী হয়ে কোন বিধি অনুসারে তোমারে করিয়া বিক্রয় দানের দক্ষিণা আমি করিব প্রদান। তার চেয়ে মৃত্যুই আমার সহস্র সুখের।

শৈব্যা : ইহা ছাড়া উপায় নেই স্বামী? তুমি আমার ইহপরকালে দেবতা আমি তোমার অর্ধাঙ্গের অঙ্গিনী, নহে কি উচিত রক্ষিতে তোমায়, কেন তুমি হতেছ কাতর স্বামী? চলুন হাটে যাই।

হরিশ্চন্দ্র : পরীক্ষা? পরীক্ষা? আমার। শৈব্যা? তাই হোক, তাই হোক। ওগো–হরিশ্চন্দ্র বিক্রয় করিবে তাঁর জীবন সঙ্গিনী।

ব্রাহ্মণ : ওগো–কে তুমি?

হরিশ্চন্দ্র : ওগো বাপু–এটা কোন শহর?

ব্রাহ্মণ : এটা বারানসীর হাট। ওহে বাপু? আমার একটা পরিচারির প্রয়োজন, আপনি কি সত্যই এই স্ত্রী–লোকটিকে বিক্রয় করিবেন?

শৈব্যা : ওগো–উচ্চকূলে লভিয়া জনম, ভাগ্যদোষে পথের ভিখারিনী হয়েছি, পরিচারি পেলে আপনি গ্রহণ করবেন ঠাকুর?

ব্রাহ্মণ : ওহে বাপু? ব্যাপার কি বলো তো? সত্যই কি তুমি এই স্ত্রী–লোকটিকে বিক্রী করবে?

হরিশ্চন্দ্র : ওহে সত্যই আমার স্ত্রীকে বিক্রী করিব।

ব্রাহ্মণী : বলো ইহার মূল্য কত দিতে হইবে?

হরিশ্চন্দ্র : ওগো–আমার সাত কোটি স্বর্ণমুদ্রার প্রয়োজন, আপনি কত দিতে পারেন?

ব্রাহ্মণী : না বাপু–অত চড়া দাম দিয়ে আমার কেনবার ক্ষমতা নেই। আমার কাছে এক কথা বাপু, আমি দুই কোটি স্বর্ণমুদ্রা দিতে পারি, ইচ্ছে হয় দিতে পারো।

হরিশ্চন্দ্র : আচ্ছ তাই আপনি দুই কোটি স্বর্ণমুদ্রাই আমাকে দিন।

ব্রাহ্মণী : বেশ? তবে এই নাও মূল্য। (মূদ্রা প্রদান) তোমার স্ত্রীকে আমার সঙ্গে যেতে বল। চলো মা আমার আশ্রমে।

হরিশ্চন্দ্র : যাও শৈব্যা? দুঃখ কোরোনা সব বিধাতার লিখন নিয়তির চক্র। এছাড়া যে আমার আর কোন উপায় ছিল না।

শৈব্যা : স্বামী–দিন পদ ধূলি, করুন আশীর্বাদ বাঁচিলে জীবন যদি কভু আসে সেই দিন তব সাথে আবার আমার হইবে মিলন। (স্বামীর পদ ধূলি নিয়া) চলুন–বাবা ঠাকুর। (শৈব্যা, রুহিতাশ্ব, ব্রাহ্মণ প্রস্থানাদ্যেত)

ব্রাহ্মণ : এ্যা–ও কাকে সঙ্গ নিয়ে আসছো মা? আমি তো দুজনকে পুষতে পারবো না।

শৈব্যা : বাবা ঠাকুর? এযে আমার পুত্র। আপনি দয়া করে ছেলেটির ভার নিন, এর জন্যে আপনাকে পৃথক কড়ি দিতি হবে না বাবা?

ব্রাহ্মণ : তা–না হয় হলো। কিন্তু দুজনকে তো খেতে দিতে হবে।

ক্রোন্দন সুরে শৈব্যার গীত

আমার পুত্র বিনে বাঁচে না জীবন।
রুহিতাশ্ব দুধের বালক, খাই দণ্ডে দণ্ডে গো,
তিল অর্ধ না দেখলে আমার, প্রাণ বাঁচে নাইও গো,
আমার যাহা দিনে পিতা, খেতে যে আমার গো
তাহার অর্ধেক দিব পিতা, খেতে যে কুমারের গো,

ব্রাহ্মণ : চলো তো–যা করে গোবিন্দ। তবে একটা জুংলি বাঁধলো আর কি।

ব্রাহ্মণ রুহিতশ্ব, শৈব্যার প্রস্থান

হরিশ্চন্দ্র : (কাঁদিয়া) শৈব্যা? শৈব্যা? তুমি মানবী নও–তুমি দেবী। স্বামীর জন্যে তোমার অপূর্ব আত্মত্যাগ। আদর্শ সতী তুমি, তোমার সতীত্বের উজ্জ্বল আলোকে ভগবানের বিশাল ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক, উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক।

কমণ্ডল হস্তে বিশ্বামিত্র ঋষি প্রবেশ

বিশ্বামিত্র : (নে–পথ্যে) ধ্যানোস্তে জানিলাম হরিশ্চন্দ্র স্ত্রী–পুত্র বিক্রয় করিয়া মাত্র দুই কোটি স্বর্ণ মুদ্রা করিয়াছে সঞ্চয়,,–বাকি পাঁচ কোটি। (অগ্রসর হইয়া) কই সেই সপ্তদিন। দাও দানের দক্ষিণা সপ্তকোটি স্বর্ণমুদ্রা।

হরিশ্চন্দ্র : এই নিন ঋষিবর, আমি স্ত্রী–পুত্র বিক্রয় কর মাত্র দুই কোটি স্বর্ণমুদ্রা করেছি সঞ্চয়।

বিশ্বামিত্র : এখনও তো পাঁচ কোটি স্বর্ণমুদ্রার প্রয়োজন। তবে লহ তোমার অর্থ ব্যাপিত মনিময়ের রাজ মুকুট ভোগ কর গিয়ে রাজ্য তবো।

হরিশ্চন্দ্র : একটু অপেক্ষা করুন প্রভু। আমি নগর ভিক্ষা করিয়া আসি বাকি ঋণ করিব পূরণ।

হরিশ্চন্দ্রের নগর ভিক্ষা

গীত

আমি কেমনে শুধিব দক্ষিণা।
দানের দক্ষিণা আমি, কেমনে শুধিব গো,
ভিক্ষা দেন গো নগরবাসী, ভিক্ষা দেন আমারে গো,
দানের দক্ষিণা দিয়া, মুক্ত হবো ঋণ গো॥

হরিশ্চন্দ্র : (ভিক্ষাতে আসিয়া) এই নিন ঋষিবর–নগর ভিক্ষায় মাত্র দেড়কোটি স্বর্ণমুদ্রা পেয়েছি। (মুদ্রা প্রদান)।

বিশ্বামিত্র : হরিশ্চন্দ্র–এখনও তো বাকি অর্ধ প্রয়োজন। আর সহেনা বিলম্ব মোর, লহ তোমার অর্থ, ব্যাপিত মনিময়ের রাজ মুকুট ফিরে যাও অযোধ্যা নগর ভোগ কর গিয়ে রাজ্য তব।

হরিশ্চন্দ্র : না, না আমি যে ত্রি–সত্য করেছি। ওগো–কে কোথায় আছে, কিঙ্কর হরিশ্চন্দ্র প্রস্তুত তাইতে।

ঝোলা কাঁধে লাঠি হস্তে কালুডোমের প্রবেশ

ডোম : আছে–আলবোৎ আছে।

ডোম : কে নফর হবিরে বেটা–কে নফর হবি।

হরিশ্চন্দ্র : আমি হবো কিঙ্কর প্রভু? আপনি হইয়া বিক্রয় ঋণ মুক্ত হতে।

কালুডোম : বোল তুহার মূল্য কেত দিতে হোবে?

হরিশ্চন্দ্র : ওগো–আমি সপ্ত কোটি স্বর্ণমুদ্রা ঋণগ্রস্ত। বাকি সাড়ে তিন কোটি স্বর্ণ মুদ্রা দিন এই ঋষি স্ব–কোশে।

কালু ঠাকুর : লে–ঠাকুর, হামারা ঝুলিয়ার ভেতর পাঁচকোটি স্বর্ণমুদ্রা আছে। আর কিছু চান? (মুদ্রা প্রদান) বাবুকে মুক্তি দেলে তো ঠাকুর?

বিশ্বামিত্র : মুক্তি? না–না, হরিশ্চন্দ্র মুক্তি পাবে না। এখনও পরীক্ষার শেষ হয় নাই। (প্রস্থান)

কালুডোম : যা–যা বেরিয়ে যা ঠাকুর। ডাণ্ডা মারিয়ে ঠাণ্ডা কেরিয়ে দিবো। বোলে তুহারা নাম কি রে দাদুয়া?

হরিশ্চন্দ্র : হরিশ্চন্দ্র।

কালুডোম : ওরে দাদুয়া রে দাদুয়া। হো নাম তো আমি বোলতে পারবে হতে কালুয়া ডোমের নফর হরিয়া ডোম আছিস। তু হামা জানিস? হামারা শুকুর রাখবি আর শোশান ঘাট পাহারা দি তো দাদুয়া?

হরিশ্চন্দ্র : হ্যাঁ সর্দার, খুব পারবো।

কালুডোম : তু চেলিয়ে আই হামারা পিচ্ পিচ্। (উভয়ে প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক প্রথম দৃশ্য

স্থান মধুসূদন শর্ম্মার বাটী শৈব্যা ও রুহিতাশ্বের প্রবেশ

রুহতাশ্ব : (নেপথ্যে) এই ব্রাহ্মণের বাড়িতে আমাদের আর কত দিন থাকতে হবে মা

শৈব্যা : কন বাবা? এই ব্রাহ্মণের বাড়িতে থাকায় তোমার কি কোনো অসুবিধা হচ্ছে বাপ?

রুহিতাশ্ব : না মা, তাই বলছি।

ব্রাহ্মণের প্রবেশ

ব্রাহ্মণ : (নেপথ্যে কই মা শৈব্যা? তোমার পুত্র খেলাধূলা করে বেড়াচ্ছে, আমার কিছুটা কাজ–টাজ করুক না। ঐ তপোবন হতে আমার পূজার পুষ্প তুলে আনতে বল।

শৈব্যা : আপনি জান বাবা ঠাকুর, আমি এখনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ব্রাহ্মণ : একটু তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দাও মা, আমার পূজার সময় হয়ে এল। (ব্রাহ্মণ প্রস্থান)

শৈব্যা : বাপ রুহিতাশ্বরে, বাবা ঠাকুর বলেছেন তাঁর পূজার পুষ্প তুলে আনতে, তুমি পারবে বাবা?

রুহিতাশ্ব : খুব পারবো মা, ঐ যে ফুল বাগান দেখা যাচ্ছে, আমি এখনি গিয়ে ফুল তুলে নিয়ে চলে আসবো।

শৈব্যা : (রুহিতাশ্বর থুতায় হাত দিয়ে) না–বাপ তুমি আর ফুল তুলতে যেও না।

শৈব্যার গীত

এস এস ও এস যাদু, এস করি কোলে,
বাপরে যেওনা সেই তপোবনে কুসুম তুলিতে।

রুহিতাশ্বর গীত

আমি যদি না যাই মাতা, কুসুম তুলিতে,
মাগো–দুর্ম্মুখ ব্রাহ্মণের অন্ন তোমায় না দিবে।

শৈব্যার গীত

কাল নিশিতে ও দেখেছি বাপ নিদারুণ স্বপ্ন,
বাপরে–যেয়োনা সেই তপোবনে কুসুম তুলিতে।
কাল নিশিতে দেখেছি বাপ নিদারুণ স্বপ্ন,
বাপরে–নিশ্চয় ও করিবে তোমার ভুজঙ্গ দংশন।

রুহিতাশ্বর গীত

পিতার পুত্রেয়ী করে মাতারী পালন মাগো—
তোমারে খাওয়ায়ে অন্ন থাকি সর্বক্ষণ।

রুহিতাশ্ব : মা? তবে আমি ফুল তুলতে চললুম।

শৈব্যা : যাও বাপ? ফুল তুলে তাড়াতাড়ি ফিরে এস। (রুহিতাশ্ব প্রস্থান)

ব্রাহ্মণের প্রবেশ

ব্রাহ্মণ : কই মা শৈব্যা? তোমার পুত্র এখনও ফুল তুলে ফিরে আসেনি? সন্ধ্যা হয়ে এল আমার পূজার সময় বয়ে যাচ্ছে, তুমি যাও মা, একটু এগিয়ে দেখে এস।

শৈব্যা : আপনি যান বাবা ঠাকুর, আমি এখনি যাচ্ছি।

ব্রাহ্মণ : একটু তাড়াতাড়ি যাও মা। (ব্রাহ্মণের প্রস্থান)

শৈব্যা : রুহিতাশ্ব গিয়েছে ফুল তুলিবারে এখনও তো সে ফুল তুলে ফিরে এল না। যাই একটু এগিয়ে দেখে আসি। (শৈব্যা প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান কালুডোমের বাটি। হরিশ্চন্দ্রের প্রবেশ

হরিশ্চন্দ্র : (নেপথ্যে) হে ধর্ম দয়াল শ্রী হরি তুমি থাকিও সহায় মোর, রাজা হরিশ্চন্দ্র আজ চণ্ডাল হাড়ির চাকর। রাজরাণী ব্রাহ্মণের দাসী-উত্তম সৌভাগ্য আমার। বষ্ট কষ্টে। করিয়াছি তাপসের ঋণ পরিশোধ।

লাঠি হস্তে কালুডোমের প্রবেশ

কালুডোম : এ্যা-রে, হরিয়া দাস? তু এত্তাক্ষণ কাঁহা ছিলিরে বেটা? হামি তুহারা বহুত খুঁজিয়াছে, তুহারা কাম তো তু বুঝিয়ে লিইবি। তু-হামারা বাত বুঝিলি তো?

হরিশ্চন্দ্র : হ্যাঁ সর্দার বুঝেছি।

কালুডোম : বহুত আচ্ছা? বহুৎ আচ্ছা? ঐ দেখ শুকরের পাল, তু আউরমে ঐ শুকুরের পাল এরাবি, আর ঐ দেখ বারানসীর শ্মশান ঘাট, ঐ শোশান ঘাট পাহারা দিবি। যব আদমি লোক মড়া নিয়ে পুড়াতে আসবে, তু আদমি লোক মড়াতে পঞ্চাশ কাহন কড়ি গুনিয়ে লিবি, তবে পুড়াতে দিবি। তু এক গণ্ডা কড়ি কম লিবি না।
তু আর এক কাম করবি-বাতানে শুকুরের পায়খানা দু-হস্তে ভালা কেরিয়ে পরিস্কার কোরবি। আর বেশী কাম নেহি দিব, তু আদমি লোক একটু নেরম মানুষ আছিস। তু হামারা বাত বুঝলি তো দাদুয়া?

হরিশ্চন্দ্র : (হরিশ্চন্দ্রের কাঁধে হাত দিয়ে) বহুৎ আচ্ছা? বহুৎ আচ্ছা? আর বেশী বেলা নেহি, আমারা এখন বহুত কাম আছে। এই নে আমারা ঝুলি, এই নে হামারা লাঠি। এখন হামি চেলিয়ে গেলাম। তু-ভালা কেরিয়ে পাহারা দিবি, বুঝলি তো?

হরিশ্চন্দ্র : হ্যাঁ সর্দার।

কালুডোম : হ্যাঁ-সাবধান। ভালা কেরিয়ে পাহারা দিবি। (কালুডোম প্রস্থান)

হরিশ্চন্দ্র : হে কৃপাসিন্ধু, দয়াময় শ্রীহরি। তুমি সব করতে পার, ভিখারীকে রাজ সিংহাসনে বসাতে পার, আবার রাজাকে পথের ভিখারী বানাতে পার। দয়াময়, সুখ দুঃখ সবই তোমারি হাত। দয়াময় আমার পরীক্ষার শেষ এখনও কি হইনি প্রভূ? আমি কেমন করে শুকরের পায়খানা স্ব-হস্তে পরিস্কার করব। শোন, শোন ওরে শুকরের পাল? আজ আমি চণ্ডাল আজ আমি তোমাদের রাখাল, আমার একটি মাত্র আদেশ আজ হতে তোমাদের পালন করে চলতে হবে। তোমাদের নিজ নিজ পায়খানা মলমূত্র বাতান হতে দূরে নিক্ষেপ করে আসবে। আমি আজ চণ্ডাল, আমি চণ্ডাল। চণ্ডালের অন্নে আমার জীবন ধারণ আচরণ পরিধানে চণ্ডালের বসন মৃত্যুর কাপড়। বৃত্তি আমার মৃত্যু সৎকারের কড়ি। উত্তম সৌভাগ্য আমার, আমি চণ্ডাল, আমি চণ্ডাল, আমি চণ্ডাল।

হরিশ্চন্দ্র প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য

স্থান–তপোবন, ফুল বাগান। ফুলির সাজি হাতে রুহিতাশ্বর প্রবেশ।

রুহিতাশ্ব : নে–পথ্যে এই তো দেখছি ফুলবাগান। বাহ! কি সুন্দর সুন্দর ফুল, আমি তাড়াতাড়ি ফুল তুলে নিয়ে যাই, দেরি হলে ওদিকে ঠাকুর রেগে পড়বেন। (ফুল তুলতে তুলতে ফুলের সাঝি ফেলে পা ধরে) (পা ধরিয়া) ওউঃ– কিসে কামড়ালো আমারে। এযে বিষ কীটের দংশন। ওউঃ জ্বলে গেল পুড়ে গেল আমার শরীর যে অবসন্ন হয়ে আসছে। মা, মা, তোমার সাথে আমার আর বুঝি দেখা হল না। আমার প্রাণ যাই, প্রাণ যাই–(মৃত্যুর অবস্থায় ভূমিতে শয়ন)

শৈব্যার প্রবেশ

শৈব্যা : (নেপথ্যে) এই তো দেখছি ফুল বাগান ওরে ও রহিত রহিত। কই বাবার তোর এখনও কি ফুল তুলা হল না। (অগ্রসর হয়ে) এ্যাঃ–একি রুহিতাশ্ব, আমার শয্যা শায়িত কেন? তবে কি রুহিতাশ্ব আমার নেই ওরে রহিত রহিত—

শৈব্যা রুহিতাশ্বর বুকের উপর পড়িয়া ক্রন্দন।

গীত

উঠরে বাপ রুহিতাশ্ব রে
একবার উঠে কথা বল রে,
চন্দ্রমুখী বাপরে রহিত,
একবার নয়ন মেলে চাও রে। (রহিত, রহিত)
নিশি প্রভাত হলে বাপরে রহিত
আমি কার বাড়ি যাবো রে,
কে বেড়াবে সাথে সাথে রে
আমি কার বা কোলে নেব রে (ওরে রহিত রহিত)
আমার কে ডাকিবে মা মা বলে রে
আমি কার বা পানে চাবো রে।

মৃত রুহিতাশ্বর থুঁতায় হাত দিয়ে

ওরে ও রহিত, রহিত বাবা আমি রাজ্য হারা হয়েছি, স্বামী হারা হয়েছি, শুধু তোর মুখের দিকে চেয়ে, আজ তুই ফাকি দিয়ে চলে গেলি বাপ। ওরে রহিত, রহিত, ওরে বুক ভরা মানিক, একবার মা বলে ডাক, সাড়া দে বাপ তুই একি করলি বাবা। (গায়ে হাত দিয়া) আহারে বাছারে নিশ্চয় বীষ কীটে দংশন করেছে, বাছার সর্ব শরীর নীলবরণ হয়ে পড়েছে। ওরে রহিত রহিত, কথা বল বাপ, মা বলে ডাক।

ব্রাহ্মণের প্রবেশ

ব্রাহ্মণ : (নেপথ্যে) কই মা শৈব্যা তোমার পুত্রের এখনও কি ফুল তুলা হলো না?

শৈব্যা : বাবা ঠাকুর পুত্র আমার নেই ফুরিয়ে গিয়েছে। (কাঁদিয়া ফেলিল)

ব্রাহ্মণ : এ্যাঃ সে কি মা! দাদু, দাদু। ওউ ভগবান। একি করিলে তুমি আমার যা আশা ছিল পূর্ণ করতে দিলে না। ওরে দাদু তুই একি করলি দাদু, ওরে

আমি কেন তোরে ফুল তুলতে বলেছিলাম। আর কি করবো, চল মা কেঁদে আর কি হবে, বেলা নেই, সন্ধ্যা হয়ে এল, চলো তোমার পুত্রকে বারানসীর ঘাটে সৎকার করে আসি।

শৈব্যা : (মৃতদেহ তুলিয়া) চলুন বাবা ঠাকুর। ইহায় ছিল আমার অদৃষ্টে লিখন। ভগবান! একি করলে তুমি মা হয়ে পুত্রের সৎকার এই ছিল কপালে আমার। (উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক প্রথম দৃশ্য

স্থান বারানসীর শ্মশানঘাট। চণ্ডাল হরিশ্চন্দ্রের প্রবেশ

হরিশ্চন্দ্র : (নেপথ্যে) প্রভু নিরাঞ্জন পাতকি তারণ। তুমি তো জান আমার অন্তরের ব্যথা প্রভূ? তুমি কাউকে হাসাও, কাউকে কাঁদাও আবার কাউকে বসাও রাজ সিংহাসনে। আবার তুমি কাউকে একমুষ্টি অন্নের জন্যে ফিরাও দ্বারে দ্বারে, একি লীলা তোমার প্রভূ? হে কৃপাসিন্ধু দয়াময়, তুমি সব করতে পার, ছিলাম রাজা হলাম ফকির, আজ আমি কালিয়া ডোমের নফর হরিয়া ডোম। আমার কাজ শুকর রাখা আর শ্মশান ঘাট পাহারা দেওয়া। (হাসি) হা হা-হা, উত্তম? উত্তম? অদৃষ্ট আমার আজ আমি চণ্ডাল, আমি চণ্ডাল, আমি চণ্ডাল (প্রস্থান)

স্থান : বারানসীর শ্মশান ঘাট, ব্রাহ্মণসহ মৃত রুহিতাশ্ব বুকে চেপে ধরে শৈব্যার প্রবেশ

ব্রাহ্মণ : (নেপথ্যে) ঐ যে মা-বারানসীর শ্মশান ঘাট। তুমি এখন যাও মা, আমি গেলে ঘাটের মাশুল দিতে হবে। তুমি যাও মা, আমি এখন যাই। (ব্রাহ্মণ আস্তে আস্তে প্রস্থান)

শৈব্যা : ওরে ও রহিত রে, ডাক বাবা একবার মা বলে ডাক। ওরে সেই মধুময় বোলে চাঁদ মুখে একটি বার মা বলে ডাকদে বাবা। ওরে রহিত, রহিত।

শৈব্যা মৃত রহিতাশ্বকে কোলে রাখিয়া বসিল

লাঠি হস্তে ঝোলা কাঁধে চণ্ডাল বেশে হরিশ্চন্দ্রের প্রবেশ

হরিশ্চন্দ্র : (নেপথ্যে) ঐ-ঐ নারী কণ্ঠস্বর ধ্বনি, ঐ শোনা যায়। দেখি কোন অভাগিনী আসিল হেথা। (অগ্রসর হয়ে) কে? কে তুমি নারী? মেঘে আছন্ন আকাশ অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা ভীষণ দুর্যোগপূর্ণ নিশি, মিটিমিটি আলো বিদ্যুৎ বিকাশ মাঝে মাঝে, হতেছে বজ্রপাত এ ঘোর নিশিতে একা তুমি কেন? কেন আসিলে এই শ্মশান ঘাটে?

শৈব্যা : ওগো কে তুমি? ওগো-আমার পুত্র কাল ঘুমে ঘুমিয়েছে। আমি তাঁর বারানসীর চিতা শয্যায় শয়ন করাতে এসেছি। ওগো, তুমি কথা বলছো কে?

হরিশ্চন্দ্র : আরে শোকাতুর নারী? আমি এই শ্মশানঘাট রক্ষক প্রহরী।

শৈব্যা : ওগো, শুনি তোমাদের চণ্ডাল জাতি, বড় দয়াল জানে কত মন্ত্র ঔষধি। ওগো পার যদি সর্পদষ্ট সন্তান মোর বাঁচাইয়ে দাও।

হরিশ্চন্দ্র : আরে, শোকাতুর নারী, জাতিতে চণ্ডাল নহি আমি। দারিদ্র পেষণে ভাগ্যক্রমে হয়েছি জাতিভ্রষ্ট চণ্ডাল অধম। আমি নাহি জানি কোন মন্ত্র ঔষধি।

শৈব্যা : ওগো, তবে কি বাচার এ ঘুম ভাঙ্গবে না আর।

হরিশ্চন্দ্র : আরে শোকাতুর নারী? এ বড় মজার ঘুম। এ ঘুম একদিন সবারই ঘুমাতে হবে, তবে কিছুদিন আগে, আর কিছুদিন পরে। তুমি মরা পুত্র কোলে করি বৃথা কেন করিবা ক্রন্দন। তোমার কর্তব্য? তুমি শব দাহ কড়ি আমাকে দিয়ে ফিরে যাও গৃহে। তোমার পুত্রের দাহ কৃতকার্য আমিই করিব সম্পন্ন।

শৈব্যা : ওগো, কি নিষ্ঠুর তুমি? জান না এ বিপদে মাতৃপ্রাণে কত জ্বালা। তুমি কেন কও আশ্বাসের বাণী। ওগো, আমি যে কাঙ্গালিনী। কোথায় পাব কড়ি।

হরিশ্চন্দ্র : আরে, আরে, শোকাতুর নারী। আমি এই শ্মশানঘাটের প্রহরী। আমার পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে দিয়ে তুমি কর পুত্রের সৎকার।

শৈব্যার ক্রন্দন সুরে গীত

ব্রাহ্মণের দাবি আমি কোথায় পাব কড়ি,
কি দিয়ে মেটাবো দেনা বুঝতে না পারি।

ক্রন্দন সুরে শৈব্যার পুনঃগীত

কোথায় রইলে প্রভূ আমার গো,
ওনা দানবীর হরিশ্চন্দ্র গো,
তোমার পুত্র-রুহিতাশ্ব গো,
একবার দেখলে না আসিয়া গো।

হরিশ্চন্দ্র : (হাতের লাঠি ফেলিয়া) নারী? সত্য পরিচয় দাও-তুমি শৈব্যা? তোমার কোলে কি সত্যই মৃত রুহিতাশ্ব?

শৈব্যা : ওগো-পরিচয়? সে অনেক কথা, আমার স্বামী ছিলেন অযোধ্যার রাজা হরিশ্চন্দ্র।

হরিশ্চন্দ্র : শৈব্যা? শৈব্যা? আমি সেই হরিশ্চন্দ্র। আমি দানের দক্ষিণা দিতে তোমায় বিক্রি করেছিলাম ব্রাহ্মণের নিকট দুইকোটি স্বর্ণমুদ্রায়। আর নিজে কালু হাড়ির নিকট হয়ে পরিশোধ হয়েছি বিশ্বামিত্র ঋষি তাপসের ঋণ সপ্তকোটি স্বর্ণমুদ্রা দানের দক্ষিণা।

শৈব্যা : স্বামী? স্বামী (স্বামীর গলা ধরিয়া ক্রন্দন।)

হরিশ্চন্দ্র : ভগবান? ভগবান? এ কি করলে আজ একি মিলন শ্মশানে আমার। বিদ্যুৎ, বিদ্যুৎ একটিবার চমকে উঠ বিদ্যুৎ, বাপ রুহিতাশ্বর চাঁদমুখ জন্মের মত দেখে নি।
(মৃত রুহিতাশ্বর কাছে বসিয়া) ওরে-রহিত রে,-ও বাবা রহিত রহিত। একবার সাড়া দে বাপ।

কতদিন হলো তোর মুখে বাবা ডাক শুনতে পারি নি। একবার সাড়া দে বাপ, সাড়া দে। না রুহিতাশ্ব, আর সাড়া দেবে না। (উঠিয়া) শৈব্যা? কেঁদ না আর, সাজাও অগ্নিচিতা, চিতা শয্যায় যাব মোরা আজ পুত্রসহ ধর্ম অনুষ্ঠানে। (অগ্নিকুণ্ড)

হঠাৎ কমণ্ডল হস্তে বিশ্বামিত্র ঋষির প্রবেশ

বিশ্বামিত্র : (নেপথ্যে) ধন্য, তুমি অযোধ্যাপতি রাজা হরিশ্চন্দ্র। আমি অতীব সন্তুষ্ট তোমা প্রতি, উত্তীর্ণ হলে মোর পরীক্ষায় আজ ঋণমুক্ত তুমি অবনিমণ্ডলে। রহিল এই ভূমণ্ডলে বিখ্যাত নাম তোমার দানের এ কাহিনী।

হরিশ্চন্দ্র : (কাঁদিয়া) দেখ-দেখ ঋষিবর, পুত্র মোর কাল ঘুমে ঘুমিয়ে আছে। চৈতন্য কি হবে না প্রভূ? (পদ ধারন)

শৈব্যা : (কাঁদিয়া) মুনিবর! মুনিবর! বাঁচায়ে দিন পুত্র মোর। (বিশ্বামিত্রের পদধারণ)

বিশ্বামিত্র : (কাঁদিয়া) শান্ত হও। শান্ত হও মা সতী দেবী, মরিবে না পুত্র তবো থাকতে আমার এই কোমণ্ডলের অমৃত সুধা বারি। মম বরে জীবিত হোক তোমার পুত্র রুহিতাশ্ব।

মৃত রুহিতাশ্ব জীবিত নিমিত্ত বিশ্বামিত্র ঋষির ব্রহ্মহোম। বিশ্বামিত্র ঋষি একটা আম্রশ্বার দিবে। রুতিাশ্ব মা মা বলে ডেকে উঠবে—

শ্লোক

বিশ্বামিত্র : ওঁ ব্রহ্মায় নমোস্তে
অগ্নিকুণ্ডে স্বাহা
রুহিতাশ্ব-জীবিতং।
ওঁ ব্রহ্মায় নমোক্ষে
অগ্নিকুণ্ডে স্বাহা
রুহিতাশ্ব-জীবিতাং।
ওঁ ব্রাহ্মায় নমোস্তে
অগ্নিকুণ্ডে স্বাহা
রুহিতাশ্ব-জীবিতং।

রুহিতাশ্ব : মা মা (ডাকিয়া উঠিল)।

হরিশ্চন্দ্র : (দুবাহু তুলিয়া) জয় মহর্ষী বিশ্বামিত্র ঋষির জয়, জয় মহর্ষী-বিশ্বামিত্র ঋষির জয়।

বিশ্বামিত্র : (ডান হাত তুলিয়া) মম জয় নয় হরিশ্চন্দ্র-এ জয় তব। জয়-অযোধ্যাপতি দানবীর রাজা হরিশ্চন্দ্রের জয়। জয়-অযোধ্যাপতি রাজা হরিশ্চন্দ্রের শ্মশান মিলন, শ্মশান মিলন, শ্মশান মিলন।

যবনিকা

তথ্যসূত্র

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *লোকসাহিত্য*

২. ড. সুকুমার সেন, 'শিশুদেব', শ্রীভবতারণ দত্ত (সম্পা), *বাংলাদেশের ছড়া।*

৩ তিতাস চৌধুরী, *কুমিল্লা জেলার লোকসাহিত্য* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩), পৃ. ১৩

৪. ওয়াকিল আহমদ,

৫ পঞ্চানন মণ্ডল (সম্পা), *পুঁথি পরিচিতি, ৩য় খণ্ড* (কলিকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ) পৃ ৮১

৬ ঐ, পৃ ৪৫

৭ ঐ. পৃ. ৮১

৮ ওয়াকিল আহমদ, *বাংলা লোকসাহিত্য : মন্ত্র* (ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৫), ভূমিকা, পৃ. ৫

৯. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস :আদিপর্ব* (কলিকাতা : দেজ পাবলিশিং, ১৪০২) পৃ. ৪৭১

১০ বিজয় গুপ্ত, *পদ্মাপুরাণ,* জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত (সম্পা) (কলিকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২) পৃ. ১৫৪

১১. ঐ, পৃ -১৫৪

১২. ঐ, পৃ. ১৭২

১৩ কোরেশী মাগন, *চন্দ্রাবতী,* আহমদ শরীফ (সম্পা), (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৬৭), পৃ ৬২

১৪ ওয়াকিল আহমদ, *বাংলা লোকসাহিত্য :মন্ত্র*, প্রাগুক্ত, পৃ ৮

১৫. ঐ, পৃ. ৮

১৬. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, *চণ্ডীমঙ্গল, ধনপতি উপাখ্যান,* বি., ১৯৬৬), পৃ. ৩৬

১৭ ঐ, পৃ ৭২

১৮ দ্বিজমাধব. *মঙ্গলচণ্ডীর গীত,* সুধীভূষণ ভট্টাচার্য (সম্পা.), (কলিকাতা : ক বি , ১৯৫৭), পৃ ১৫০

১৯. দ্বিজরাম দেব, *অভয়ামঙ্গল,* শ্রী আশুতোষ দাস (সম্পা.), (কলিকাতা : ক বি., ১৯৫৭), পৃ. ১৫০

২০ ওয়াকিল আহমদ, *বাংলা লোকসাহিত্য :মন্ত্র,* প্রাগুক্ত, পৃ ২৩

২১ মুহম্মদ আবদুল জলিল, *লোকচিকিৎসায় তন্ত্র-মন্ত্র* (ঢাকা : বিশ্বসাহিত্য ভবন, ২০০১), পৃ. ভূমিকা-১-৬২

২২. যাঁর কাছ থেকে সংগৃহীত : ভোলানাথ রায়, গ্রাম—গোনদল গ্রাম, থানা—চিরিরবন্দর, দিনাজপুর, বয়স-৭৫, পেশা-কৃষি ও ওঝাগিরি, শিক্ষা-নিরক্ষর।

২৩. ঐ

২৪. বাবুরাম বর্মণ, গ্রাম-বলেয়া, থানা-কাহারুল জেলা-দিনাজপুর, বয়স-৪৫, পেশা-ব্যবসা, শিক্ষা-নিরক্ষর।

২৫. রামচন্দ্র বর্মা, গ্রাম-ভাংবাড়ি, থানা-রানীশংকৈল, জেলা-ঠাকুরগাঁও, বয়স-৬৫, পেশা-কবিরাজী, চিকিৎসা, শিক্ষা-নিরক্ষর।

২৬. যুগোলচন্দ্র বিশ্বাস, গ্রাম-বাদুরগাছা, থানা-কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ, বয়স-৭৫ পেশা-কৃষি, শিক্ষা-৫ম শ্রেণী।

২৭. ধীরেন্দ্রনাথ বর্মণ, গ্রাম-নরগা, থানা-রাণীসংকেল, ঠাকুরগাঁও, বয়স-৫৫ পেশা-কবিরাজী, শিক্ষা-নিরক্ষর।

২৮. নিমাইচন্দ্র বিশ্বাস, গ্রাম-চান্দুটিয়া, থানা-যশোর সদর, যশোর, বয়স-৭০, পেশা-কবিরাজী, শিক্ষা-৪র্থ শ্রেণী।

২৯. অমলচন্দ্র বিশ্বাস, গ্রাম-বাদুরগাছা, থানা-কালীগঞ্জ-ঝিনাইদহ, বয়স-৩৫, পেশা-কৃষি শিক্ষা-৫ম শ্রেণী।

৩০. যুগোলচন্দ্র বিশ্বাস, প্রাগুক্ত।
৩১. ধীরেন্দ্র নাথ রায়, গ্রাম-সংকাইল, থানা-বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর, বয়স-৬২, পেশা-কৃষি, শিক্ষা-৫ম শ্রেণী।
৩২ শৈলেন্দ্র বিশ্বাস (সংকলিত), *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান*, (কলিকাতা, ১৯৫৪, ২য় সংস্করণ)
৩৩. ড. শীলা বসাক, *বাংলা ধাঁধার বিষয় বৈচিত্র্য ও সামাজিক পরিচয়* (কলিকাতা : পুস্তক বিপনী, ১৯) পৃ ৬
৩৪. বঙ্কিমচন্দ্র মাহাত, *ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য*
সংস্করণ, পৃ. ১৯৫
৩৫. ড. কাজী দীনমুহম্মদ, *লোকসাহিত্য : ধাঁধা ও প্রবাদ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী)
৩৬. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলা লোকসাহিত্য : ধাঁধা* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫), পৃ. ১০.
৩৭. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোকসাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬
৩৮. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলা লোকসাহিত্য : প্রবাদ ও প্রবচন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪-১৫
৩৯. *বাংলার লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড,* পৃ. ৪৪৫-৪৪০, *লোকসাহিত্য* পৃ. ১৮৭-১৮৯, মুহম্মদ আব্দুল হাফিজ, *লোককাহিনীর দিগদিগন্ত* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৬৮), পৃ. ৬-১৭
৪০. বঙ্কিম চন্দ্র মাহাত, *ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১
৪১. শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু (সম্পা), *বিশ্বকোষ, খণ্ড ১৮*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬
৪২ ঐ, পৃ. ৪৬
৪৩. ঐ, পৃ. ৪৬
৪৪. ঐ, পৃ. ৫১
৪৫. ঐ, পৃ. ৭৬
৪৬. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা), *বাংলাপিডিয়া : বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ*, খণ্ড ৯, প্রাগুক্ত থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ২৩৬
৪৭. ওয়াকিল আহমদ, *লোককলা প্রবন্ধাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

পরিশিষ্ট-৪

চৈত্র পূজার শ্লোক অর্থাৎ

চৈত্র মাসে শিব পূজায় বালাদারের বালাদারী-কর্ম। ঘটোস্থাপন (শিব প্রণামী)

(১)

প্রণাম হইলাম ভক্তি আদ্য দেব আদ্য শক্তি
ব্রহ্ম বিষ্ণু শিব আদি দেবা ।।
দিবা কর হৃষি প্রদি দেব রাজ গণপতি
কৈলাসেতে শিব পদে সেবা ।।

(২)

প্রণাম হইলাম মনে কূর্মা আদি নাগগণ,
বলি আদি তলাতল বাসী।
ত্রিলোকের দেবতা যত পৃথিবীতে অনুগত
বিপ্রের চরনে ভক্তি রাখি ।।

(৩)

সর্ব্ব সর্ব্বদেব গননায় অগ্রে যার স্থান।
বিধি বিষ্ণু শিব যিনি সর্ব্বাধিক মান ।।
ও রাঙ্গা চরণে প্রভু, ভক্তের প্রণাম।
সর্ব্বসিদ্ধি দাতা পূর্ণকর করি নমস্কার ।।
সর্ব্বসিদ্ধি দাতা পূর্ণকর করি নমস্কার ।।

শিব বন্দনা :

গলে দোলে মুণ্ড মাল পরিধান বাঘছাল
হাতে মুণ্ড চিতা ভস্ম গায়।
ডাকিনি যোগিনি গণ, ভূত পেত অগনন
সঙ্গে সঙ্গে নাচিয়া বেড়াই ।।
অতি দীর্ঘ জটাজুট, কণ্ঠে শোভে কালকুট
চন্দ্র কলা ললাটে শোভিত।
ফনি বালা ফনি হার, ফনি বালা অলঙ্কার
শিরে ফনি ফনি উপবিত
যোগিনি অগম্য হয়ে, সদা থাক যোগ লয়ে
কি জানি কাহার কর ধ্যান
অনাদি অনন্ত মায়া, দেহ যারে পদছায়া
সেই পাই চতুর্বর্গ দান ।।
মায়া মুণ্ড তুমি শিব, মায়া যুক্তি তুমি জীব
কে বুঝিতে পারে তব মায়া ।।

অজ্ঞানে যাহার যায়, অনাসে জ্ঞান পাই
যারে তুমি দেহ পদ ছায়া।।
লায়েকের দুঃখ হর, ঘটোস্থাপন পূর্ণ কর
নিবেদি বন্দনা বিশেষ।
প্রণাম হইলাম গুরু বাঞ্ছা আদি কল্পতরু
ভক্ত জনের প্রতি কর দয়া।
যাঁহার সেবক নন্দী, তাঁহার চরন বন্দি
উদ্দেশ্য বন্দিলাম মহামায়া।।

(৪)

ত্রি-গুঁণ যতি সতি, বৈষ্ণবাদি নরপতি
জনক জননী দুই জন।
গঙ্গা আদি তীর্থ যত, শাস্ত্র আদি ভাগবত
ভক্তি স্তুতি শ্রীগুরুর চরন।।

(শ্রী শ্রী গনেশ বন্দনা)

নমোঃ নমোঃ গজানন বিঘ্ন বিনাশন।
নমঃ প্রভু মহাকায় মহেশ নন্দন।।
নমোঃ নমোঃ লম্বোদর নমোঃ গনপতি
মাতার যার আদ্যশক্তি দেবী ভগবতী।।

(শুর্ণকার)

নাহি ছিল দেবগন, না ছিল সমিরন
না ছিল পর্ব্বত আকার।।
নাহি ছিল রবি শশী সন্ন্যাসীতপস্বী জঙ্গল
ছিল তখন সব শুর্ণকার।
এই সব দেব গণ, না ছিল একজন
সব ছিল অন্ধকার।।
দুই নয় সর্ন্নি সপ্তদ্বীপ পাতাল সর্ন্নি, সর্ন্নিরূপ আছিল সবাই।
সেই শুর্নে করি ভর, আদ্য পুরুষ বর
সন্নি রূপ আপনি গোসাই।।
দিবস রজী একই না জানি।
নাছিল চন্দ্র সূর্য দুই জন।
নাহি ছিল রবি শশী সন্ন্যাসীজগৎ পোর্শি
না ছিল উমার বন্দর।
এসব দেবগন, নাহি ছিল একজন
শুর্নেতে ভ্রমিলেন নৈরাকার।
অনার্দ্দ বলে যে, তাহা বা সেবিল কে
কোন গোসায়ের সেবা কর তুমি।।

যাইতে জলের পুর, সে জানি কতেক দুর
হিল্লোল ছাড়িল ভগবান।
নীর ভরেতে রয়ে, পিণ্ড বরন হয়ে
নীর রূপে নিবার ভাসে নিরাঞ্জন॥
শুনিলে পবন সূতঃ বর্তিতে যে পদাও
আপনার পাপ বিনাশিয়ে॥
(নৈরাকার)
শুন শুন মুনিগন, পূর্ব্বের কথন
কহিতে সে অনেক কথন।
(মৃত্তিকা সৃজন।)
অমৃত অঞ্জল দিয়ে প্রভু হয়ে আছেন নীর।
কুম্ভনীর পৃষ্ঠে বসুমাতা হয়ে আছেন স্থীর॥
তুমিত বসুমাতা হেমন্ত কুমারী।
ক্ষনেক স্থীর হয়ে রও মোরা ঘটস্থাপন করি।
আপনি নিরাঞ্জন॥
(মৃতিকা সৃজন।)
মাটি মাটি মাটি খানি সৃজন করিলেন কে?
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর অনাদি মাটি খানি
সৃজন করিলেন সে॥
মাটি খানি সৃজন করিয়ে ফেলে দিল জলে।
ভাসেন বসুমাতা জলোপরে টলমল করে॥
কোন দেবতাকে; তাহা বা সেবিল কে
কোন পুরাণে গনি।
(সৃষ্টি পত্তন)
আবম্ব শুন্তের মধ্যে আছয়ে গোলক।
শক্তির সঙ্গেতে প্রভু করিলেন কৌতুক॥
শুন শুন প্রাণপ্রিয়ে বলি যে তোমারে।
কি রূপে যে করিব সৃষ্টি কি রূপ প্রকারে॥
এত বলি দুই জন রতি পরম আনন্দেতে।
খসিয়া পড়িল বীর্য্য আবস্ব স্তম্ভেতে॥
আবম্ব স্তম্ভেতে থাকিয়া ধারা জলেতে পড়িল।
ভাসিয়া শক্তির আশ্রয়ে বীর্য্য ভাসিতে লাগিল॥
(পুনঃসৃষ্টি পত্তন)
ব্রহ্মার দক্ষিণ রায় দক্ষ উপার্জ্জিল তায়
কন্যা জন্মি বাম অঙ্গে
দক্ষ তাহে বিভা কৈল, একশত কন্যা হইল
তার কন্যা দিল কোশ্বেরে॥

তাসতার গর্ভ হইল ইন্দ্র আদি জন্মিল
শশী সূর্য পাবন বরুন।
দেবতা অসুর ক্রমে, নাগ পক্ষগণ জন্মে
গন্ধর্ব কিন্নর দেবগণ॥
তবেত নর জন্মিল, শ্ত্রী-পুরুষ দুই হইল
এইরূপে হইল সৃজন।
খর্পর বিষ্ণু ছিল, পদ সবেন্দ্র জন্মিল
তবেত বর্ণভেদ হইল গণন।

(গুরু প্রণামি)
জগতের গুরু জগন্নাথ, তীর্থের গুরু কাশী
বর্ণের গুরু ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের গুরু সন্নাসী॥
সন্ন্যাসীর গুরু ন্যাসী, ন্যাসর গুরু দন্ডি।
দন্ডির গুরু অবদ্ধোত, অবদ্ধোতের গুরু
পরম মংস, হংসের গুরু বৈষব বৈষ্ণবী॥
বৈষ্ণবের গুরু শ্রীরাধা ঠাকুরাণী
ইহাদের শ্রীপাদ পদ্মে করি প্রণামী।
(দিক বন্দনা, পূর্বদিক)
বন্দি পূর্ব দ্বারে, দেব দিবাকরে
শত অশ্ব যার রথে করে গতি
অন্ধকার দীপ্তকার ময়।
তুমি হইয়ে সদয়, বর দাও আমায়
বিমুখ হইওনা মোরে।
আমি যুড়ি দুই কর, প্রতি দিবাকর
প্রণাম হইল সূর্য্য দেবের পদে॥

(উত্তরদিক)
বন্দিলাম উত্তর দ্বারে, কৈলাস শিখরে
হিমালয় পর্বতে যিনি।
পার্বতীর সহিত, করেন নৃত্যগীত
পুলকে ত্রিশুল পানি॥
শিব খাই ভাংয়ের গুড়া, শিরে শোভে জটের চুড়া
অকুল সাগরের ভেলা।
তার মস্তকের উপর, সাপের বাজার
আনন্দে করিতেছে খেলা।
শিবের করেতে ডম্বরু, বাহন সু-গরু
নেভে যায় ডম্বরু নাথে।
আমি যুড়ি দুই কর, প্রতি কৈলাস শিখর
প্রণাম হইলাম আমি সদা শিবের পদে॥

(পশ্চিমদিক)
বন্দিলাম পশ্চিমি, দেব দিনমনি
তিমির করয়ে নাশ
শ্রীজয় জগন্নাথ, শ্রীলক্ষ্মীর সহিত
তথায় করেন বাস॥
নর যাইয়ে জগন্নাথ, তথায় কিনে খাই ভাত
প্রসাদ বলিয়া তাহা লয়।
যে জন জগন্নাথ বলি, দিয়ে করতালি
রথে চড়ি যে জন যাই॥
তারে যেবা দেখে রথে, যাই গোলকেতে
আর জনম তার নাহি হয়।
তার চরণ কমল, করে ঝলমল
বাজার মিলায় জগন্নাথ ছাদে।
আমি যুড়ি দুই কর, প্রতি জগন্নাথ
প্রণাম হইলাম জগন্নাথ পদে॥

(দক্ষিণদিক)
বন্দিলাম দক্ষিনি মকর বাহিনী
ত্রিলোক তারিনী গঙ্গে।
যত সাগরের গণ, করিলেন উদ্ধারণ
ভগীরথকে লয়ে সঙ্গে।
মাগো দীন হীন যত, মুক্তি কত শত খত
ওমা জপিয়ে তোমার নাম।
মাগো হয়ে শতধর, ওমা পৃথিবী মাঝার
মা তুমি পাপি লোকের দিলে স্থান।
মায়ের চরণ কমল, সতত উজ্জ্বল
বাজার মিলায় চাঁদে।
আমি যুড়ি দুই কর, প্রতি গঙ্গাধর
প্রণাম হইলাম শ্রী গঙ্গাদেবীর পদে॥

(দিক প্রণামি, পূর্বদিক)
পূর্বদিক প্রণাম হই আমি, শ্রী সূর্য্য অখিলার প্রতি।
সপ্ত অশ্ব বাহন রথ যার, অরুন সারথি॥
একদিন নিদ্রা গেলেন প্রভু, সুমের পর্বতে।
নাহি ছিল রবি শশী, নাছিল প্রভাতে॥
সেইত শ্রী সূর্য্য দেব সবাকে দেহ বর।
জন্মে জন্মে লই ভক্তি সূর্য্য দেবের চরণ॥

(উত্তরদিক)
উত্তরদিক প্রণাম হই আমি, পর্বত হেমলা।।
কৈলাস শিখরে মাতা যথায় আনিলা।।
বিভুতি ভূষণ শিবের ভ্রুকুটি কর রঙ্গে।
বলদ বাহন শিবের রুদ্রাগণ সঙ্গে।।
সেইত পর্বত হেমলা সবাকে দেহ বর।
জন্মে জন্মে লই ভক্তি শিবির চরণ।।

(পশ্চিমদিক)
পশ্চিম দিক প্রণামী শ্রী ঠাকুর জগন্নাথ।
প্রসাদ বলিয়া নর সেথায় কিনে খাই ভাত।।
জগন্নাথের লীলা কভূ বুঝা নাহি যায়।
সেইত শ্রী জগন্নাথ ঠাকুর সবাকে দেহ বর।
জন্মে জন্মে লই ভক্তি ঠাকুর জগন্নারে চরণ।।

(দক্ষিণদিক প্রণামি)
দক্ষিণ দিক প্রণাম হই শ্রী গঙ্গা সপ্তসাগর।
যার জলবিন্দু পরশিলে উদ্ধার হয় নর।।
ভগিরথকে কৃপা কল্পেন মা শত মুখি হয়ে।
তার এক বিন্দু শুধিতে নারে, ইন্দ্র চন্দ্র ব্রহ্মা আপনি আসিয়ে।।
সেইত শ্রী গঙ্গা সাগর সবাকে দেহ বর।
জন্মে জন্মে লই ভক্তি মা গঙ্গা দেবীর চরণ।।

(দেহ শুদ্ধ)
মস্তক শুদ্ধ হয় আমার গঙ্গা স্নানে।
কর্ণ শুদ্ধ হয় আমার গুরু মন্ত্র জ্ঞানে।।
মুখ শুদ্ধ হয় আমার হরিনাম উচ্চারণে।
হস্ত শুদ্ধ হয় আমার দান আর ধ্যানে।।
পাদুকা শুদ্ধ হয় আমার সাধু নমো নারায়ণ।
ষোল সাঙ সন্ন্যাসী শুদ্ধ কর ত্রিলোচন।।

(স্থান শুদ্ধ)
জল শুদ্ধ স্থল শুদ্ধ আপন কায়া।
আউটক মৃত্তিকা শুদ্ধ শুদ্ধ মহামায়া।।
গঙ্গা সাগর শুদ্ধ শুদ্ধ বারানসী।
তিন তীর্থের জল দিয়া স্থান পবিত্র করি।।
পবিত্র পুনগুরি কাঙ্ক্ষাং নমো নারায়ণ।
ষোল সাঙ সন্ন্যাসীশুদ্ধ কর ত্রিলোচন।।

(ঘট হাড়ির জন্ম ও শুদ্ধ)
উত্তম স্থানের মাটি কুমারেতে আনে।
দুয়ারে চটকায়ে মাটি স্ত্রী-লোকে ছানে॥
ভিয়ান করিয়া মাটি তুলি দিল চাকে।
নির্মাণ হইল হাড়ি সহস্রটি পাকে॥
সূর্য্য পুড়ায়ে দিল ঘট হাড়ির পারি পাশ।
অগ্নিতে পুড়িয়া ঘট হাড়ি হইল নৈরাশ॥
সেই ঘট হাড়ি নন্দী বালা তুলে নিল করে॥
ক্ষির জলে হাড়ি ঘট মহাদেবের বরে॥

(ক্ষিরপত্র নির্মাণ ও শুদ্ধ)
কোপিলের নন্দন মাতা বড় পূর্ণবান।
যাহার দুগ্ধে স্নান করেন দেবগণ॥
স্নান করে দেবগণে হইল বড় সুখী।
পূর্বে ক্ষির পাত্র শুদ্ধ বাছুরের মুখী॥
সূবর্ণের পাত্রেতে ভরিয়া গঙ্গাজল।
কোপিলের দুগ্ধ তাহে অতি মনোহর।
গঙ্গা জল তুলসী শঙ্খের আভরণ।
ক্ষিরপাত্র শুদ্ধ করি শ্রী বিষ্ণু স্মরণ॥

(সিঁদুরের জন্ম ও শুদ্ধ)
লঙ্কায় জন্মাইল সে সে গাছে রইল পাতা।
সে সে জন্মিল সিঁদুর শুন তার কথা॥
চাঁদ সদগরের পুত্র ধন সদগর।
এনেছিল সেই সিঁদুর পৃথিবী মাঝার॥
ভগবতী পাইয়া সিঁদুর রাখিল যতনে।
ঘটে পাটে ফুটা দিল হনুমান এনে॥
সেই সিঁদুর মহামান্য সর্ব পূজায় লাগে।
সিঁদুর শুদ্ধ হইল শিব ভগবতীর বরে॥

(ধুপির জন্ম ও শুদ্ধ)
সপ্ত সমুদ্র পরে ছিল ধূপ হইয়া গাছে আটা।
রাবন আনিয়া ধূপ প্রচারিল হেতা॥
ধূপ ব্রহ্মা ধূপ বিষ্ণু ধূপ মহেশ্বর।
এই ধূপের গন্ধে নাচে বাসকে কুঞ্জর॥
জয়া বিজয়া নাচে দিয়া করতালি।
উমর্ত্ত কালী তিনি নাচেন জীহ্বা মেলি॥

ধূপ ধূপ মিশ্রিত দূপ ত্রিজগতে সার।
এই ধূপের গন্ধে নাচে ভূলা মহেশ্বর॥
ধূপ শুদ্ধি করে বালা নন্দী কিশর।
ধূপ লয়ে পূজা এখন ভুলা মহেশ্বর॥
(শঙ্খের জন্ম ও শুদ্ধ)
সমুদ্র মন্থনে জন্ম শঙ্খ শুন তার কথা।
গরুড় আনিয়া শঙ্খ প্রচারিল হেতা॥
মুখটি ভেঙ্গে শ্বাস খাই শঙ্খ থুইল ডালে।
পবণ হিল্লোলে শঙ্খ শিব রাম বলে॥
শঙ্খ দেখিয়া দেবীর মনে হইল রঙ্গ।
বিশ্বকর্মা গঠে দিল দশ রায় শঙ্খ॥
দশ বার শঙ্খ দেবী হস্তে নিল তুলে।
আজ্ঞা কর মহাপ্রভু থাকি পদ তলে॥
পদ তলে থাকলে মোর যমের নাহি ভয়।
ভক্তি প্রণাম হই আমি শিব দূর্গার পায়॥
(পাটের জন্ম)
নাছিল ঘাট নাছিল পাট নাছিল সিংহাসন।
শ্রীফল কাষ্ঠের পাট বিশ্বকর্মা করিল গঠন।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম আর যে ত্রিশুল।
করিয়া জীবন নাশ পাটে দিলাম ফুল॥
সেইত মহাদেবের স্থাপিত পাট ধৃত মুনি।
জগৎ ব্যাপিত পাট হইল পূজ্য মানি॥
সেই পাট লইয়া সন্ন্যাসীত্রিজগতে পোজে।
সে কারণে মহামান্য পাট ত্রিভূবন মাঝে॥
(তামার জন্ম ও শুদ্ধ)
কলে বলে জন্মিল তাম্র সহ জলে রয়।
সপ্ত সমুদ্র উঠে গজ লবণ কলা হয়॥
বস্ত্র ঠেলে গজ বলে ভগবান।
আজ্ঞা কর ভগবান রব কোন স্থন॥
কন্ কৃষ্ণ নারায়ণ আজ্ঞা দিল তারে।
তামা হইয়া থাক গিয়া সয়াল সংসারে॥
ইন্দ্রপুরের বিন্দু তুমি সভামুনির মন।
কথা দিল পশুপতি তামা শুদ্ধ হন॥
তাম্র বা তামার করি শিব তামার করি পাত।
তামার পরে তুলে পূজ ত্রিদশের নাথ॥
হেন তামা হতে করি করিলাম সংপাট।
জন্মে জন্মে লই ভক্তি শিবির দাসের দাস॥

(লৌহার জন্ম ও শুদ্ধ)
লৌহাসুর বধি প্রভু লৌহার কৈল জন্ম।
আর্দ অনার্দ যে করিল সন্ন্যাস ধর্ম॥
গঠিলেক নান অস্ত্র করি নান বুদ্ধি।
ক্ষির জলে লৌহা শুদ্ধ শিব থউল বন্দি॥

(বেতের জন্ম ও শুদ্ধ)
দোক্ষ যজ্ঞ বিনাশিতে জটা ছেড়েন হর।
জটা হইতে পড়ে বীজ বাঘ চর্মের উপর॥
তথায় পড়িল বীজ গাছ হয় আচম্বিতে।
সলা কাটি আটি প্রণাম কৈল বন্দী।
ক্ষির জলে বেত শুদ্ধ শিরে থইল বন্দি॥

(সূতার জন্ম ও শুদ্ধ)
দোক্ষ যজ্ঞ্ বিনাশিতে জটা ছেড়েন হর।
জটা হইতে পড়ে বীজ বাঘ চর্মের উপর॥
তথায় পড়িল বীজ গাছ হয় আচম্বিতে।
বেত রুপেতে অমনি গাছ বাড়ে পৃথিবীতে॥
সলা কাটি আটি প্রণাম কৈল বন্দী।
ক্ষির জলে বেত শুদ্ধ শিরে থইল বন্দি॥

(সূতার জন্ম ও শুদ্ধ)
যোড় বঙ্গে উঠে গাছ বঙ্গে ম্যালে আগা॥
ধবল বর্ণ ফুল্য ফুল নীল বর্ণ রেখা॥
কার্পাশ তুলিয়া দিল পার্বতির তরে।
সূতার জন্ম হইল দেখ পার্বতির ঘরে॥
নিরখির তাঁতি তল্লাস করে আনি।
উত্তরি বিধান দিল শাস্ত্র বিধি জানি॥
সরবর তীরে এই উত্তরি কাচি।
সেই উত্তরি গলাই দিয়ে অঙ্গ হইল সূচী॥

(কাচার জন্ম ও–শুদ্ধ)
সীতাদেবী কাটে সূতা বিশ্বকর্মা বোনে।
কাঁচার জন্মের কথা শুন সর্বজনে।
কাঁচিরাম গঙ্গা জলে কাঁচা শুন সর্বজন।
শুদ্ধ হইল কাঁচা শ্রী বিষ্ণু স্মরণ॥

(পুস্পের জন্ম ও শুদ্ধ)
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সংসারের অধিপতি।
খর্ম পূজাবারে ভাবিল যুক্তি।

ধর্ম পূজা নিরাঞ্জন করিলেন স্থুল।
কি দিয়া পূজিব ধর্ম নাহি এক ফুল॥
তখন বাতাসে কয় জটা ভুলা মহেশ্বর।
বিয়াল্লিশ পূষ্পের বীজ পড়িল বাঘ চর্মের উপর॥
তথায় পড়িল বীজ গাছ হইল তখন।
পূষ্প লয়ে পূজ ধর্ম দেব ত্রিলোচন॥

(ঢাকের জন্ম ও শুদ্ধ)
স্বর্গে ছিল অমৃত ফল খাইল দেবতা সকল।
সেই আটিতে গাছ হইল পৃথিবী মণ্ডল॥
সেই গাছে ঢাকের জন্ম কহিলাম সার।
কন্ধে করে বয় ঢাক আম কাষ্ঠ তার॥
আম্র ডম্বুর বিরচিয়ে কপিলের মাতা বড় পূর্ণবান।
তাহার চর্মের বাদ্য নিত্য গীত গান॥
কপিলের চর্ম তার দক্ষিণেতে ছায়।
যে বাদ্য তুষ্ট হন দেব গন্ধর্ব রায়॥
শিব শক্তি দুই কাটি তুলে নিলাম হাতে।
ক্ষির জলে ঢাক শুদ্ধ সাধুলি নমস্তে॥

(কাশর ঘণ্টা কুশাকুশি ও পঞ্চ প্রদীপ জন্ম ও শুদ্ধ)
কাশর ঘণ্টা পঞ্চ প্রদীপ আর কুশাকুশি।
ইহা দিয়া পূজিলে দেবতা হন বড় খুশি॥
ধর্ম পূজাবারে গঠিত আজ্ঞা দেন পঞ্চানন।
আজ্ঞা পেয়ে বিশ্কর্মা কাশর ঘণ্টা করিল নির্মাণ॥
ঘণ্টা বাদ্যে মহালক্ষ্মী না কর পূজন।
ক্ষির জলে কাশর ঘণ্টা পঞ্চ প্রদীপ কুশাকুশি শুদ্ধ হন॥
কুশাকুশি পঞ্চ প্রদীপ ঘণ্টা আর কাশর।
মন আনন্দে পূজ এখন দেব ত্রিলোচন॥
(ঘটোস্থাপন সমাপ্ত)

দেল বিলেত হইতে বাড়ি আনিয়া পাট স্নানের দিনের কর্ম :
পাটবান নামাবার সময় যোগভঙ্গ। আগে প্রণামি পড়িয়া পরে যোগ নিদ্রাভঙ্গ।

(যোগভঙ্গ)
শিব শিব যোগেশ্বর, আদি পুরুষ বর
অনাদি পশুপতি।
আর্দ্দ অনার্দ্দ ধর্ম, ধর্ম রক্ষা পূর্ণ ব্রহ্ম
তোমা বিনা অন্য নাহি গতি॥

এক মনে এক ধ্যানে, যে জন তোমাকে সেবে
তাঁর কোন স্থানে নাহিক সংশয়।
তব ঘরে যোগেশ্বর, ধর্ম রক্ষা চরাচর
লয়ে কের হইতে সদয়।।
বালক সমান করি, শুন ওগো ত্রিপুরারী
সজল হইয়া দেহ বর।
তোমার চরণ সার, ভবার্ণবে কর পার,
যোগভঙ্গ করহ ঈশ্বর।।

(যোগনিদ্রা ভঙ্গ)

কুট সহস্র যোগেশ্বর চন্দ্র বদন।
যোগ নিদ্রা কর ভঙ্গ তরিত গমন।।
নিদ্রা হইতে গা তুল প্রভু ত্রিলোচন।
বিভুতি ভূষন শিবের ভ্রকটি কর রঙ্গে।
বলদ বাহন শিবের রুদ্রগণ সঙ্গে।।
যোগ নিদ্রা ভঙ্গ করি, করহ গমন।
ভক্তগণে ডাকে তব, পূজিবে চরণ।।

(নিদ্রা ভঙ্গ)

যোগ কর ভঙ্গ, সেবকের দেখাও রঙ্গ
পরিহার তোমার চরণে।
দুই পত্র লয়ে কোলে শুয়ে আছো নিদ্রা ভোলে
প্রণাম আজ হইব কেমনে।।
ইন্দ্র ব্রহ্ম পরন্দর মহামুনিগণ আর
চরণে করিল গিয়া স্তুতি।
কে করিবে শুভস্তর, হর হর বাক্য বর
মহিত অজ্ঞান শিশু মতি।।
চড়িয়া ব্রসপরে, শিঙ্গা ডুম্বু লহই করে
পর্বতীকে লয়ে বাম ভাগে।
আহরণ ব্রস রথে, উরু উরু মন রথে
বেকেরা এই বর মাঙ্গে।।

(ভগবতীর নিদ্রা ভঙ্গ শ্লোক)

উঠ মাগো ভগবতী শঙ্কর শঙ্করী।
দুই পুত্র লয়ে কোলে নিদ্রা কর ভঙ্গ
গা তুলিয়ে দেখাও তোমার সেবকের রঙ্গ।।
ওমা দুই পুত্র লয়ে সনে নিদ্রায় আছ মহাভোলে
কেমনে করিব মাগো তোমারি অর্চনা।।

অর্চনা কালেতে মাগো নিদ্রা গেলেন আপনি।
কেমনে দিব পুষ্প পদ কমলে আমি॥
তোমার চরণে মাগো এই নিবেদন।
ভক্তগণে ডাকে তোমার পূজারি কারণ॥
আমি অতি মূঢ় মতি না জানি ভক্তি স্তুতি
আমি অতি অধম অজ্ঞান॥

পাটবান নামাইয়া ঘাটের কাছে আসিয়া চারিযুগ বন্ধনা, দশ অবতার খাটনি ও পাট নাচিতে নাচিতে ঘাটে গমন

(সত্যযুগ)
সত্যযুগে বন্দিলাম লক্ষ্মী নারায়ণ।
জীব উদ্ধার করিলেন প্রভু দিয়া শ্রীচরণ॥
তোমার চরণ বিনা নাহি জানি আর।
লক্ষ্মী নারায়ণ পদে প্রণাম আমার॥

(ত্রিতাযুগ)
ত্রিতা যুগে বন্দিলাম শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
এক বিষ্ণু চার অংশে প্রভু লভিল জনম॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘ্ন।
রাম সীতা শ্রীপাদ পদ্মে মজে থাক মন॥

(দ্বাপর যুগ)
দ্বাপর যুগেতে বন্দি রাধা রামে কানু॥
গোকুল নগরে জন্ম রুহিনী নন্দন।
অনন্ত প্রণাম করি প্রভুর যুগল চরণ।

(কলিযুগ)
কলিযুগে বন্ধি আমি শ্রী গৌর নিতাই।
সোচিমাতা বিষ্ণু প্রিয়া বন্ধি এক ঠাই॥
অদ্যৈত মহাপ্রভুর যত ভক্তগণ।
ছয় গোসায়ের পদে আমি লইলাম স্মরণ॥

(দশ অবতার)
(১) মিন :
বেদ উদ্ধারিতে গোসাই মন কৈল সার।
অগাধ জলের মধ্যে করিল সহচার॥
চারি বেদ উদ্ধারিলে জীব করিলেন স্থির।
তৎ প্রণামি আমি মিন শরীর॥

(২) কূৰ্ম্ম :
কমল দেহ কঠিন তব পিষ্ট পরে ফণি।
যার পরেতে ভার ধরিলেন ধরণী॥
মেদিনির মধ্যে লইয়া জীব করিলেন স্থির।
তং প্রণামি আমি কূৰ্ম্ম কর শরীর॥

(৩) বরাহ :
কলের সমান বিদারিল ক্ষিতি।
দীর্ঘ মুখ, চতুষ্পদ হেট মণ্ডে গতি॥
কোটি ব্রহ্মাণ্ড যার এক লোম কূপ।
তাং প্রণামি আমি বরাহরূপ॥

(৪) নরসিংহ :
তবে হিরণ্য কোশ্বব্য দৈত্য মহাবলবান।
বলে ছলে দেবগণ করে অপমান॥
নখাঘাতে বিদারিল উরু মধ্যে ধরি।
তাং প্রণামি আমি নরসিংহ হরি॥

(৫) বামন :
জন্মিলেন কোশ্ববের অপূর্ব মুরতি।
বলিরাজার যজ্ঞে গেলেন পিতার সংহতি॥
ত্রিপাদ ভুমি লইয়া বলির থুইল পাতাল।
তাং প্রণামি আমি বামন গোপাল॥

(৬) ক্ষত্রিয় পরশরাম :
করেতে কুঠার ধরি অপূর্ব আকার।
নিক্ষত্রি পৃথিবী ধরিল শতবার॥
পিতৃ আজ্ঞা পাইয়া মাতৃর কাটিলেক শির।
তাং প্রণামি আমি ক্ষত্রিয় শরীর।

(৭) শ্রীরাম :
দশরথের ঘরে জন্ম চারি অংশ হইয়া।
বলিরাজার বধ কৈল কিস্কীন্ধায় যাইয়া॥
সেতু বান্ধি বন্ধন করি বধিল দশ শির।
তাং প্রণামি আমি জয় রঘু বীর।

(৮) শ্রী বলরাম হলধর :
গোকুল নগরে জন্ম রুহিনী উদ্ধারে।
কত কেলি করিলেন যমুনার নীরে॥
মহাবল পরক্ষে সে পর্বত গভীর।
তাং প্রণামি আমি হলধর বীর।

(৯) বুদ্ধ অবতর :
নাহি মানে বেদ শাস্ত্র ধর্মে অনুমতি।
জীব প্রতি দয়া নাহি দুরাচার অতি॥
বাক্য যোগ্য জ্ঞান শুত মতি নাহি স্থির।
তাং প্রণামি আমি বুদ্ধ শরীর॥

(১০) কলিযুগ :
লীলা ছলে ধন হেতু মুক্তি বিপরিত
মস্তকেতে নাহি কেশ মুখ বিস্তারিত॥
ভক্ষের বিচার নাহি অতি দুরাচার।
তাং প্রণামি আমি কলির শেষ মতি সয়াল সংসার।
ধূপ পুড়ান শ্লোক, শ্লোক পড়ার পর সন্ন্যাসী সকল ধুনচিতে ধুপ দিবে।
ধুপ ধুনাই অগ্নি যাই যেন যমের ভগ্নি॥ (ধুনচিতে ধুপ দিবে)
ধুপ ধুনাই অগ্নি যাই গগন প্রকাশে।
সতীত্ব প্রকাশ হয় তারি পূর্ণ লেশে॥ (ফের ধুনা দাও)
শিব বলে শুন দূর্গা এই ধর্ম তার।
দূর্গা বলেন প্রভু কহ পুনঃবার॥ (ধুনচিতে ধুপ দাও)
তবে সর্ব অগ্রে লাগ বিদ্যা তুমি পরায়নী।
দরিদ্র সাগরে জল তরীতে তারিনী॥
রোগ শোক অবতার মা শত্রু বিনাশিনী।
ব্রহ্মানি ঈশ্বরী দেবী নমঃ নারায়ণী॥ (ধুনচিতে ধুপ দাও)
তবে রক্ত বস্ত্র পরিধান মা চড় মংস রথে।
গলার ঝরিকের মালা কোমণ্ডল হাতে॥
করিলে অসুর খ্যায় দিয়া কুশের পানি।
ব্রহ্মাণী ঈশ্বরী দেবী নমঃ নারায়ণী॥ (আবার ধুপ দাও)
ঐরাবৎ গজ পৃষ্ঠে সহস্র লচনি।
কিরিটি কোজের কর রক্তের রচনি॥
ব্যঘ্র চর্ম পরিধান বৃসব বাহিনী।
ইন্দ্রানি ঈশ্বরী দেবী নমঃ নারায়ণী॥ (ধুপ দাও)
বিকৃতি আকৃতি মাগের ধর মুণ্ডমালা॥
বার্তা খবর করে তবে ডাকত বৎসলা॥
চণ্ড মুণ্ড বধে মাগো হইলে একাকিনী।
চামুণ্ডা ঈশ্বরী দেবী নমঃ নারায়ণী॥ (ধুপ দাও)
ত্রিশুল ডম্বুর কার সদতঃ ভূষণ।
চন্দন মুহিক মুণ্ড এতিন ভূবণ॥
ব্যঘ্র চর্ম পরিধান কমল নয়নী।
মুণ্ড মালা গলায় হার রুধীর পিয়ানী॥
শিব শক্তি রু-দুর্গে নমঃ নারায়ণী॥ (ধুপ দাও)

পাতালে পুজিত মহি হয়ে এক মন।
তার দর্প চূর্ণ কৈল বীর হনুমান॥
সংহার করিলে তুমি থাকিয়া আপনি
ভদ্র কালি দুর্গা নম নারায়ণী॥ (ফের ধুপ দাও)
নীল জিহ্বা ভয়াংকর দশন ঠন ঠনি।
মুণ্ডু মালা গলায় হার রুধীর পিয়নী॥
অন্ধকার দর্পদার শ্মশান বাসিনী।
মহাকালী রূপ দূর্গা নমঃ নারায়ণী॥ (ধুপ দাও)
কনক কুণ্ডলা ভাল কোটি তটে ব্যঘ্র ছাল,
নফরে ধরা পাল।
কহে শিব রাম রাজ কে বোঝে তোমার কাজ,
কেবল বোঝে কৃষ্ণ ভগবান॥
শিবের জটা লটপট পিঙ্গল বেশ।
শিঙ্গা ডুম্বুর আমি তুলি দিলাম হস্তো।
জলবিহীন আইস ত্রিদেশের নাথ নমঃহস্তে।
(নাচিতে নাচিতে ঘাটে গমন)

(ঘাটের পথ শুদ্ধ)
দেব শান্তি পথি গতি পথসে পরম গতি।
পথসে পরম নির্মাণ।
রবি শশি ধায় গতি গোধন চলিল অতি,
শুদ্ধিত হইল পথস্থান॥ (পথে বাদি কাটা)
শুন শুন বলি তবে দেব ত্রিলোচন।
পথে মাঝে কালী কিসের কারণ॥
আইস বলি জয় মা কালী করি নিবেদন।
শিব সঙ্গে চলো যাই এখন গঙ্গা দরশন॥

বাদি কালী পূজা করিয়া যাইবে, ঘাটে ঢনা মড়ার লাগি ঠনার কান্না মুনি বালাদারের উক্তি

শ্লোক :
যাইতে গঙ্গার ঘাট দেখি বড় উৎকাট
পর্বত শিখরের ডানি আর বাই।
যে বা ছিল অস্পথ তাহা দেখি গতাগত,
মড়া ঢনা পড়ে রইল তাই॥
শিবের সেবক মোরা জানে সর্বজনে।
পথ ছেড়ে দাও মড়া মোরা যাব গঙ্গা স্নানে॥

(ঠনার উক্তি)
শিবের সেবক বলিস তবে তোরে চেনে কে।
বার বৎসরে মড়া ঢনা বাচাইয়ে দে॥

যদি না বাঁচাতে পার এই ঢনা মড়া।
সমুদ্রে ফেলিব তোদের গলায় দিয়ে দড়া॥

(বালার উক্তি)
ঢনা মড়ার কথারে ভাই সর্ব লোকে কয়॥
কোথা হইতে আইল মড়া সত্য দেহ পরিচয়॥
কথাকার ঢনা মড়া রেখেছিল কে।
কি নাম কাহার বেটা সত্য পরিচয় দে॥
পরিচয় না দিতে পার এই ঢনা মড়া।
সমুদ্রে ফেলিব তোদের গলায় দিয়ে দড়া॥

(ঠনার উক্তি)
লৌহ সেনের পুত্র কাকসেন মহাজন
বাসি পুষ্প দিয়া সেই পূজিল ত্রিলোচন॥
বনাশ্রয়ে আসিয়া তথা আছিল সন্ন্যাসী।
আউটক যুগ হইতে ঢনা পর্বতেতে আসি॥
বিরাট চৈত্র মাসে এই মলয় হিল্লোলে।
আসিয়া পড়িল ঢনা সাগরের জলে॥
ঢনার দেখিয়া দেবী রাখিল যতনে।
বুঝিতে হরের মন ভক্ত কারণে॥

(বালার উক্তি ও ঢনামড়া জীবিত)
এতক শুনিয়া তখন নন্দী মহাকালে।
জীব সঞ্চারিয়া দিল দিয়া কুশ অগ্রের জল॥
দুই দিকে দুই পর্বত মধ্যে বহে ঝরা।
দেখতো সন্ন্যাসী ভাই জিয়ন্ত কি মরা॥
এইখানে ব্রহ্মা হোম যজ্ঞ কৈল সার।
বেচে উঠ মড়া ঢনা না মরিবে আর॥
দেবী বলে পুত্রবর পড়ে আছে ভোলে।
জিয়াইলাম মড়া ঢনা তুলে নিলাম কোলে॥
কুশি দ্বারা জল দিয়া মড়া ঢনা জীবিত

(ঘাটে গঙ্গা স্তব)
দেবী মন্তাকিনী পতিত পাবনী,
জগৎ জননী মা গঙ্গা।
ব্রহ্মত্বের ঈশ্বরী ব্রহ্মাণ্ডে বসতি
ক্ষিতিতে কলুস গঙ্গে॥

অধম তরিতে মহাদেব যাইয়ে
পঞ্চ মুখে কৈল গান।
বিষ্ণুপদ হইতে উপনিত হইতে
তিন লোকে কৈল পরিত্রাণ॥
আমি মূঢ় মতি না জানি ভক্তি স্তুতি
মন অতি দুরাচার।
অতি ক্ষিন মতি না জানি ভক্তি
দয়া করি কর পার॥
ওমা তব নীর পান করে যেই জন
অনায়াসে যাই সে তরী।
ওমা পুরাণে মহিমা শুনি ব্রহ্মার কোমণ্ডে বাস কর তুমি
আসিয়া ব্রহ্মার পবিত্র করিলে ব্রহ্মপুরী॥
জীব রাখি দুরাশয়, নাশিবারে ভবভয়
এই মহিমা কে বুঝিতে পারে।
সগর বংশের রাজা, ব্রহ্ম শাপে হইল ধ্বংস
সগর বংশ উদ্ধারিতে আইলে ধরাপরে॥
তাই তোমার জলে করি পাক, অন্ন আদি কিবা শাক
দিবতায় দুর্লভ করি খাই।
সেই অন্ন সুধাময়, ব্যাসা ব্যাস বেদে কয়
ভুঞ্জিলে নাহি যমের ভয়াভয়॥
গত প্রাণী মৃত্যু কায়া, কাকে বা শৃগালে খাইয়া
সব ভেসে রাগে তব তটে।
সেসব সংকট দিনে, মা তোমার চরণ বিনে
তোমা বিনা গতি নাহি কার বটে॥
মাতা পিতা অনুগত, ভাই ভগ্নি দ্বারাসূত
মরিলে নিয়ে ফেলে শ্মশান তব পাশে।
ওমা স্নান করে তব জলে, শোক দুঃখ পাশরিলে
ক্রমেক্রমে শোক দুঃখ যাই অবশেষে॥
রামধনে বলে, ওমা রেখ পদ তলে
তব জলে যেন মরি।
মা ডাকি তোমার বারেবার, পার কর ভবার্নব
তোমা বিনা গতি নাহি আর॥
ওমা গঙ্গে, অন্তিমে নিও সঙ্গে
ওমা ব্রহ্মাণ্ড, ঈশ্বরী, মা শত শত প্রণাম করি
ঐ চরণে স্থান দিও আমার॥
(গঙ্গাস্তোব সমাপ্ত)

(ঘাটে গঙ্গা পূজা)
ওঁ এতৎ পদৎ ওঁং গং বিশ্ব মুক্ষৈঃ
বিশ্ব মিত্রৈ শান্তিঃ।
প্রদায়িনৈ নারায়নৈ নমঃ নমঃ।
মা গঙ্গা দেবীর পূজা মহৎ
করিস্যে নমঃ মনঃ।
মা গঙ্গা পাদং প্রনমোহস্ততে
নমঃনমঃ।। (প্রণাম করিবে)
(পাট বান স্নান করাইয়া ঘাটের কাছে আসিয়া ফল মুল ইত্যাদি)
(ফল শুদ্ধ করা)
জল শুদ্ধ, স্থল শুদ্ধ, শুদ্ধ আপন কায়া।
আউটক মৃত্তিকা শুদ্ধ, শুদ্ধ মহামায়া।।
গঙ্গা সাগর শুদ্ধ, শুদ্ধ বারনসী।
তিন তীর্থের জল দিয়া ফল পবিত্র করি।।
ওঁ পবিত্র পুণ্ডরী কাখ্যং নমোঃ নারায়ণ।
১৬ সাঙ সন্ন্যাসী শুদ্ধ কর ত্রিলোচন।।
(ফলে গঙ্গা জলের ছিটি দিবে)
(সন্ন্যাসীসকল ফল ভক্ষণ)
শুন শুন শুন তবে সন্ন্যাসী সকল।
সূর্যোদয়ের পূর্বে কর ফলমূল ভক্ষণ।।
পেঁপে, আতা, তরমুজ আর নারিকেল।
যব ছাতু শাক আলু ছোলা রম্ভা পাকা বেল।।
সকল সন্ন্যাসী এই উত্তরি গলায় করিয়া ধারণ।
ঢাক ঢোল কাশর ঘন্টা কোশা কুশি শঙ্খ
পঞ্চ প্রদীপে মন আনন্দে পূজ সবে দেব ত্রিলোচন।
(সন্ন্যাসরি উত্তরি ধারণ)
যেজন দেউল করে, প্রথম শঙ্খ স্থাপিলাম তারে।
দ্বিতীয় শঙ্খ দিল পুরোহিত।।
তৃতীয় শঙ্খ শিলা, চতুর্থ শঙ্খ নন্দী বালা।
সাধুলি পঞ্চমে শঙ্খ কৃত।।
অষ্টমে শঙ্খ বেতাসন সপ্তমে ধনচিল।
অষ্টমে শঙ্খ হুন ক্ষির পাত্র।
শ্রীফলের কাষ্টে নবম শঙ্খ পাটে।
লায়েকের কল্যাণ হর, রাখিবেন গঙ্গাধর।
সেই হইতে যাইবে দুর্গতি।।
তোমার এহকাল পরকাল তরাইবে মহাকাল।
বিল্ব দলে ভজ পশুপতি।।

এই উত্তরি গলায় দিয়ে, ১৬ সাঙ্গ সন্ন্যাসী হয়ে।
এক মনে পূজ ত্রিলোচণ॥
সদয় হর হর শিব আরাধন কর।
সর্বদুঃখ হইবে বিনাশন॥

(সূর্যোদয় হইলে প্রাত্যেঃ ক্ষির পাত্র নির্মাণ ও অধিবাস)
ভক্তি যুক্ত হইয়া নর, ত্রিভুবন মাঝে।
স্থাপিত করিয়া শিবের পাদপদ্ম পোজে॥
তুষ্ট হয়ে এই গৃহে দেব মহেশ্বর।
যাহারো কল্যাণে দেউল তাহাকে দেহ বর॥
সম্পূর্ণ হউক তার, মনের অভিলাষ।
সেই পূর্ণে হউক তার স্বর্গেতে নিবাস॥
ঢাক ঢোল শঙ্খ ঘন্টা কাশর বাজে চতুর্ভিতে।
অধিবাস কর শিবের দ্বীপ পুরোহিতে॥
সূর্য্য অর্ঘ শনি বাচক করে বিপ্রগণ॥
সংকল্প মানসকল্পে বাক্য উচ্চারণ॥
গণেশ আদি পঞ্চদেব করিয়া পূজন।
আদিত্যাদি নবগ্রহ করি আবাহন॥
ইন্দ্র আদি দিকপাল করিহ পূজন।
উদ্যানে মাতঙ্গ আর ধ্যানে উচ্চারণ॥
মহিগন্ধ আদি নানা দ্রব্য আনিয়া যতন।
দধি ঘৃত মস্তিষ্ক আর সিন্দুর কাজল॥
মহি গন্ধ শিলা ধান্য দুর্বা পুষ্প ফল।
রচনা সিদ্ধান্ত আর লইয়া কাঞ্চন॥
প্রসস্ত পাত্রে হরিদ্রা করিয়া সমর্পণ।
অধিবাস করিয়া পূজ দেব ত্রিলোচন॥
(সমাপ্ত)

(জঙ্গল ঝুড়া)
ডেকে বলে দানেশ্বর, শুন শুন ওহে মহেশ্বর।
চরণেতে প্রণাম আমার॥
তোমার অজ্ঞাতে জঙ্গল ঝুড়িতে।
মোরা চলিলাম সত্তর॥
তখন সন্ন্যাসী যাইয়া জঙ্গল ঝুড়িয়া।
গুম্ভির করিবে নির্মাণ॥
সেই গুম্ভিরে হবে পূজা হর গৌরের চরণ॥
(গুম্ভির নির্মাণ)
অনাদি ঈশ্বরী মুখী ধৃত মুনিগণে।
জন্মিল জীব সুখী হয়ে লোক তার কারণে॥

বসিয়া অখিল মাঝে শিবের সেবক পোজে।
পূজা রূপ হইল মনন॥
ত্রিশূল উপরে পুরি যথা গঙ্গা সুরেশ্বরি।
বারানসী নামে পূণ্য স্থান॥
অন্তরে জানিল মুনি পূজা হইতে শুলপানি।
তথা মণ্ডব করহ নির্মাণ।
সমুদ্র কূলেতে তীর্থ বারানসী।
যাহার কূলেতে স্নান করে আট সহস্র ঋষি॥
ঋষিগণে স্তব করে ভাবি নিরাঞ্জন।
ধৃত মুনি আসি কৈল দেউল সৃজন॥
আইস বাছা হনুমান পবন নন্দন।
ভোম কাটিয়া করে দেউল সৃজন॥
এতক যে হনুমান বীর আজ্ঞা পাই।
বড় বড় নল খাগড়া উপাড়িয়া ফেলাই।
অর্জুন বীর মারে দুড়া দানবে বাচে ইট।
কন্ধে করে ভিম বীর বেন্ধে ছিল ভিট॥
পাথর আনিয়া যোগায় বীর হনুমান।
বিশ্বকর্মা পাথর কেটে করে খান খান॥
পশ্চিম কোলেতে করে দেউল আরম্ভ।
চতুর্ভিতে শোভে তার মুখ তার ছাড়া।
প্রতি খোপে শোভে তার রজতের তারা॥
ভিম কলস শোভে তার দেওলের ছাউনি।
নির্মাণ করিল দেউল বিশ্বকর্মা আপনি।
গুম্ভির নির্মাণ কর সবে আনন্দিত মন।
সেই গুম্ভিরে পুজিব মোরা হর গৌরির চরণ॥
(গুম্ভির নির্মাণ সমাপ্ত)

(সোমেদ ভঙ্গ)
চৈত্র মাস মধুমাস হেব্যেসি নিরামিষ।
ফলের উপবাস॥
১৬ সাঙ সন্ন্যাসী গেল শিবের পাশ॥
শিব শিব বলিয়া সন্ন্যাসী বালা ডাকে ঘন ঘন।
সেমেদ ভাঙ্গিল শিবের নাড়িল আসন॥
কহে জয়দেব শুন এসব বচন।
শ্রীহরি গৌরির শ্রীপাদ পদ্মে লইলাম স্মরণ॥
(সেমেদভঙ্গ সমাপ্ত)

(ব্রসসজ্জা)
হরশিত হইয়া মনে দেব ত্রিলোচন।
.নন্দীকে কহিল ব্রস করিতে সাজন॥
ব্রস সাজাতে তখন নন্দী বীর চলে।
ব্রস সাজায় শ্বেত লেজ চামর গঙ্গা জলে॥
সুবর্ণেতে শৃঙ্গ বান্ধে গলে মুক্তর হার।
নানা বেসে সাজায় তখন ব্রস সত্বর॥
ব্রস সাজায়ে তখন নন্দীবালা নাচ।
সাজন ব্রস এনে দিল মহাদেবের কাছে॥
ব্রস পাইয়া হর বড়ই হৃষ্ট মতি।
ব্রসতে চড়িয়া যাই আনন্দিত অতি॥
ব্রসে চড়ে ভুলানাথ যাই মহারঙ্গে।
হেন কালে হইল দেখা কুচনির সঙ্গে॥
কুচনির প্রবোধ দিয়া দেব শুল পানি।
জল বিহারে কৌতুহলে চলিল আপনি॥
(ব্রস সজ্জা সমাপ্ত)

(ফুল তুলা সাজি গঠন)
পুষ্প তুলিতে মালিনী ভাবে মনে মন।
কিসেতে তুলিব পুষ্প নাহিক বাসন॥
বিশ্বকর্মার নাম কব্রি ডাক দিল যে তখন।
ডাক শুনিয়া বিশ্বকর্মা আইল তখন॥
আইস বাছা বিশ্বকর্মা বাটাই তাম্বুল খাও।
পুষ্প তুলিবারে এখন সাজি গঠে দাও॥
এত শুনে বিশ্বকর্মা মালি আজ্ঞা পাই।
আজ্ঞা পেয়ে বিশ্বকর্মা সাজি গঠে দেয়॥
সুবর্ণের সাজি আর মানিকের ঢাকনি।
সেই সাজিতে ফুল তুলিতে গেলেন মালিনী॥
কদম্ব কেলি কাতলি আর রক্ত উৎপল।
ঝটি উরঞ্চ তুলি শত সূর্য্য ফুল॥
দোমুখি বিষ্ণু পুরা অশোক টগর।
চাপা আর ভুই চাপা কনক নাগেশ্বর॥
শেফালী সূর্য্য মনি কেতুকি ধাতুকি।
রক্ত জবা জাতি যুতি আর মল্লিকি॥
মালতি দোপাটি আর দারু গান্ধারী।
গোলাপ অপরাজিতা কাষ্ট মালি ধরি॥
কুরুমক কোবরি আর সেউতি।
গোলাপি সুনাপি আর রাধা পদ্মতি॥

ঝুমকো লতা গলঘসি আকন্দ ভালবাসি।
পূজার পুষ্প ফুল তুলি সন্ন্যাসী মনের উল্লাসী॥
বাকস বিল্ব ফুল পাতা কিংসুক তুলসি করিয়া একত্র।
পুষ্প লয়ে পুজ সন্ন্যাসী ভুল মহেশ্বর॥
(অধিবাস কর্মাদি সমাপ্ত)

ভোগ দেওয়াস্থানে বিকালে হাজরা নিমন্ত্রণ

সতীর মরণ শুনি জটা ছেড়েন শুলপানি।
সেই জট জনম তোমার॥
জ্বলন্ত অনক দেখি মোরা অতি ভয়ংকর আখি।
হাজরা বলি পোজেতে সংসার॥
শুন হাজরা অধিকারী ভুত ধুত সঙ্গে করি।
নিমন্ত্রণ লওসে তোমার॥
রাত্র প্রভাতের কালে ভোগ দিব তোমার স্থলে।
সাল সোল আর সরাপান॥
এই ঢাক ঢোল গীত নাটে,
ভোগ দিব তোমার তটে।
অধিষ্টান হও সে ঘাটে,
নিত্যানন্দের এই নিবেদন॥

আগে প্রণামি পড়িয়া পরে পান সুপারি দিয়া দিয়া নিমন্ত্রণ করিবে

(খেঁজুর ভাঙ্গা স্থানে হাজরা গাছ নিমন্ত্রণ)
সতীর মরণ শুনি জনম তোমার॥
অনন্ত অনল দেখি মোরা অতি ভয়ঙ্কর আঁখি।
হাজরা বলি পোজেত সংসার॥
শুন হাজরা অধিকারী ভুত ধুত সঙ্গে করি।
নিমন্ত্রণ লও সে তোমার॥
রাত্র সন্ধ্যার কালে পূজা দিব তোমার স্থলে।
গন্ধ পুষ্পে সারচন্দন আর গঙ্গাজলে॥
এই ঢাক ঢোল গীত নাটে পূজা দিব তোমার তটে।
অধিস্থান হও সে ঘাটে
ভক্ত জনের এই নিবেদন॥

আগে প্রণামি পড়িয়া পরে পান সুপারি দিয়া নিমন্ত্রণ করিবে
সন্ধ্যায় হাজরা পূজা খেঁজুরভাঙ্গা গাছ শুদ্ধ। আগে প্রণামি পড়িবে

সুবর্ণের পাত্রেতে ভরিয়া গঙ্গা জল।
কোপিলের দুগ্ধ তাহে অতি মনোহর॥
গঙ্গা জল তুলসী শঙ্গের আভারণ।
খেঁজুর গাছ শুদ্ধ করে বালা শ্রী বিষ্ণু স্মরণ॥

ক্ষির পাত্রের জল গাছের চতুর্দিকে ছিটা দিয়া শুদ্ধ করিয়া, পরে দশ অবতার খাটনি এবং মাথা খাটনি রাখিয়া হাজরা পূজা করিয়া মাথা খাটনি করিবে। মাথা খাটনির পর মূল সন্ন্যাসী দ্বারা চারিদ্বার পূজা করিবে। পরে সন্ন্যাসী সকল খেঁজুর গাছ বেড়ে দাড়াইয়া গাছের কোল দিয়া দাড়াইবে। কাটা বারা হইলে সকলে প্রণাম করিয়া গাছে উঠিবে।

মাথা খাটনি পর হাজরা পূজায় বসিয়া পূজা মন্ত্র ও কাল অক্ষ, রুদ্রস্তব, শঠ ও অক্কুরের স্তব, কালী অষ্টক, শিব অষ্টক স্তব। প্রণামি মন্ত্র যব করিয়া পূজা সাঙ্গ করিয়া সুপারী, চালা চারিদ্বার পূজা করিয়া গাছে তিনবার কোল দিয়া গাছে উঠিবে।

(হাজরা পূজা ও খেজুর গাছ শুদ্ধ)
সুবর্ণের পাত্রেতে ভরিয়া গঙ্গা জল।
কোপিলের দুগ্ধ তাহে অতি মনোহর।।
গঙ্গাজল তুলসী শঙ্খের আভরণ।
খেজুর গাছ শুদ্ধ করে বালা শ্রী বিষ্ণু স্মরণ।।

ক্ষির পাত্রের জল গাছের চতুর্দিকে ছিটা দিয়া শুদ্ধ করিয়া, পরে দশ অবতার খাটনি এবং মাথা খাটনি রাখিয়া হাজবা পূজা করিয়া মাথা খাটনি করিবে। হাজরা পূজায় পূজা মন্ত্র, কাল অক্ষ রুদ্র স্তব, গঙ্গা রুদ্রস্তব, শঠঅক্কুরের স্তব, কালী অষ্টক স্তব, শিব অষ্টক স্তব করিয়া মাথা খাটনি করিয়া পরে সুপারি চালা চারিদ্বার বন্দনা পূজা করিয়া গাছের কাঁটা বারা হইলে সন্ন্যাসী সকল গাছে তিনবার কোল দিয়া ও প্রণাম করিয়া গাছে উঠিবে।

(হাজরা পূজা–গঙ্গারুদ্র স্তব)

মন্ত্র

গঙ্গাধ হর হর অর্ধ কুমারী।
মৌন কৃপাকর হলা হল ধারি।।
চন্দ্রাচূড়া ফণি কুণ্ডল কর্ণে।
ভস্ম বিভুষিত জটা ধর মর্তে।
(নমস্তে অন্তে আসনে ফুল দিবে।)
বৃসভা বাহনে বন্ধিয়ে নমস্তে।
প্রণামি বৃষ ধ্বজ রুদ্র নম নমস্তে।
গঙ্গে ধর হর গঙ্গে গঙ্গে নমস্তে।
কৃতি সুন শুভিত ডম্বুর হস্তে বৃষবঃ
বাহনো বন্দিয়ে নমস্তে
প্রণামি বৃষ ধ্বজ নমঃ নমস্তে।।
প্রণামোস্তুতে নমঃ নামঃ

(কাল অক্ষ রুদ্রস্তব)
কাল অক্ষ রুদ্র স্তব তার।
বড়ই মহান বেশ উদ্ধান্ত আকার।।
প্রভাতের রূপ যিনি তনুরূপে ঠাম।
সোম শুদ্ধাগ্নি যেন এ তিন নয়ন।

ললাটে টোসর দেবের লম্বিত জটা ভার।
রত্ন কলস শোভে ফণি মনি উজ্জ্বল॥
কাল অক্ষরুদ্রবেদ বড়ই মহন।
জন্মে জন্মে ভক্তি হর গৌরির চরণ॥
কাল অক্ষ রুদ্রদেব নমঃ নমস্তে।

(শঠ অক্কুরের স্তব)

ওঁং কাব সিদং সং জগতং নিতাণ্ডি
ধ্যাণ্ডি যোগি নং কাম দং মক্ষ দং
চৈবর্ত্তং কারয়ে নমঃ
নমামি নেবসং রিক্ষা জণ্ডি নবিমাণ্ডে
নমস্তে সর্ব দেবতা প্রকারয়ে নমঃ
মহাদেবং মহাত্রাণং মহযোগি মহেশ্বরং।
শিব শাণ্ডুং জগন্নাথং লৌকানং হীত কারণং
শিব মেখে পরং ব্রহ্মা সকারয়ে নমঃ
জয়ে তয়ে স্থিতি দেবং জগৎ ব্যাপিতং
মহেশ্বর জগৎ কর্ত্তা জগন্নাথং শঠ অক্কুরের
স্ব নমস্তে রকারয়ে নমঃ নমঃ।

(কালী অষ্টক স্তব)

কালী কালী মহা কালী সৃষ্টি রক্ষাকারিনী
দৈত্য রক্ষা পিত মণ্ডগলে মুণ্ড ধারিনী॥
সৃষ্টি স্থীতি উৎপত্তি সদা শিবের বাহিনী।
ত্রিলোচন লই স্মরণ কালী মক্ষ দায়িনী।
নারায়ণী মহাদেবী সদা শিবের ঘোরনী
বিষম যমুনা মধ্যে সৃষ্টি রক্ষা তারিনী॥
রণ মধ্যে দিগম্বরি কৈশ কৈল ধারণং
জন্মিয়ে মেয়ে ঘরে দুর্গা নামটি ধরিলে
দক্ষ যোজ্ঞ ধ্বংস মাগো করেছিলে আপনি
কাটিয়ে অশুরের মুণ্ড রুধী পান করিলে
বন্ধি শ্রী পাদপদ্ম বৈরবি দুর্গে পান করিলে
শরৎ কালে আইলে মাগো পৃথিবী মাঝারে।
দেবগণে করে পূজা নানা উপহারে॥
পূজায় সন্তুষ্ট হয়ে মাগো বর দিলেন আপনি।
বন্দি মাতা শ্রী পাদপদ্ম ভৈরবী দূর্গে ভবানী।
যুদ্ধে কালী নাচে ভালি দিয়া কর তালি।
দেবগণে করে পূজা দিয়া পুষ্প মল্লি॥
পূজায় সন্তুষ্ট হয়ে মাগো বর দিলেন আপনি।
বন্দি মাতা শ্রীপাদপদ্ম ভৈরবী দূর্গে ভবানী॥

কালী কালী মহাকালী দুর্গে নমঃ নমস্তে।

শিব অষ্টক স্তব

প্রভূ মেস মোনিস মহেশ গুনং হিনং
মহেশ গলা ভরনং রণ নির্জজত দুর্জ্জয় দৈত্য পরং
প্রণমি শিবং শিব কল্প তরু নমঃ নমস্তে।
গিরিরাজ সূতার্ম্মিত বাম তনু নিন্দিত।
বাজিত কোটি বিধং বিধূ মিক্ষ শিবস্তবং
পাদ পদ্মং যুগং প্রণমি শিবং শিবাং
কল্প তরু নমঃ নমস্তে।
শ্মশানাঙ্গিত বঙ্গি শুম্ভু কুটং কোটী
নঙ্গিত সুন্দর কৃতি পটং সুবৈশ্চে বলি
নিকৃতং পটু জুট প্রণামি শিবং
শিব কল্পতরু নমঃ নমস্তে।
নয়ন ত্রিভুতং চারু মুখং মর্খপদ্ম বিরাজিতং
বিধং বিধং খণ্ডবি মণ্ডিতং ভানত্য টং
প্রণমি শিবং বিধং শিব কল্প তরু নমঃ নমস্তে।
বৃষরাজ নিকেতনং নমাদি গুরং গরান সনং
প্রয়াস নিবাশ ধরং প্রমখং বিপ্র সেব কং
বঞ্জন কং মুনি যোগি মুনিভুজ শঠপদ কং
প্রণামি শিবং শিব কল্পতরু নমস্তে।
মক ধ্বজ মর্ত্ত মাতঙ্গ হর কোবি চর্ম্ম গং
বিলাস বিশেষ করং বরদা ভয় বিসর্ন ধরং
প্রণামি শিবং শিব কল্পতরু নম নমস্তে।
জগৎ উদ্ভব পালনং নাশ করং কুরুনৈব
প্রণত্রিয় রূপ ধরনং পৃত মানব সাধু জনৈক
গতিং প্রণামি শিবং শিব কল্প তরু নমেস্ত।
নদেহ পুষ্পং সদা পাপ চিন্তে পুনঃ জনসং
দুঃখে পরিত্রাহি সম্ভুং বজত খিন দুঃখ
সমিশ্চ হরং প্রণমিং শিবং কল্প তরু নমঃ নমস্তে।

প্রণামি মন্ত্র :
ওঁ জয় তং দেবী চামুণ্ডে জয় ভূতাপ হারিনী
জয় সর্ব্ব গতে দেবী রাত্রি নমোহস্ততে
জয়ন্তি মঙ্গলা কালী ভদ্রা কালী কপালিনী
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রি স্বাহা স্বধা নমোহস্তে
প্রনমোহস্ততে নমঃ নমঃ॥

(মাটি স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিবে। হাজরা পূজা সমাপ্ত)
(এখন মাথা খাটনি, পরে সুপারি চালা চারি দ্বার বন্দনা পূজা)

(উত্তর দ্বার)
প্রথমে উত্তর দ্বারে মহাকাল নমস্তবং
প্রথ এহং ভয় বিঘ্নি কৃতাঞ্জলি আরাধ্যামি
দেব সংদ্বারে মধু ঘট দিয়া তং নমস্তে।

নমস্তে পরে বাম হস্ত দ্বারা সন্ন্যাসী দাড়াইয়া উত্তর দিকে সুপারি চালিয়া দিবে। এই নিয়মে চারিদ্বার পূজা করিবে।

(পূর্ব দ্বার)
পূর্বদ্বারে গণক্ষেত্র প্রণসর্ত্তাং প্রথ এহং
ভয় বিঘ্নি কৃতাউলি আরাধ্যামি দেব সংদ্বারে
মধূ ঘট দিয়া তং নমস্তে।

(দক্ষিণ দ্বার)
দক্ষিণ দ্বারে নমস্তে নন্দীরে স্তবং প্রথ এহং
ভয় বিঘ্নি কৃতাঞ্জলি আরাধ্যামি দেব সংদ্বারে
মধু ঘট দিয়া তং নমস্তে।

(পশ্চিম দ্বার)
পশ্চিম দ্বারে গুরিক্ষে ক্ষেত্র পাল নমস্তে প্রথ এহং
ভয় বিঘ্নি কৃতাঞ্জলি আরাধ্যামি দেব সংদ্বারে
মধূ ঘট দিয়া তং নমস্তে।
(চারিদ্বার পূজা সমাপ্ত। এখন কাঁটাবারা হইলে সন্ন্যাসী সকল গাছে উঠিবে)

সন্ন্যাসী সকল খেজুর গাছের চতুর্দ্দির্কে দাড়াইবে গাছের কাটা বারা হইলে গাছে তিনবার কোল দিয়া প্রণাম করিয়া শিবশিব বলিয়া ডাকিয়া গাছে উঠিবে। গাছ হইতে নামিয়া ঐ রূপ তিনবার গাছে কোল দিয়া প্রণাম করিবে।

(কাঁটা বারা)
অতি উচ্চ খেজুর বৃক্ষ অতি উচ্চ মতি।
উর্দ্ধমুখে ধাইরে কাঁটা প্রহার কাটার স্তুতি॥
উর্দ্ধমুখে ধাইরে কাঁটা যমের দশর।
ছুয়ালে মাত্র প্রবেশ করে অঙ্গের ভিতর॥
অন্তর ডরাই আমার তোমার সেবক পাছে মরে।
হর গৌরি পদ্ম হস্ত দিয়া রাখ কাঁটার উপরে॥
শিব শিব বলিয়া সন্ন্যাসী ডাকে ঘনে ঘন।
কাঁটার মুখ বারিয়া দেহ দেব ত্রিলোচণ॥
খেজুর গাছে উঠ সন্ন্যাসী ভয় নাহি আর।
কাঁটা বারিলাম আমি শ্রীবিষ্ণু স্মরণ।
(সন্ন্যাসী সকল গাছ হইতে নামিলে খেজুর গাছ বাচান শ্লোক)
দূর্গা বলে শুন শুন সন্ন্যাসী সকল
মরিল খেজুর বৃক্ষ বাঁচাও এখন॥

কেমন শিবের সেবক এবার যাবে জানা।
না বাঁচালে বৃক্ষ পাইবে যন্ত্রণা॥
নারদ বলে শুন শুন সন্ন্যাসী এখন।
বদনেতে বল তোমার দেব ত্রিলোচন॥
সন্ন্যাসী শিব শিব বলে ডাকো তিন বার।
বেঁচে উঠিবেখেজুর বৃক্ষ না মরিবে আর॥
শিব শিব বলে সন্ন্যাসী ডাকে ঘনে ঘন।
বাঁচায়ে দিল খেজুর বৃক্ষ দেব ত্রিলোচন॥

(সন্ন্যাসী সকল শিব শিব বলিয়া ডাকিয়া গাছে তিনবার কোল দিয়া প্রণাম করিবে। খেজুর ভাঙ্গা সমাপ্ত। খেজুর ভাঙ্গার পরে ঘটের কাছে আসিয়া ফের প্রণামি পড়িয়া ধুপপুড়ান লক্ষ্মী নারায়ণী, চারি যুগ বন্দনা ও দশ অবতার খাটনি করিয়া পরে নীল ধুল বান্ধিয়া পাটবানসহ্ গুম্ভিরে নীল চালু হইবে। গুম্ভিরে নীল ধুল পাটবান আসিয়া হরগৌরী একাসনে স্থাপন শ্লোক পড়িয়া নীল ধুল পাটবান গুম্ভির সিংহাসনে নামাইবে। নামাইবার আগে ক্ষির পাত্রের জল গুম্ভিরে ছিটা দিয়া গুম্ভির শুদ্ধ করিয়া গুম্ভিরে নামাইবে।)

শ্লোক :

হর আইল একেশ্বরী নামাইল সুরেশ্বরী
ঝট করি আনহ্ পার্বতি।
সুমেরু প্রদক্ষিণ করি চলিলেন নারদ মুনি
যথায় বসে আছেন পার্বতি॥
শুন শুন জগৎ মাতা তোমার লইয়া পরম কথা
ঝট করি চল মা শঙ্করী।
শুনিয়ে নারদের বাণী তুষ্ট হইলেন ভবানী
সিংহাসনে আইলেন হর গৌরি॥

গুম্ভির সিংহাসনে পাটবান নামাইয়া পরে হাজরা ভোগ রান্নার চাল-ডাল মাঙ্গিয়া আসিবে। ও টিয়ের কাটিয়া মূল সন্ন্যাসী ভোগ রান্না করিবে। সাবধান নিজ নিশ্বাস ভোগে না লাগে। গুম্ভিরা পূজার যোগাড় করিয়া বালাদার অথবা ব্রাহ্মণে পূজা করিবে। গুম্ভির পূজা সারিয়া হাজরার ভোগ নিয়া ভোগ দেওয়া স্থানে যাইবে। হাজরার ভোগ দিয়া আসিয়া পূজার প্রসাদবিতরণ করিবে।

(ভোগ রান্না ব্রহ্মস্মরণ শ্লোক)
চাউল ডাউল বার ভাজা করে আয়োজন।
ভোগ রান্ধিতে ব্রহ্মরাজকে করিনু স্মরণ॥
চাল ডাল সাল শৈল আনিয়া যতনে।
ভোগ রান্না করে সন্ন্যাসী শ্রী বিষ্ণু স্মরণে॥
(ব্রহ্মস্মরন হইলে ভোগের টিয়ের জ্বালিয়া দিবে)

গুম্ভির পূজায় মন্ত্রপাঠ :

যথা–১। গঙ্গা রুদ্র স্তব। কাল অক্ষ রুদ্র স্তব ৩। অক্কুরের স্তব ৪। কালী অষ্টক স্তব ৫। শিব অষ্টক স্তব ও শিব প্রণামি এই মন্ত্র দ্বারা গুম্ভির পূজা করিবে। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ যদি পূজা করে তাহার বিধি মত সে গুম্ভির করিবে। ভোগ দেওয়া স্থানে ভোগ নিয়ে যাইয়া মূল সন্ন্যাসী ভোগ মাথায় দাড়াইয়া মূল সন্ন্যাসী দ্বারা সুপারি চালা হাজরার চাবি পূজা করিয়া ভোগ নামাইবে।

চারিদ্বার পূজা :

(পূর্বদ্বার)

পূর্বদ্বার বন্দি শিরে করি বন্দি অবিরত,
চরণ বন্দি বন্দি নমস্তে।
ভয় বিঘ্ন খণ্ডেত্রি জগৎ পাল
ভূত নাথ নমঃ নমস্তে॥ (পূর্ব দিকে সুপারি চালিবে)

(উত্তর দ্বার)

উত্তরে কাল ত্রিভুবন জাল ভয় বিঘ্ন খণ্ডে
জগৎ পাল ভূত নাথ নমঃ নমস্তে। (সুপারি উত্তর দিকে চালিবে)

(পশ্চিম দ্বার)

পশ্চিম দ্বারে গুরিক্ষেত্র পাল সিংহদ্বারে জাল
ভয় বিঘ্ন ত্রিজগৎ পাল
বূত নাথ নমঃ নমস্তে॥ (ঐ রূপে চালিবে)

(দক্ষিণ দ্বার)

দক্ষিণ দ্বারে ভিম নিশির পর নিশি ভোগ সবার কিসি।
তোমার মহিমা আমি কি বুঝিতে পারি॥
ভোগে এসে হও অধিষ্ঠান হাজরা অধিকারী॥
ভয় বিঘ্ন খণ্ডে ভূত নাত নমঃ নমস্তে।
ভোগ দেওয়া ক্ষির পাত্রের জল ছিটা দিয়া ভোগ নামাইবে

মূল সন্ন্যাসী তিন ঝাকিতে ভোগ পাতায় ঢালিয়া হাড়ি পিছনে ফেলে দিবে পরে জোড় হস্তে জল তুলসী দ্বারা ভক্তি স্তুতি ভোগ নিবেদন করিয়া প্রণাম করিবে।

(ভোগ নিবেদন মন্ত্র)

রাত্র প্রভাতের কালে ভোগ দিলাম তোমার স্থলে।
সাল শৈল বারভাজা আর সূরা পান।
ডাকিনি শাকিনি ভূত ধুত লয়ে সনে।
হাজরা অধিকারী ভোগে এসে হও অধিষ্ঠান॥
নিত্যানন্দের এই নিবেদন।
শুন হাজরা অধিকারী ভুল ক্রটি যাহা করি।
ক্ষমা করিবে ভক্ত জনের সেবক বলিয়া
করি ভক্তি স্তুতি নিবেদন এসে ভোগ করহ গ্রহণ।

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব মহেশ্বর
ভুত নাথ নম নমস্তে॥
প্রণমহস্তে নমঃ নমঃ। (প্রণাম করিবে)
সমাপ্ত

চড়ক পূজা :
(প্রথম প্রণামি পড়িয়া কাদা শুদ্ধ)
জল শুদ্ধ স্থল শুদ্ধ আপন কায়া।
আউটক মৃত্তিকা শুদ্ধ শুদ্ধ মহামায়া॥
গঙ্গা সাগর শুদ্ধ শুদ্ধ বারনসী।
তিন তীর্থের জল কাদা পবিত্র করি॥
ওঁ পবিত্র পুণ্ডরি কাক্ষং নমঃ নারায়ন।
১৬ সাঙ সন্ন্যাসী শুদ্ধ কর ত্রিলোচন॥
(কাদায় গঙ্গাজলের ছিটা দিবে)

চারি যুগ বন্দনা :
১। সত্য যুগ :
সত্য যুগে বন্দিলাম লক্ষ্মী নারায়ণ।
জীবন উদ্ধার করিলেন প্রভু দিয়া শ্রীচরণ॥
তোমার চরণ বিনা নাহি জানি আর।
লক্ষ্মী নারায়ণ পদে প্রণাম আমার॥
২। ত্রিতা যুগ :
ত্রিতা যুগে বন্দিলাম শ্রীরাম লক্ষণ।
এক বিষ্ণু চার অংশে প্রভু লভিল জনম॥
শ্রীরাম লক্ষণ আর ভরৎ শত্রুঘ্ন।
রাম সীতা শ্রীপাদ পদ্মে মজে থাক মন॥

৩। দ্বাপর যুগ :
দ্বাপর যুগেতে বন্ধি রাধা বামে কানু।
কদম্ব হিল্লল দিয়া বাজাইল বেনু॥
গোকুল নগরে জন্ম রুহিনী নন্দন।
অনন্ত প্রণাম করি প্রভুর যুগল চরণ॥
৪। কলি যুগ :
কলিযুগে বন্দি আমি শ্রীগৌর নিতাই।
সচী মাতা বিষ্ণু প্রিয়া বন্দি এক ঠাই॥
অদ্যৈত মহাপ্রভুর যত ভক্তগণ।
ছয় গোসাইয়ের পদে লইলাম স্মরণ॥

দশ অবতার মাথা খাটনি বন্ধ রাখিয়া লিঙ্গপূজা করিয়া মাথা খাটনি করিবে। মাথা খাটনি পর হাল চালান ধান্য বপন ও ধান্য ছেদন।

হাল চালানো মন্ত্র :
নমঃ নারায়ণৈ নমস্কৃত নরশ্চৈব ত্বতঃ জয়ঃ
মুদি রয়তঃ নমঃ নমঃ
(এই মন্ত্র পর হাল চালাইবে)
(কাদা খেলার কাদা দিয়া শিব লিঙ্গ তৈরী করিয়া শিব লিঙ্গ পূজা করিবে)

লিঙ্গ পূজা মন্ত্র :
ভূষবি ভূষিতং সুবিতং পিঙ্গলং
জটা জুটি দুঃখ হরনং ভৈরবি ক্ষীর বরনং
প্রণামি শিব পাপ হরনং নাগমি ভূষিতং
দিগম্বর নমমি বরনি দিবাকর নিত্য ধারনং
নীল চিতং গলে সুবিতং নমামি সদা শিব
পাপ হরনং শিবং শিব লিঙ্গ য়ৈ
ভজয়েৎ নমঃনমঃ
প্রণমহস্তে নমঃ (প্রণাম করিবে)
এখন মাথা খাটনি করিয়া কাঁদা খেলা

ধান্য বপন শ্লোক :
হরশিত হয়ে মনে দেব ত্রিলোচন।
বর্ণুকার তীরে করে ধান্যের সৃজন।।
বিশ্বকর্মার ডাক দিয়া আনিল তখন।
বিশ্বকর্মা লাঙ্গল বান্দি দিলেন তখন।।
মৈ দিয়া ভুমি করিল সোসর।
ধান্যের সৃজন করে ভুলা মহেশ্বর।।

এই শ্লোক পাঠ অন্তে মূল সন্ন্যাসী দ্বারা চারিদিকে চারিমুঠা ধান ছিটাইবে। আগে পূর্বদিকে পরে উত্তরদিকে, পরে পশ্চিম দিকে ও দক্ষিণ দিকে ছিটাইবে।

ধান্যছেদন ও আক নেওয়া পূজা মন্ত্র :
নমঃ নারায়ণৈ নমস্কৃত নরশ্চৈব
নরোত্তমঃ দেবীং সরস্বতীশ্চৈব দেবী
মহালক্ষী ত্বতঃ জয়ঃ মুদি বয়ঃ তঃ।
নমঃ নমস্তে।

(মালঞ্চ ভাঙ্গা শ্লোক)
আইস বাছা হনুমান পবন নন্দন।
আম্র ফল আনিবারে করহ গম।।
এতেক যে হনুমান শিব আজ্ঞা পাই।
মহাদেবের আজ্ঞা পেয়ে হনুমান আম ভাঙ্গিতে যাই।।
লম্ফে ঝম্ফে বীর তখন করিল গমন।
মধু বনে যেয়ে হনু দিল দরশন।।

সেই বনে ছিল রাজা মধুদৈত্য নাম।
হনুকে দেখিয়া দৈত্য করিল আক্রম॥
কার বলে আস তুমি ওহে পশু রাজ।
তুমি শুন নাই লোকমুখে আমি দৈত্য রাজ॥
আমার বনেতে যদি ভাঙ্গ মধু ফল।
পাইবে ভীষণ শাস্তি জানিবে সকল॥
হনুমান বলে বীর নাহি করি ভয়।
ফল লয়ে বীর নাহি করি ভয়।
ফল লয়ে যাব আমি শিবের আলয়॥
দৈত্য বলে হনুমান এইবার যাবে জানা।
এক লম্ফে ফল ছিড়ে আন দেখি আপনা॥
তুমি বড় বৃক্ষের ফল যদি ছিড়িবারে পার।
তবেতে জানিব আমি তুমি রামের কিঙ্কর॥
এত শুনে হনুমান উঠে বড় গাছে।
ফল ছিড়ে এক লম্ফে আসে মহাদেবের কাছে॥
ফল পেয়ে মহাদেব বড়ই সন্তুষ্ট হইল।
বহুমতে মণুমানের আশীর্বাদ করিল।

উক্ত শ্লোক পাঠ অন্তে মালঞ্চ ছিড়িয়া নিয়ে সকলেই ঘাটে গমন। কাদা খেলে ও মালঞ্চ ভাঙ্গা সমাপ্ত

চড়ক পূজা সমাপ্ত।

শ্রী শ্রী ভগবতী পূজা :

শ্রী শ্রী শিব ভগবতী পূজা নিয়ম করণ যথা—

প্রাতে সূর্যোদয়ের পূর্বে পাটবান ঘাটে স্নান করাইয়া গম্ভিরে আনিয়া–কাচা হরুদ রস, কুমকুম, গুগগুল, কস্তরি, চম্বুক চন্দন, সার চন্দন ও সুগন্ধি তেল মিশ্রিত করিয়া পাটবানে মাখাইয়া কাচা দুগ্ধ ও ডাবজলে পাঠবান স্নান করাইয়া পাটের মাথায় সিঁদুর দিয়া পাটের গলায় ৩টা ফুলের মালা দিয়া দিবে। পরে পাটবানে শিব ভগবতী পূজা করিয়া পাটবান রাখিবার জায়গায় তুলিয়া রাখিয়া দিতে হইবে।

পূজা :

ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু

ওঁ শিব ভগবতী পূজাদিভ্যোয় নমঃ

প্রণমোহস্তে নমঃ নমঃ

ঘট স্থাপনের দিন যেসব দ্রব্য লাগিবে :

একটি ঘট, ঘটমুখে একটি শিশ ডাব, পঞ্চপল্লব ও একখানা লালচি, চারটা তীর, তীরে লালি সূতা বাঁধিয়া দিবে। ঘটের বামে একটা আঁড়ি পাতিবে। আঁড়িতে ধান দিবে ও লালচি দিয়া আঁড়ি ঝাপিয়া দিবে ও আমেশ্বার দিবে। ঘটে সিঁদুর, ডাবমুখে সিঁদুর দিবে, আঁড়িতে সিঁদুর দিবে। কিছু আতপ চাল, কিছু বাতাসা, তিনটি পাকা কলা, গঙ্গাজল, কাচা দুধ, তুলসী

পাতা ও ফুল ফল ইত্যাদি লাগিবে। ঘটস্থাপনের জায়গায় আলোমাটি দ্বারা প্রলেপ দিয়া ঘট বসাইবে ও ঘটে জল দিয়া ঘট বসাইয়া পূজা করিবে।

(গুম্ভির পূজার ফর্দমালা)

একখানা কুলা ও কুলা সজ্জা–আয়না, চিরুনী, ঘমসি মালা, ত্রিফলা, লাল সূতা, আলতা, সিঁদুর, সিঁদুর কৌটা, শাঁখা খাড়ু, শ্বেত সরিষা, পঞ্চ বর্ণের গুড়িকা, কর্পূর, মধু, মধুপক্ক বাটী, কুমকুম, গুগগুল, চম্বুক চন্দন, রক্ত চন্দন, সার চন্দন, জটা মাংসি, মহৌষধি, ৫টি পৈতা, মোমবাতি, ধূপ, ধুনা, ১৬টি উত্তরি, পীত অঙ্গরী, শীল অঙ্গরী, আসন অঙ্গরী, গঙ্গা মৃত্তিকা, গাঁজা ও নীল ধুল বাঁধা নীল। বার ভাজা, পান মসলা, আতপ চাউল পাঁচ পোয়া, বাতাসা পাঁচ পোয়া, চিনি পাঁচ পোয়া, পাকা কলা ৫ গণ্ডা, পেড়া সন্দেশ দুইটা, কিছু লুচি পুরি, দধি পাঁচ পোয়া, দুগ্ধ, ঘি, মধু, ছানা, ক্ষীর, পান, সুপারী, নারিকেল, ডাব, শিশ ডাব, শিশির জল এড়ে গুরুর ডান শিং এর মাটি, বরাহ দন্তের মাটি, পদ্ম, পুষ্প, ফল, ফুল ইত্যাদি।

বস্ত্র সজ্জা : শিব ভগবতীর জোড় শাড়ী, আঁড়ি ঢাকা লক্ষ্মীর শাড়ী, ঘট মুখে গামছা, মূল সন্ন্যাসীর গামছা ৩খানা, মালঞ্চ বান্ধা গামছা, নীল ধুল বান্ধা লালচি একখানা, পাটবান ঢাকা কাচা ও মড়া ঢাকা গামছা একখানা ইত্যাদি।

কুমার সজ্জা : একটা ঘট, তাম্বুর হাড়ী একটা, ক্ষীর পাত্র হাড়ী একটা, ভোগ রান্না হাড়ী একটা, কোলকে ২টা, ধুনচি ১টা, প্রদীপ ১টা, নীল ধুল বান্ধা ছোট মুচি ২টা, বড় সরা ২টা, বড় মুচি ২টা ও নৈবদ্য আসনের জন্য ছোট মুচি ১৬টা ইত্যাদি।

পরিশিষ্ট–৫

রাজবংশী সমাজে ব্যবহৃত শব্দাবলি

অ		বাংলা অর্থ
১. অইটে	:	ওখানে
২. অইলে	:	রইলে
৩. অক ওঠা	:	বমি ওঠা
৪. অকুমারী	:	অবিবাহিত
৫. অখুটা	:	মন্দ কাঠ
৬. অগ/রগ	:	শিরা
৭. অঙচঙের নাচ	:	রঙ্গরসিকতা প্রকাশক নাচ
৮. অচোদা	:	অর্থহীন
৯. অতন	:	রতন
১০. অথৈ	:	ঠাঁইহীন
১১. অসা/রসা	:	পাটের মোটা দড়ি
১২. অসিয়া বন্ধু	:	রসিক বন্ধু

আ		
১. আঁই	:	মা
২. আঁইটে	:	খাবারের উচ্ছিষ্টাংশ
৩. আইল	:	ক্ষেত্রের চতুর্দিকের মাটির বন্ধনী
৪. আঁউড়ি	:	বাঁশের চাটাইয়ের তৈরি ধান রাখার গোলাঘর
৫. আউঙ–বাউঙ	:	অসংলগ্ন
৬. আওলা পাউলা	:	এলোমেলো
৭. আউডাল	:	আড়াল
৮. আউলাইল	:	আলুথালু
৯. আউলা–বাউলি	:	ছটফট
১০. আকচানো	:	একত্রিত করা
১১. আকা–বাকা	:	তাড়াতাড়ি, দ্রুততত্তার সাথে
১২. আকারী	:	আ–কাঁড়া, ধানযুক্ত বা অপরিষ্কার চাউল
১৩. আঁখা	:	চুলা, উনুন
১৪. আখোয়াল	:	রাখাল
১৫. আগত	:	আগেতে

১৬. আগাল	:	অগ্রভাগ
১৭. আগুম-নিগুম	:	আগম-নিগম (তন্ত্র শাস্ত্রে ব্যবহৃত)
১৮. আক্ষি	:	চোখ
১৯. আঙা	:	রাঙ্গা
২০. আঙা-পাঙা	:	চঞ্চল
২১. অ্যাঙা-প্যাঙা	:	ঘ্যানর-ঘ্যানর
২২. আজা	:	মাতামহ
২৩. আজি	:	মাতামহী
২৪. আজারি	:	খালি, অর্থহীন
২৫. আঁটা	:	সংকুলান হওয়া, শক্ত হওয়
২৬. আটো	:	ছোট-খাটো
২৭. আটোশ	:	পোশাক
২৮. আত্তু	:	কুকুরকে আহ্বানের ডাক
২৯. আতি	:	রাত্রী
৩০. আন্দন	:	রান্না করা
৩১. আবং	:	খাঁটি
৩২. আবো	:	ঠাকুমা, দিদিমা
৩৩. আভোং	:	নতুন
৩৪. আম্বল	:	টক
৩৫. আরার বাঁশ	:	বাঁশের থোকা
৩৬. আলাঙ-নাথাঙ /থাঙ-নাথাঙ	:	ছলাকলাদির ব্যবহার
৩৭. আলে-ছালে	:	এলোমেলোভাবে
৩৮. আড়	:	রামধনু
৩৯. আআড়	:	বেড়া
৪০. আড়ি	:	সারি

উ

১. উদাং	:	খোলা, নগ্ন
২. উনিঝুনি	:	চুলবাঁধা খোপার ধরন বিশেষ
৩. উপড়ানো	:	সমূলে তুলে ফেলা
৪. উপা	:	রূপা
৫. উম	:	ঈষদুষ্ণ, হালকা গরম
৬. উমরা	:	ওরা
৭. উয়া/রুয়া	:	খড়ের ঘরের চালে ব্যবহৃত বাঁশ
৮. উরাং-পারাং	:	উথাল -পাথাল
৯. উরাং বাইরাং	:	উড়ু উড়ু করা।

এ

১. এ্যালাও	:	এখানে
২. এলুয়া-কাশিয়া	:	অল্প পানিতে জন্মানো ঘাসজাতীয় গুল্ম

ও

১. ওগ	:	রোগ
২. ওম	:	হালকা গরম
৩. ওমা-ওমা	:	ঈষদুষ্ণ
৪. ওশার	:	চওড়া, প্রসার

ঔ

১. ঔদ	:	রৌদ্র

ক

১. কমর	:	কোমর
২. করতোয়া	:	নদীবিশেষ
৩. কাইন	:	নিকাহ্, বিয়ে
৪. কাইজ্যা	:	ঝগড়া-বিবাদ
৫. কাউয়া	:	কাক
৮. কাঁকই	:	চিরুনী
৬. কাউ কাউ করা	:	হন্যে হয়ে খোঁজা
৭. কাছার	:	নদীর তীর, পাড়
৯. কাঙ্খে	:	কোমরে, মাঞ্জায়
১০. কাথা	:	কথা
১১. কাল্	:	ঠাণ্ডা
১২. কায়/কাঞঞ	:	কে
১৩. কাংতানো	:	খুটির প্রান্তভাগ ছ্যাও করে (ঢালুভাবে) কর্তন
১৪. কালাই যাওয়া	:	ঠাণ্ডা হওয়া
১৫. কারুর	:	কাহাকেউ
১৬. কিরা	:	দিব্যি
১৭. কুচকুচে কাল	:	অতিশয় কালো
১৮. কুরুয়া	:	চিল, ঈগল
১৯. কুশিয়ার/কুশারী	:	আখ
২০. কুশিয়ারা	:	নদীর নাম
২১. কুরাকুরি	:	একপ্রকার জলজ পাখি
২২. কোনঠে	:	কোথায়
২৩. কোষ্টা/কুষ্টা	:	পাট
২৪. কৈতর	:	কবুতর, পায়রা

২৫. কোলাতে : কোলে
২৬. কামি : বাঁশের বাখারি
২৭. কোবোত্ কোবোত : কড়কড় শব্দ
২৮. ক্যাউ ক্যাউ করা : সারাক্ষণ ঘ্যান ঘ্যান করা (বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত)
২৯. কলার থাতি : কলার ছড়া

খ

১. খসখসে : অমসৃণ
২. খলত : উঠান
৩. খসানো : খুলে ফেলা
৪. খামাকা : অনর্থক
৫. খাড়ু : লৌহা, তামা ইত্যাদি দ্বারা তৈরি চুড়ি
৬. খেসক : গর্বিত
৭. খুরা : কাঠের পায়া
৮. খোঙখোঙা : ফাঁপা
৯. খোপ : ঝোঁপা
১০. খোলান : খামার (ধান, গম সাড়াইয়ের স্থান)।
১১. খোঁটা : পূর্বের কোনো কথা বা বিষয় বারবার স্মরণের মাধ্যমে অপমান
১২. খোঁপ : কুটরী

গ

১. গগান : চিৎকার করা
২. গতর : শরীর
৩. গবগব : জলপতনের শব্দ
৪. গাইন : উদুখলে ধান ভানার দণ্ড
৫. গাইরস্থ : গৃহস্ত
৬. গাঙ : নদী
৭. গাঙচিল : নদীতে থাকা একপ্রকার চিল
৮. গাব : রং
৯. গাবান : রং করা
১০. গাবুর : যুবক
১১. গাবুর বেটা : যুবক বন্ধু
১২. গাভিন : গর্ভবতী
১৩. গালা : গলা
১৪. গাড়া : গর্ত
১৫. গাড়িয়াল : গাড়োয়ান
১৬. গিথ্যানি : গৃহিনী
১৭. গিদালী : গায়িকার দল

১৮. গুরা : গলুই
১৯. গুয়া : সুপারি
২০. গোঁসা : রাগ, ক্রোধ
২১. গ্যাদর/গ্যাদরা : ময়লা

ঘ
১. ঘরৎ : ঘরে।
২. ঘাটা : পথ।
৩. ঘান্টি : ঘন্টা।
৪. ঘোঙর : ঘোমটা।
৫. ঘুঙরা : ঘুঙুর।

চ
১. চরু : উরু
২. চরোৎ : চরেতে
৩. চাইপর : চৌ-প্রহর
৪. চাইলোন : চালুন
৫. চাকা : স্বাদ পরীক্ষা করা/খাওয়া
৬. চাংরা : দলাপাকানো, শক্ত ইট বা মাটির খণ্ডাংশ
৭. চাঁড়ি : গরুর ঘাস-পল খাওয়ানোর পাত্র।
৮. চিকের : চিৎকার
৯. চিটা : আঠাল
১০. চিলকা : বর্ষণ
১১. চাঙরা : বাঁশের তৈরি উঁচু বসার স্থান।
১২. চুকো : টক
১৩. চেংরি : মেয়েদের সম্বোধনের শব্দ।
১৪. চোঙ : গিরাহীন ফাঁপা বাঁশদণ্ড
১৫. চ্যাট : পুরুষাঙ্গ
১৬. চ্যাট-ডাংরা : বড় পুরুষাঙ্গ যার
১৭. চ্যাংরা : ছেলেদের সম্বোধনের শব্দ
১৮. চ্যাং : টাকি মাছ
১৯. চিলাং-ঝাটাং : এলোমেলো

ছ
১. ছনছনা (ছেনছনা যৌবন, ছনছনাধার) : পূর্ণ, ভরা
২. ছাওয়া/ছাওয়াল : ছেলে
৩. ছাতি : বুক
৪. ছেড়নি : পাতলা দাস্ত

৫. ছোড়ানি	:	চাবি
৬. ছ্যাও/শ্যাও	:	নীচ/ঢালু
৭. ছ্যাকেন	:	দুধ দোয়ান
৮. ছ্যাঙ ছ্যাঙা	:	অতি ঠাণ্ডা
৯. ছ্যাচড়া	:	লোভী
১০. ছ্যানা	:	মাখানো
১১. ছ্যাপ	:	থুথু
১২. ছ্যামরা	:	বালক অর্থে

জ

১. জঙল	:	জঙ্গল, ঝোঁপ
২. জলঙ্গা	:	মাছধরার যন্ত্র
৩. জাঙ	:	জঙ্ঘা, যোনী
৪. জুত	:	সুবিধা

ঝ

১. ঝটক	:	কিছু
২. ঝাকা	:	চাঙারি
৩. ঝ্যাঙঝ্যাঙা	:	ফাঁক ফাঁক গাঁথুনি
৪. ঝাংঝাং	:	উচ্চ কণ্ঠে ডাকাডাকি।
৫. ঝামা	:	বেশি পোড়া কাল্‌চে রঙের ইট
৬. ঝিনই	:	ঝিনুক
৭.ঝুনা	:	পাকা

ট

১. টঙটঙ	:	টং টং শব্দে কাড়ার বাজনা
২. টাটি	:	খড়ের বেড়া
৩. টাটি গুড়	:	শক্ত গুড়
৪. টারিটারি	:	পাড়ায় পাড়ায়
৫. টিঙটিঙা	:	সরু বা শুষ্ক
৬. টুই	:	সন্তানবতী হাতি
৭. টুটি	:	গলা
৮. টুভুয়া	:	লুকোচুরি।
৯. টেঙি	:	হাত–কোদাল
১০. টোঙ্ক	:	শক্ত
১১. ট্যাঙা	:	টক
১২. ট্যাঙনা	:	হিংসুটে

১৩. ট্যামা : কৌটা
১৪. টোপলা : বোচ্কা

ঠ
১. ঠটি কলা রম্ভা কলা
২. ঠাটু : বন্যা
৩. ঠেঙা, ঠেঙ্গা : বাঁশের দণ্ড, লাঠি
৪. ঠেঙান : পিটানো, প্রহার করা
৫. ঠেঙো : গোড়ালির উপর কাপড় পরলে বলা হয়
৬. ঠোসা : ফোসকা
৭. ঠ্যাং : পা

ড
১. ডলা : মালিশ করা
২. ডাঙর : বড়
৩. ডাঙরা : বড়
৪. ডাঙেয়া : পিটিয়া
৫. ডিংসলি : মজবুত
৬. ডিঙা/ডোঙা : কাঠের গুড়ির তৈরি নৌকা
৭. ডুয়া : দেয়ালের ভিত্তি
৮. ডেরু : মাছধরার যন্ত্র
৯. ডোঙা ভোঙডোঙা : বড় ছিদ্র

ঢ
১. ঢলঢলে : পাতলা (ঘনতরল পদার্থ)
২. ঢালকাউয়া : দাঁড়কাক
৩. ঢালাফোতা : বড় রঙিন বস্ত্র
৪. ঢুম : ঢোল
৫. ঢোঙা : কলার খোলা, পানি সেচার পাত্র
৬. ঢ্যাঙা : লম্বা

ত
১. তক্তা : চেরানো কাঠ,
২. তম্‌রা : তোমরা
৩. তাতা : গরম হওয়া
৪. তামাতি : নাগাদ, পর্যন্ত
৫. তিস্তা : নদীর নাম
৬. তুয়াজ করা : ভয়ে কাউকে মান্য করা
৭. তেঁও : সত্ত্বেও

৮. তেরিবেরি	:	বক্রভাব। ঘোর-প্যাঁচাল স্বভাবের লোকের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত।
৯. ত্যানা	:	ন্যাকরা
১০. তোরষা	:	নদীর নাম

থ

১. থৈ	:	ঠাঁই, সীমা
২. থান	:	দেবস্থান
৩. থুতু	:	চিবুক
৪. থুবড়ো	:	বেশী বয়স অবধি অবিবাহিত
৫. থুরি	:	বাঁশের চোঙা
৬. থুয়া	:	রাখা
৭. থেত	:	চ্যাপ্টা
৮. থেবড়া	:	চ্যাপ্টা, ভোঁতা
৯. থোক	:	মোট, গুচ্ছ
১০. থ্যাতলানো	:	চ্যাপ্টা বা পিষ্ট হয়ে যাওয়া
১১. থ্যারথ্যারা	:	কুশ্রী

দ

১. দলা	:	একত্রিত অবস্থা
২. দলোঙ	:	সেতু
৩. দলামলা করা	:	কোনো জিনিস হাত দ্বারা নিষ্পেষণ করা (কাগজ, কাপড়)
৪. দাফনা	:	উরু
৫. দিয়ারী	:	মাটির প্রদীপ
৬. দিসে-না-পাওয়া	:	কিংকর্তব্যবিমূঢ়
৭. দুরদুরায়	:	গুড় গুড়
৮. দেওয়ান	:	সভা
৯. দেহা	:	দেহ
১০. দোনামনা	:	দ্বিধা বিভক্ত চিন্তা

ধ

১. ধমাধম	:	তাড়াতাড়ি, দ্রুত
২. ধিক্‌ধিক্‌	:	ধুক্‌ ধুক
৩. ধুরা	:	মহিষের বাথান, আস্তানা
৪. ধোরকা	:	মাছ ধরার যন্ত্র।

ন

১. নগুল	:	আঙ্গুল
২. নথ	:	রথ
৩. নাগে	:	লাগে

৪. নাঙ	:	উপপতি, পরপুরুষ বা অবৈধ প্রেমিক
৫. নাড়া	:	জমিতে রাখা ধান গাছের অবশিষ্টাংশ
৬. নিংড়া	:	চাপিয়া নিঃশেষে (রসাদি) বের করা
৭. নিন/নিন্দ	:	ঘুম
৮. নেলজ্ব	:	নির্লজ্জ
৯. ন্যাকারে–থ্যাকারে	:	হেলেদুলে

প

১. পঙোর	:	সাঁতার
২. পটুয়া	:	কলাগাছের খণ্ড
৩. পন্থ	:	পথ
৪. পরার	:	পরের, অন্যজনের
৫. পাক	:	ঘোরা
৬. পাটানি	:	রেশমী বস্ত্র
৭. পাতারে	:	পাথারে
৮. পালা	:	গাদা, স্তুপ
৯. পালামারা	:	স্তুপ করা
১০. পছিম	:	পশ্চিম
১১. পিঠেৎ	:	পিঠে
১২. পিন্দান	:	পরা (বস্ত্রাদি)
১৩. পিঁপিরা	:	পিঁপড়া
১৪. পুঙা	:	মলদ্বার
১৫. পুটা	:	সর্দি, সিমেন
১৬. পুয়াঁতি	:	গর্ভবর্তী
১৭. পোছে	:	জিজ্ঞাসা করে।

ফ

১. ফাকিয়া	:	ছোট ছোট করে কাটা
২. ফ্যাৎরা	:	খেঁজুর, নারিকেল, তাল প্রভৃতি গাছের ডাগবেষ্টিত ছোবড়া
৩. ফারা	:	চিরা, ছেঁড়া
৪. ফুটোনি মারা	:	অহং করা, অতিরিক্ত গর্বিত হওয়া
৫. ফেরখাটা	:	দ্রুত এলোমেলোভাবে ঘোরা
৬. ফোতা	:	কাপড়
৭. ফোসা	:	ফোস্কা

ব

১. বইনক	:	বোনকে
২. বগলে	:	পাশে
৩. বতর	:	মৌসুম

৪. বন্ধু : বন্ধু
৫. বশ : লাউয়ের খোল
৬. বলক উঠা : টগবগ করে ফোটা, উথ্‌লে উঠা (তরল পদার্থের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত)
৭. বাইগন : বেগুন
৮. বাইজ : বাজনা
৯. বাইওক : দিদি
১০. বাইরাং বাইরাং : ধুক্‌পুক করা, উথাল-পাথাল করা
১১. বাউদিয়া : ভবঘুরে, পরপুরুষ প্রেমিক
১২. বাঁজা/বাজী : বন্ধ্যা নারী
১৩. বাকরা : মাঠ
১৪. বাসনা : সৌরভ, গন্ধ
১৫. বাসই : মই
১৬. বাও : বাতাস
১৭. বাথান : গো-মহিষ চরিবার বা থাকার স্থান
১৮. বাপা/বাপ : বাবা
১৯. বাইষ্যা : বর্ষা
২০. বাণা : বৃষ্টি
২১. বিছন : পাখা
২২. বিত্‌রি : আউশ ধান
২৩. বিদি : গুল্ম জাতীয় গাছ
২৪. বিয়ান : ভোর, প্রত্যূষ কাল
২৫. বৈদ : কিশোর বালক
২৬. বোলভাত : গরম ভাত
২৭. বৈরাতি : বরযাত্রী
২৮. ব্যাদেলেং : জলজোঁক
২৯. ব্যাঙ : ভেক
৩০. ব্যানা : বাদ্যযন্ত্র
৩১. ব্যাদা/বিদা : কৃষিকাজে ব্যবহৃত আগাছা পরিষ্কারক যন্ত্র।

ভ

১. ভরমিয়া : ধরিয়া/যাবৎ
২. ভরকে যাওয়া : ভয় পাওয়া
৩. ভাকুরা গালি : আজেবাজে গালি
৪. ভুরা : কলার ভেলা
৫. ভুলকি : উঁকি
৫. ভুগুল : ছিদ্রপথ
৭. ভুশুং ভাশাং : এলোমেলো হয়ে থাকা

৮. ভেংরুল	:	ভিমরুল
৯. ভেলি	:	ঝুড়ি
১০. ভোতরা	:	ভোঁতা
১১. ভ্যাঙানো/ ভ্যাংচানো	:	মুখ বিকৃত করে ব্যঙ্গ করা

ম

১. মঙ্গা	:	না–পাওয়ার ফলে সৃষ্ট সঙ্কট
২. ময়া	:	মায়া
৩. মটুক	:	মুকুট
৪. মধুয়ার	:	নলখাগড়া জাতীয়
৫. মাঙ	:	যোনী
৬. মাঙনা	:	বিনি পয়সায়, শুধু শুধু
৭. মাঙ–ডাঙরি	:	বড়যৌন দ্বার যার
৮. মাজা ভক্ষা করা	:	যৌনীদ্বার যার
৯. মাঞ্জা	:	কোমর
১০. মাঁচা	:	উঁচু স্থান বিশেষ (বাঁশের তৈরি)
১০. মাউগ	:	হীনচরিত্রের স্ত্রীলোক
১২. মাঝিয়াৎ	:	মেঝেতে
১৩. মারেয়া মশাই	:	যে গৃহস্বামীর বাড়িতে পূজা হয়
১৪. মাঠা/মাটা	:	ঘোল
১৫. মাথা–ডাঙরি	:	বড় মাথা যার
১৬. মুচি	:	বিচি
১৭. মুরা	:	শেষ সীমা
১৮. মুতুরা	:	বারবার প্রস্রাব করে যে
১৯. মেচড়ি	:	পুঁইশাকের ফল
২০. মোঁচ	:	গোঁফ
২১. মোটে	:	শুধু, কেবলমাত্র
২২. মোক	:	আমাকে
২৩. মৈলাম	:	ময়লা

র

১. অসিয়া বন্ধু	:	রসিক বন্ধু
২. রন্ন	:	অন্ন, ভাত
৩. রাও	:	শব্দ

ল

১. লগেৎ	:	সাথে
২. লণ্ডভণ্ড	:	হয়বরল অবস্থা সৃষ্টি

৩. লাহাক : বৃথা, অর্থহীন
৪. ল্যাটা : বিপদ

শ
১. শাঙনা : উপপতি; দ্বিতীয় বা তৃতীয় বিয়ের স্বামী

স
১. সগায় : সকলে
২. সনা : সোনা
৩. সাং : গ্রাম
৪. সারিন : কুমারী
৫. সারিন্দা : বাদ্যযন্ত্র
৬. সাওয়াদ : স্বাদ
৭. সিরসিরাসে : কাঁপছে
৮. সোন্দানো : প্রবেশ করানো, ঢুকানো
৯. স্যানে : তবে

হ
১. হরিয়াকোণ : উত্তর-পশ্চিম কোণ
২. হরিকায় যাওয়া : ভয় পাওয়া
৩. হরবর : দ্রুত, তাড়াতাড়ি
৪. হাউস : সখ
৫. হাগা : মলত্যাগ করা
৬. হাগুরা : যে বার বার মলত্যাগ করে
৭. হাঙরা : বাঁশের বেড়া
৮. হাতচাবি : ছোট চাকজাল (মাছ ধারার যন্ত্র)
৯. হাফা : বনবিড়াল
১০. হিম : ঠাণ্ডা
১১. হিলহিলা : দোলা
১২. হেমতি : আমন ধান
১৩. হোলা : শাপলা ফুল
১৪. হুকারী দেওয়া : উলুধ্বনী দেওয়া
১৫. হুলুক ভুলুক : উঁকি
১৬. হ্যাটাঙ-ট্যাঙরা : ছোট বড়, উঁচু-নীচু